শ্রীমান প্রবুদ্ধ মজুমদার
শ্রীমতী মিতা মজুমদাব
পরম স্নেহভাজনেষু

ভূমিকা

প্রায় দুই দশক আগে আদিবাসী লোককথার দুটি খণ্ড প্রকাশিত হয়েছিল। আফ্রিকা ভারত ফিলিপিনিস্ দ্বীপপুঞ্জ মেলানেশিয়া মাইক্রোনেশিয়া পলিনেশিয়া ও আস্ট্রেলিয়ার একষট্টিটি আদিবাসী লোককথা ছিল সেই দুটি খণ্ডে। প্রকাশিত সেই সব লোককথার সঙ্গে লাতিন আমেরিকা গ্রিনল্যাণ্ড আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র সাইবেরিয়া চিন মোঙ্গোলিয়ার আদিবাসী জনগোষ্ঠীর লোককথা যুক্ত করে বর্তমান গ্রন্থটি প্রকাশিত হল। প্রথম দুটি খণ্ড প্রকাশের পর পাঠকদের কাছ থেকে অনুকূল সাড়া পেয়ে তৃপ্তি বোধ করেছি। দীর্ঘদিন আগেই দুটি গ্রন্থ নিঃশেষিত হয়ে যায়।

প্রকাশিত সমস্ত লোককথাই দুনিয়াজোড়া আদিবাসীদের মৌখিক সাহিত্যের উজ্জ্বল ঐতিহ্য বহন করছে। সমস্ত লোককথাই আগে সংগৃহীত হয়ে ইংরেজি ভাষায় অনূদিত হয়ে পুস্তক আকারে প্রকাশিত হয়েছে। এই অর্থে এগুলি আদিবাসী মৌখিক ভাষা থেকে অনুবাদের অনুবাদ। তবে, যেসব ইংরেজি গ্রন্থ থেকে এইসব লোককথা অনুবাদ করেছি সেগুলি মূল আদিবাসী মৌখিক ভাষা থেকে সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞানীরা অত্যন্ত নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সঙ্গে ভাষান্তরিত করেছেন। আমি খুব পুরনো গ্রন্থের ওপরেই বেশি নির্ভর করেছি। কেননা, লোকসমাজ যখন আরও সংহত ছিল তখনকার মানসিকতার ছাপ এর মধ্যে পাওয়ার সম্ভাবনা বেশি। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর থেকেই আদিবাসী জনগোষ্ঠীর সঙ্গে বৃহত্তর দুনিয়ার যোগাযোগ ঘনিষ্ঠ হতে শুরু করে। তারও আগে উনিশ শতকের গোড়া থেকে গ্রেট ব্রিটেন ফ্রান্স পোর্তুগাল জার্মানি নেদারল্যান্ড আমেরিকা নরওয়ে প্রভৃতি দেশের প্রশাসক ও খ্রিস্টীয় যাজক পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে ছড়িয়ে পড়েন এক বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে। খ্রিস্টধর্ম প্রচার ছিল মূল উদ্দেশ্য। আর সবচেয়ে অনুন্নত হতভাগা দরিদ্র নিগৃহীত অবহেলিত সরল আদিবাসীদের মধ্যেই যাজকেরা ধর্ম প্রচারের উপযুক্ত ভূমির সন্ধান পেয়েছিলেন। অবশ্য একথা মানতেই হবে, এইসব পুরোহিত ধর্ম প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য বিষয়েও মহৎ কাজ করেছেন। যে কুষ্ঠরোগীকে গ্রাম থেকে তাড়িয়ে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেওয়া হত, খ্রিস্টান যাজকেরা পরম যত্নে তাদের আপন করে চিকিৎসার ব্যবস্থা করেছেন, অন্তত মানবিক ব্যবহার করে কুষ্ঠরোগীদের মানসিক শক্তি জোগাতে সমর্থ হয়েছেন। যাজকদের এই মহত্ত্বকে অস্বীকার করে লাভ নেই। এইসব কাজের সুবাদেই অনেক যাজক আদিবাসীদের অনেক লোককথাও সংগ্রহ করেছিলেন। কেন সংগ্রহ করেছিলেন তা আজ আর জানবার উপায় নেই। কিন্তু এইসব থেকে পরবর্তী গবেষকরা উপকৃত হয়েছেন। আবার একথাও সত্যি, এমন অনেক যাজক ছিলেন যারা সাদা 'পবিত্র' পোশাকের আড়ালে উপনিবেশবাদীদের চক্রান্তকে সফল করার কাজে কুৎসিত বীভৎস

ভূমিকা পালন করেছিলেন। এইসব কুচক্রী যাজকেরাও অনেক লোককথা সংগ্রহ করেছিলেন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়কালে বৃহত্তর সমাজের সঙ্গে আদিবাসীদের সম্পর্ক নিবিড়তর হয়। ঔপনিবেশিক শোষণের বিরুদ্ধে দেশে দেশে বিশেষ করে এশিয়া আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার অনেক দেশে জাতীয় মুক্তিসংগ্রাম শুরু হয়। অনেক দেশ রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের পর স্বাধীনতা লাভ করে। আধুনিক শিক্ষা প্রসারিত হল, আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের পরিকল্পনা গ্রহণ করল জাতীয় সরকার, স্বাস্থ্য-সচেতনতা বৃদ্ধি পেল,—অর্থাৎ হাজার হাজার বছরের অন্ধকার বিচ্ছিন্ন জীবন ও গণ্ডিবদ্ধ পরিবেশ থেকে মুক্ত হওয়ার অনুকূল অবস্থা দেখা দিল। এটাই অভিপ্রেত। আদিবাসীদের উন্নত সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে শ্রদ্ধার সঙ্গে বহন করতে হবে, সেই সঙ্গে আধুনিক দুনিয়ার বিজ্ঞাননির্ভর শিক্ষা ও সংস্কৃতির আলোকও গ্রহণ করতে হবে। বিচ্ছিন্ন হয়ে বসবাস করার মধ্যে জনগোষ্ঠীর কোনো মঙ্গল হতে পারেনা, সামাজিক-সাংস্কৃতিক উন্নয়ন ঘটাও অসম্ভব। 'অতীত অন্ধকারের' মধ্যে তাদের বিচ্ছিন্ন করে রাখার পরিকল্পনা অমানবিক, সামাজিক অপরাধের অপর নাম। এই সুস্থ স্বাভাবিক যোগাযোগের ফলে চিন্তা-চেতনা-শিক্ষা-স্বাস্থ্যভাবানার পরিবর্তন ঘটবে, বৃহত্তর সমাজে আমরা সকলে ভ্রাতৃত্ব-বন্ধনে আবদ্ধ হব, আমরা এক হব, —আজকের দিনে এই মানসিকতার প্রয়োজন রয়েছে। 'শিকড়ের সন্ধান' ভালো কিন্তু আধুনিক জীবনে এই সন্ধান অনেক সময়েই সংকীর্ণতার জন্ম দেয়, আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের আড়ালে কদর্য বিচ্ছিন্ন মানসিকতার উৎস-মুখ খুলে দেয়। ভারত ও আফ্রিকার কয়েকটি দেশে 'শিকড়ের সন্ধান' বড় মর্মান্তিক অবস্থার মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিয়েছে আমাদের। আদিবাসীদের পুরোনো ঐতিহ্যকে স্মরণ ও শ্রদ্ধা করতে হবে, কিন্তু নতুন ভাবানায় উদ্দীপিত না হলে ও জীবনকে না পালটালে আদিবাসীসহ সমস্ত সমাজেরই অমঙ্গল।

আদিবাসী লোককথার সাহিত্যিক মূল্য বড় বিস্ময়কর। কাহিনির বাঁধুনি ও গল্পের আকর্ষণ নাগরিক মনকে গভীরভাবে টানবে। অনেক লোককথা আধুনিক ছোটগল্পকে মনে পড়িয়ে দেয়, বিশেষ করে লোককথার শেষ দু-তিনটি বাক্য যেন বুকে গিয়ে বেঁধে। আদিবাসীদের জীবন সরল, সেখানে জটিলতা কিংবা সামাজিক-পারিবারিক দ্বন্দ্ব প্রায় বিরল,—অথচ লোককথায় এমন সব দার্শনিক মন্তব্য ও অভিজ্ঞতালব্ধ প্রশ্নের আমরা মুখোমুখি হই যার উত্তর অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আমাদের অজানা। এই কারণেই লোককথার অভিপ্রায় বিশ্লেষণ বড় জরুরি। লোককথা শুনলাম কিংবা পড়লাম, তাতে মৌখিক ঐতিহ্যের স্বরূপ জেনে আনন্দলাভ করা গেল। কিন্তু আদিবাসীদের সমাজ-মানসিকতার পরিচয় পেতে হলে লোককথার অভিপ্রায় বিশ্লেষণ করতেই হবে। মনে রাখতে হবে, লোককথা শুধুমাত্র আনন্দের প্রকাশ নয়, এর মধ্যে লোকসমাজের বেদনাময় সংগ্রামশীল রূঢ় বাস্তবের ঐতিহাসিক রূপটি লুকনো রয়েছে। দারিদ্র, বঞ্চনা, উৎপীড়ন, জীবনযুদ্ধের জ্বালা, পারিবারিক মধুর সম্পর্ক, ভাই-বোন-স্বামী-স্ত্রী-পিতা-মাতা-প্রতিবেশীর সঙ্গে অপার বন্ধন, গোষ্ঠীপতির অত্যাচার, ভ্রষ্টাচার-অবিশ্বাস-লাম্পট্য-হীনমন্যতা-কৃপণতা, —সামাজিক জীবনের সবকিছুর সন্ধান মিলবে লোককথায়, অবশ্য লোককথার অভিপ্রায় বিশ্লেষণ না করলে এসবের সন্ধান মিলবে না। সমাজ ও

পারিবারিক সম্পর্কের যা কিছু অভিজ্ঞতা তার প্রকাশ ঘটেছে লোককথায়। সবই রূপকের আড়ালে জীবনের কথা। সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞান ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদী দর্শনের আলোকে আমি 'লোককথা পরিচয়' অংশে এই সামাজিক অভিপ্রায়ের বিশ্লেষণ করেছি। এ বিষয়ে পূর্বসূরিদের কাছ থেকে মননগতভাবে তেমন কোনো সহায়তা পাইনি। সীমাবদ্ধ ক্ষমতায় অভিপ্রায় বিশ্লেষণের চেষ্টা করেছি। আমার মনে হয়েছে, লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতির যে কোনো আঙ্গিকের অভিপ্রায় বিশ্লেষণ না করলে এই দুই মৌলিক সংস্কৃতির প্রাণ-ভোমরার অন্তর্লোকের সন্ধান জানা সম্ভবপর নয়। অভিপ্রায় বিশ্লেষণ না করলে সে গবেষণা বিবৃতিমূলক হবে, বিশ্লেষণধর্মী হবে না। আর আজকের গবেষণায় বিবৃতিধর্মী ব্যাখ্যার কোনো মূল্য নেই।

এক দেশের লোককথার সঙ্গে অন্য দেশের লোককথার আশ্চর্য মিল দেখতে পাওয়া যায়। সুদূর অতীতকালের ইতিহাস অনুসন্ধান করেও সেই দুই দেশের মধ্যে কোনো সম্পর্কের ইতিবৃত্ত জানা যায়নি। অনেক গবেষণার পরে সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞানীরা এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে, লোককথার মাইগ্রেশন অবশ্যই হয়েছে,—যেমন আফ্রিকার ক্রীতদাসদের ক্ষেত্রে ঘটেছে। কিন্তু এই প্রত্যক্ষ মাইগ্রেশন ছাড়া ব্যাপক অর্থে লোককথার যে সাদৃশ্য দেখা যায় তা লোকসমাজে নিরপেক্ষভাবেই গড়ে উঠেছে। এই বিষয়টি একটু বিস্তৃতিভাবে ব্যাখ্যা করেছি এবং 'লোককথা পরিচয়' অংশে সাদৃশ্যগুলি দেখাতে চেষ্টা করেছি।

পৃথিবীজোড়া অসংখ্য আদিবাসী জনগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের একটি আঙ্গিক লোককথার কিছু পরিচয় মাতৃভাষায় অনুবাদ করে তৃপ্তি অনুভব করছি। পাঠকগণ যদি আদিবাসী লোককথার সামান্যতম পরিচয়ও পান তাহলে আদিবাসীদের এই সমৃদ্ধ উজ্জ্বল দিকটি তাঁদের বিস্মিত করবে, এ বিষয়ে আমি নিশ্চিত। একথা ভুলব কেমন করে যে, সভ্যতাব বির্বতনের জটিল পথে আদিবাসীদের মহান সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী আমরা সকলেই।

দিব্যজ্যোতি মজুমদার

এফ ডি ৪১৭
সল্ট লেক সিটি
কলকাতা ৭০০ ১০৬

সূচি

প্রস্তাবনা

লোককথা মৌখিক ঐতিহ্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রকাশ। পুরুষানুক্রমে এই সম্পদ সংহত সমাজের মনটিকে ধরে রাখে। মৌখিক ঐতিহ্যবাহিত বলেই এর মধ্যে আদিমতা ও অকৃত্রিমতার কোন 'পবিত্র বিশুদ্ধ' গুণ থাকতে পারে না। যদিও সংহত সমাজ তাদের সংস্কৃতিকে অন্য প্রভাব থেকে বাঁচাতে সর্বদাই সচেষ্ট থাকেন। কিন্তু যত ধীরগতিতেই হোক না কেন, প্রতি সমাজেই প্রতি মুহূর্তেই বিবর্তন ঘটে যাচ্ছে। অন্যদের সংস্পর্শে না এলেও পরিবর্তন ঘটছে। প্রকৃতির সঙ্গে নিরন্তর লড়াইয়ের ফলে অভিজ্ঞতা বাড়ছে, পিতার অভিজ্ঞতা পুত্র গ্রহণ করেছেন, আবার পুত্র নতুনভাবে নতুন অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ হচ্ছেন। শিকার-কৃষি-বাসস্থান প্রভৃতিকে ঘিরে যন্ত্র ও অস্ত্রের বিবর্তন হচ্ছে, হাত ও মস্তিষ্ক আরও পটু হচ্ছে, চিন্তা-চেতনার উত্তরণ ঘটছে। সহজে অনুভূত না হলেও সামাজিক বিবর্তন ঘটেই চলেছে। পৃথিবীর কোন সমাজই প্রতিনিয়ত বিবর্তিত না হয়ে থাকতে পারে না। অভিজ্ঞতা যখন বাড়ছে, চিন্তা-চেতনায় যখন নীরব বিপ্লব ঘটে যাচ্ছে, তখন অজ্ঞাতেই তার মৌখিক ঐতিহ্যে পরিবর্তন ঘটবে, সচেতনভাবে না চাইলেও ঘটবে। যে সময়ে কথক লোককথা শোনাবেন সেই কালের কিছু সমস্যা তার মধ্যে প্রবেশ করবেই। আবার পরবর্তী পুরুষে যদি সেই সমস্যা না থাকে হয়তো লোককথার মধ্যে থেকে সেটি বাদ পড়বে। এই গ্রহণ-বর্জনের রীতিকে ধরেই লোককথা বয়ে চলে। তাই বিশেষ কোনো কালের রীতি-নীতি লোকাচারের অস্পষ্ট বেশ থেকে যেতে পারে। কিন্তু শুধুমাত্র তার ওপরে ভিত্তি করে সেই কালের ইতিহাস খোঁজা নিরর্থক।

তবু একটা কথা মনে রাখতে হবে, লোককথার মধ্যে সামাজিক মনটি ধরা পড়ে। মানুষের এমন অনেক বেদনা-ক্ষোভ-আশা-আকাঙ্ক্ষা-চাওয়া-পাওয়া আছে যা বলা যেতে পারে সর্বজনীন। কৃষিভিত্তিক সমাজের মন একরকমের আবার পশুপালক সমাজের মন অন্যধরনের। কিন্তু সেখানেও কিছু কিছু মানসিকতার মিল থাকবেই। বিশেষ কালের চিত্র ধরা না পড়লেও সর্বজনীন ও সর্বকালিক এক সামাজিক মনের হদিস পাওয়া যাবেই। লোককথাগুলি পড়লেই মনে পড়বে,—গল্পগুলি শুধুমাত্র আনন্দের প্রকাশ নয়, এর মধ্যে লোকসমাজের বেদনাময় সংগ্রামের কথা, প্রকৃতির নিষ্ঠুরতার কথা, রূঢ় বাস্তবতার কথা লুকনো রয়েছে। দারিদ্র, বঞ্চনা, ব্যর্থ প্রেম, সামাজিক অবিচার, উৎপীড়ন, জীবনযুদ্ধের জ্বালা,ষড়যন্ত্র, নিষ্ঠুরতা, মহান আত্মত্যাগ, পবিত্র মাতৃত্ব ও প্রেম চিরকালীন মানুষের মধ্যে যার সন্ধান মিলবে তারই কথা লুকনো আছে এইসব লোককথায়। জীবনের এইসব কথা হয়তো রয়ে গিয়েছে রূপকের আড়ালে। সামাজিক অভিপ্রায় ব্যাখ্যা করলে আমরা লোকসমাজের মন ও মননকে অনুধাবন করতে পারব। একথা তো মানতেই হবে, হাজারো বৈচিত্র ও বিভিন্নতা সত্ত্বেও সকলেই সামাজিক মানুষ এবং একই উত্তরাধিকার সকলের।

লোককথার মধ্যে লোকসমাজ নিজেকে যেভাবে প্রকাশ করেছে তার অভিব্যক্তির রূপটি আন্তর্জাতিক। কথকতার ভঙ্গি, রূপ ও বিষয়বস্তু একই ধরনের।[১] মানুষের আন্তর্জাতিকতাবোধ বলতে যা বোঝায় তার অনন্য নিদর্শন এই লোককথা। মহাসমুদ্রে এক বিচ্ছিন্ন দ্বীপ, গভীর বনভূমির নির্জন এলাকা, বনে-ঢাকা পাহাড়ি গুহা,—যেখানেই মানুষ রয়েছে, সমস্ত বিচ্ছিন্নতা সত্ত্বেও তাদের একই ধরনের মন ও প্রকাশভঙ্গি খুঁজে পাওয়া যাবে তাদের সৃষ্ট মৌখিক লোককথার মধ্যে। এ এক বিস্ময়কর মানবিক সেতু।

আফ্রিকার আদিবাসী লোককথা

ইঁদুর সব জায়গায় ঘুরে বেড়ায়। সর্দারের শক্ত বাড়ির আনাচে-কানাচে থেকে গরিব মানুষের রান্নাঘর, সব জায়গায় ইঁদুর ঘুরে বেড়ায়।—ইঁদুর গল্পের সন্তান বুনল। এই গল্পগুলোই হল ইঁদুরের ছেলেমেয়ে। ইঁদুরের মতো ছোট্ট নগণ্য চঞ্চল একটি প্রাণীকে আফ্রিকার আদিবাসী মানুষ পশুকথার নায়ক করে তুললেন। এই মানসিকতার মধ্যেই আফ্রিকার লোককথার প্রাণ লুকিয়ে রয়েছে।[২] পশুকে ঘিরে অগুনতি গল্পের জাল বুনেছেন এদেশের মানুষ। লোকপুরাণে দেবতাদের সম্পর্কেই গল্প বেশি থাকে, আফ্রিকার লোকপুরাণেও পশু-পাখির মেলা। অধিকাংশ দেবতাই পশুপাখি।

আফ্রিকার লোককথার একটি বিশেষত্ব রয়েছে। লোককথার আন্তর্জাতিকতা সর্বজনস্বীকৃত। স্বাধীনভাবেই এগুলো গড়ে উঠেছে। কিন্তু আফ্রিকার লোককথা আক্ষরিক অর্থে মাইগ্রেটেড হয়েছে উত্তর আমেরিকা, দক্ষিণ আমেরিকা, পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ প্রভৃতি বিস্তৃত এলাকায়। উপনিবেশবাদীরা একসময় ক্রীতদাস আনতেন আফ্রিকা থেকে। তাদের উত্তরপুরুষেরা লোককথার অলিখিত মৌখিক ঐতিহ্যকে বহন করে চলেছেন। তাদের আদি বাসভূমির অন্য কোন স্মৃতি আজ বেঁচে নেই, বেঁচে নেই তাদের মাতৃভাষা—কিন্তু পুরুষ পরম্পরায় লোকসংগীত ও লোককথা আজও সজীব রয়েছে। এই অর্থে আফ্রিকার আদিবাসীদের লোককথা যেভাবে বিশ্বপরিক্রমা করেছে তার আর কোন নজির নেই। অন্য অনেক দেশের লোককথা অনূদিত হয়ে গ্রন্থাকারে নানাস্থানে প্রচারিত হয়েছে, কিন্তু লোকসমাজ সেগুলো কোনভাবেই গ্রহণ করেননি, সাক্ষর হয়েও নয়। আসলে সেগুলো পড়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ, ঐতিহ্যের গভীরে সেগুলো প্রবেশাধিকার পায় নি, এ ক্ষেত্রে আফ্রিকা সত্যিই বিশ্বজয় করেছে।

আফ্রিকার লোককথার সংখ্যা কত? এ ব্যাপারে ভারত ছাড়া আর কোন এলাকাই তার পাশে দাঁড়াতে পারবে না। আফ্রিকায় যে হাজার হাজার আদিবাসী গোষ্ঠী রয়েছেন, তাদের একটি গোষ্ঠীরও সমস্ত লোককথা আজ পর্যন্ত সংগৃহীত হয়নি। ১৮৩৮ সালে এম.এ. ক্লিপ্‌ল্‌ আমেরিকার ইন্ডিয়ানা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে নয় হাজার আফ্রিকার লোককথার একটি পঞ্জি প্রকাশ করেন। কিন্তু বিশাল লোককথা ভাণ্ডারের কতটুকুই বা সেদিন অনূদিত হয়েছিল ? বি.স্ট্রাক্‌ ১৯২৫ সালে বার্লিনে আফ্রিকার লোককথা বিষয়ে একটি গ্রন্থ প্রকাশ করে অনুমান করেছিলেন, আড়াই লক্ষ লোককথা আফ্রিকার আদিবাসীদের মধ্যে রয়েছে। আধুনিক গবেষকগণ এই সংখ্যাকে বহুগুণ বাড়াবার সপক্ষে। কেননা, এখনও পর্যন্ত বহু আদিবাসী গোষ্ঠীর তেমন কোন লোককথার সংগ্রহ প্রকাশিত হয় নি।

আফ্রিকার আদিবাসীদের মধ্যে দীর্ঘ লোককথা প্রায় অনুপস্থিত। এই গ্রন্থের 'জাদু আয়না ও সুন্দরী মেয়ে'র মতো রূপকথা প্রায় বিরল। এল. ফ্রোবেনিয়াস ও ডি. সি.

ফক্স ১৯৩৭ সালে নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত 'আফ্রিকান জেনেসিস' গ্রন্থে কয়েকটি দীর্ঘ লোককথা প্রকাশ করেছিলেন। আধুনিক লোকসংস্কৃতবিদগণ মনে করেন, লোককথার আদি রূপ খুব সংক্ষিপ্ত ছিল। পরবর্তীকালে কথকের চিন্তা মিশে সেগুলি দীর্ঘ হয়েছে। কেননা, আদিম মানুষ বিস্তৃত চিন্তাকে সূত্রবন্ধ করতে অপারগ ছিলেন। তাই, দুটো গল্প যদি একই বিষয় ও নায়ককে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে, তবে সংক্ষিপ্ত গল্পটিকে পুরনো এতিহ্য-অনুসারী বলে এরা মত দিয়েছেন। এই হিসেবে আফ্রিকার অধিকাংশ লোককথা পুরনো কালের মৌখিক ঐতিহ্যকে বহন করে বয়ে এসেছে। অবশ্য, অনেক সময় একটি কেন্দ্রীয় বিষযকে কেন্দ্র করে গল্পের চক্র গড়ে উঠেছে। একটি সূত্র যুক্ত করে গল্প থেকে অন্য অন্য গল্প গাঁথা হয়েছে। এগুলো অধিকাংশই প্রবঞ্চক ধূর্ত ট্যাটনের (ট্রিকস্টার) গল্প।

আফ্রিকার আদিবাসী লোকপুরাণ ও কিংবদন্তির মধ্যে আধিবাসী ইতিহাসের সন্ধান করছেন অনেকেই। কেননা, অলিখিত মৌখিক উপাদান ছাড়া অন্য পথ অবশিষ্ট নেই। হয়তো একদিন যা ছিল সামাজিক ইতিহাস, পরে তাই হয়ে উঠেছে লোককথার প্রাণবস্তু। কিছু কিছু সূত্রও পাওয়া যাচ্ছে নিঃসন্দেহে, কিন্তু এখনও অনুসন্ধান সম্পূর্ণ হয়নি। এই শ্রমসাধ্য পদ্ধতি সকল জাতির ইতিহাস-অনুসন্ধানে একদিন পরম সহায়ক হয়ে উঠবে বলে আশা করা যায়।

আফ্রিকার আদিবাসী কথকেরা যখন সন্ধ্যার আধো-অন্ধকারে লোককথা বলতে শুরু করেন, তখন তাকে মনে হবে তিনি শুধুই গল্প-বলিয়ে নন, তিনি অভিনেতা, তিনি নাট্যকার। বিভিন্ন চরিত্রে বিচিত্র সংলাপে তিনি একাই অভিনয় করে চলেছেন, নাটকীয় জাল বিস্তার করে চলেছেন।

অন্যান্য সকল দেশের আদিবাসীদের মতো আফ্রিকার আদিবাসীদের কাছে এসব লোককথার কাহিনি অবাস্তব নয়, জীবনের মতোই সত্য। এগুলো অবশ্যই ঘটেছে,—তারা সামান্য অবিশ্বাসও প্রকাশ করবেন না। মানুষের নানাবিধ দুষ্কর্মের জন্য আজ আর এসব ঘটে না। কিন্তু যা তাবা গল্পে শুনছেন তা সর্বাংশে সত্য বলে মানছেন। এখানে লোককথা ও আদিবাসী জীবনের মধ্যে কোন কৃত্রিম ব্যবধান নেই। তাই প্রতিদিনের কাজকর্মে লোককথাগুলোর সামাজিক মূল্য ও তাৎপর্য রয়েছে। এখনও আফ্রিকার আদিবাসী গোষ্ঠীর অধিকাংশ মানুষের জীবনাচরণকে এইসব লোককথা অনেকাংশে নিয়ন্ত্রণ করে। আফ্রিকার আমাজুলু আদিবাসী গোষ্ঠীর একটি গল্পে রয়েছে, এই দুনিয়ায় কত কিছুই ঘটে, আমরা জানি না, জানে ওই নুয়ে-পড়া বুড়োবুড়িরা। আমরা জানি না, কিন্তু ওদের কথাও অবিশ্বাস করি না। অবিশ্বাস করতে নেই।

ভারতের আদিবাসী লোককথা

ভারতের বিশাল প্রাকৃতিক ও খনিজ সম্পদ উপনিবেশবাদীদের বহুকাল থেকে আকৃষ্ট করে এসেছে, ভারতবর্ষ দীর্ঘদিন আগেই উপনিবেশে পরিণত হয়েছে। কিন্তু বিদেশিরা আমাদের দেশের আদিবাসীদের মধ্যে তাদের শাসনের জাল তেমনভাবে বিস্তার করেননি, যেমন করেছিলেন আফ্রিকায়। কিছু আদিবাসী গোষ্ঠী বিদেশিদের সংস্রবে এসেছিলেন, খনি ও চা-বাগিচায় শ্রমিক হয়েছেন, স্বাধীনতা হরণের অপচেষ্টা

বুঝতে বিদ্রোহ করেছেন, খ্রিস্টীয় মিশনারিদের দ্বারা প্রলুব্ধ ও ধর্মান্তরিত হয়েছেন। কিন্তু অধিকাংশ গোষ্ঠীই এই ছোঁয়াচ থেকে বেঁচে গিয়েছেন। আর 'ভাদ্রলোক হিন্দু জনগোষ্ঠী'র মানুষেরা আদিবাসীদের সঙ্গে কোনকালে ঘনিষ্ঠতা গড়ে তোলেন নি, স্বাধীনতার পরে রাস্তাঘাট, খনি এলাকার সম্প্রসারণ, গ্রামীণ উন্নয়ন প্রভৃতির ফলে যোগাযোগ সহজ হয়ে আসছে। তবুও আমাদের দেশের আদিবাসী সংস্কৃতি অনেকাংশে অপরিচিতই থেকে গিয়েছিল। তাদের উন্নত সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের বিস্তৃত পরিচয় আমরা পাই কিছু উদারহৃদয় বিদেশিদের মাধ্যমে। তাদের অক্লান্ত নিষ্ঠা ও পরিশ্রমে অসংখ্য লোককথা সংগৃহীত হয়েছে। কিন্তু যা সংগৃহীত হয়েছে তার হাজার গুণ বেশি লোককথা মৌখিক ঐতিহ্যেই রয়ে গিয়েছে। ভারতীয় আদিবাসী লোককথা যে কত সমৃদ্ধ তার পরিচয় এই স্বল্পসংখ্যক প্রকাশিত গল্পগুলো থেকেই অনুধাবন করা যাবে।

ভারততত্ত্ববিদ কিছু পণ্ডিত মনে করতেন, ভারতের বেদ, উপনিষদ, পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত, পঞ্চতন্ত্র, পিল্‌পের গল্পসংগ্রহ থেকে অসংখ্য গল্প ছড়িয়ে পড়েছিল ভারতের একপ্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে। বিষয়টি উল্‌টো দিক থেকে বিচার করার সময় এসেছে। এবং বর্তমানের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিসম্পন্ন লোকসংস্কৃতিবিদরা সেইভাবেই চিন্তা করে চলেছেন। রামকথা গ্রথিত করবার জন্য কবি বাল্মীকি নাকি তাঁর শিষ্যদের দূর-দূরান্তে পাঠিয়েছিলেন। রামের কাহিনি তাঁরা সংগ্রহ করে আনবেন। একটি দৃষ্টান্তের মধ্যেই প্রকৃত সত্য নিহিত রয়েছে। লোকসমাজের মধ্যে ঐতিহ্যবাহিত হয়ে যেসব কাহিনি আবহমান কাল ধরে চলে আসছে, শিষ্যদের মাধ্যমে সেসব কাহিনি শুনেই কবি বাল্মীকি সেগুলিকে লিখিত আকার দিয়েছিলেন। অবশ্য মহাকবির মনের মাধুরী যুক্ত হয়েই সেগুলি গ্রথিত হয়েছিল। বাইরে থেকে আরোপিত কোন লোককথা লোকসমাজ বেশিদিন মনে রাখেন না। আপন সমাজের নিজস্ব সৃষ্টিই তাদের ঐতিহ্যে বহমান থাকে। তাই বেদ থেকে পিলপের সংগ্রহ পর্যন্ত সমস্ত গ্রন্থেই যেসব লেককথা রয়েছে তার অধিকাংশই এসেছে লোকসমাজের মৌখিক ঐতিহ্য থেকে। আর এই লোকসমাজের এক বিরাট অংশই হলেন ভারতীয় আদিবাসী জনগোষ্ঠী। যা সত্য তা কারও ভালো-লাগা মন্দ-লাগা কিংবা বিশ্বাস-অবিশ্বাসের ওপর নির্ভর করে না। লোকসমাজ থেকে লোককথা উন্নত লিখিত সাহিত্যে অনুপ্রবেশ করেছে,—এই সত্য নিয়ে আজ আর কোন তর্ক চলে না।

দু-একটি উদাহরণ দেওয়া যাক, মহাভারতের শান্তিপর্বে ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে 'সন্ধি বিগ্রহের সময়— মার্জার মূষিক বৃত্তান্ত' শুনিয়েছিলেন।[৫] এই পশুকথাটি আজ থেকে সত্তর বছর আগে বস্তার জেলার মারিয়াদের মধ্যে থেকে সংগৃহীত হয়েছে। যে বৃদ্ধার কাছে সংগ্রাহক গল্পটি শোনেন, তিনি মাতৃভাষা ছাড়া অন্য কোন ভাষা জানতেন না, রামায়ণ মহাভারতের নাম শোনেননি। তাকে পাঁচবার বিভিন্ন দিনে গল্পটি বলতে বলা হলে একইভাবে গল্পটি তিনি শোনান। তাঁর রক্তে-চিন্তায় মিশে ছিল এই মৌখিক ঐতিহ্য। লোকসমাজের লোককথাই লিখিত উন্নত সাহিত্যে স্থান পেয়েছে। মহাভারতের শান্তিপর্বের 'অকৃতজ্ঞের অধোগতি—কুক্কুর-শরভ বৃত্তান্ত' গল্পটি[৬] সংগৃহীত হয়েছে মধ্যভারতের গোন্দ আদিবাসী এক বৃদ্ধের কাছ থেকে। এই বৃদ্ধের সামাজিক অবস্থান একই রকমের। এরকম অসংখ্য উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। পঞ্চতন্ত্রের অনেক গল্পের উৎসস্থান আদিবাসী জনগোষ্ঠীর মৌখিক সাহিত্য।

যে কয়েক হাজার আদিবাসী লোককথা সংগৃহীত হয়েছে তার বৈচিত্র ও ঐশ্চর্য আমাদের বিস্মিত করে। এদের লোককথার প্রতিটি বিভাগই সমানভাবে উন্নত। আমাদের দেশের সকল আদিবাসী গোষ্ঠী অত্যন্ত দরিদ্র, অধিকাংশই ভূমিহীন খেতমজুর কিংবা ভাগচাষি, সবচেয়ে অনুর্বর জমিতে চাষ করেন, অরণ্যের সম্পদ থেকে বঞ্চিত, পুরনো অধিকার থেকে বিচ্ছিন্ন, আলোকিত জনসমাজের সঙ্গো নিবিড় একতা অনুভব করেন না,—এসবই সত্যি। কিন্তু তাদের অনন্য মৌখিক ঐতিহ্যবাহিত লোককথার পরিচয় পেলে মনে হবে, সে সংস্কৃতি তথাকথিত উন্নত সংস্কৃতির চেযে কোন অংশে খাটো নয়। তাদের সংস্কৃতি বৃহৎ ভারতীয় বটবৃক্ষের সবুজ সতেজ পত্রগুচ্ছ, যেমন অন্য সংস্কৃতির পত্রগুচ্ছও একই গাছে পাশাপাশি মিলেমিশে রয়েছে।

এক সময় পাশ্চাত্যের ভারততত্ত্ববিদ নৃতাত্ত্বিক লোকসংস্কৃতিবিদ পণ্ডিতজন মনে করতেন, পৃথিবীর যাবতীয় লোককথার উৎসস্থান ভারতবর্ষ। এই মূল ভূখণ্ড থেকেই অন্য প্রান্তে লোককথা ছড়িয়ে পড়েছিল। ছড়িয়ে পড়ার কারণ হিসেবে তারা বলেছিলেন, সুদূর অতীতকাল থেকেই ভারতের সঙ্গো বহির্বিশ্বের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ঘটেছিল। বেদ-উপনিষদ-রামায়ণ-মহাভারত-পুরাণ-পঞ্চতন্ত্র প্রভৃতির বিশাল গল্পভাণ্ডার দেখে তারা এই সিদ্ধান্তে এসেছিলেন। বহুকাল ধরে এই বিশ্বাস দৃঢ় ছিল।

এর কিছু পরবর্তী সময়ে ভারতবর্ষের পাশে আফ্রিকার নামও যুক্ত হল। অর্থাৎ তারা বললেন, ভারতবর্ষ ও আফ্রিকা থেকে লোককথা অন্যত্র ছড়িয়েছে। অবশ্য আজকের দিনে মাইগ্রেশনের এই তত্ত্ব বাতিল হয়ে গিয়েছে। কিন্তু তবু মনে রাখতে হবে, এই দুই ভূখণ্ডের গল্প-সম্ভারের বৈচিত্র ও প্রাচুর্য একদিন তাদের এভাবে ভাবাতে বাধ্য করেছিল।

ব্যাপক-মাইগ্রেশনের এই তত্ত্ব বর্তমানে কোনভাবেই বিশ্বাস করার উপায় নেই। কিন্তু আফ্রিকা ও ভারতের আদিবাসীদের লোককথায় সামাজিক মনের এক আশ্চর্য সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। এই দুই ভূখণ্ডের আদিবাসীগোষ্ঠী সবচেয়ে বেশি গল্প বলেছেন পশুকে ঘিরে। খরার ফলে জীবনে দুঃসহ কষ্ট, অনুর্বর জমিতে চাষের দুর্বিষহ যন্ত্রণা, সামাজিক অবিচার,—বারবার গল্পে চিত্রিত হয়েছে। সামাজিক বঞ্চনা ও প্রতিকূল পরিবেশ অসংখ্য গল্পের প্রাণ। আর ট্যাটনের লোককথার বৈচিত্র তো অনন্য।

ওশিয়্যানিয়ার লোককথা

▧ রামধনুর কোলে আকাশকন্যা হিনা বসে রয়েছে। হঠাৎ তার গলার মুক্তোর মালার সুতো ছিঁড়ে গেল। মুক্তোগুলো অনেক নীচে ঘন নীল সাগরের বুকে ছড়িয়ে পড়ল। এক একটি মুক্তো জেগে উঠল দ্বীপ হয়ে, সাগরের বুকে অনেক দ্বীপ।

▧ আকাশের দেবীর শ্বেতশুভ্র দুটি বুক টন্‌টন্ করে উঠল। পবিত্র দুধে বুক দুটি ভরা। নীচের দিকে চেয়ে রয়েছে দেবী। বিন্দু বিন্দু দুধ ছড়িয়ে পড়ল সাগরে। এক এক বিন্দু দুধ জেগে উঠল দ্বীপ হয়ে, অনেক দ্বীপ।

▧ আকাশকুমারী চেয়ে আছে নীচে অথৈ সাগরের পানে। বেদনায় চোখদুটি অশ্রুসজল। আহা! কোথাও মাটি নেই। ডাগর চোখ থেকে অশ্রুবিন্দু ঝরে পড়ল। অনেক। জেগে উঠল দ্বীপের পরে দ্বীপ।

⧅ সাদা মেঘের টুক্‌রো টুক্‌রো খণ্ড। আকাশের বুকে মেঘের খেলা। প্রতিচ্ছবি পড়েছে নীচের নীল সাগরজলে। কোথায় থাকবে মানুষ ! কুয়াশাকুমারী মেঘখণ্ডগুলোকে পাঠিয়ে দিল সাগরের জলে। মেঘের আকারে দ্বীপ ভেসে উঠল। অনেক দ্বীপ।

ফিলিপিনস্‌ মাইক্রোনেশিয়া মেলানেশিয়া ও পলিনেশিয়া অর্থাৎ ওশিয়্যানিয়ার লোকপুরাণে এই এলাকার হাজার হাজার দ্বীপের জন্মকথা এইভাবে কাব্যময় ভাষায় বিধৃত হয়ে রয়েছে। দ্বীপময় এলাকার মানুষের কবিমনের অপরূপ পরিচয়। আজও পরব-উৎসবের সময় তাদের মিহি মিষ্টি সুরে ঝরে পড়ে এই কাব্যকথা, অতীতের মহান ঐতিহ্যের গাথা। অথচ হাজার প্রাকৃতিক বিপর্যয়, মানুষের অমানবিক অবিচার-অত্যাচার আর বারবার বাসভূমি পাল্‌টানোর মতো দুঃসহ বেদনা তাদের সহ্য করতে হয়েছে। সহ্য করতে হয়েছে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে। তবু, ঐতিহ্যের আশ্চর্য সঞ্জীবনী শক্তি,—শত নির্মম পাষাণ-আঘাতেও সংস্কৃতিকে বিলুপ্ত করা যায় নি। অজেয় মানুষ অপরাজেয় লৌকিক ঐতিহ্যকে লালন করে চলেছেন।

দ্বীপময় স্বদেশভূমি ও জনবসতির কথা

রাতের আকাশে যেমন অসংখ্য তারা ফুটে ওঠে, ওশিয়্যানিয়ায় তেমনি অগুনতি দ্বীপের সমাহার। ব্যাপ্ত প্রশান্ত মহাসাগরের উদার বুকে বিচ্ছিন্ন ছোট ছোট দ্বীপময় ভূমিখণ্ড। পৃথিবীর সবচেয়ে বড় দ্বীপ নিউ গিনি আবার পৃথিবীর ক্ষুদ্রতম মহাদেশ অস্ট্রেলিয়া এই এলাকাতেই রয়েছে।

তিরিশ লক্ষ বর্গ মাইল জুড়ে বিচিত্র গাছপালা-পশুপাখির দেশ অস্ট্রেলিয়া এই দ্বীপময় এলাকার বৈশিষ্ট্য বহন করছে না। অস্ট্রেলিয়ার পরিচয় আলাদাভাবে দিতে হবে।

প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপময় জগৎ অন্য ধরনের। বিশাল উন্মুক্ত সাগর পৃথিবীর এক তৃতীয়াংশ এলাকা জুড়ে রয়েছে। বিচ্ছিন্ন দ্বীপগুলির মানুষকে এই সাগর যেমন বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে আবার তেমনি এক মানবিক সেতুবন্ধনে ঘনিষ্ঠও করে তুলেছে। সাগরের ঢেউ, প্রকৃতি, ঝোড়ো আবহাওয়া, গাছপালা, সামুদ্রিক খাদ্যদ্রব্য এলাকার মানুষকে প্রায় একই সংস্কৃতির সূত্রে আবন্ধ করে রেখেছে। এখানেই রয়েছে অসংখ্য আগ্নেয়গিরি দ্বীপ, আবার প্রবাল দ্বীপ। সাগরের পারে রয়েছে সবুজ বনানীতে ঢাকা পাহাড়-পর্বত। মেলানেশীয় নিউ আয়ারল্যান্ডের ৩৭০ মাইল দূরে সবচেয়ে কম জনবসতিপূর্ণ ক্ষুদ্রতম দ্বীপ কাপিন্‌গারান্‌গি রয়েছে। এর আয়তন আধ বর্গমাইলের সমান্য বেশি, সমুদ্র-পৃষ্ঠ থেকে মাত্র ১০ ফিট উঁচু। নিরক্ষবৃত্তের দশ ডিগ্রি দক্ষিণে দুটি বিচিত্র দ্বীপ রয়েছে। মাঝখানে সমুদ্রের ব্যবধান মাত্র পঁচিশ মাইল। দ্বীপ দুটি হল মানিহিকি ও রাকাহান্‌গা। দুই দ্বীপের অধিবাসী একই জনগোষ্ঠী। পালা করে তারা এক এক দ্বীপে কিছুকালের জন্য থাকে। একটি দ্বীপ যখন জনশূন্য থাকে তখন সেখানে বেড়ে ওঠে শস্য-ফল-মূল। আবার তারা চলে আসে ছেড়ে-আসা দ্বীপে। ভুলে-যাওয়া সেই কোন কাল থেকে এই রীতি চলে আসছে।

ওশিয়্যানিয়াকে তিনটি ভৌগোলিক এলাকায় বিভক্ত করা যায়। মেলানেশীয় দ্বীপপুঞ্জের পশ্চিমবলয়, উত্তর-পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরীয় এলাকার মাইক্রোনেশীয় ছোট ছোট দ্বীপ

এবং পলিনেশিয়া যার মধ্যে নিউজিল্যান্ড ও পূর্ব প্রশান্ত মহাসাগরীয় এলাকার অসংখ্য দ্বীপও যুক্ত রয়েছে। এইসব এলাকার মানুষজনের সাংস্কৃতিক-দেহগত-ভাষাগত বৈশিষ্ট বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, এক জটিল জনবিন্যাস ও বসতি। গোটা এলাকায় ঘটেছে ব্যাপক মাইগ্রেশন ও বিভিন্ন জনবসতির মিশ্রণ। কীভাবে ঘটল এই জটিল জনবিন্যাস?

কিছু নৃবিজ্ঞানী বিশ্বাস করেন, দুই থেকে আড়াই হাজার বছর আগে এক বিরাট জনগোষ্ঠী ইন্দোনেশিয়া থেকে মাইক্রোনেশিয়ার পথ বেয়ে পলিনেশীয় দ্বীপগুলিতে এসে উপস্থিত হয়। তাদের আদি সংস্কৃতি ছড়িয়ে পড়ে এই এলাকায়। ধীরে ধীরে তারা গোটা এলাকায়, এমন কি বিচ্ছিন্নভাবে মেলানেশিয়ার কিছু দ্বীপেও উপনিবেশ গড়ে তোলে। ইন্দোনেশিয়া থেকে আসা এই মানুষের মূল কেন্দ্র ছিল বর্তমানের সোসাইটি দ্বীপ, লোকপুরাণের ভাষায় ওপোয়া বা হাওয়াইকি। এখান থেকেই পুরনো সংস্কৃতির প্রসার ঘটে। ঐতিহ্য বহুকাল ধরে প্রায় একই পর্যায়ে ছিল। ইউরোপের সংস্পর্শে আসার আগে পর্যন্তও পলিনেশীয় ব্যবহারিক জীবনচর্যার মূল কাঠামো ছিল নব্য প্রস্তর যুগের বস্তুগত সাংস্কৃতিক চিন্তাভাবনা। পুরনো ঐতিহ্যের মহান সম্পদ তারা ধরে রেখেছিল তাদের মৌখিক সাহিত্যে। মাঝখানে কোন বিপর্যয়ে তাদের মানসিক অগ্রগতি বোধহয় ব্যাহত হযেছিল।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া থেকে জনগোষ্ঠী এসেই এই বিশাল এলাকা বসতিপূর্ণ করে তুলল এ ধারণা সর্বাংশে সত্য নয়। লক্ষ লক্ষ মানুষ এসেছিল ঠিকই, তাদের উন্নত সংস্কৃতির প্রভাব ব্যাপকভাবে পড়েছিল ঠিকই,—কিন্তু দ্বীপময় এলাকাযও কিছু মানুষ, আদি বাসিন্দা ছিল। মিশ্র সংস্কৃতি তাই গড়ে উঠতে পেরেছিল, যেমন ঘটেছে মাওরিদের ক্ষেত্রে। তবে, এটা আজ নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হয়েছে, পৃথিবীর যে কয়েকটি এলাকায় সবচেয়ে শেষে মানুষের বসতি গড়ে উঠেছে তার মধ্যে প্রশান্ত মহাসাগরীয় এলাকার এই অংশ অন্যতম। আর এও সত্য, সংগঠিতভাবে এখানে মাইগ্রেশন হয়নি, বরং বিক্ষিপ্তভাবে ধীরে ধীরে জনজাতিরা এখানে এসেছে।

ইতিহাসের যেটুকু সাক্ষ্য প্রমাণ মিলেছে তাতে বলা যায়, প্রথম আগত জনজাতিরা হল কৃষ্ণকায় খাটো কুঞ্চিত-কেশ নেগ্রিটো গোষ্ঠী ও হালকা দেহবর্ণ-বিশিষ্ট ঢেউ-খেলানো চুল যাদের সেই আইনু গোষ্ঠীর মানুষ। অস্ট্রেলিয়া, নিউ গিনি ও মেলানেশিয়ার কিছু এলাকা ছাড়া ওশিয়্যানিয়ার মানুষ সাধারণত কৃষিজীবী। তারা কুকুর-শুয়োর-মুরগি পোষে। যদিও মজার ব্যাপার, সব দ্বীপে এখনও এসব পোষা জন্তু পৌঁছয় নি। যেমন নিউজিল্যান্ডের মাওবরিদের মধ্যে শুয়োর কিংবা মুরগি এখনও অজানা প্রাণী।

এর পরবর্তী কালে এই এলাকায় পৌঁছয় হালকা রঙের অসট্রোনেশীয়, ককেশীয়-মঙ্গোলীয় মিশ্রণজাত জনগোষ্ঠী। এই জনগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক প্রভাব এলাকায় সুদূরপ্রসারী হয়েছে। এরাই সমুদ্র-পোতের জটিল কারিগরিবিদ্যা তাদের শেখায়। আজকের ওশিয়্যানিয়ার ভাষাগত বৈচিত্র,সাংস্কৃতিক কাঠামো এদেরই সৃষ্টি। এরা মাইক্রোনেশিয়ায়ও বসতি গড়ে তোলে। এত সব জনজাতির মিলনের ফলেই জটিল জনবিন্যাস গড়ে ওঠে।

দ্বীপ থেকে অন্য দ্বীপে নতুন বসতি গড়ে তোলার পেছনে কাজ করেছিল জনসংখ্যার আধিক্য, যুদ্ধে পরাজয়, ক্ষমতার লড়াই, শাসক দলের অত্যাচার, সুদূরের নেশা। এদের

মৌখিক ঐতিহ্যের মধ্যেও এসবের হদিস পাওয়া যাচ্ছে। কারণ যাই হোক না কেন, যখন তারা নতুন দ্বীপে পাড়ি জমাল, সেখানকার আদি জনগোষ্ঠীর সঙ্গে মিলন বা সংঘর্ষের অবসানে এক নতুন জীবন গড়ে তুলল। অন্য দ্বীপ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এক অভিনব জীবন কাঠামো গড়ে তুলল। বহু শতাব্দী ধরে চলল তাদের এই প্রায় একই ধরনের জীবনযাপন॥ চিন্তায় বয়ে যেতে লাগল পুরনো ঐতিহ্যের স্মৃতি। নতুন কোন জনগোষ্ঠী এসে যদি তাদের বিতাড়িত করত, তবে আবার অকূল দরিয়ায় নতুন বসতির সন্ধান চলত। যদি বিতাড়িত না করত, তবে আর একটি সংস্কৃতি মিলেমিশে যেত।

এমনি করে ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত ভাঙা-গড়া চলল। অনেকাংশে স্থিতিও এসে গিয়েছিল। এমন সময় এল নতুন অভিযাত্রী দল। পুরনো কাল হল শেষ। এল ইউরোপীয় অভিযানকারী। প্রাশান্ত মহাসাগর পেরিয়ে এলেন মাজেল্যান। ১৫২১ খ্রিস্টাব্দে তিনি নোঙর ফেললেন মাইক্রোনেশিয়ার উত্তরে মারিয়ানা দ্বীপপুঞ্জের গুয়াম দ্বীপে। নতুন রক্তাক্ত বিষাদময় ইতিহাস শুরু হল।

মাইক্রোনেশিয়া

মাইক্রোনেশিয়ার অর্থ ছোট দ্বীপপুঞ্জ। চারটি দ্বীপপুঞ্জের গুচ্ছ নিয়ে মাইক্রোনেশিয়া। মারিয়ানা, ক্যারোলিন, মার্শাল ও গিলবার্ট। মাইক্রোনেশিয়ার চারপাশের এলাকা বরাবর একটি রেখা টানলে সেটা দেখতে হবে ডিম্বাকৃতির মতো। এর উত্তর দিকে কাসান মিনামি তোরি প্রভৃতি দ্বীপপুঞ্জ, দক্ষিণে মেলানেশিয়া, পূর্বদিকে ফিলিপিনস্ ও পশ্চিমে পলিনেশিয়া।

ম্যাজেলান যখন প্রথম এখানে আসেন তখন এখানকর আদি বাসিন্দা বলতে ছামোরো আদিবাসী। এরা থাকত মারিয়ানা দ্বীপপুঞ্জে। ১৬৬৮ খ্রিস্টাব্দে এই এলাকায় স্পেনের সত্যিকার আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হল। তখন ছামোরো আদিবাসীর সংখ্যা ছিল এক লক্ষ। ১৭১০ খ্রিস্টাব্দে অর্থাৎ মাত্র ৪২ বছর পরে লোকসংখ্যা দাঁড়ায় মাত্র সাড়ে তিন হাজারে। শত শত বর্ষের সামুদ্রিক ঝড় যে প্রাণহানি ঘটাতে পারেনি, নতুন উপনিবেশবাদীদের বর্বর হত্যাকাণ্ড তাই সম্ভব করে তুলল। ছামোরোরা পাশের ক্যারোলিন দ্বীপপুঞ্জে পালিয়ে গেল এবং কোনোরকমে টিকে থাকল। এর কিছুকালের মধ্যে গুয়াম দ্বীপসহ মারিয়ানা দ্বীপপুঞ্জ জনামানবহীন হয়ে পড়ে। উনিশ শতকের শেষদিকে আবার বসতি শুরু হয়। অল্প সংখ্যক ছামোরো, ফিলিপিনো, স্পেনীয় এবং জাপানিরা গড়ে তোলে এক মিশ্র সংস্কৃতি। এই এলাকা হয়ে উঠল স্পেন, জার্মানি, জাপান, গ্রেট ব্রিটেন ও আমেরিকার অবাধ বিচরণক্ষেত্র। অফুরন্ত সামুদ্রিক তিমি-ঝিনুক-শঙ্খ, ফসফেট, নারকেল ও মাছের জোগান এদের লোভ বাড়িয়ে দিল। অবাধ বাণিজ্য-কেন্দ্র হিসেবে মাইক্রোনেশিয়া যেন ব্যবসার মৃগয়াক্ষেত্র। তারা গড়ে তুলল সমুদ্র বন্দর, বিমানবন্দর ও কেব্‌ল স্টেশন। ছামোরো আদিবাসীদের মতো এমন বিপর্যয়ের মুখে আর কাউকে পড়তে হয়নি।[৫] দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হবার আগে পর্যন্ত কয়েকটি ছোট দ্বীপ এদের থাবার বাইরে উপেক্ষিত ছিল। কিন্তু এই সময়েই সব দ্বীপ তাদের লুণ্ঠনের আওতায় এল, এমন কি অতি ক্ষুদ্র বলয়াকৃতি বিকিনি প্রবাল দ্বীপ পর্যন্ত। আদিবাসী সংস্কৃতি ধ্বংসের কাজটি সম্পূর্ণ হল।

মাইক্রোনেশীয় লোককথা

সাড়ে তিনশো বছর ধরে এই এলাকার আদিবাসীদের সংস্কৃতির ওপরে প্রচণ্ড বিপর্যয়কর আঘাত এসেছে। ক্ষতি হয়েছে অনেক। তবু ঐতিহ্য একেবারে নিশ্চিহ্ন করা যায়নি। লৌকিক সংস্কৃতির প্রাণশক্তি এমনই দুর্বার। লুণ্ঠনকারীরা যেমন একটি দেশে আসে তেমনি তাদের পথ বেয়ে কিছু মহৎ মানুষও আসেন। এদের হৃদয় উদার, চিন্তা মানবিক। এদের অক্লান্ত পরিশ্রমেই আদি বাসিন্দাদের সংস্কৃতি ও মৌখিক ঐতিহ্যের পরিচয় আমরা পাই। সব পরাধীন দেশেই এইসব উদার মানুষের সাক্ষাৎ মিলেছে।

মাইক্রোনেশিয়ার আদিবাসীদের লোককথার বিশাল ভাণ্ডারের বেশির ভাগই বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে গিয়েছে। তবু প্রথম দিকের কিছু মহৎ ভ্রমণকারী, মিশনারি ও প্রশাসকের চেষ্টায় অনেক লোককথা সংগৃহীত হয়েছে। এদের মধ্যে প্রথমেই নাম করতে হয় অসাধারণ দক্ষ প্রশাসক স্যার আর্থার গ্রিম্‌ব্‌ল্‌-এর। গিলবার্ট দ্বীপপুঞ্জের আদিবাসীদের মৌখিক সাহিত্যকে তিনি পরম যত্নে নথিভুক্ত করে যান।[৮] পরবর্তীকালে আদিবাসীদের সম্পর্কে বিশদ বিবরণ তুলে ধরেন সি আই এম এ অর্থাৎ কো-অর্ডিনেটিং ইন্‌ভেস্টিগেশন অব মাইক্রোনেশিয়ান অ্যানথ্রোপলজি।

কিন্তু আদিবাসীদের সংস্কৃতি বিশেষ করে তাদের লোকপুরাণ সংগ্রহের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কাজ করেছেন জার্মান ক্যাথলিক মিশনারি ও জার্মান বৈজ্ঞানিক অভিযাত্রীদল। এরা ১৯০৮-১০ সালের মধ্যে ব্যাপক সমীক্ষা ও সংগ্রহের কাজ করেন এবং অনেকগুলি খণ্ড প্রকাশ করেন। ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে ভাইকিং ফান্ডও গিলবার্ট দ্বীপপুঞ্জের অদিবাসীদের সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক সমীক্ষা করে অনেক কিছু সংগ্রহ করে। এছাড়া আর বি ডিক্সন, ক্যাথারিন লুওমালা, এল টমসন ও পি এল বোলিগ বিংশ শতাব্দীতে এই এলাকার সংস্কৃতি সম্পর্কে প্রামাণিক সব গ্রন্থ লিখেছেন।

অন্য এলাকার সাংস্কৃতিক প্রভাব ও রক্তের মিশ্রণ ঘটলেও এখনও এক লক্ষের ওপর মানুষ আদিবাসী সংস্কৃতিকে তাদের ঐতিহ্যে পালন করে চলেছেন। এদের ভাষা মালয়ী-পলিনেশীয় ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। মিশ্রণের ফলে স্পষ্ট দেহগত কোন বৈশিষ্ট নজরে পড়ে না। তবু পলিনেশীয় মেলানেশীয় জনগোষ্ঠী থেকে এদের আলাদাভাবে চেনা যায়।

মাইক্রোনেশীয় লোককথার যে সব সংগ্রহ-গ্রন্থ রয়েছে, তার মধ্যে লোকপুরাণের গল্পই বেশি। এর ফলে মনে হওয়া স্বাভাবিক, তাদের সমাজের মৌখিক ঐতিহ্য লোকপুরাণকেই আন্তরিকভাবে লালন করেছে। রূপকথা-পশুকথা-নীতিকথা-কিংবদন্তির গল্প তুলনায় কম। অনেকে মনে করেন, বহিরাগত সংস্কৃতির মিশ্রণের ফলে রূপকথা-পশুকথাজাতীয় গল্প তারা ভুলে গিয়েছেন, আবার নতুন লোককথা সৃষ্টির মানসিকতা হারিয়ে ফেলেছেন। কিন্তু বাইরের আঘাত যত প্রবল হয়েছে নিজেদের অস্তিত্ব ও স্বাতন্ত্র বজার রাখতে তারা লোকপুরাণকে বেশি করে আঁকড়ে ধরেছেন। কেননা, লোকপুরাণের মধ্যে ধর্মীয় সংস্কার লুকিয়ে থাকে। মানুষ যত বিপদের মুখোমুখি হয়, ঐতিহ্যগত ধর্মীয় ভাবনায় তত আকৃষ্ট হয়, এর মাধ্যমেই সে বাঁচবার পথ খোঁজে।

মাইক্রোনেশীয় লোকপুরাণে ইন্দোনেশীয় লোকপুরাণের অনেক সাদৃশ্য রয়েছে। ইন্দোনেশীয় এলাকা থেকে বহু শতাব্দী আগে তারা বর্তমানের এইসব এলাকায় এসেছিলেন,

এই তত্ত্ব কিছুটা পরিমাণে যে সত্য তা বোঝা যায়। কেননা, কোন জনগোষ্ঠীর লোকপুরাণের সঙ্গে অন্য জনগোষ্ঠীর লোকপুরাণের সাদৃশ্য কম থাকে, অন্তত লোককথার অন্য বিভাগের তুলনায়।

প্রসঙ্গত, একটি আশ্চর্য সাদৃশ্যের কথা অনেককে বিস্মিত করেছে। মাইক্রোনেশিয়ায় একটি অত্যন্ত জনপ্রিয় লোকপুরাণ হল 'শুশুককন্যা'। নানা রূপে গল্পটি বলা হয়। উলিথি দ্বীপের মানুষ এইভাবে গল্পটি বলেন ঃ দুটি শুশুককন্যা দূরের আকাশের কিংবা গভীর সমুদ্র থেকে তীরে উঠে আসত। তীরভূমিতে মানুষজন নাচত আর সেই নাচ দেখতে তাদের খুব ভালো লাগত। প্রতি রাতে ঝোপের মধ্যে তারা লেজ দুটোকে লুকিয়ে রেখে নাচ দেখত। বালির ওপরে অদ্ভুত পদচিহ্ন দেখে একজন মানুষ লুকিয়ে তদের খোঁজ পায়, আর চতুর্থ রাত্রে সে একটি লেজ চুরি করে যাতে একটি শুশুক কন্যা ফিরে যেতে না পারে। বাধ্য হয়ে কন্যা তাকে বিয়ে করে। স্বামী লেজটিকে বরগার মধ্যে লুকিয়ে রাখে। তাদের দুটি সন্তান হয়। একদিন শুশুককন্যা দেখে, বরগা থেকে কয়েকটা ছারপোকা নীচে পড়ল। বরগার আড়াল থেকে সে লেজ খুঁজে পেল। সে ফিরে চলল গভীর সমুদ্রের পথে। যাওয়ার আগে সে সন্তানদের সাবধান করে দিয়ে গেল,—বাছা, তোমরা কখনও শুশুকের মাংস খাবে না।

এই সরল গল্পটির সন্ধান মিলেছে ভারতীয় ঋগ্বেদে। এক বিস্ময়কর মিল। ৩০০০ বছর আগে ঋগ্বেদের গল্প কীভাবে এখানে মৌখিক ঐতিহ্যে ধরা রইল তার উত্তর আজও মেলেনি। এই গল্পে খাদ্যবিষয়ক ট্যাবু ও সামাজিক প্রথার উল্লেখ রয়েছে। এই গল্প শুধু এই এলাকায় নয়, গোটা ওশিয়্যানিয়া, এমন কি অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসীদের মধ্যেও শোনা যাবে। তবে কি ভারতীয় উপমহাদেশ থেকে যাযাবর মানুষের অকূল দরিয়ায় পাড়ি জমানো সেই সুদূর কালেই শুরু হয়েছিল ? লোকসংস্কৃতিবিদ উইলিয়াম লেসা এই ধারণাই পোষণ করেন।

প্রশান্ত মহাসাগরীয় বলয়ে তিনিরাউ, হিনে, মাওই, পুনতান ও রুপেকে কেন্দ্র করে অসংখ্য লোকপুরাণ রয়েছে। উচ্চারণের কিছু তফাৎ সত্ত্বেও এরাই মাইক্রোনেশীয় লোকপুরাণেও খুব প্রাধান্য পেয়েছে।

মৃত্যুর পরে মানুষ ও পশুপাখির আত্মা, সৃষ্টিতত্ত্ব, অশুভ শক্তি-দলনকারী স্বর্গীয় শক্তি প্রভৃতি বিষয়ে অসংখ্য লোকপুরাণ রয়েছে।

মাইক্রোনেশীয় আদিবাসী অসাধারণ দক্ষ নৌযাত্রী, সমুদ্রের বুকে নৌকা নিয়ে তারা বহু বহু দূরে চলে যায়। রহস্যময় সমুদ্র, সামুদ্রিক ঝড়, উত্তাল ঢেউ তাদের কল্পনাকে উদ্দীপ্ত করেছে। তাই রূপকথার অধিকাংশ বিষয়বস্তু এই সমুদ্র ও সমুদ্রযাত্রা। অবশ্য, এই বলয়ের অধিকাংশ আদিবাসীদের রূপকথার প্রিয় বিষয় হল রহস্যময় সমুদ্র। আর রয়েছে পুরুষ ও স্ত্রী দৈত্যের রূপকথা। এরা সবসময়ে খুব বোকা অথচ দেহে রয়েছে অমিত শক্তি। এরা মাঝে মধ্যে গোটা গ্রামের মানুষকে খেয়ে ফেলে। কেমন করে বেঁচে যায় একজন গর্ভবতী নারী। তার সন্তান দৈত্যকে নিধন করে। অনেক রূপকথায় রয়েছে পশুমাতা বা পশধাত্রীর কথা। এরা মানবিক চেতনায় মানুষের সন্তানকে লালন করে তবে সন্তান সচরাচর হয় কন্যা। কোন এক অজানা দ্বীপ থেকে আসে এক ছেলে, কন্যাকে

সে বিয়ে করে। আবার এই ধরনের রূপকথায় বিষাদময় পরিণতির কথাও আছে। ভুল করে সেই ছেলে পশুধাত্রী ও কন্যাকে হত্যাও করে বসে। তারপরে অনুশোচনায় আত্মহত্যা করে। আত্মহত্যার বিষয়টি এলাকার বহু গল্পে রয়েছে, এই বিষয়টি ব্যতিক্রমের পর্যায়ে পড়ে। কেননা, আদিবাসী কিংবা অন্য লোকসমাজের লোককথায় আত্মহত্যার বিষয়টি প্রায় বিরল। সংহত সমাজে বিচ্ছিন্ন মানসিকতার স্থান নেই, সমাজে আত্মহত্যাও নেই, তাই লেককথায়ও আত্মহত্যার কাহিনি অনুপস্থিত। পশুমাতা বা পশুধাত্রী সাধারণত ইল বা বাইন মাছ অথবা গিরগিটি। বাইন মাছ এই এলাকায় অসাধারণ গুরুত্বপূর্ণ। গোষ্ঠীর সৃষ্টিবিষয়ক লোকপুরাণের সঙ্গো অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত।

শুধুমাত্র মানুষকে কেন্দ্র করেও অনেক রূপকথা আছে। এই ধরনের প্রায় সব রূপকথায় একসঙ্গো দুটি চরিত্র সমান প্রাধান্য পায়,—দুই ভাই, দুই বোন, স্বামী-স্ত্রী, দুই ছেলে বন্ধু, দুই মেয়ে বন্ধু। যেসব রূপকথায় দুই ভাইয়ের গল্প রয়েছে সেখানে ছোট ভাই দয়ালু ও ভাগ্যবান আর বড় ভাই নিষ্ঠুর ও উদ্ধত।

মাইক্রোনেশিয়ায় আর এক ধরনের লোককথায় দূর দূর দেশের কাল্পনিক অভিযানের গল্প রয়েছে। একটি কাহিনির সূত্র ধরে আরেকটি কাহিনি, এইভাবে কাহিনি এগিয়ে চলে। রোন্‌গারিক নামে একজন দুঃসাহসী বিশ্বস্ত অভিযাত্রীর কাহিনি খুব জনপ্রিয়। পালুয়েলাপের দুই ছেলে। বড় ছেলে কোথায় হারিয়ে গিয়েছে। তাকে খুঁজতে বেরিয়েছে ছোট ছেলে রোন্‌গারিক। তার বিচিত্র অভিযানের কাহিনিতে পূর্ণ এই লোককথার মালা।

মাওরি আদিবাসী ঃ অকূল দরিয়ার ঐতিহ্য

নীল সাগরের তীরভূমি, ঢেউ-এর পর ঢেউ ভেঙে এগিয়ে আসছে কয়েকটি ছিপ্ নৌকো। নৌকোয় অনেক মাছ, সোনালি রোদে রূপোলি আভা। তীরভূমিতে দাঁড়িয়ে উচ্ছল বউ-মেয়ে-মায়েরা। গান গাইছে,—আনন্দের গান। যুবক ছেলে স্বামী বাবা অনেক মাছ নিয়ে ফিরেছে। আরও আনন্দ,—উত্তাল সাগর থেকে প্রিয়জন নিরাপদে ফিরে এসেছে।

হে কোয়া কাই! হে কোয়া কাই!
হে পাপা তেরেতেরে! হে পাপা তেরেতেরে!
এই..............ই...........ই এই......

এই গান গায় মাওরি আদিবাসী মেয়েরা। ভুলে-যাওয়া সেই কোন্ সুদূর কাল থেকে তারা থাকে নিউজিল্যান্ডে। নিউজিল্যান্ডে ইউরোপের মানুষ উপনিবেশ গড়বার পরে তাদের নিজেদের দেশে আজ তারা দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিক, মূল স্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন জনগোষ্ঠী। এমন দিন আগে ছিল না। বড় করুণ আর দুঃসহ আজকের জীবন। নয়া উপনিবেশ তো এই সেদিনের কথা, মৌখিক ঐতিহ্যে বিধৃত রয়েছে পুরনো দিনের স্মরণীয় গাথা। কেমন ছিল সেই সংস্কৃতি?

নিউজিল্যান্ডের উত্তর দ্বীপের পূর্ব সাগরতীরে মাওরি আদিবাসীদের এক গোষ্ঠী বাস করে। এরা হল তাকিতুমু গোষ্ঠী। এরাই সবচেয়ে অকৃত্রিমভাবে প্রাচীন ঐতিহ্যকে লালন করে চলেছে। মাওরিদের প্রাচীনতম ঐতিহ্যের কথা জানতে হলে এই গোষ্ঠীর কাছ থেকেই আজ তা জানতে হবে।

পলিনেশিয়া থেকে মৌখিক ঐতিহ্যের নানা উপকরণ সংগহ করেছেন সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞানীরা। পলিনেশিয়ার হাজার হাজার দ্বীপের বিচিত্র উপকরণ বিশ্লেষণ করে দুটি অসাধারণ সিদ্ধান্তে পৌঁছানো সম্ভব হয়েছে। এক, এই জাতিগোষ্ঠীর জীবন কেটেছে দীর্ঘ লড়াই, সমুদ্রযাত্রা ও নয়া বসতি গড়ার মধ্য দিয়ে। লড়াই বেঁধেছে দ্বীপে দ্বীপে, পরাজিত হয়ে কিংবা খাদ্যের অন্বেষণে দ্বীপ ছেড়ে যেতে হয়েছে, সমুদ্রই একমাত্র পথ,পথের শেষ হয়েছে নতুন দ্বীপে নতুন উপিনিবেশে। আজ তারা যেখানে রয়েছে সেখানেও একদিন তারা পরবাসী ছিল। দুই, নিউজিল্যান্ডের বর্তমান মাওরি আদিবাসীরাও পরবাসী, নতুন বসতি একদিন মাতৃভূমি হয়ে উঠল।

তাকিতুমু মৌখিক ঐতিহ্যের ধারা বেয়ে আমরা জানতে পারি, এই মাওরিদের আদি জন্মভূমি ছিল সুদূর পশ্চিম দিকে। এই জন্মভূমির নাম ছিল উরু। যুদ্ধ শুরু হল, গোষ্ঠীবিরোধ চরমে উঠল, তখন পুহি-রান্‌গিরান্‌গি নামে একজন গোষ্ঠীপতির নেতৃত্বে তারা পুবদিকে এগিয়ে চলল। অসংখ্য লম্বা লম্বা নৌকায় চলেছে অসংখ্য অভিযাত্রীর দল, এক উষ্ণতর আবহাওয়া অঞ্চলের দিকে। মন মানছে না নতুন দ্বীপে। বড় গরম। সেই চঞ্চল মুহূর্তে একজন সমুদ্র-অভিযাত্রী তু-তে-রান্‌গিআওয়া তাদের এক স্বপ্নরাজ্যের কথা জানাল। সে দেখে এসেছে সাগরতীরের সবুজ রাজ্য। আরও পুবে পাড়ি দিতে হবে। তু-তে আরও বলল, সে স্বপ্নরাজ্যের নাম ইরিহিয়া। অফুরন্ত খাদ্য সেখনে। সেখানকার মানুষগুলো রোগামতন, শান্ত স্বভাবের, তাদের গায়ের রঙ কালো। আর রয়েছে বিস্ময়কর একটি গাছের ছোট ছোট শস্য। তাতে রক্ত নেই, রস নেই। তাই সেগুলো দেবপূজায় উৎসর্গ করা হয়।

সামাজিক ইতিহসের সূত্র খুঁজে পাওয়া যাবে এই কাহিনির মধ্যে। তারা দেশ ছেড়েছিল যুদ্ধের জন্য, খাদ্যাভাবের জন্য। বসতি গড়ল সেখানে, যেখানে রয়েছে অফুরন্ত খাদ্যের জোগান, যেখানকার মানুষ শান্ত স্বভাবের। আবহমান কালের মানুষের এই একই সামাজিক ইতিহাস। মানুষের চেয়ে যাযাবর আর কোন্ প্রাণী আছে?

তারা এল ইরিহিয়া এলাকায়। তাদের আদি বাসভূমির তুলনায় এখানেও গরম বেশি। তবু তেমন নয়। সবই সয়ে যায় ধীরে ধীরে, যদি পেট থাকে ভর্তি। গরম এলাকা বলে তারা ইরিহিয়াকে ইরিরান্‌গি-ও বলত,—সূর্যের তেজ প্রবল বলেই এই নতুন নাম। এখানকার আদি কালো মানুষজনের সঙ্গেই এরা থাকতে লাগল। এদের অনেকেই ছিল যাযাবর, নির্দিষ্ট বাসস্থান ছিল না। দুই জনগোষ্ঠী মিলে গেল। চেহারায় তার প্রভাব পড়ল। এ-ও ঐতিহাসিকভাবে সত্য। কাহিনির মধ্যে রক্ত-মিশ্রণের স্মৃতি সুপ্ত রয়েছে। পৃথিবীর কোন জনগোষ্ঠীতেই বোধহয় এক রক্ত নেই। যাযাবর মানুষের স্বাভাবিক পরিণতি।

অন্য একটি কাহিনিও আছে। এর মধ্যেও ঐতিহাসিক সত্য রয়েছে। মাওরি জনগোষ্ঠী ইরিহিয়াতে পৌঁছল, কিন্তু সহজে সেখানে বসতি গড়ে তুলতে পারেনি। কেননা, ইরিহিয়াতে কোপুরা-তাহি নামে এক সর্দার ছিল, তার অধীন ছিল পাঁচশ ছোট ছোট সর্দার। তাদের জনবল এত বিপুল ছিল যে, তীরভূমির বালুকণার মতো তাদের সংখ্যা। তাদের সঙ্গে মাওরিদের বিরোধ বাধল, তীব্র লড়াই শুরু হল। শেষ পর্যন্ত সন্ধি হল,—মীমাংসায় স্থির হল সবাই একসঙ্গেই থাকবে। সবাই থাকতে লাগল।

মানবসমাজের ইতিহাসে বহুবার ঘটে-যাওয়া ঐতিহাসিক সত্য। কাহিনিতে আরও বলা হয়েছে, এইসব যুদ্ধ ও বিরোধে কিছু মানুষ বিরক্ত হয়ে আরও পুবের দিকে রওনা দিল। তারাও সংখ্যায় কম নয়। আবার অকূল দরিয়ায় যাত্রা। ভারত মহাসাগরের বুক বেয়ে জাভা সুমাত্রার পাশ দিয়ে সে পথ আরও পুবের দিকে।

অভিযানের এই পর্বে একটি ভাষাগত সাদৃশ্য পণ্ডিতজনকে বিহ্বল করে আসছে দীর্ঘ দিন ধরে। দেশের নাম ইরিহিয়া, সংস্কৃত ভাষায় প্রাচীন ভারতবর্ষের নাম ব্রীহিয়া। মাওরি অভিযাত্রীদল কি ব্রীহিয়ার উচ্চারণ করত ইরিহিয়া বলে? মাওরিদের প্রধান খাদ্য চাল, তারা বলে আরি, ভারতের দক্ষিণাঞ্চলের দ্রাবিড়রা চালকে বলে আরি। প্রচীন ভারতবর্ষে ধানকে বলা হত ব্রীহি আর ব্রীহিক হল ধান্যবিশিষ্ট। ব্রীহিয়া দেশের নাম কি ব্রীহি বা ব্রীহিক থেকে এসেছে?[৮] তাহলে আমাদের প্রাচীন সংস্কৃতির সঙ্গে কি মাওরিদের কোন পূর্ব বন্ধন ছিল? প্রাচীন ভারতীয় মানুষও ছিল অকূল দরিয়ার মাঝি। সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হলে অজানা ইতিহাসের সন্ধান পাওয়া যাবে একদিন। সেদিন নতুন করে সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞান চর্চা শুরু হবে।

যারা এভাবে উত্তাল সমুদ্র পাড়ি দিয়েছিল, সমুদ্র ও জলযান সম্পর্কে তাদের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা কত গভীর ও ব্যাপক ছিল তা সহজেই বোঝা যায়। মাওরি লোকপুরাণে রয়েছে, ইরিহিয়ার সংঘর্ষের পরে কিছু মাওরি আরও পুবের দিকে এগিয়ে চলল। চলছে,চলছে—এগারো দিন এগারো রাত কেটে গেল। শেষকালে তারা বনে-ঘেরা এক ডাঙা দেখতে পেল। সেখানে তারা নতুন বসতি গড়ে তুলল। সে দেশের নাম তাওহিতি-রোয়া।

এই কাহিনিতেই রয়েছে অভিযানের কথা ও নৌকোর বিবরণ। সামুদ্রিক প্রকৃতির কথাও রয়েছে। ঝোড়ো বাতাসে ঢেউয়ের তাণ্ডবের মধ্যে তারা কি ধরনের হাল-দাঁড় ব্যবহার করত তাও বলা হয়েছে। আকাশের তারা দেখে কীভাবে রাতের অন্ধকারে তারা দিক নির্ণয় করত সে তথ্যও রয়েছে। লোকপুরাণের মধ্যেও বিজ্ঞানভিত্তিক এসব বর্ণনা কাহিনির আকারে তারা বলেছে। সমুদ্রের পোকা না হলে, সমুদ্র সম্পর্কে গভীর জ্ঞান না থাকলে, জ্যোতির্বিদ্যার প্রাথমিক পাঠ জানা না থাকলে মূল বাসভূমি থেকে প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপগুলিতে পৌঁছানো সম্ভব হত না।

যাত্রার শেষ কিন্তু এখানেই নয়। কোন এক অজ্ঞাত কারণে কিছু মাওরি আবার জলে নৌকো ভাসিয়ে দিল। আরও পুবে। কিছু রয়ে গেল সেই দ্বীপেই। আবার সমুদ্রযাত্রা, এবার পৌঁছল তাওহিতি-নুই দেশে। মাওরি সংস্কৃতি-বিশেষজ্ঞ এস. পারসি স্মিথ মনে করেন, তাওহিতি হল বর্তমানের সুমাত্রা ও নুই হল বর্তমানের জাভা।

অশান্ত যাযাবর মাওরি জনগোষ্ঠী তাওহিতি-নুই দ্বীপেও বেশিদিন থাকল না। কয়েক পুরুষ পরে একটি অংশ আবার সমুদ্রযাত্রা করল। রক্তে বুঝি অভিযানের নেশা। তারা পৌঁছল আহু, মাওই ও হাওয়াই-কি দ্বীপে। বেশ কিছুকাল তাদের স্থিতি হয়েছিল এই তিন দ্বীপে। পারসি স্মিথ বলেছেন, এই তিনটি দ্বীপের বর্তমান নাম হল আহু, মাওই ও হাওয়াই। লোকপুরাণের নামের সঙ্গে বর্তমানের নামের হুবহু মিল। হাওয়াই দ্বীপমালার মধ্যে এগুলো রয়েছে।

আজ আর বলা সম্ভব নয়, কীভাবে কোন্ সঠিক পথে এই দুর্ধর্ষ অভিযাত্রী দল প্রশান্ত মহাসাগর পাড়ি দিয়েছিল। কিন্তু লোকপুরাণে বিবৃত এই অভিযানকে আজগুবি

গল্পকথা বলেও তো উড়িয়ে দেওয়া যায় না।[১] কেননা, আজও আমরা মেলানেশীয় অঞ্চলে বহু পলিনেশীয় উপনিবেশ দেখতে পাই, দেখতে পাই ছোট ছোট জনগোষ্ঠী যারা পলিনেশিয়া থেকে এত দূরের দ্বীপে বাস করেও পলিনেশীয় ভাষায় কথা বলছে। এইসব জনগোষ্ঠীকে আজও দেখতে পাওয়া যাবে ফুটুনা, টিকোপিয়া, রেনেল, ওন্‌টোংগ প্রভৃতি দ্বীপে। এমন কি ক্যারোলিন-এর দক্ষিণে নুকুওরো দ্বীপেও। সমুদ্র পাড়ি দিয়ে না এলে পলিনেশীয় ভাষা ও সংস্কৃতির সঙ্গে এমন মিল রইবে কেন ? আজ যারা এইসব দ্বীপে পলিনেশীয় সংস্কৃতির মানুষ, তারা নিশ্চয়ই সেই অভিযাত্রীদের উত্তরপুরুষ।

মনে হয়, পূর্ব প্রশান্ত মহাসাগরীয় এলাকায় ঢোকার পরে অভিযাত্রী দল দুটি বা তিনটি পথে এগিয়ে গিয়েছিল। সামোয়া ও ফিজি দ্বীপপুঞ্জের তীরভূমি থেকে অসংখ্য সমুদ্রযাত্রা করে তারা এইসব দ্বীপে পৌঁছয়। কম্পাস নেই, ধাতুর ব্যবহার জানা নেই, অন্তত নৌকোয় ধাতুর ব্যবহার করে নি,— অথচ কি সাহসিক অভিযান। খাদ্য-অন্বেষণের মর্মান্তিক আগ্রহ বোধহয় প্রাণীকে সাহসী করে তোলে। তাদের যদি লিপি থাকত, তারা যদি সেদিনের অভিযানের ইতিহাস লিখে যেতে পারত, যদি অবিস্মরণীয় সাগরপাড়ির মানচিত্র আঁকতে জানত, পথের হদিস লিপিবদ্ধ করতে জানত, তবে পঞ্চদশ শতক থেকে ইউরোপের অভিযানকারীদের এত পরিশ্রম করতে হত না।

পলিনেশিয়ার এইসব মানুষের সর্বশেষ আশ্রয়ভূমি নিউজিল্যান্ড। অস্ট্রেলিয়া তাসমানিয়ার কোল ছুঁয়ে আরও পূর্ব সমুদ্রতীরে তাদের শেষ যাত্রা। অবশ্য এটাও অনুমান-নির্ভর। পলিনেশীয় এলাকা থেকে, সেখানকার দ্বীপপুঞ্জ থেকে সুদূর পূর্বে এই দ্বীপপুঞ্জে এসে একদলের স্থিতি হল। আজ শুধু এরাই মাওরি নামে খ্যাত। বোধহয় অন্তহীন দুঃসাহসিক কষ্টকর সমুদ্রযাত্রার এখানেই পূর্ণচ্ছেদ।

মাওরি আদিবাসীর তাকিতুমি ঐতিহ্যে বলা হয়েছে, বীর অভিযাত্রী কুপে নতুন দ্বীপ নিউজিল্যান্ডের আবিষ্কর্তা। সে পূর্ব-পলিনেশিয়ার বাসিন্দা, নতুন দ্বীপে এল কেমন করে ?

কুপে ও ন্‌গাহুয়ে 'সোসাইটি' দ্বীপপুঞ্জের বাসিন্দা। দুটি নৌকোয় তারা রওনা দিল। চলতে চলতে তারা নিউজিল্যান্ডের সুদূর উত্তর ভূমিখণ্ডে পৌঁছল। অল্পকাল সেখানে থেকে তারা অনেক দক্ষিণে নেমে এসে পূর্ব তীরে চলে গেল। গ্রেট ব্যারিয়ার দ্বীপ হল তাদের আওটেয়া দ্বীপ আর উত্তর ভূমিখণ্ড হল তাদের আওটেয়া-রোয়া। এ নামেই তারা দ্বীপ দুটিকে ডাকে। এই দুজন অভিযাত্রী যখন উত্তর অন্তরীপ অঞ্চলে যাচ্ছিল, তখন প্রথমে দেখতে পায় আকাশে এক খণ্ড সাদা মেঘ, তারপরেই নজরে পড়ে স্থলের ব্যাপ্তি। সাদা মেঘ তাদের ভাষায় আওটেয়া, সেই থেকে স্থানের নাম হল আওটেয়া। এখানকার 'ক্যাসল পয়েন্ট' ও 'পালিসার' উপসাগরে পৌঁছে তারা এল 'ওয়েলিংটন' বন্দরে। এখানকার সোমেস ও ওয়ার্ড দ্বীপপুঞ্জের নাম তাদের ভাষায় মাটিউ এবং মাকারো। এই দুই নামে কুপের দুজন প্রিয় আত্মীয় ছিল। এখান থেকে তারা গেল পোরি-রুয়া এলাকায়, বর্তমানের সিনক্রেয়ার হেড-এর কাছাকাছি। তারপরে পাড়ি দিল দক্ষিণ দ্বীপে। আরাহুরাতে তারা সবুজ পাথরের সন্ধান পেল। লোকপুরাণে বলা হয়েছে, এসব এলাকায় তখন কোন মানুষজন ছিল না। তাই অভিযাত্রী দুজন আবার পূর্ব-পলিনেশিয়ায় ফিরে আসে। সে কোন কালে ? মাওরি আদিবাসী বলে, তা জানি না, আমাদের আসার অনেক অনেক কাল আগে।

কুপে ও নগাহুয়ের পরের অভিযাত্রী হল তোই। সে-ও পূর্বদিকের সাগরপথে নিউজিল্যান্ডে পৌঁছল। সে এসে দেখল, উত্তর দ্বীপে কালো রঙের মানুষদের বসতি রয়েছে। তারা বেশ অনুন্নত বলে তোই-এর মনে হল। কুপে এইসব এলাকায় কোন মানুষ দেখেনি। তোই দেখল অনেক মানুষ। তাহলে দুজনের অভিযানের মাঝখানে কি এরা এসেছিল. মাওরি লোকপুরাণে আছে, এরাও কোন অজানা দ্বীপ থেকে সাগরে পাড়ি দিয়েছিল, সমুদ্র-ঝড়ে দিশেহারা হয়ে এইসব দ্বীপে ছিটকে পড়ে। স্বেচ্ছায় তারা এসব দ্বীপে আসেনি। এরা বোধহয় এসেছিল বর্তমানের মেলানেশিয়ার নিউ হেব্রাইডিস দ্বীপ থেকে। অস্ট্রেলিয়া কিংবা তাসমানিয়া থেকে কোনভাবেই এরা আসতে পারে না। কেননা, সমুদ্র পাড়ি দেবার মতো নৌকো তারা বানাতে জানত না। মাওরিরা এইসব মানুষের বিবরণ দিয়েছে এইভাবে ঃ এদের বোঁচা নাক, স্ফীত নাসারন্ধ্র, ঘন চুল, অশান্ত চাহনি। এরা রোগামতন, পোশাক পরে অতি সামান্য। এই দৈহিক বিবরণ থেকে আংশিকভাবে মনে হয়, এরা মেলানেশীয় জনগোষ্ঠী। কিন্তু মেলানেশীয়রা রোগামতন নয়, এরা তুলনামূলকভাবে উজ্জ্বল রঙের। অনেকে মনে করেন, এই গোষ্ঠী পলিনেশীয়-মেলানশীয় মিশ্রিত জনজাতি।

যাইহোক, তোই নিউজিল্যান্ডে উপনিবেশ গড়বার পর থেকে শুরু হল পলিনেশীয় মানুষদের আসা। আগে যারা এসেছিল, নতুন আসা দলের সঙ্গো কখনও কখনও মিলন কখনও বিরোধ চলতে লাগল। পলিনেশিয়া থেকে এসেছে পুরুষই বেশি। সমুদের অত ধকল কি সব মেয়ে সইতে পারে? বউ চাই। আগে আসা অন্য জনগোষ্ঠীর অনেক মেয়ে তাদের বউ হল। এর স্বাভাবিক পরিণতিতে আগে আসা মানুষজন একদিন প্রচণ্ড ক্ষেপে গিয়ে আক্রমণ করল মাওরিদের। কিন্তু তারা পারবে কেন উন্নত মাওরিদের সঙ্গো? নিঃশেষ হয়ে গেল পুরুষেরা। সামান্য কিছু মানুষ পালিয়ে গেল তীরভূমি থেকে অনেক দূরে গহন অরণ্যে। শেষ পর্যন্ত তাদের সামান্য কয়েকজন ছিল চ্যাথাম দ্বীপপুঞ্জে। ১৭৯১ খিস্টাব্দেও তাদের কয়েকজন উত্তরপুরুষ স্বাতন্ত্র বজায় রেখে বেঁচে ছিল। আজ আর তাদের কেউ নেই, যেমন নেই তাসমানিয়ার আদিবাসী। তাসমানিয়ার শেষতম আদিবাসী মারা গিয়েছেন ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দে।

নব্য প্রস্তরযুগের সমুদ্র-অভিযাত্রীদের মতোই পলিনেশীয়রা এক বিস্ময়কর সমুদ্রজয়ী জনজাতি। সাগররাজ্যের এক ব্যাপক এলাকা তারা চষে বেরিয়েছে। আদি তীরভূমি থেকে হাজার হাজার মাইল পাড়ি দিয়েছে। অনেক ঝড় সমাজের ওপর দিয়ে বয়ে গিয়েছে, বহু প্রতিকূলতা তারা আজও বহন করে চলেছে। অকূল দরিয়ায় যারা এভাবে পথ চলেছে, অকূল দরিয়ার ঐতিহ্যকে তারা সহজে ভুলবে কেমন করে?

মাওরি লোককথা

সুদূর কাল থেকে মৌখিক ঐতিহ্যে বয়ে আসা এই স্মৃতি মাওরি লোককথাকে লালন করে এসেছে। মাওরিদের সমস্ত লোককথার জাতিগত পরিচয়জ্ঞাপক একটি নাম দেওয়া থাকে, তা হল—'কোরেরো পুরাকাউ'। এদের বেশির ভাগেরই সন্ধান মিলবে পলিনেশীয় দেশগুলিতে, যা থেকে নিশ্চিতভাবে প্রমাণ পাওয়া যায়, তাদের আদি বাসভূমির কথা। পলিনেশীয় রূপকথা পশুকথা লোকপুরাণ কিংবদন্তির হুবহু রূপগুলি মাওরিদের মধ্যে রয়েছে। আবার দীর্ঘদিনের বিচ্ছিন্নতার ফলে কিছু নতুন লোককথারও

উৎসার ঘটেছে, যা একান্তই নিউজিল্যান্ডের সীমানায় আবদ্ধ। বিশেষ করে, ঐতিহ্যবাহী লোকপুরাণগুলির আদি উৎস যে পলিনেশীয় দ্বীপপুঞ্জ তাতে সন্দেহ নেই। 'জার্নাল অব দ্য পলিনেশিয়ান সোসাইটি'র তৃতীয় খণ্ডে অনেক লোকপুরাণের সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ রয়েছে, যা থেকে বোঝা যায় পলিনেশীয় স্থানগুলির কিছু নামসহ এইসব লোকপুরাণ মাওরিদের মৌখিক ঐতিহ্যে স্থায়ীভাবে রয়ে গিয়েছে।

আদিবাসী লোকসমাজের বিশেষত্ব হল, তাদের লোককথা ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান-পরবের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত।[১০] যেমন হিন্দুদের ব্রতকথার গল্পগুলি। বিশেষ বিশেষ সময়ে এগুলি স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রকাশ পেয়ে থাকে। মাওরিদেরও এই একই বিশ্বজনীন ঐতিহ্য। শীতকালেই তাদের অধিকাংশ উৎসব-পরব আর শীতের গোধূলি-সন্ধ্যায় পবিত্র আগুন জ্বালিয়ে তারা এইসব লোককথা বলে চলে। অফুরন্ত সে ভাণ্ডার। শ্রুতির মাধ্যমে উত্তরপুরুষ বাঁচিয়ে রাখে লোককথার ভাণ্ডার।

এইসব লোককথার বিষয়গুলো হল : সৃষ্টি বিষয়ক লোকপুরাণঃ রামধনু-বনভূমি-সূর্য-চাঁদ-নক্ষত্র-মানুষ-পশুপাখি-সাগরের জন্ম হল কীভাবে, পৌরাণিক মানুষ-খেকো দৈত্য-দানো, দৈত্য-দানো নিধনকারী অপরাজেয় মানুষ, সমুদ্রে একাকী বীর পুরুষ, অপরূপা পরির দল, কথা-বলা জাদু-জানা উপকারী পশুপাখি, চলন্ত পাহাড়-বনানী, নীতিকথা, পশুকথা। মাওরি আদিবাসী সমাজে ব্যভিচারের কোন লোককথা নেই, সমাজে যেমন নেই ব্যভিচারের স্থান। আশ্চর্য নিষ্কলুষ সমাজবন্ধন। এইসব লোককথার মধ্যে অনেক ঐতিহাসিক সত্যকথন রয়েছে। যেমন, ন্‌গাহুয়ের কাহিনি। ইনি একজন পলিনেশীয় অভিযাত্রী, তিনি সুদূর পলিনেশিয়া থেকে নিউজিল্যান্ডে এসে সবুজ পাথর আবিষ্কার করেছিলেন। আবার ফিরে গিয়েছিলেন পূর্ব পলিনেশিয়ায়। এই কাহিনির ঐতিহাসিক সত্যতা প্রমাণিত হয়েছে। এইভাবে রাতা, হুইরো প্রভৃতি অভিযাত্রীর কথাও লোকপুরাণে রয়েছে। মাওরিরা বিদ্যুৎ-ঝড়-ধূমকেতুতে চেতন-ধর্ম আরোপ করে লোকপুরাণে নাম দিয়েছে টাওহাকি-হোয়াইতিরি-ওয়াহিয়েরোওয়া,—এরা ঐতিহাসিক চরিত্র।

মাওরি আদিবাসী স্বপ্নের ফলাফলে গভীরভাবে বিশ্বাসী। তাই স্বপ্নকে ঘিরে তাদের অসংখ্য লোককথা রয়েছে। এই স্বপ্ন তাদের জীবনাচরণকে নানাভাবে প্রভাবিত করে বলেই মৌখিক ঐতিহ্যে স্বপ্নের স্থানও বেশ ব্যাপক। যুদ্ধ-প্রসঙ্গে স্বপ্ন দেখার প্রভাব বেশি। তাই যুদ্ধ-সংক্রান্ত লোককথায় স্বপ্ন বেশি বেশি স্থান করে নিয়েছে।

হাজার বছরের ওপরে হল মাওরি আদিবাসী আদি বাসভূমি 'রাইয়াতিয়া' বা 'হাওয়াইকি' ছেড়ে পাড়ি দিয়েছিল অজানা দ্বীপের পথে,—এতদিনের ঐতিহ্য, আদি বাসভূমির স্মৃতি আজ ও তারা তাদের লোককথায় ধরে রেখেছে, এটাই বিস্ময়ের। প্রতিটি মহান জাতিগোষ্ঠীর এই ঐতিহ্যপ্রিয়তাই হাজার প্রতিকূলতার মধ্যেও তাকে স্বাতন্ত্র বজায় রাখতে সাহায্য করে।

মেলানেশিয়া

ফিলিপিনস্ দ্বীপপুঞ্জের পূর্বদিকে, মাইক্রোনেশিয়ার দক্ষিণে, অস্ট্রেলিয়ার উত্তরে ও পলিনেশিয়ার পশ্চিমে অসংখ্য দ্বীপের মালায় গাঁথা মেলানেশিয়া এলাকা। ঘন বনানীতে আবৃত গ্রীষ্মমণ্ডলীয় এই মেলানেশিয়াকে তিনটি প্রধান ভৌগোলিক ভাগে বিভক্ত করা

যায়। প্রথম নিউ গিনি। পৃথিবীর সর্ববৃহৎ দ্বীপ, প্রাচীনকালে যে দ্বীপ অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে যক্ত ছিল বলে অনুমান করা হয়। দ্বিতীয় বিসমার্ক, সোলোমোন, সানটাক্রুজ, ব্যাংক, নিউ হেব্রাইডিস, লয়্যালটি ও নিউ ক্যালেডোনিয়া দ্বীপপুঞ্জের সমাহার। এইসব দ্বীপ মূলত আগ্নেয়গিরিপ্রবণ। তৃতীয়, পলিনেশিয়ার পশ্চিম সীমান্ত এলাকার ফিজি দ্বীপপুঞ্জ।

বিচিত্র সংস্কৃতি ও দৈহিক কাঠামোগত বিভিন্নতা রয়েছে এই এলাকায়। তাই এখানকার আদি জনবসতিকে তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যদিও দীর্ঘদিনের মিশ্রণের ফলে একের প্রভাব পড়েছে অন্য গোষ্ঠীর ওপরে। এলাকার সবচেয়ে পুরনো বাসিন্দা হল নিউ গিনির অভ্যন্তরে অরণ্য এলাকার নেগ্রিটো মানুষ। এদের লোককথার কোন পরিচয় আজও জানা যায়নি। পরবর্তী স্তরে এল পাপুয়া আদিবাসী। এরাই নিউ গিনির বেশির ভাগ অংশ দখল করে নেয়। পার্শ্ববর্তী দ্বীপগুলির মানুষজনের সঙ্গে মেলামেশা চলতে থাকে। আর মধ্যবর্তী এলাকায় থাকে ওশিয়্যানিক নিগ্রয়েড। এরা মালয়ী-পলিনেশীয় ভাষায় কথা বলে। মেলানেশিয়ার মাঝখানের সমস্ত দ্বীপেই এদের প্রাধান্য। এরা আবার নিউ গিনির তীরভূমির পূর্ব অংশে গিয়েও বসবাস শুরু করে। নৃবিজ্ঞানীরা নিউ গিনিকে মূল মেলানেশিয়া থেকে স্বতন্ত্র সংস্কৃতি এলাকা বলে গণ্য করেন, কেননা এখানে মূলত পাপুয়া আদিবাসীদেরই বাস। নিউ গিনির বিশাল আকৃতিও এই স্বাতন্ত্রের অন্যতম কারণ বলে মনে করা হয়।

মেলানেশিয়ার অধিকাংশ আদিবাসী কৃষিজীবী। অতি সরল পুরনো পদ্ধতিতে তারা চাষ করে। তবে গভীর অরণ্য এলাকায় কিছু কিছু গোষ্ঠী আজও আধা যাযাবর। কুকুর, মুরগি ও শুয়োর গৃহপালিত প্রাণী। দীর্ঘদিন ধরে এই এলাকায় বাইরের জনগোষ্ঠীর অনুপ্রবেশ ঘটে চলেছে, সংস্কৃতির ওপরেও তার প্রভাব পড়েছে। ভাষাগত বৈচিত্রও দেখা দিচ্ছে।

ম্যাজেলানের পথ বেয়ে এল ইউরোপীয় অভিযাত্রী দল। সামুদ্রিক ঝড়, ঢেউ-এর তাণ্ডব যে বিপর্যয় ঘটাতে পারে নি এদের সামাজিক জীবনে, তাই ঘটে গেল ইউরোপীয়দের হাতে। ওশিয়্যানিয়ার অন্য এলাকায় যা ঘটেছে সেই একই নিষ্ঠুরতা বর্বরতা ও রক্তপাতের ইতিহাস এখানেও গোষ্ঠীজীবনে মর্মান্তিক হয়ে দেখা দিল। ম্যাজেলানের দেশের এক অভিযাত্রী, আলভারো মেনডানা ১৫৯৫ খ্রিস্টাব্দে সোলোমন দ্বীপপুঞ্জে আদিবাসীদের রক্তে বন্যা বইয়ে দিলেন। শিকারি যেমন 'বীভৎস আনন্দে' পশুশিকার করে, ইনি সেই আনন্দে আদিবাসী হত্যা করতেন। অথচ ইনি নাকি ছিলেন খুব ভক্তিমান খ্রিস্টান। এই মেনডানা যখন পলিনেশিয়ার মারকুইসাস দ্বীপপুঞ্জে অহিংসার প্রতীক ক্রস স্থাপন করেন সেই মুহূর্তে দুশো আদিবাসীকে হত্যা করেছিলেন। এই এলাকায় ম্যাজেলান বা মেনডানা একজন দুজন আসে নি, এসেছে একের পর এক। এই নতুন সুসভ্য মানুষেরা আর একটি নতুন জিনিসের আমদানি করল যা আদিবাসী সমাজে আগে ছিল না। নতুন নতুন রোগ, সবচেয়ে সাংঘাতিক বসন্ত ও সিফিলিস। অত্যাচার তো অত্যাচারেই শেষ হয়, মৃত্যুর পরে আর সহ্য করতে হয় না, কিন্তু এই রোগ পুরুষ পরম্পরায় বয়ে চলে, জনগোষ্ঠীর সামাজিক জীবনকেই ওলটপালট করে দেয়।[১১] ওশিয়্যানিয়ার সর্বত্রই এই একই করুণ ইতিহাস।

এইসব বিপর্যয় থেকে রক্ষা পেতে কিছু জনগোষ্ঠী সুদূর দুর্গম পাহাড়ি বনাঞ্চলে আশ্রয় নেয়। বিশেষ করে নিউ গিনিতে। তারা আজও বাইরের জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েই বসবাস করছে।

মেলানেশীয় লোককথা

মেলানেশীয় আদিবাসী জনগোষ্ঠীর লোককথার বিশাল ভাণ্ডার আজও পুরোপুরি সংকলিত হয়নি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী কালে সাংস্কৃতিক মিশ্রণের ফলে অনেক লোককথা কোথায় হারিয়ে গিয়েছে, চেষ্টা করলেও আজ আর তার সন্ধান পাওয়া যাবে না। এ বিষয়ে উল্লেখযোগ্য প্রথম কাজ করেন আর.এইচ.কডরিঙ্গটন। ১৮৯১ খ্রিস্টাব্দে তিনি মেলানেশীয় আদিবাসী সম্পর্কে তথ্যবহুল গ্রন্থ লেখেন। এছাড়া ১৯০৭ সালে এল ফিসন, ১৯১০ সালে সি.এস. সেলিগম্যান, ১৯১৭ সালে জি.ল্যান্ডম্যান, ১৯২৬ সালে সি.বি. হামফ্রেস ও জি.সি. হুইলার ও ১৯৩৩ সালে এইচ. পাউডারমেকার মেলানেশিয়ার ওপরে অসাধারণ সব গ্রন্থ লিখেছেন। জার্মান মিশনারি ও নৃবিজ্ঞানীরাও ১৯০৫-১০ সালের মধ্যে অনেক তথ্য ও লোককথা সংগ্রহ করেন।

মাইক্রোনেশিয়ার মতো এই এলাকাতেও সবচেয়ে বেশি সংগৃহীত হয়েছে আদিবাসী লোকপুরাণ। মানুষের জন্ম কীভাবে হল এই বিষয় নিয়ে প্রতিটি দ্বীপেই প্রায় ভিন্ন ভিন্ন লোকপুরাণ রয়েছে। এত কাছাকাছি থাকা সত্ত্বেও এই একই বিষয়ে কয়েকশো লোকপুরাণ সংগৃহীত হয়েছে। মানুষ জন্মেছে আকাশ থেকে, নরম মাটির তলদেশ থেকে, গাছের বাকল থেকে, মাটি থেকে, বালি থেকে, পাথর থেকে, জমাট রক্ত থেকে, ডিম থেকে, লতা থেকে, মানুষ জন্মেছে সবচেয়ে পরে। এইসব ধারণা বিভিন্ন আদিবাসীর লোকপুরাণে রয়েছে। তবে প্রথমে যে এই পৃথিবীতে সূর্য-চন্দ্র-আকাশ-সমুদ্র-পশুপাখি-মানুষ ছিল না, এই চিন্তা সকলের মধ্যেই রয়েছে। এসব যিনি সৃষ্টি করেছেন, তিনিও কোন একক স্রষ্টা নন। বিভিন্ন স্রষ্টার ইচ্ছায় এসবের জন্ম। এইসব স্রষ্টা হলেন, নিউ গিনির রোরোভাষী আদিবাসীর ওরা রোভে মারাই, কিওয়াই পাপুয়াদের মারুনোগেরে, ফিজির কলোউ-ভু, ওরোকোলো আদিবাসীর ইভো ও উকাইপু প্রভৃতি। লোকপুরাণের মধ্যে যেসব টোটেম-এর পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে তার অধিকাংশই সামুদ্রিক প্রাণী কিংবা তীরভূমির গাছগাছালি।

অধিকাংশ লোকপুরাণে রয়েছে, স্রষ্টা আগে সৃষ্টি করেছেন পুরুষকে, তারপরে পুরুষের নিঃসঙ্গতায় ব্যথিত হয়ে সৃষ্টি করলেন নারীকে। অথচ এই নারীই অনেক কিছু সৃষ্টি করল। আসলে সে অনেক কিছু গোপন রাখত, পরে নিজের ব্যক্তিগত সম্পদ ইচ্ছায় অথবা বাধ্য হয়ে সমাজকে দেয়। যেমন আগুন। নারী তার দেহের গোপন অঙ্গের ভেতরে আগুন লুকিয়ে রাখত। পরে বাধ্য হয়ে সে সকলকে আগুন জ্বালাতে শেখাল। গাছগাছালি সম্পর্কে যেসব লোকপুরাণ রয়েছে তা উর্বরতাকেন্দ্রিক ধ্যানধারণা থেকে জন্মেছে। নারকেল গাছের জন্ম নিয়ে অগুনতি লোকপুরাণ রয়েছে। বাইন মাছ বা সাপের মাথা মাটিতে পুঁতে রাখার পরেই নারকেল গাছের জন্ম।

মেলানেশিয়ার রূপকথা-পশুকথাগুলি আকারে খুব ছোট, কিন্তু অসাধারণ বুদ্ধিদীপ্ত। গল্পের শেষে দু-একটি বাক্যে থাকে অনন্য চমক, বিস্ময়কর বিশ্লেষণ। মেলানেশিয়ার পুব দিকের দ্বীপগুলিতে বিশেষ করে ভানুয়া লেভু, তান্না, আমব্রিম, পাইনস্, রোতুমা প্রভৃতি দ্বীপে অনাথ বালকের অসংখ্য রূপকথা পাওয়া গিয়েছে। শিশু-অবস্থায় সে

মাতাপিতাকে হারিয়েছে, পাড়ার ছেলেদের কাছে খারাপ ব্যবহার পেয়েছে, অনেক প্রতিকূলতা সহ্য করেছে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে গোষ্ঠীর সর্বময় কর্তা হতে পেরেছে। 'ছোট্ট অনাথ' নামে একটি রূপকথা সংগ্রহ করেছেন আর.এইচ.কডরিঙ্গটন। ইউরোপীয় সিন্ডেরেলা রূপকথার সঙ্গে যার আশ্চর্য সাদৃশ্য রয়েছে।

মেলানেশিয়ায় পাওয়া গিয়েছে অনেক পরীকথা। এগুলোকে তারা বলে কুকোয়ানেবু। বর্ষার সন্ধ্যায় এগুলো বলা হয়। এর সঙ্গে জাদুর ধারণা মিশে আছে। সব গল্পের শেষে কথক ও শ্রোতারা বলে ওঠে,— খুব উর্বরা জমি, খুব উর্বর ফসল। বর্ষার সঙ্গে ফসলের সম্পর্কের জন্যই এই সময়ে এইসব গল্প বলা হয়। আর রয়েছে এক ধরনের কিংবদন্তি যেগুলো এককালে সত্যি ঘটেছিল বলে তাদের বিশ্বাস। কিছু কিছু ঐতিহাসিক ঘটনা সত্যিই এর সঙ্গে যুক্ত হয়ে রয়েছে। এই গল্পগুলির নাম লিবোগুও। কোন ঐতিহাসিক স্থানে কিংবা সমুদ্র যাত্রার সময়ে এগুলো বলা হয়।

মেলানেশিয়ার উপকূল বরাবর দ্বীপগুলিতে মাইক্রোনেশিয়া, পলিনেশিয়া, অস্ট্রেলিয়া ও ইন্দোনেশিয়ার লোককথার কিছু সাদৃশ্য চোখে পড়ে, কিন্তু দূরবর্তী এলাকায় সাদৃশ্য খুব কম, যেটুকু আছে তাও মেলানেশীয় জনগোষ্ঠী নিজের মনের মাধুরী মিশিয়ে নিজের করে নিয়েছে। লোককথার মিল সবচেয়ে বেশি রয়েছে নিউ ক্যালেডেনিয়া, ফিজি, বোগেনভিল, কানিয়েট, ওনটোঙ্গা, জাভা প্রভৃতি দ্বীপে। সবই সীমান্ত এলাকার দ্বীপ।

পলিনেশিয়া

প্রশান্ত মহাসাগরীয় সাংস্কৃতিক বলয়ের একেবারে পূর্বপ্রান্তে পলিনেশিয়া। বিশাল ত্রিকোণ আকৃতির এই এলাকা হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জ থেকে নিউজিল্যান্ড সহ এবং ইসটার দ্বীপ থেকে সামোয়া ও টোংগা দ্বীপ পর্যন্ত বিস্তৃত। এই এলাকার বৃহৎ বৃহৎ দ্বীপপুঞ্জের মধ্যে হাওয়াই বা স্যান্ডউইচ, ফিনিক্স, সামোয়া, নিউজিল্যান্ড, সোসাইটি, মারকুইসাস, তুয়ামোতু, অসট্রাল, কুক ও টোংগা প্রধান। বিশাল এলাকা সত্ত্বেও, এক দ্বীপের সঙ্গে অন্য দ্বীপের ব্যবধান সত্ত্বেও এখানকার সংস্কৃতি উল্লেখযোগ্যভাবে সমগোত্রীয়। এদের মৌখিক ভাষা মালয়ী-পলিনেশীয় ভাষা, উপভাষায় সামান্য কিছু বিভিন্নতা অবশ্য রয়েছে। সংস্কৃতির এই মিলের কারণ হিসেবে নৃবিজ্ঞানীরা বলেন, এখানকার বিপুল জনগোষ্ঠীর পূর্বপুরুষ দু হাজার থেকে আড়াই হাজার বছর আগে ইন্দোনেশিয়া থেকে মাইক্রোনেশিয়ার সমুদ্রপথ বেয়ে এখানে পৌঁছয়। একই সংস্কৃতির উত্তরাধিকার তারা বহন করে এনেছিল, তারপর দ্বীপে দ্বীপে নতুন উপনিবেশে ছড়িয়ে পড়েছিল। নতুন উপনিবেশে একাত্ম হয়ে যাওয়ার পরে শত শত বৎসর কেটেছে নিরুদ্বেগে। প্রাকৃতিক বিপর্যয় ছাড়া অন্য উদ্বেগ ছিল না।

পলিনেশীয় জনগোষ্ঠীর পৌরাণিক আদি বাসভূমির নাম হাওয়াইকি। নৃবিজ্ঞানীরা মনে করেন, হাওয়াইকি হল সোসাইটি দ্বীপপুঞ্জের রাইয়াতিয়া দ্বীপের ওপোয়া এলাকা। এখানেই তাদের সংস্কৃতির একটি কাঠামো গড়ে উঠেছিল, এবং তারপরেই তারা ছড়িয়ে পড়ে পলিনেশিয়ার চারদিকে। ৩০০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যেই দ্বীপগুলিতে জনবসতি গড়ে ওঠে আর জীবনেও স্থিতি আসে।

তারপর বহু শত বছর পরে এল ভয়াবহ বিপর্যয়। এল ইউরোপীয় অভিযাত্রীদল। অন্য জায়গায় যেমন এখানেও তেমনি একই চিত্র। একটি উদাহরণ দিলেই বোঝা যাবে। পলিনেশিয়ার একেবারে পূর্বপ্রান্তে বিচ্ছিন্ন একটি দ্বীপ ইস্টার। ১৮৬০ সালে কয়েক হাজার আদিবাসীকে শেষ চালান দেওয়া হল সুদূর চিলিতে। এমন সময় শুরু হল ভয়াবহ বসন্ত রোগ। শেষ পর্যন্ত দ্বীপের আদিবাসী সংখ্যা দাঁড়াল মাত্র ৬০০তে। আদিবাসী সর্দার, পুরোহিত ও প্রধানেরা সবাই মৃত কিংবা নিহত। ১৮৬৮ সালে বাকি সবাই খ্রিস্টধর্মে দীক্ষা নিতে বাধ্য হল। এই বিপর্যয়ের মধ্যে একমাত্র ভরসা মিশনারিরা। তারা মানবতা ভ্রাতৃত্ব সামাজিক স্থিতি সবই চান, কিন্তু এ চাওয়ার ওপরে আর একটু বেশি চান—তা হল They too wanted something, they wanted soul. নতুন শক্তিশালী সভ্য শ্বেতবর্ণের দেবতা আদিবাসীদের ঐতিহ্যগত দেবতাদের হটিয়ে দিল। কালের বিবর্তনে স্বাভাবিক শিক্ষার প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে এই 'উত্তরণ' ঘটলে কিছু বলার নেই, কিন্তু যখন নির্মম অত্যাচারের মাধ্যমে ঐতিহ্য ত্যাগ করতে বাধ্য করা হয়, তখনই দেখা দেয় জনগোষ্ঠীর জীবনে সামাজিক বিপর্যয়।

লোকসংস্কৃতির প্রাণ বড় বিস্ময়কর। তাই শত ঝোড়ো প্রতিকূলতার মধ্যেও বেঁচে থাকে, যেমন গুল্ম বাঁচে পাহাড়ি ফাটলে কিংবা বরফ-ঢাকা মাটিতে। পলিনেশিয়াতেও উজ্জ্বলভাবে বেঁচে আছে সেখানকার আদিবাসী সংস্কৃতি। মৌখিক ঐতিহ্য হারিয়ে গিয়েছে অনেক, যা আছে তার ভাণ্ডারও অসীম।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে ইউরোপ আমেরিকা ও এশিয়ার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মানুষজন এইসব দ্বীপে বেশি পরিমাণে আসতে শুরু করে। আর তখন থেকেই এদের সম্পর্কে সত্যিকার গবেষণা শুরু হয়, শুরু হয় লোককথার সংগ্রহ। নানা বর্ণ, জাতি, সংস্কৃতির মানুষ আজ এখানে এক মিশ্র সংস্কৃতির জন্ম দিয়েছে।

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধেও ওশিয়্যানিয়া সম্পর্কে বাইরের জগতের জ্ঞান ছিল খুব সীমিত, যেটুকু ছিল তাও ভ্রান্তিতে পূর্ণ।[১২] লুণ্ঠনের মৃগয়াক্ষেত্র হিসেবেই ছিল তার পরিচয়।

পলিনেশীয় লোককথা

পলিনেশীয় জনগোষ্ঠী যেখানেই বসতি গড়ে তুলেছে সেখানেই মৌখিক ঐতিহ্যকে পরম যত্নে লালন করেছে। হাওয়াই বা নিউজিল্যান্ডের মতো ঘন জনবসতি এলাকাতে যেমন তেমনি আবার সুদূরের ছোটো নির্জন দ্বীপ ইস্টারেও একই মৌখিক ঐতিহ্যের সন্ধান মিলবে, চারণকবি, কথক কিংবা পুরোহিত একই ধরনের প্রাচীন সংগীত লোককথা বলে যান। এই উত্তরাধিকারকে পলিনেশীয় জনগোষ্ঠী বলে 'ঐতিহ্যের রাত্রি'। সমস্ত দিনের কাজকর্মের শেষে সন্ধ্যার ঘনায়মান অন্ধকারে লোকসংস্কৃতির ভাণ্ডার উজার করে দেন বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা, আর শ্রোতা নবীন বংশধরেরা। শুনতে পাওয়া যাবে রামধনুকন্যা হিনা, মাউই, তিনিরাউ, আকাশবিহারী তাওহাকি, নৌকাবিহারী রাজার কথা। এইসব লোককথার কাহিনি একদিন উৎসারিত হয়েছিল তাদের আদি বাসভূমিতে, পৌরাণিক হাওয়াইকিতে,—দিকবিদিকে ছড়িয়ে পড়া সত্ত্বেও একই ঐতিহ্য বয়ে চলেছে। বিস্ময়কর

সাদৃশ্য। বিচ্ছিন্ন দূর দূর দ্বীপের বাসিন্দা হওয়া সত্ত্বেও সাংস্কৃতিক একতা তাদের দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ করে রেখেছে।

ওশিয়্যানিয়া এলাকার লোককথা সম্পর্কে সবচেয়ে বেশি গবেষণা হয়েছে পলিনেশিয়ার লোককথাকে ঘিরে। অসংখ্য মূল্যবান তথ্যসমৃদ্ধ গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। ১৮৫৩ খ্রিস্টাব্দে ডাবলু এলিস, ১৮৫৫ সালে জি গ্রে, ১৮৭৬ সালে ডাবলু ডাবলু গিল,, ১৮৮৭ সালে জে হোয়াইট, ১৮৯১ সালে ই ট্রেগিয়ার, ১৯০২-৬ সালে এ ক্র্যামার, ১৯০৭ সালে টি জি থ্রুম, ১৯১৬ সালে আর বি ডিক্সন, ১৯১৮ সালে টি হেনরি, ১৯৭০ সালে এম বেকউইথ পলিনেশিয়ার সংস্কৃতি ও লোককথা বিষয়ে অসাধারণ সব গ্রন্থ লিখেছেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে এই এলাকা সম্পর্কে ব্যাপক গবেষণা হয়েছে এবং অসংখ্য গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী কালে এই এলাকার সঙ্গো বাইরের যোগাযোগ অনেক ঘনিষ্ঠ হয়, সাংস্কৃতিক আদান-প্রদান বেড়ে যায়। কিন্তু তবু আশ্চর্য মমতায় দ্বীপপুঞ্জের আদিবাসীরা তাদের লোককথাকে বাঁচিয়ে রেখেছেন। এর প্রধানতম কারণ হল, এদের লোককথার সঙ্গো ধর্মীয় বিশ্বাস ও আচার-অনুষ্ঠান গভীরভাবে সম্পৃক্ত হযে রয়েছে। নৌকো তৈরির সময় এরা গান করেন, লোককথা বলেন। নৌকো তৈরিতে দরকার অসাধারণ দক্ষতা। কিন্তু এরা বিশ্বাস করেন, শুধুমাত্র দক্ষতা বা কারিগরি জ্ঞান থাকলেই চলবে না। তাই বৃদ্ধ যখন তরুণকে নৌকো তৈরির কলাকৌশল শেখান তখন একই সঙ্গো শেখান নৌকোকে কেন্দ্র করে যে লোকপুরাণ রয়েছে, যে আচার রয়েছে, যে অতিলৌকিক আশীর্বাদ রয়েছে। অর্থাৎ কারিগরি জ্ঞান ও ধর্মীয় ধ্যানধারণা একসঙ্গো শিক্ষা করতে হয়। দৈনন্দিন জীবনে লোকসংস্কৃতির এই অনুশীলন করতে হয় বলে শত প্রতিকূলতার মধ্যেও আদিবাসী জীবন থেকে তাদের ঐতিহ্যগত সংস্কৃতি বিবিক্ত হতে পারেনি। গাছ কাটা কিংবা গাছ থেকে নারকেল পাড়ার মতো অতি সাধারণ ঘটনাও আচার-অনুষ্ঠান পালন না করে সম্পন্ন করা হয় না। সেই আচার পালনের সময়েও লোকপুরাণ বলা হয়। বীর রাতা সঠিকভাবে আচার পালন না করে একটি গাছ কেটেছিল। পরের দিন কাঠ সংগ্রহ করতে এসে দেখে গাছ তেমনি দাঁড়িয়ে আছে। পরপর কয়েকদিন একই ঘটনা ঘটে। শেষকালে রাতা বনদেবতার পুজো দিয়ে নৌকো তৈরির কাঠ সংগ্রহ করতে পারে। এই ধরনের লোকবিশ্বাস তাদের জীবনাচরণকে নিয়ন্ত্রণ করে।

প্রশান্ত মহাসাগরীয় বলয়ের অন্যান্য এলাকার মতো পলিনেশিয়াতেও সবচেয়ে বেশি সংগৃহীত হয়েছে লোকপুরাণ। আবার লোকপুরাণের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য চরিত্র হল হিনা ও মাওই। দেবতা-দেবী-আত্মা-ভূত-প্রেত-অশুভ শক্তির সঙ্গো তাদের চিন্তা-চেতনা ওতপ্রোতভাবে জড়িত। আর এদের ঘিরেই অসংখ্য লোকপুরাণের উৎসার। লতাপাতা আকাশ রামধনু সূর্য চন্দ্র প্রভৃতি বিষয়ে নানা ধরনের সৃষ্টিবিষয়ক লোকপুরাণ রয়েছে।

অভিযানের কাহিনী নিয়ে রয়েছে অসংখ্য রূপকথা। এই জাতীয় রূপকথার নায়ক রাতা। গল্পের মালা গাঁথা হয়েছে এই বীর সমুদ্রযাত্রীকে ঘিরে। রাতাই নৌকো তৈরিতে সবচেয়ে দক্ষ। এই রূপকথার সঙ্গো লোকপুরাণের মেজাজ কোথাও কোথাও মিশে

গিয়েছে, কেননা রাতা হল পৌরাণিক চরিত্র। যেহেতু অধিকাংশ দ্বীপে আদিবাসীরা অন্য দ্বীপ থেকে এসে বসতি গড়ে তোলে, তাই রূপকথার বিষয়বস্তুতে অভিযান সমুদ্র-ঝড়-সামুদ্রিক প্রাণী-তীরভূমিতে অসহায় কন্যা প্রভৃতির কথা বারবার ঘুরে ফিরে এসেছে।

রূপকথার নায়কেরা অনেক সময়েই অমিত শক্তির অধিকারী, কোন ভালো কাজ করবার ফলে সে এই ক্ষমতা পেয়েছে দেবতার কাছে। তাদের জন্মও বড় অদ্ভুত। হয় তারা জন্মেছে ডিম থেকে কিংবা কোন গাছ বা পাথর থেকে। প্রথমে তাদের দেহ মানুষের মতো থাকে না, পরে মানুষের আকৃতি পাবার পর তারা পাতানো দাদু-দিদিমার কাছে বড় হয়। এইসব নায়ক আবার অনেক সময় হয় জন্মট্যাটন। ইওয়া নামে একজন রূপকথার নায়কের গল্প রয়েছে যে মায়ের পেটে থাকতেই চুরিবিদ্যা শিখেছিল। তার ছিল একটি জাদু দাঁড়, নৌকোয় বসে চারটি আঘাত করলেই সে এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে চলে যেতে পারত। ওনো নামে একজন দক্ষ জেলের কথাও আছে। তার সম্পর্কেও রয়েছে অসংখ্য রূপকথা।

পশুকথার খুব পরিচিত নায়ক নায়িকা হল সামুদ্রিক পাখি, কচ্ছপ, তিমি, চিংড়ি, শুয়োর ও মুরগি। পৃথিবীর অন্যান্য পশুকথার সঙ্গে একই সাদৃশ্য রয়েছে, তা হল শক্তিহীন ছোট্ট পশুপাখি সবসময়েই জয়ী হবে, দেহের বলে নয়, বুদ্ধি-কৌশলে।

পলিনেশিয়ার লোককথার বৈশিষ্ট হল, দ্বীপময় এলাকায় বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকা সত্ত্বেও তাদের মৌখিক ঐতিহ্যের আশ্চর্য মিল। একই উত্তরাধিকার রয়েছে বলেই এটা সম্ভবপর হয়েছে।

অস্ট্রেলিয়া

১৭৮৭ খ্রিস্টাব্দে ১৩মে ইংলন্ডের বন্দর থেকে ক্যাপ্টেন আর্থার ফিলিপ ৬টি কিশোর ও ৫টি কিশোরীসহ ৭৭১ জন মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত আসামিকে নিয়ে রওনা হলেন, অস্ট্রেলিয়ার তীরভূমিতে পৌঁছলেন ১৭৮৮ খ্রিস্টাব্দের ১৮ জানুয়ারি। এ দেশ হয়ে উঠল স্বাভাবিক উন্মুক্ত জেলখানা। ইউরোপীয় বসতি গড়ে উঠতে লাগল, তিরিশ হাজার বছরের বিচ্ছিন্ন সামাজিক জীবনের অবসান ঘটল। এই সময়ে এই মহাদেশের আদিবাসী সংখ্যা ছিল তিন লক্ষ। কিন্তু এই সংখ্যা বিস্ময়করভাবে কমতে থাকে পরবর্তী বছরগুলোতে। জনসংখ্যা হ্রাসের কারণ সেই এক অমানবিক আচরণ ও রোগ।[১৩] অথচ আগে তাদের মধ্যে এই ধরনের কোন রোগ ছিল না।

প্রাগৈতিহাসিক মানুষের সমুদ্র-যাত্রার যে প্রথম নিদর্শন পাওয়া যায় তা এই মহাদেশকে কেন্দ্র করেই। আদিবাসীদের জ্বালানো কাঠকয়লার রেডিয়োকারবন পরীক্ষায় প্রমাণিত হয়েছে যে এরা তিরিশ হাজার বছর আগে এই মহাদেশে এসেছে। নৃবিজ্ঞানীরা মনে করেন, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া থেকে ইন্দোনেশিয়ার পথ বেয়ে তারা এখানে আসে। কিছু বিজ্ঞানী দক্ষিণ ভারতের দ্রাবিড়দের সঙ্গে এই মহাদেশের আদিবাসীদের নানাবিধ মিল দেখে বিস্মিত হয়েছেন। রুশ বিজ্ঞানী আলেকজান্দার কনদ্রাতভ 'লেমুরিয়ার রহস্য' আলোচনায় এ বিষয়ে বিস্তৃত তথ্য উপস্থাপন করেছেন। যাইহোক, এরাই যে পৃথিবীর আদি সমুদ্রযাত্রী সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

এখানকার আদিবাসীদের বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে ৩০০টি ভাষা ৬০০টি উপভাষা প্রচলিত ছিল। অনেক গোষ্ঠী আবার ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের সময় এক বিশেষ ভাষা ব্যবহার করত যা দৈনন্দিন জীবনে কোনভাবেই উচ্চারিত হত না। এখনও বহু ভাষা ব্যবহৃত হয়। তবে পশ্চিম মরুভূমি এলাকার কয়েকটি উপভাষাই বর্তমানে সবচেয়ে ব্যাপকভাবে প্রচলিত।

আদিবাসী পুরুষেরা প্রধানত শিকারি ও মৎস্যজীবী আর নারী ও শিশুরা ফলমূল সংগ্রহ করে। ক্যাঙারু, এমু, পোসাম, সাপ প্রভৃতি জন্তু জানোয়ার ধরা হয় ফাঁদ ও জাল পেতে, গর্ত খুঁড়ে কিংবা বুমেরাং দিয়ে। এখানকার আদিবাসীদের এক আশ্চর্য ক্ষমতা রয়েছে: পদচিহ্ন, গাছের ভাঙা ডাল, পায়ের আঘাতে সরে যাওয়া পাথর অথবা হাওয়ায় গন্ধ পেয়ে তারা বলে দিতে পারে কোন জন্তু চলে গিয়েছে। খুব ছেলেবেলা থেকে তাদের এ বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হয়। পাথরের অস্ত্র তৈরিতে এখানকার প্রতিটি আদিবাসী গোষ্ঠী অত্যন্ত দক্ষ।

অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসী লোককথা

অষ্টাদশ শতকের শেষদিকে ব্রিটিশ ও ডাচ অভিযাত্রীরা দলে দলে এই 'জীবন্ত জীবাশ্মের প্রাকৃতিক জাদুঘরে' আসতে শুরু করে, আর উনিশ শতকের শেষদিকে এখানকার আদিবাসী সংস্কৃতি সম্পর্কে অনুসন্ধান গবেষণা ও গ্রন্থপ্রকাশ শুরু হয়। আদিবাসী সংস্কৃতি ও তাদের লোককথা সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ প্রকাশ করেন ১৮৯৭ সালে কে. এল. পার্কার, ১৯০৪ সালে এ এইচ হোউইট, ১৯০৫ সালে এ গেনেপ, ১৯১৬ সালে আর বি ডিক্সন, ১৯২৭ সালে বি স্পেন্সার ও এফ জে গিলেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী কালে আরও ব্যাপক গবেষণা হয়।

এই ক্ষুদ্রতম মহাদেশের আদিবাসীদের লোককথায় পশু সবচেয়ে বেশি জায়গা জুড়ে রয়েছে। এদের লোকপুরাণেও পশু অগ্রাধিকার পেয়েছে। এমু, গিরিগিটি, ক্যাঙারু, ডিম-পাড়া স্তন্যপায়ী প্লাটিপাস প্রভৃতি জন্তু লোকাচার ও লোককথার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে রয়েছে।

লোককথার পাত্রপাত্রী ভিন্ন হলেও অস্ট্রেলিয়ার অসংখ্য লোককথায় পলিনেশীয় মাওই লোকপুরাণ, মেলানেশীয় বুদ্ধিমান ও নির্বোধ ভাইদের গল্প কিংবা ইন্দোনেশিয়ার ট্যাটনের গল্পের সঙ্গে প্রচুর সাদৃশ্য রয়েছে। হয়তো পুরনো কালের ঐতিহ্যের রেশ রয়ে গিয়েছে।

লোকপুরাণে যে সব নায়ক-নায়িকা তাদের পূর্বপুরুষ বলে চিহ্নিত হয় তারা একসময় ছিল মানুষ কিংবা মানুষ ও গাছ বা মানুষ ও পশুর মিশ্রিত রূপে। এইসব চরিত্রকে কেন্দ্র করে 'অনন্ত স্বপ্নের' অগুনতি লোককথা প্রতিটি গোষ্ঠীতেই রয়েছে। দুটি মানুষ 'ওয়াতি-কুত্জারা'-র অনন্ত স্বপ্নের কাহিনি সবচেয়ে জনপ্রিয়।

লোকাচারের সঙ্গে গভীরভাবে সম্পৃক্ত যে সব লোককথা রয়েছে সেগুলো বলা হয় বিশেষ বিশেষ সময়ে। তাছাড়া অন্যান্য লোককথা যে কোন সময়েই বলা হয়। কেউ শুনতে চাইলেই লোককথা বলা হয়। দৈনন্দিন কাজের মতোই লোককথা বলাও যেন বয়স্কদের একটা কাজ।

আদিবাসী লোককথায় আদি মাতার অসংখ্য কাহিনি রয়েছে। আর্ন্হেম এলাকার পশ্চিমে যে সব আদিবাসী রয়েছে তারা আদি মাতা সম্পর্কে বলে, আদি মা পূর্ব সমুদ্রের পথ বেয়ে এসেছিল, তার দেহ থেকে সে গাছগাছালি প্রাণী সৃষ্টি করল এবং চারিদিকে তাদের ছড়িয়ে দিল। সে প্রতিটি গোষ্ঠীর জন্য আলাদা আলাদা ভাষা শিখিয়ে দিল। এই আদি মাতাকে নিয়ে আলাওয়া ও আরান্ডা আদিবাসী গানের ভঙ্গিতে লোককথাও শুনিয়ে থাকে। আবার সব সময় গর্ভবতী থাকে এমন দুই বোনের গল্পও আছে, তারা উর্বরতাকেন্দ্রিক ধারণার প্রতীক। তারাও মা।

অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসী আজও সবচেয়ে প্রাচীন জীবনধারা বয়ে চলেছে। অধিকাংশ গোষ্ঠীই এখনও বৃহত্তর জনজীবন থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে বসবাস করে। অনাহার-অপুষ্টি-খাদ্যাভাব-খরা প্রভৃতি তাদের নিত্যসঙ্গী। অথচ লোককথার যে উন্নত ভাণ্ডার তাদের মৌখিক ঐতিহ্যে লালিত হয়ে আজও বহমান রয়েছে তা বিস্ময়কর, অপরাজেয় মানুষ তার লৌকিক সংস্কৃতিকে যে কীভাবে বাঁচিয়ে রাখেন তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসী সংস্কৃতি।

উত্তর আমেরিকার লোককথা

উত্তর আমেরিকার বিশাল ভূখণ্ডের মধ্যে বাফিনল্যান্ড, হাডসন বে, ল্যাব্রাডর, নাসকাপি, নাহানে, ম্যাকেনজি, ইরোকিউস, পোন্কা, ডগরিব প্রভৃতি এলাকায় নানা গোষ্ঠীর আদিবাসী বাস করেন। এদের মধ্যে রেড ইন্ডিয়ান ও এস্কিমো জনগোষ্ঠীই প্রধান। এস্কিমো, মেনোমিনি, সেনেকা, জুনি, মাইডু, কাটো, ইউকুট, তাহ্লতান্, চেরোকি, ইরোকুইস, বেল্‌লা কুলা, লিলোয়েট, ওনোনদাগা, টমসন, মিক্‌মাক্, কোমান্‌চে, ম্যালেসাইট, আবানাকি, ওজিবাওয়া, ব্ল্যাকফুট, চেয়েনে, পনি, আরাপাহো, জিকারিল্‌লা আপাচে, নেজ পারসি, স্কিডি পনি, কোডিয়াক, হুপা, ক্রো, টিমাগামি ওজিবাওয়া, ক্রি, ওকানাগন, গ্রস ভেনট্রে, চিল্‌কোটিন, চেরোকি, লাসিক, আরাপাহো, গ্রিনল্যান্ড এস্কিমো, ল্যাব্রাডর এস্কিমো, ওসাগে, ইউছিটা, হাইডা, স্মিথ সাউন্ড এস্কিমো, শাস্‌টা, আসিনিবয়েন, পেনোরস্কট, আরিকাড়া, প্রভৃতি আদিবাসী গোষ্ঠীই উত্তর আমোরিকার আদি বাসিন্দা। অবশ্য এইসব লোকসমাজের অনেকগুলির নামকরণ করেছে শ্বেতকায় উপনিবেশবাদীরা।

আমেরিকা 'আবিষ্কারের' পর থেকে ইউরোপের নানা দেশ থেকে শত সহস্র উচ্চাকাঙ্ক্ষী ভাগ্যান্বেষী সেই দেশে পাড়ি দেয়। এদের অধিকাংশই ছিল হিংস্র প্রকৃতির মানুষ, মানবতাবিরোধী, নৃশংস, হৃদয়হীন ও ভ্রষ্টাচারী। আফ্রিকা, অস্ট্রেলিয়া কিংবা ওশিয়্যানিয়ায় যে ধরনের অত্যাচার উপনিবেশবাদীরা করেছিল, সেই একই নির্মম নাটকের পুনরাভিনয় হয় আমেরিকায়। পার্থক্য অবশ্য ছিল, অন্য এলাকার মতো আমেরিকার আদিবাসীরা, বিশেষ করে রেড ইন্ডিয়ানরা সহজে নতি-স্বীকার করেনি। অসংখ্য রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের পরেই তারা পরাজয় স্বীকার করেন। সে ইতিহাস নথিভুক্ত রয়েছে।

উপনিবেশবাদীদের সঙ্গে সঙ্গে আসেন একদল 'শান্তির দূত', তারা আসেন 'পতিত আত্মাদের' উদ্ধারের জন্য। তারা সাদা পোশাকের খ্রিস্টীয় পুরোহিত। উত্তর আমেরিকায় প্রথম যে খ্রিস্টীয় পুরোহিতরা আসেন তারা হলেন জেসুইট যাজক।

তারাই প্রথম ১৬৩৩ খ্রিস্টাব্দে আদিবাসীদের লোককথা সংগ্রহ করেন। প্রথম সংগৃহীত হয় ইরোকুইস সৃষ্টিবিষয়ক লোকপুরাণ। সবচেয়ে বিস্ময়কর ঘটনা হল, সপ্তদশ শতকে যেসব লোকপুরাণ সংগৃহীত হয়ে নথিভুক্ত করা হয়েছিল, বিশ শতকে ক্ষেত্রসমীক্ষা করে যে সংগ্রহ ভাণ্ডার গড়ে উঠল, দেখা গেল বলার ভঙ্গি ও লোকপুরাণের কাহিনিতে কোনো তফাৎ নেই। ঐতিহ্যের প্রতি কি ধরনের অটুট বন্ধন থাকলে এই ব্যাপক সময়কালেও লোককথা অপরিবর্তিত থাকে তা সহজেই অনুভব করা যায়।

প্রাথমিক কাজের পর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য সংগ্রহ ও সম্পাদনার কাজ করেন হেনরি রো স্কুলক্র্যাফ্ট। তিনি ১৮৩৯ সালে 'অ্যালজিক্ রির্সাচেস', ১৮৪৫ সালে 'দ্য ইন্ডিয়ান ইন হিজ্ উইগ্‌ওয়াম' এবং ১৮৫৬ সালে 'দ্য মিথ অব হিয়াওয়াথা' প্রকাশ করে উত্তর আমেরিকার আদিবাসীদের লোককথার সমৃদ্ধ ভাণ্ডারের কথা বিশ্ববাসীর নজরে আনেন। অবশ্য, তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগও রয়েছে যে, তিনি অনেক লোককথার বিকৃতি ঘটিয়েছেন। নিজের সাহিত্যিক রুচির প্রভাব পড়েছে তাঁর অনূদিত লোককথায়। অভিযোগ হয়তো সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন নয়, কিন্তু স্কুলক্র্যাফ্‌টের কাজেরও কোন তুলনা নেই।

উত্তর আমেরিকার আদিবাসীদের মধ্যে সংগীত প্রবাদ ধাঁধা প্রভৃতির প্রাচুর্য থাকলেও সবচেয়ে সমৃদ্ধ হল লোককথা যা গদ্যভঙ্গিতে মৌখিকরূপে প্রকাশ করা হয়। মৌখিক ঐতিহ্যবাহিত হয়ে এক পুরুষ থেকে অন্য পুরুষে এগুলি বির্বতিত হয। এই পদ্ধতি আজও সক্রিয় রয়েছে। তাই লোককথার অফুরন্ত ভাণ্ডার লোকসমাজের মধ্যে উজ্জ্বল রয়েছে আজও। আবার লোককথার মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় ও সংখ্যায় অধিক হল লোকপুরাণের কাহিনি। এইসব লোকপুরাণ আকারে বেশ দীর্ঘ।

আমেরিকার লোককথার আর একটি বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করতে হবে।[১৪] নতুন উপনিবেশের বাগিচা খনি খেত প্রভৃতিতে প্রয়োজন পড়ল অসংখ্য শ্রমিকের। আমেরিকার আদি বাসিন্দাদের এসব কাজে নিয়োগ করা গেল না। তারা দূরে বিচ্ছিন্ন হয়ে কষ্টকর জীবনযাপন করতে লাগলেন। শ্রমদাস আনা হতে লাগল আফ্রিকা থেকে। কঙ্গো, সুদান, চাদ, ঘানা, আবিসিনিয়া (ইথিওপিয়া), নাইজিরিয়া, কিনিয়া, ট্যাংগানাইকা, লাইবেরিয়া, সেনেগাল প্রভৃতি দেশ থেকে লক্ষ লক্ষ আদিবাসী ক্রীতদাস হয়ে চালান গেল আমেরিকায়। কিছুকাল পরে এইসব আদিবাসীর ধর্ম ও মাতৃভাষা পাল্‌টে গেল। কিন্তু তারা নতুন 'স্বদেশে' তাদের শোনা লোককথা বলতে লাগলেন। আমেরিকান লোকসংস্কৃতিও এদের মৌখিক ঐতিহ্যে সমৃদ্ধ হল। এগুলো আজ আফ্রো-আমেরিকান লোকসংস্কৃতি হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। ভাষা ভিন্ন হলেও লোকসংস্কৃতির মূল বিষয় একই ধরনের রয়ে গিয়েছে।

আফ্রিকার পাশাপাশি ফরাসি ও স্পেনীয় লোককথাও আমেরিকার লোককথায় বিশেষ স্থান করে নিয়েছে।[১৫]

মোঙ্গোলীয় আদিবাসী লোককথা

চিন, মোঙ্গোলিয়া ও তিব্বতে অনেক আদিবাসী গোষ্ঠী বাস করেন। এদের দৈহিক সাদৃশ্য প্রায় একই রকমের। কিন্তু ভাষা ও সংস্কৃতিগত কিছু অমিল লক্ষ্য করা যায়। বিশ্বের আদিবাসীদের কোন লিপি নেই, একমাত্র ব্যতিক্রম চিনের উঘের আদিবাসী।

উঘেরদের ইতিহাস খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় অব্দ থেকে জ্ঞাত রয়েছে। এমন উন্নত মৌখিক ও লিখিত সাহিত্যের ঐতিহ্য অন্য কোন আদিবাসীর নেই।

মোঙ্গোলীয় আদিবাসীদের মধ্যে চিন মঙ্গোলিয়া ও তিব্বতে রয়েছে মোঙ্গোলীয়, হুই, তিব্বতি, উঘের, মিয়াও, ইয়ি, জুয়াঙ, বুয়ি, কোরীয়, মানচু, ডোঙ, ইয়াও, বাই, তুজিয়া, কাজাক, হানি, দাই, লি, লিসু, ওয়া, শে, গাওশান, লাহু, শুই, ডোনজিয়াঙ, নাক্সি, টু, লোবা, কিরঘিস, জিংগ্পো, দাউর, মুলাও, কুয়াঙ, ব্লাঙ, সালা, মাওনান, জেলাও, জিবো, আচাঙ, টাজ্গি, নু, এওয়েনকি, বেনগ্লোঙ, পুমি, মইনবা, জিনো, উজবেক, বাওয়ান, উগুর, জিঙ, তাতার, ড্রুঙ, ওরোকেন, হেজেন প্রভৃতি আদিবাসী।

আটান্ন বছর আগে চিনে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব হয়েছে, চিন গণপ্রজাতন্ত্রী রাষ্ট্র হয়েছে, ১৯৫৯ সালে গণপ্রজাতন্ত্রী চিন তিব্বতের অধিকার নিয়েছে এবং সেখানকার ধর্মীয় প্রভু দলাই লামা অসংখ্য প্রজাদের নিয়ে দেশান্তরী হয়েছেন অর্থাৎ ভারতে আশ্রয় নিয়েছেন। অন্যদিকে হাজারো প্রতিকূলতার মধ্যেও মোঙ্গোলীয় প্রজাতন্ত্র স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে নিজের অস্তিত্ব বজায় রেখেছে। রাষ্ট্রনৈতিক এইসব পরিবর্তন ঘটে গেলেও লৌকিক সংস্কৃতির খুব যে একটা পরিবর্তন ঘটেছে এসব এলাকায় তা মনে হয় না।[১৬] আবার বিশাল দেশ চিন, তার প্রভাবও তিব্বতে মঙ্গোলিয়ায় ব্যাপক। মোঙ্গোলিয়াও সমাজতান্ত্রিক দেশ, তিব্বতেও ৪৮ বছরের ওপর চিনের প্রভুত্ব,—তাই স্বাভাবিকভাবেই সাংস্কৃতিক আদান-প্রদান নিবিড় হয়েছে। কিন্তু আদিবাসী সংস্কৃতি প্রতি এলাকাতেই নিজস্ব বৈশিষ্ট বজায় রেখেছে। আবার মনে রাখতে হবে, এইসব সমাজতান্ত্রিক দেশে আদিবাসী গোষ্ঠী খুব যে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকতে পারেন তাও নয়। শিক্ষা ও স্বাস্থ্য বিষয়ে তাদের মধ্যে অনেক পরিবর্তন এসেছে। সংস্কৃতি ও ভাষার বিষয়ে কিছু আরোপিত জুলুমও যে না হয়েছে তা নয়। ব্যবহারিক সম্পর্ক ও নিত্যদিনের জীবনধারণে তার প্রভাব পড়েছে। কিন্তু আদিবাসীদের মৌখিক ঐতিহ্যের খুব ব্যাপক কোন পরিবর্তন ঘটানো সম্ভব হয়নি। এখানেই আদিবাসীদের সংস্কৃতির জোর।

ভারত, প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জ ও আফ্রিকার আদিবাসীদের মতো চিনের আদিবাসীরাও খুব রক্ষণশীল, নিজেদের সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারকে লালন করতে তৎপর। চিনের আদিবাসী সংস্কৃতি অত্যন্ত সজীব ও ঐতিহ্যাশ্রয়ী। অনেক দেশেই আজ নাগরিক সংস্কৃতির ব্যাপ্ত প্রভাবে আদিবাসীদের সংস্কৃতি বিকৃত হয়ে গিয়েছে, তাই তথ্য সংগ্রহ বড় দুরূহ হয়ে পড়েছে। গণপ্রজাতন্ত্রী চিনে কিন্তু আদিবাসী সংস্কৃতির বিপুল ভাণ্ডার আজও অক্ষত রয়েছে।[১৭] পৃথিবীর অন্যান্য দেশের আদিবাসীদের লোককথায় যে মানসিকতা ও সরল জীবনদর্শনের কথা প্রকাশ পায়, চিনের আদিবাসী লোককথায়ও তার পরিচয় ও সাদৃশ্য মিলবে।

চিনের সাংস্কৃতিক ইতিহাসের একটি বৈশিষ্ট্য রয়েছে। খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দী থেকেই সে দেশের শিক্ষিত ও ধনী পণ্ডিতেরা লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতির নানা আঙ্গিক লিপিবদ্ধ করে যান। এরা অধিকাংশই সামন্তপ্রভু কিংবা তাদের অনুগৃহীত পণ্ডিতকুল। আর চিনের সামন্তশাসনের মতো এমন নিষ্ঠুর বীভৎস অমানবিক সামাজিক ব্যবস্থা পৃথিবীর ইতিহাসেও দুর্লভ। যে লোকসমাজ ও আদিবাসী সমাজকে

তারা পশুর চেয়েও অধম হিসেবে দেখে এসেছে, যারা এদের সামান্যতম কোন মর্যাদা দেয়নি, তারাই এইসব অবমানিত নিগৃহীত মানুষের মৌখিক ঐতিহ্যকে লিখিত আকারে ধরে রেখেছে। এ এক আশ্চর্য বৈপরীত্য। সামন্ত-অত্যাচারের সেইসব করুণ অধ্যায়ের কথা মনে রেখেও একথা বলতে হবে যে, অত্যাচারী এইসব শ্রেণি লোকঐতিহ্যের যে ভাণ্ডার লিপিবন্ধ করে গিয়েছেন তাতে আদিবাসী সংস্কৃতির পরম্পরা সম্পর্কে ইতিহাসগত তথ্য পাওয়া যাচ্ছে। চিনের এই লিখিত ঐতিহ্যই আদিবাসীদের সংস্কৃতির সবচেয়ে পুরনো নিদর্শন এবং নিঃসন্দেহে উন্নত ও সমৃদ্ধ নিদর্শন। এইসব নিদর্শনের পরিচয় সুষ্ঠুভাবে লিপিবন্ধ রযেছে চৌ বংশ (খ্রিস্টপূর্ব ১১০০ থেকে খ্রিস্টপূর্ব ২২১), ছিন বংশ (খ্রিস্টপূর্ব ২২১ থেকে খ্রিস্টপূর্ব ২০৬), হান বংশের (খ্রিস্টপূর্ব ২০৬ থেকে ২৪ খ্রিস্টাব্দ) আমলে।

চিনে সমাজতান্ত্রিক শাসন চালু হওযার পরে আটান্ন বছর কেটে গিয়েছে। শিক্ষা স্বাস্থ্য বিজ্ঞান গবেষণা কৃষি শিল্প প্রভৃতি ক্ষেত্রে চিনের বিস্ময়কর সাফল্য ঘটেছে। যদিও বছর কয়েক আগে থেকেই চিনের শাসকেরা সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিকে পরিত্যাগ করেছে এবং বিশ্বায়নের হাওয়ায় চিনের অগ্রগতি আগের তুলনায় অনেক দ্রুত হয়েছে। এসব তথ্য সঠিক অবশ্যই, কিন্তু চিনের অসংখ্য আদিবাসী গোষ্ঠী এখনও রযেছে যারা বিশ শতকের শেষেও মোটামুটি আদিম জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত। দেশের বৃহত্তর অংশের সামাজিক পরিবর্তন আজও এদের স্পর্শ করেনি। দুঃখজনক হলেও সমাজতান্ত্রিক চিনের আদিবাসীদের জীবনে এ বড় মর্মান্তিক বিচ্ছিন্নতা। কেন ন্যূনতম নাগরিক সুযোগ তাদের কাছে পৌঁছল না, তার উত্তর চিনের আদিবাসী বিষয়ক কোনো ইংরেজিতে অনূদিত গ্রন্থে পাইনি। অথচ এই আটান্ন বছরে চিনের আদিবাসীদের মৌখিক ঐতিহ্যের কি বিপুল সম্ভার শুধুমাত্র সংগৃহীত হয়নি, তা প্রকাশিত হয়েছে। যাদের মৌখিক সম্পদ প্রকাশ করে চিনের লোকসংস্কৃতিবিদ ও সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞানীরা আজ গর্ববোধ করছেন তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থান কিন্তু যথেষ্ট বিপর্যয়কর।

মোঙ্গোলিয়ার ইতিহাসে দেখা যায়, এ দেশ ছিল যাযাবর আদিবাসীদের স্বভূমি। ত্রয়োদশ শতকে চেঙ্গিস খানের অধীনে মোঙ্গোলিয়া বৃহত্তর মোঙ্গল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়, চিনের সঙ্গে যুক্ত হয় এবং 'ইনার' ও 'আউটার' মোঙ্গোলিয়া হিসেবে বিভক্ত হয। 'আউটার' মোঙ্গোলিয়া স্বাধীন হয় ১৯১১ খ্রিস্টাব্দে, ১৯২৪ সালে দেশের নাম হয় মোঙ্গোলীয় গণপ্রজাতন্ত্র। এত পরিবর্তন সত্ত্বেও মোঙ্গোলিয়ার রুক্ষ পাহাড়ি এলাকায় যেসব আদিবাসী গোষ্ঠী বসবাস করে তাদের জীবনের খাত বয়ে চলেছে একইভাবে। খাল্‌কা, দোরবেড, বুরিয়াত, দারিগাংগা, কাজাখ প্রভৃতি আদিবাসী নিজস্ব সংস্কৃতির ধারা আবহমান কাল ধরে বয়ে চলেছেন। উত্তরে রাশিয়া ও দক্ষিণে চিন প্রজাতন্ত্রের অবস্থানের ফলে মোঙ্গোলিয়ার সংস্কৃতি ও অর্থনীতিতে এই দুই বৃহৎ দেশের প্রভাব যথেষ্ট। কিন্তু মোঙ্গোলিয়ার আদিবাসীদের সংস্কৃতিতে যেটুকু প্রভাব রয়েছে তা মোঙ্গোলীয জাতি হিসেবে চিনের আদিবাসীদের চিন্তা ও দর্শনের প্রভাব কিংবা বলা সঙ্গাত একই মানসিকতার উত্তরাধিকার।

মোঙ্গোলিয়ার আদিবাসী লোককথায় বরফ, শীতের কষ্ট, কাঁপুনি, বরফ-ঢাকা পাহাড়-উপত্যকা-বন প্রভৃতির কথা বারবার এসেছে। শীতের দুঃসহ যন্ত্রণা থেকে

মানুষ মুক্তির পথ খুঁজেছে লোককথায়। যে দেশে গড় বাৎসরিক তাপমাত্রা -২৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস, সেই দেশের মানুষ যে তাদের লোককথায় এই কষ্টের কথা বলবে তা স্বাভাবিক। আদিবাসী লোকসমাজ চারপাশের চেনা-জানা পরিবেশকেই তাদের লোককথায় জীবন্ত করে তোলে। মোঙ্গোলিয়ার আদিবাসীদের লোককথা খুবই উন্নত এবং মানবিক আবেদনে সমৃদ্ধ।

লোককথার মাইগ্রেশন

মেলানেশিয়া মাইক্রোনেশিয়া পলিনেশিয়া অস্ট্রেলিয়া ও আমেরিকার লোককথার আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য স্বীকার করে নিয়েও এই সিদ্ধান্তে পৌঁছতে হয়ে যে, এইসব এলাকায় যেমন জনবসতির মাইগ্রেশন ঘটেছে ব্যাপকভাবে, তেমনি লোককথাও নতুন নতুন রূপে কিংবা কখনও একইভাবে ছড়িয়ে পড়েছে। বিশেষ করে ইন্দোনেশিয়া, দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া ও ফিলিপিনস্-এর লোককথার সঙ্গে সাদৃশ্য খুব বেশি। লোককথার এই মাইগ্রেশন বিষয়টি অত্যন্ত জটিল, এ বিষয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে মতপার্থক্যও যথেষ্ট।

একদল সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞানী মনে করেন, এইসব লোককথা নিরপেক্ষভাবেই লোকসমাজে গড়ে উঠেছে, কোন মাইগ্রেশন-এর প্রয়োজন হয়নি। পৃথিবীতে মানব সমাজের অসম সামাজিক-অর্থনৈতিক বিকাশ ঘটেছে। বিকাশের এইসব স্তরে মানুষ সর্বজনীন কতকগুলি অভিজ্ঞতা অর্জন করে। আর এই দৈনন্দিন অভিজ্ঞতাকে মৌখিক সাহিত্যে রূপ দিতে গিয়ে তারা সদৃশ চিন্তাকেই প্রতিফলিত করে। সকল সমাজের অভিজ্ঞতাই মূলত এক, তাই লোককথার মাধ্যমে একই কাহিনি রূপ পায়। পার্থক্য শুধু পাত্রপাত্রীর নামে। তারা বলেন, বিচ্ছিন্নভাবে সম্পর্কহীন অবস্থাতেই এইসব লোককথার জন্ম হয়েছে। পৃথিবীর বহু এলাকার লোককথার জন্ম-ইতিহাস সম্পর্কে এই তত্ত্ব নিশ্চয়ই বৈজ্ঞানিকভাবে সঠিক।

কিন্তু যেসব এলাকায় মানুষের নতুনভাবে বসতি গড়ে তোলার ইতিহাস অত্যন্ত স্পষ্ট, সেখানে আক্ষরিক অর্থেই লোককথার মাইগ্রেশন হয়েছে। আজকের পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের ত্রিনিদাদ, লিওয়ার্ড, বারবাডোস, ভার্জিন, টোবাগো, জ্যামাইকা প্রভৃতি দ্বীপের অধিকাংশ বাসিন্দা এককালে এসেছিল আফ্রিকা থেকে। খনি-নদী-বাগিচা ও খেতে কাজের জন্য শত সহস্র ক্রীতদাস আমদানি করতে হয়েছিল। এরা এসেছিল আফ্রিকার কঙ্গো, ক্যামেরুন, দাহোমে, সেনেগাল, কেনিয়া প্রভৃতি দেশ থেকে। তারা আজ স্বদেশভূমি থেকে অনেক দূরে, তাদের আদি ধর্ম ও ভাষা তারা ভুলে গিয়েছে। নতুন পরিবেশে নতুন মানুষ। কিন্তু তাদের লোককথা বিশ্লেষণ করে দেখা গিয়েছে, আফ্রিকার লোককথা কিছুটা ভিন্নভাবে তারা বলে চলে। ঐতিহ্য মিশে রয়েছে চিন্তা-চেতনায়। এই এলাকায় আক্ষরিকভাবেই লোককথার মাইগ্রেশন ঘটেছে।

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রেও এই একই ঘটনা ঘটেছে। সেখানকার আফ্রো-আমেরিকান জনগণের লোককথা বিশ্লেষণ করেও দেখা গিয়েছে, আফ্রিকার লোককথা নানাভাবে তাদের বর্তমান লোককথার ভাণ্ডারকে পুষ্ট করেছে। আমেরিকাতে আক্ষরিক অর্থেই আফ্রিকার জনসমাজের মাইগ্রেশন ঘটেছে, তাই লোককথাও এসেছে মৌখিক ঐতিহ্য হিসেবে। আমেরিকার লোককথায় শুধু আফ্রিকার প্রভাব নয়, আরও ব্যাপক প্রভাব

ঘটেছে। সম্প্রতি নৃবিজ্ঞানীরা প্রমাণ করেছেন, চারটি পথে আমেরিকায় লোককথার মাইগ্রেশন হয়েছে।

আসলে পঞ্চদশ শতক থেকে পৃথিবীর চতুর্দিকে যখন ইউরোপীয় অভিযাত্রী দল জাহাজে চেপে নতুন উপনিবেশ গড়ে তুলতে সচেষ্ট হল তখন থেকেই লোকসমাজের নতুন বসতি সম্পর্কে তথ্য লিপিবদ্ধ করা হল। আর তাই এই সময় থেকে এক দেশ থেকে অন্য দেশে মানুষের যাতায়াত সম্পর্কেও আমরা বিস্তৃতভাবে জানতে পারলাম। বিশেষ করে, এশিয়া ও আফ্রিকা থেকে ক্রীতদাস চালানের মধ্য দিয়ে যে মাইগ্রেশন ঘটল তার সম্পর্কে তথ্য রয়েছে। আর স্বাভাবিকভাবেই লোককথাও এল নতুন দেশে।

কিন্তু সেই সুদূর কালে মানুষ যে এক এলাকা থেকে অন্য এলাকায় নতুন বসতি গড়ে তুলেছিল তার তো কোন লিখিত ইতিহাস নেই। তাই মাইগ্রেশন যে ঘটেছে সেটা প্রমাণ করাও বড় সহজ নয় । যদিও ভাষা-সংস্কৃতি-আচার-পুজো-পার্বণ-জীবাশ্ম-লোককথা প্রভৃতির ওপরে নির্ভর করে অসংখ্য বৈজ্ঞানিক প্রমাণ মিলেছে, তবু সন্দেহ থেকেই যায়। ওশিয়্যানিয়া এলাকায় যে মানুষ ও তার মৌখিক ঐতিহ্যের মাইগ্রেশন ঘটেছে সে বিষয়ে আজ আর কারও কোন সন্দেহ নেই। তবে তিরিশ হাজার বছর আগেকার এই ইতিহাসটি আজও যথাযথভাবে লিখিত হয়নি।

মাইগ্রেশন ঘটে দুভাবে। বাধ্যতামূলক দেশত্যাগ। পূর্ব ভারতীয় ও পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ, আমেরিকা প্রভৃতি এলাকায় যে বিপুল সংখ্যক এশিয়া ও আফ্রিকার মানুষ রয়েছে, তাদের এই নতুন বসতিতে আনা হয়েছে জোর করে। এই বাধ্যতামূলক মাইগ্রেশনের ফলে তারা তাদের মাতৃভাষা ভুলতে বাধ্য হয়েছে, নিজস্ব ধর্ম ত্যাগ করে বেশির ভাগ খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করেছে, আর নিজস্ব সংস্কৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। নতুন দেশে নতুন মাতৃভাষা গ্রহণ করে নতুন সংস্কৃতির সঙ্গে প্রায় একাত্ম হয়ে উঠেছে। এই জনগোষ্ঠীর মধ্যে লোককথার পুরনো রেশ অবশ্যই রয়েছে, কিন্তু তা খণ্ডিত। বর্তমান পরিবেশে সেই আদি লোককথার মূল রূপটি আবিষ্কার করা তাই বেশ কষ্টকর।

আর একটি হল স্বেচ্ছায় দেশত্যাগ। অবশ্য এখানেও কিছুটা বাধ্যবাধকতা থাকে। যুদ্ধে-পরাজয়-বন্যা-খরা-খাদ্যাভাব প্রভৃতি কারণে এই দেশত্যাগ ঘটে। তবে কোন গোষ্ঠী জোর করে দেশত্যাগে বাধা করায় না। ওশিয়্যানিয়া এলাকায় ঘটেছে এই ধরনের দেশত্যাগ। ইন্দোনেশীয় অঞ্চল বা ভারতের দক্ষিণ এলাকা যেখান থেকেই দলে দলে মানুষ মাইক্রোনেশিয়া মেলানেশিয়া পলিনেশিয়া অস্ট্রেলিয়ায় যাক না কেন তারা গিয়েছে স্বেচ্ছায়। ফলে, তাদের নিজস্ব ভাষা-সংস্কৃতি-আচার-পার্বণ প্রভৃতি বিসর্জন দিতে হয়নি। কালের প্রভাবে, নানা জাতির সঙ্গে বন্ধুত্বমূলক মিশ্রণের ফলে তাদের ভাষা ও সংস্কৃতির বির্বতন ঘটেছে কিন্তু একেবারে ত্যাগ করতে হয়নি। তাই পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ কিংবা আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে যারা এল তাদের মাতৃভাষা আজ ইংরেজি, ধর্মও আলাদা। কিন্তু ওশিয়্যানিয়া কিংবা অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসীদের বৃহত্তর অংশই পুরনো ভাষা ও সংস্কৃতিকে ধরে রেখেছে। নানা প্রতিকূল ঢেউ আছড়ে পড়লেও তাদের নিজস্বতাকে একেবারে মুছে দিতে পারেনি। মাইগ্রেশন আলোচনার সময় এই দুটি ভিন্ন রূপকে মনে রাখতে হবে।

আসলে লোকসংস্কৃতি কখনও বিলুপ্ত হয় না, তা বিবর্তিত হয়, নতুন সামাজিক

অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক পরিবেশে নতুনতর রূপ নেয়, নতুনভাবে সৃষ্টি হয়। সামাজিক প্রয়োজনেই লোকসংস্কৃতির কিছু অংশ হারিয়ে যায়, শুকিয়ে যায়, লোকমানসে সেগুলো অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে। কিন্তু মূল বিষয়ের পরম্পরা বা ধারা কখনই একেবারে বিলুপ্ত হতে পারে না। সামাজিক সম্পর্কে মানুষ যেখানে আবন্ধ সেখানেই লোকসংস্কৃতির উর্বর ক্ষেত্র। আদিবাসী জনসমাজ সবচেয়ে বেশি প্রতিকূলতা সহ্য করেছে, সবচেয়ে নিষ্ঠুর আঘাত সহ্য করেছে,—এবং ইতিহাসের সাক্ষ্য রয়েছে, তারা প্রতিকূল আঘাতকে প্রতিহত করেছে বারবার। যন্ত্রণায় বিদ্ধ হয়েও আবার পথ চলেছে। তাই আদিবাসী সংস্কৃতি বেঁচে থাকবে বহতা নদীর মতো, সুউচ্চ পর্বতের মতো, সবুজ বনানীর মতো, সহজ সুরের গানের মতো। যে মানুষ এই সংস্কৃতির জন্ম দিয়েছে, সে মানুষ যতদিন থাকবে, এই সংস্কৃতিও ততদিন আপন প্রাণময় অস্তিত্ব সগর্বে ঘোষণা করবে।

---

১. As more and more of the primitive peoples of the world are studied, we see that men everywhere and in all types of culture have told tales. Though there is a difference in the emphasis and in the proportion of folktales in particular groups, many of the principal forms are practically universal. Stith Thompson : The Folktale, The Dryden Press, New York, 1951.

২. The choice of mouse, this tiny ,drab, inconspicuous yet uncanny creature of the night and hidden corners, tells much about the spirit of African folklore. Susan Feldmann : African Myths and Tales, Dell Publishing Co. Inc. Now Yord, 1963

৩. The names of animals, and even that of the sky-god himself, were substituted for the names of real individuals whom it would have been very impolitic to mention . later, no doubt, such a mild expose in the guise of a story of ten came to be related qua story. The orignial practice is still resorted to however, to expose someone whom the offended party fears to accuse more openly. R. S.Rattray: Akan-Ashanti Folktales, Oxford, The Clarendon Press, 1930.

৪. মহাভারত ঃ কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বেদব্যাস বিরচিত। ৫ম খণ্ড। কালীপ্রসন্ন সিংহ অনুবাদিত। সাক্ষরতা প্রকাশন, কলকাতা, ১৯৭৬

৫. No other Micronesians suffered from the unwanted attentions of Europeans quite so rapidly or drastically as the Chamorro, but the strategic position of most of their islands meant that freebooters, whalers, blackbirders and traders were inevitable followed by the official claimstaking of both European and Asian nations. Oceanic Mythology : Roslyn Poignant. Page 70.

৬. Myths from the Gilbert Islands : A. Grimble, 1922

৭. Micronesians protect eels with a severe tabu. Eels, malevolent or friendly, are important in myths, particularly those about clan

origins. *Katharine Luomala : Micronesian Mythology. The Standard* Dictonary of Folklore Mythology and Legend. Ed. by Maria Leach, page 719

৮. As to the name of Irihia, it is of interest to remember that Vrihia was an ancient Sanskrit name for India, and that this name can be pronounced by the Maori as Irihia or Wirihia. The word Ari the name of a very important food-supply of Irihia, is the Dravidian word for rice, and it may be compared to Vari, Wari, Pari etc., all of which denote rice. An old Sanskrit name for rice was Vrihi, which may possibly have been the origin of the mane Vrihia. Again Mr. S. Percy Smith has shown in his work Hawaiki that Hawaiki-te-Varinga is mentioned in Rorotongan tradition as a name for the homeland and here again this Vari rice word appears. The Maori as he was : Elsdon Best. R.E.Owen Govt. Printer. Wellington. 1924 Pages 18-19

৯. Maori traditional history deals in large part with this migration and subsequent events. Ancient history of the Maori : J. White. Page 37.

১০. Religion also has played a mighty role everywhere in the encouragement of the narrative art, for the religious mind has tried to understand beginnings and for ages has told stories of ancient days and sacred beings. Often whole cosmologies have unfolded themselves in these legends, and hierarchies of gods and heroes. The Folktale : Stith Thompson. 1977. Pages 5-6.

১১. European Civilization brought in its train other evils no less deadly than murder. Of these the worst was disease. These peoples, who had adjusted their life very exacty to physical conditions were immune from most diseases so long as they were left alone. Their bodies hardended by life in the open air, and sustained by the crude food to which they had been accustomed for centuries, were quite unable to withstand the ailments brought by the whites. C. M. Bowra : Primitive song. The New American Library. Page 34.

১২. Our information with respect to the domestic institutions of the inhabitants of Polynesia Micronesia and the Papuan Islands is still limited and imperfect....An expostition of their institutions, inventions and discoveries, and moral and mental traits, would supply one of the great needs of anthropological science . Lewis Henry Morgan : Ancient society. Indian Ed Pages 386-7

১৩. Numbers declined dramatically with the colonizations of Australia, sometimes without direct contact with the white man. Whole groups vanished within a few years due to introduced diseases and conflicts

: Australian Aboriginal Culture, The Australiann Unesco Committee for Museums, Second Ed, 1973. Page 6

১8. It abstracts in four channels, from Europe across the North Atlantic, from Africa across the South Atlantic, from Northeast Asia via the *Bering Strait, and from Southeast Asia across the South Pacific. It extends from the first migrations of Mongoloids from Asia, centuries* before Columbus, to very recent centuries. The Migration of Folktales : Francis Lee Utley. Current Anthropology, A journal of the University of Chicago. March, 1974. Page 13.

১৫. On the stories of certain tribes the recent influence of the Europeans is very apparent. The French in Canada, the Spanish in the Southwest, and the Negroes in the Southeast have contributed many tales to the tribes in their respective territories. Usually the Indians recognise these definitely as borrowings. Stith Thompson : Tales of the North American Indians. Indiana University Press, Bloomington. Page XX.

১৬. Today there till exist many tribes or peoples who have lagged behind in their social evolution and are still leading a rather primitive life. Yet they all possess a rich store of folk songs, myths, legends, folktales, painting, sculpture and dance. Many are of a high standard, and we are often astonished and delighted to discover their true beauty. Zhong Jingwen. Folktales of China. Tr. by John Minford. New World Press, Beijing, China, 1983, Pages 5-6.

১৭. Where as elsewhere the student of folklore is frequently embarraged by lack of date, in China he meets a richness of custom, belief and ritual which is made more complex by geographical variations and an extraordinarily long and complete written record. R.D. Jameson : Standerd Dictionary of Folklore Mythology and Legend. Funk and Wagnalls Company New York, 1949, Page 220.

গল্প এল কোথা থেকে । নাইজেরিয়ার ইকোই আদিবাসী জনগোষ্ঠীর পশুকথা। এই দেশের দক্ষিণে ক্যামেরুন পর্বত, তারই পাদদেশ ঘিরে বাস করেন এই আদিবাসী গোষ্ঠী। অল্প দূরেই ক্যামেরুনের বামেন্দা আদিবাসীদের বাস। তাদের মধ্যেও এই পশুকথাটি শোনা যাবে। কিন্তু ইকোইদের মধ্যেই এটি বেশি জনপ্রিয়। এই পশুকথাটির একটি বৈশিষ্ট্য রয়েছে। আদিবাসী ও অন্যান্য জনগোষ্ঠীর লোকপুরাণে মানুষের ভাষা এল কি করে তার অনেক গল্প রয়েছে কিন্তু মানুস গল্প পেল কেমন করে সে সম্পর্কে বেশি লোককথা নেই। অস্ট্রেলিয়ার আরান্ডা আদিবাসীদের মধ্যে একটি পশুকথা রয়েছে—উলা নামে একটি গিরগিটি পুরনো একটা গাছের কোটর থেকে গল্প এনে মানুষকে দিয়েছিল। গিরগিটি মানুষকে বন্ধু বলে জানে, কেননা সেই আদ্যিকালে প্রথম মানুষ ছিল গিরগিটির মতো দেখতে। এই সূত্রে আর একটি গল্প রয়েছে। মাকড়সা কেমন করে আকাশ দেবতার গল্প পেল। এই মাকড়সা হল লোককথার ট্যাটন, ধূর্ত, প্রবঞ্চক। মাকড়সার গল্পটিতে একটি সুন্দর ধারাবাহিকতা আছে। কিন্তু ইকোই গল্পে ইঁদুরের গল্প-ছেলেমেয়ের সঙ্গে চিতা ও ভেড়ার কোন সম্পর্ক নেই। শুধুমাত্র ইঁদুরের পুরনো দরজায় ধাক্কা খাওয়া ছাড়া ভেড়া-চিতার কোন ভূমিকা নেই। এমন হতে পারে, দুটো আলাদা পশুকথা মিলে গিয়েছে। কথক শুধু একটি যোগসূত্র বজায় রেখেছেন। লোককথায় এমন দৃষ্টান্ত অনেক রয়েছে। ভেড়া ও চিতার গল্পাংশের মধ্যে সমাজে প্রাকৃতিক দুর্যোগের একটি করুণ বর্ণনা রয়েছে। খরা ও দুর্ভিক্ষে মানুষের কি শোচনীয় অবস্থাই না ঘটে। ক্যামেরুনের সীমানায় এই এলাকা খুব অনুর্বর। খাদ্যাভাব নিত্যদিনের সঙ্গী। তার আভাস রয়েছে।

কচ্ছপের পিঠে ফাটা ফাটা দাগ কেন। জাম্‌বিয়ার থোংগা আদিবাসী পশুকথা। দেশের দক্ষিণে জাম্‌বেসি নদীর তীরে এদের বাস। কঙ্গোর বেনা লুলুয়া আদিবাসীদের মধ্যেও একটু অন্যভাবে পশুকথাটি প্রচলিত রয়েছে। সেখানে রয়েছে বাজপাখির কথা, আর আকাশে উড়েছিল কচ্ছপের স্ত্রী, তামাক পাতার বদলে পোঁটলায় ছিল লাল টুকটুকে বুনো ফল। 'কেন হল ও কেমন করে হল'— লোককথায় লোকসমাজ নিজেদের মতো করে অনেক সরস গল্প সৃষ্টি করেছেন। মানুষ-প্রকৃতি-পশুজগতের বিচিত্র ধরন-ধারণ, দেহের আকৃতি-প্রকৃতি বিষয়ে অনন্য সব গল্প রয়েছে। এই পশুকথাটি হালকা ভঙ্গিতে বলা হয়েছে। কিন্তু তার মধ্যেও অনাহারজনিত কষ্টের কথা এসে পড়েছে। লোকসমাজ এভাবেই তার সামাজিক মনকে উজার করে মেলে ধরেন তাদের মৌখিক সাহিত্যে।

মাকড়সা সব ধার শোধ করল। সুদানের নুয়ের আদিবাসী পশুকথা। দেশের পূর্বদিকে ইথিওপিয়ার সীমানার কাছে এদের বাস। সুদানে দিন্‌কা আদিবাসীদের বহু

লোককথা নুয়েরদের সঙ্গে একাকার হয়ে গিয়েছে। নিউজিল্যান্ডের মাওরি আদিবাসীদের মধ্যে প্রায় একই ধরনের একটি গল্প রয়েছে। সেখানে নায়ক মাকড়সা নয়, গঙ্গাফড়িং। আর শেষ লড়াই হয়েছে বুনো কুকুর ও হায়নার মধ্যে। লোককথার একটি সাধারণ বৈশিষ্ট—যার শক্তি কম, যে অতি ক্ষুদ্র, পরিশেষে সে বিজয়ী হয়। বুদ্ধির জোরে। টুনটুনি, খেঁকশেয়াল, পিঁপড়ে, খরগোশ, মাকড়সা প্রভৃতি তুচ্ছ শক্তিহীন পশুপাখিই জয়ী হয়ে থাকে। এরা অনেকেই লোককথার ট্যাটন। আর আফ্রিকার লোককথায় অনেক গল্প রয়েছে মাকড়সাকে নিয়ে। ক্ষুদ্র প্রাণীকে বিজয়ী করবার পেছনে মানুষের পরাভূত মানসিকতার প্রকাশ ঘটে। যে শক্তির বিরুদ্ধে পর্যুদস্ত হচ্ছি, তাকে মনে মনে এবং গল্পে পরাজিত করেও এক ধরনের তৃপ্তি পাওয়া যায়। এই পশুকথাটিতে মাকড়সা এক অপূর্ব কৌশল প্রয়োগ করেছে, নিজে নিরাপদ দূরত্বে থেকে একজনকে দিয়ে অন্যজনকে পঙ্গু করেছে। যারা ধার দেয় ধার চাইতে তাদের সংকোচ এবং যে ধার নেয় ধার দিতে সে ভুলে যায়,—চিরকালীন সত্যটি এই গল্পে রয়েছে।

কেমন করে পৃথিবীর মানুষ আগুন পেল। উগান্ডার বাগান্ডা আদিবাসী রূপকথা আগুন সমাজের সবচেয়ে প্রযোজনীয় ও উপকারী বস্তু। মানবসমাজের সভ্যতার শুরু আগুনকে ঘিরেই। প্রায় প্রতিটি লোকসমাজেই আগুন নিয়ে গল্প রয়েছে। মানুষ এই আগুন পেয়েছে পশুপাখি কিংবা আকাশ থেকে। সব গল্পের শুরুতেই আছে,—সেই আদ্যিকালে মানুষের আগুন ছিল না। আগুন এল এবং তাকে রেখে দেওয়া হল শুকনো গাছ কিংবা পাথরের মধ্যে। অনেক গল্পে আছে, যে মানুষকে আগুন দিল তাকে অশেষ কষ্ট ভোগ করতে হয়েছে। উত্তর আমেরিকার রাঙাবুক রবিন পাখি কিংবা গ্রিসের প্রমিথিউসের গল্প খুবই পরিচিত। মোটু আর আদরিণীর গল্পে আগুনের বিষয় ছাড়াও সামাজিক সম্পর্কের কথা রয়েছে। অকারণ কৌতূহল মানুষের সর্বনাশ ডেকে আনে। যেমন এনেছে মোটুর জীবনে। এক করুণ বিচ্ছেদের কথায় গল্প শেষ হয়েছে।

পোষা পশুপাখির বিশ্বাসঘাতকতা। অ্যাংগোলার আমবুনডু অদিবাসী পশুকথা। গল্পটি একটি আশ্চর্য ব্যতিক্রম। আগুন-বিষয়ক সব গল্পেই রয়েছে পৃথিবীতে আগে আগুন ছিল না। কিন্তু এই পশুকথায় রয়েছে, আগুন আনতে পশুপাখিকে পাঠানো হয়েছে পৃথিবীতে। লোভ মানুষকে কীভাবে কর্তব্য ভুলিয়ে দেয় তার অসাধারণ চিত্র রয়েছে এই পশুকথায়। কুকুর মোরগ ছুটেছে আগুন আনতে, বন্ধুদের বাঁচাতে। কিন্তু খাদ্য পেয়ে তারা কর্তব্য ভুলেছে। অন্যের অধীনতা স্বীকার করাকে লোকসমাজ ঘৃণা করেন, ক্রীতদাসত্বকে স্বীকার করা তাদের কাছে মৃত্যুর সামিল। অথচ নিষ্ঠুর সমাজে এই অভিজ্ঞতা তাদের হচ্ছে। অথচ মন সায় দেয় না। আফ্রিকার যে সব মানুষ আমেরিকা ও অন্যান্য অতলান্তিক মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জে ক্রীতদাস হয়ে গিয়েছিলেন, তাদের উত্তরপুরুষদের মধ্যে এই পশুকথাটি আজও শোনা যাবে। বাহামা ও জ্যামাইকা দ্বীপপুঞ্জের বর্তমান আদিবাসী একদা আফ্রিকা থেকে আগত আদিবাসী বাগিচা শ্রমিকদের মধ্যে এই পশুকথাটি খুব জনপ্রিয় ।শুধু ভাষা পাল্‌টে গিয়েছে। এক ধরনের বিচিত্র ইংরেজিতে এখন এ গল্প শোনা যাবে।

আজও শুয়োর মাটি খোঁড়ে। নাইজিরিয়ার হাউসা আদিবাসী পশুকথা। এ দেশের

পশুকথার সবচেয়ে জনপ্রিয় নায়ক হল কচ্ছপ। শুয়োর কেন নাক দিয়ে মাটি খোঁড়ে এই 'কেন'-র উত্তর দেবার সঙ্গো সঙ্গো মর্মান্তিক একটি সামাজিক সত্য পকাশিত হয়েছে। বন্ধুর বিপদে শুয়োর সাহায্য করতে এগিয়ে এসেছিল, বন্ধু তার চরম মূল্য শুয়োরকে ফিরিয়ে দিয়েছে। এ তো প্রতিটি সমাজের প্রতিদিনের ঘটনা। উদার-মনা শুয়োর শত প্ররোচনাতেও বন্ধু কচ্ছপকে অবিশ্বাস করতে চায় নি। অন্যদিকে সংসার চালাতে হয় বলেই স্ত্রীরা অনেক বেশি বাস্তববাদী ও সন্দেহপরায়ণ। তাই শুয়োরগিন্নি বলেছে, তুমি ও টাকা আর ফেরৎ পাবে না। এই পশুকথায় সামাজিক অভিজ্ঞতার যে চিত্র ফুটে উঠেছে তা অনবদ্য। এখানেও, টাকা যে ধার দিয়েছে তারই সংকোচ আর যে ধার নিয়েছে তার ভুলে যাওবার কথা সুন্দরভাবে প্রকাশিত হয়েছে। অজুহাতগুলো আমাদের সকলের কাছেই খুব পরিচিত।

বাদুড়ের স্বভাব। দাহোমের আবোমে অদিবাসী পশুকথা। পশ্চিমে পাশের দেশ টোগোর ইয়োয়ে আদিবাসীদের মধ্যেও একইভাবে পশুকথাটি প্রচলিত রয়েছে। প্রকৃতিজগাতে বাদুড় অক অদ্ভুত প্রাণী। তার এই বিশেষত্ব লোকসমাজের চোখ এড়িয়ে যায় নি। পশুকথাটির মধ্যে বাদুড়ের পাখি ও পশু এই দুই সত্তার কথা সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। যারা মধ্যপন্থা অবলম্বন করে কিংবা সুযোগ বুঝে দল বদল করে অথবা নিরপেক্ষ থাকে তাদের প্রতি এক প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গা রয়েছে এই গল্পে। অধীনতা স্বীকার করে যে শান্তিতে বাস করা যায় না, সে অভিজ্ঞতার কথাও আছে। বাদুড়কে নিয়ে বিভিন্ন লোকসমাজে খুব মজার গল্প আছে, ভারতের বস্তার জেলার মুরিয়াদের মধ্যে এরকম কয়েকটি সুন্দর গল্প রয়েছে। রেড ইন্ডিযানরাও অনেক গল্পে বাদুড়ের বিচিত্র স্বভাবের কথা বলেছেন।

ছিঃ কি লজ্জা। গাবোনের ফ্যাঙ্ অদিবাসী লোককথা। পলিনেশীয় দ্বীপপুঞ্জ ও ওশিয়্যানিয়ার কোন কোন দ্বীপের আদিবাসীদের মধ্যেও লোককথাটি শুনতে পাওয়া যায়। সেখানে কচ্ছপের বদলে ছোট্ট বাঁদর আর তালগাছের বদলে নারকেল গাছের উল্লেখ রয়েছে। তালের শাঁস থেকে যে তেল তৈরি হয তা চুরি যাওয়াতে এক মহাবিপদ উপস্থিত হল। কচ্ছপের দেহের আকৃতি ও গলা ঢুকিযে নেবার বিচিত্র ভঙ্গি অনেক গল্পের বিষয় হয়েছে। কচ্ছপ কেন গলা ভেতরে ঢুকিয়ে নেয়,—এই স্বভাবটির কারণ খুঁজেছেন লোকসমাজ। চুরি করা লোকসমাজে এক কুৎসিত অপরাধ। লজ্জাজনক ঘটনা। তারই অভিব্যক্তি রযেছে এই গল্পে। তালশাঁস চুরির কৌশলটির কথা সুন্দরভাবে বলা হয়েছে। চৌর্যবৃত্তির প্রবণতা যে মানুষকে স্থির থাকতে দেয় না, স্বভাব নষ্ট করে দেয় সেকথাও অস্পষ্ট থাকেনি।

মানুষ-খেকো রাজা। ক্যামেরুনের বাফুম ও বাংগোয়া আদিবাসী রূপকথা। রূপকের মাধ্যমে সামাজিক একটি মর্মান্তিক অভিজ্ঞতার কথা বলা হযেছে। সামন্তপ্রভুদের সাধারণ মানুষ ভক্তি করতেন, কিন্তু সেই ভক্তির পেছনে ছিল অত্যাচারিত হবার ভয়। এরা যদি অত্যচার না করবেন তবে মানুষের মনে ভয় আসত না। সামন্তপ্রভুর নিষ্ঠুরতা বহুদূর বিস্তৃত। প্রাসাদেই সীমাবদ্ধ নয়। রাজা লোভী, নিষ্ঠুর, আত্মঅসন্তুষ্ট, স্বার্থপর। তার লোভ সীমা ছাড়িয়েছে।, এই লোভ স্নেহ-মমতাকে অস্বীকার করে। সবাই রাজার শিকার হয়েছে। বাস্তব অবস্থায় সাধারণ মানুষ হয়তো এই সামন্তপ্রভুর বিরুদ্ধে কিছু

করতে পারছেন না। কিন্তু গল্পের মধ্যে প্রতিশোধ নিয়ে শান্তি পেয়েছেন। রূপকথাটির শেষ অংশটি আধুনিক ছোটগল্পকে স্মরণ করিয়ে দেয় । এক অসাধারণ সমৃদ্ধ রূপকথা।

তিন পড়শি। ঘানার ক্রাচি আদিবাসী পশুকথা। দেশের উত্তরে অনুর্বর এলাকায় এদের বাস। অনেক উঞ্ছবৃত্তি করে এদের জীবন কাটাতে হয় । সীমাহীন দারিদ্র এদের নিত্যসঙ্গী। ঘানার অন্যান্য জনগোষ্ঠীও এদের খুব অবজ্ঞার চোখে দেখে থাকেন। এত হীনমন্যতা সহ্য করেও উন্নত লোকসংস্কৃতিকে এরা রক্ষা করে চলেছেন। সমাজে এক ধরনের ফড়ে-জাতীয় মানুষ থাকেন, যারা দৈহিক পরিশ্রম না করেও ফসলের ভালো অংশটা দখল করেন। আর সাদাসিধে কিছু মানুষ শুধুই প্রবঞ্চিত হন। তাদের সবচেয়ে বড় সম্পদ তাদের শ্রম কিন্তু শ্রম করেও পেটের খাবার জোটে না। অন্যপক্ষে ধূর্ত প্রবঞ্চক এক গোষ্ঠী এদেরই হাড়ভাঙা খাটুনিতে উৎপাদিত ফসল ভোগ করছেন। গল্পের শেষে এই বেদনার কথা ফুঠে উঠেছে।

একশো গোবুর বদলে একটি বউ। তানজানিয়ার সোয়াহিলি আদিবাসী রূপকথা। রূপকথা কীভাবে সামাজিক দর্পণের কাজ করে তার অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শন এই গল্পটি। মানুষ যদি তার নিজের অবস্থার কথা বিবেচনা না করেন, তার সাধ্যাতীত কোন কিছু কামনা করেন তবে তাকে ভুগতেই হবে। ছেলেটি রূপসী মেয়েকে বিয়ে করতে গিয়ে সর্বস্বান্ত হল। সে দিনমজুরে পরিণত হল। অথচ তার যা ছিল, বুঝেসুজে চললে তার অভাব হবার কথা নয় । কিন্তু রূপের মোহে আচ্ছন্ন হয়ে পড়লে মানুষ এভাবেই সর্বনাশের পথে এগোয়। ভুল করার পরে ছেলে সেকথা বুঝেছে কিন্তু আর ফিরবার পথ নেই। সমাজে দারিদ্র এক অভিশাপ, এর সুযোগ নিয়ে কিছু মানুষ নারীকে ঘর থেকে বের করে আনার চেষ্টা করে, সফলও হয়। যে লোকটি মাংস দিল সে বউকে দ্বিচারিণী হতে প্রলুব্ধ করেছে। মেয়েটি অসহায়। বাবা এসেছে, বাবাকে খেতে না দিতে পারার বেদনায় মেয়ে ঝর্‌ঝর্‌ করে কাঁদছে। এই দুর্বল মুহূর্তেই এসেছে শয়তান। এই রূপকথায় যা বলা হয়েছে তা প্রতি সমাজের প্রতিদিনের অভিজ্ঞতার কথা। লোককথার মধ্যে এভাবেই লোকসমাজের সামাজিক-অর্থনৈতিক জীবনের কথা লুকিয়ে থাকে। রূপকের খোলস খুলে এভাবে সত্যকে আবিষ্কার করলে অনেক রূঢ় বাস্তবতার সন্ধান মিলবে।

আকাশের সূর্য আকাশের চন্দ্র। সিয়েরা লিওনের মেন্‌ডে আদিবাসী লোকপুরাণ। পৃথিবীর বহু জনগোষ্ঠীর লোকপুরাণে রয়েছে, আদ্যিকালে সূর্য, চন্দ্র, তারা ও আকাশ পৃথিবীতেই বাস করত, মানুষের খুব কাছাকাছি ছিল। কিন্তু নানা কারণে তারা দূরে চলে যায়। দেবতারাও এক সময় মানুষের মধ্যেই ছিল। আফ্রিকা, ভারত, আমেরিকা ও পলিনেশীয় দেশগুলোতে চন্দ্র-সূর্যের দূরে চলে যাওয়ার অনেক সুন্দর সুন্দর লোকপুরাণ আছে। আফ্রিকার জুলু, বাভেন্দা, দিন্‌কা, ইফে, বাবোয়া আদিবাসীদের মধ্যে এ বিষয়ে অনবদ্য সব লোকপুরাণ আছে। ভারতের নাগা, বিরহড়, ওরাওঁ, গোন্দ আদিবাসীদেরও এ বিষয়ে সুন্দর গল্প আছে। এইসব গল্পের মধ্যে রয়েছে, মানুষের স্বভাবের কদর্যতায় ও হিংসুটে মনের জন্য চন্দ্র-সূর্য দূরে চলে গিয়েছে। কিন্তু এই গল্পে রয়েছে, গভীর বন্ধুত্ব রক্ষা করতে গিয়েই তারা ওপরে যেতে বাধ্য হয়েছে। এককালে তারা এই পৃথিবীরই একজন ছিল, তাই সেই গভীর টানে প্রতিদিন পৃথিবীর চারপাশে ঘোরে।

জাদু আয়না ও সুন্দরী মেয়ে। কঙ্গোর ম্‌পোংগোয়ে আদিবাসী রূপকথা। রূপকথাটি পড়লেই ইউরোপের 'স্নো হোয়াইট অ্যান্ড দ্য সেভেন ডোয়ার্ফস্' রূপকথাটির কথা মনে পড়বে। শুধু পার্থক্য রয়েছে,—কংগোর রূপকথায় আছে একদল ডাকাতের কথা, স্নো হোয়াইট-এ আছে সাত বামনের কথা, স্নো হোয়াইট-এর দেহ বরফের মতো সাদা আর গালদুটি রক্তগোলাপের মতো রাঙা, আফ্রিকার গল্পে মেয়ের দেহের এ রঙ হতে পারে না, বামনরা এসেই সন্ধ্যাবেলা আলো জ্বেলে স্নো হোয়াইটকে দেখেছে, আর সুন্দরী মেয়ে রান্নাবান্না করে কয়েকদিন লুকোচুরি খেলেছে; স্নো হোয়াইট বিষাক্ত আপেল খেয়ে মরেছে, প্রথম বারে বিষাক্ত চিরুনি মাথায় ফুটেছিল, কিন্তু বামনরা বাঁচিয়েছিল,আর সুন্দরী মেয়ের মাথায় ফুটেছিল তীক্ষ্ম কাঁটা, স্নো হোয়াইটকে বাঁচিয়েছিল রাজপুত্র, তার সঙ্গো তার বিয়ে হল, আর সৎ মা হিংসের জ্বালায় মারা গেল। সুন্দরী মেয়ের সৎমা কোথায় হারিয়ে গেল।

এই আশ্চর্য মিল দেখে প্রথমেই মনে হয় এক সমাজের গল্প অন্য সমাজে প্রচারিত হয়েছে। গল্পটার একটু ইতিহাস আছে। ১৯০০ খ্রিস্টাব্দে কংগো থেকে একজন মিশনারি রেভারেন্ড রবার্ট হামিল নাসাউ গল্পটি সংগ্রহ করেন। তার আড়াইশো বছর আগে একজন পোর্তুগিজ ভাড়াটে সৈন্য কংগোয় এসে বেশ কিছুদিন ছিলেন। ম্‌পোংগোয়ে আদিবাসী ভাষা তিনি শিখেছিলেন। তেমন ভালো করে নয়। দেশে ফিরে গিয়ে এই গল্পের কাঠামোটি তিনি লিখে যান। সেই সৈনিক বোধহয় স্নো হোয়াইটের গল্প জানতেন না। কেননা একবারও তার সেকথা মনে হয়নি, অন্তত তার লেখায় নেই। পোর্তুগিজ উপনিবেশবাদীরা এই সময় যখন কংগোতে আসে, তখন কংগোর অবস্থা আমরা জানি। বাইরের কোন যোগাযোগের সুযোগ ছিল না। এমন কি ১৯০০ সালে যখন রেভারেন্ড নাসাউ এই গল্পটি সংগ্রহ করেন তখনও এই গোষ্ঠীর মধ্যে বাইরের প্রভাব সামান্য। খ্রিস্ট ধর্মের কিছু প্রভাব ছাড়া আর কিছুই নেই। যারা এই ধর্মে দীক্ষিত হয়েছেন তাদের কেউ কেউ সুন্দরী মেয়ের নাম বলেছেন মারিয়া। নিঃসন্দেহে পোর্তুগিজ নাম। কিন্তু গল্পে আর কোন পরিবর্তন ঘটে নি। অন্যভাবে, আফ্রিকার গল্প ইউরোপে প্রচারিত হয়ে জনপ্রিয় হয়েছে, এরকম কোন যোগাযোগের সম্ভাবনা ছিল না। আফ্রিকার ঐতিহ্যপ্রিয় রক্ষণশীল সমাজ যেমন বাইরের গল্পকে অন্তত সেইকালে সহজে আপনার করে নিতে চাইবে না, তেমনি আফ্রিকার গল্পও ইউরোপের ঘরে ঘরে পৌঁছে যাওয়া ও সমাদৃত হওয়া সম্ভব ছিল না। তাহলে এমন ঘটল কীভাবে?

এটা ভাবা যেতে পারে যে, একটি সমাজের সঙ্গো যখন অন্য একটি সমাজের যোগাযোগ ঘটে, তখন সৈনিক, পর্যটক, বণিক, জ্ঞানান্বেষী প্রভৃতি এক দেশ থেকে অন্য দেশে গল্প নিয়ে যেতে পারেন। কিন্তু নিরক্ষর সাধারণ লোকসমাজ সহজে অন্যের লেককথাকে সমাজে ঠাঁই দেন না। আসলে এইসব লোককথা নিরপেক্ষভাবেই লোকসমাজে সৃষ্টি হয়। কোন প্রভার বা মাইগ্রেশনের প্রয়োজন পড়ে না। সামাজিক বিকাশের স্তরে অসম বিকাশ সত্ত্বেও মানুষ সর্বজনীন কতকগুলি অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। লোককথায় মূর্ত হয় ভয়াবহ অত্যাচারের কথা, নির্মম অবিচারের কথা, হৃদয়-নিঙ্‌ড়ানো কান্নার আর্তনাদ, অন্যায়ের প্রতি ঘৃণা, অপূর্ণ কামনা, আশা-আকাঙ্ক্ষা ও কল্পিত প্রতিরোধের কাহিনী। এইসব মানসিকতা সর্বকালের, সর্ব অঞ্চলের, সমগ্র মানবসমাজের। তাই

এমন সব দুর্গম অঞ্চলের লোককথা পাওয়া গিয়েছে যেখানে আগে কেউ যান নি, অথচ তার সঙ্গে মিল রয়েছে দূরদেশের কোন লোককথার।

নিয়ামবি ও কামোনু। বারোট্‌সে বা লোজি আদিবাসী লোকপুরাণ, মালয়ি ও জাম্‌বিয়ার মাঝখানে জাম্‌বেসি নদীর ওপরের দিকে এরা বাস করেন। এই লোকপুরাণটি কালাহারি-মরুভূমি ও পুবে লিম্‌পোপো নদী পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে শোনা যাবে। লোকপুরাণের সৃষ্টিবিষয়ক গল্পে রয়েছে, আদ্যিকালে কিছুই ছিল না, আদি দেবতা সব কিছু সৃষ্টি করলেন। প্রত্যেক লোকসমাজেরই আদি সৃষ্টিকর্তা রয়েছেন। নিয়ামবি হলেন তাই। পুরনো কালের নিয়ম অনুযায়ী নিয়ামবিও থাকেন মানুষের মাঝে। তিনি সবকিছুই মানুষকে শেখালেন। কিন্তু মানুষ কামোনু অকারণে নিয়ামবিকে নাস্তানাবুদ করে তুলল। সামাজিক মানুষ কেউ কেউ যে অকারণেই স্বভাববশে কিছু কিছু দুষ্কর্ম করে চলে, তার একটি সুন্দর চিত্র রয়েছে এখানে। আবার মানুষ যে কত তাড়াতাড়ি সব বিষয়ে পারঙ্গম হয়ে ওঠে তার কথাও রয়েছে। মানুষের অপরাজেয় শক্তির কথা লোকসমাজ উপলব্ধি করতে পেরেছেন। নিজের সৃষ্টিও সৃষ্টিকর্তাকে নাজেহাল করতে পারে। অবশ্য শেষকালে কামোনুর শুভবুদ্ধি জেগেছে, কিন্তু দেবতা তখন নাগালের বাইরে।

মাকড়সা কেমন করে আকাশ-দেবতার গল্প পেল। ঘানার আশান্তি আদিবাসী পশুকথা। আনান্‌সে বা আনান্‌সি পশ্চিম আফ্রিকার পশুকথার সবচেয়ে জনপ্রিয় ধূর্ত নায়ক। এই আনান্‌সে মাকড়সাকে নিয়ে অনবদ্য সব লোককথা গড়ে উঠেছে। এই ক্ষুদ্র অথচ অসাধারণ বুদ্ধিমান চতুর প্রাণীটিকে ঘিরে ওবুবা, ঘানা, আইভরি কোস্ট, সিয়েরা লিওন, লাইবেরিয়া, টোগো, দাহোমে, নাইজিরিয়া, ক্যামেরুন, কংগো ও অ্যাংগোলার লোকসমাজ অসংখ্য মজাদার গল্প সৃষ্টি করেছন। আফ্রিকার মানুষ যখন আমেরিকার নতুন দুনিয়ায় গেলেন, তখন তাদের মাধ্যমে এই আনান্‌সে সেখানেও খুব জনপ্রিয় হয়ে উঠল। নাইজিরিয়ার হাউসা আদিবাসী মাকড়সাকে নাম দিলেন গিজো, আশান্তি ও আকান আদিবাসী বলেন কোয়াকু আনান্‌সে। দক্ষিণ ক্যারোলিনা সাগর দ্বীপপুঞ্জে এর নাম হল কুমারী ন্যান্‌সি, গুলাহ্‌-এ এর নাম খুড়ি ন্যান্‌সি, হাইতি দ্বীপে এ হল তি মালিস বা অনিষ্টকারী। সুরিনাম নিগ্রো সম্প্রদায় একে আনান্‌সি নামেই ডাকেন। জ্যামাইকায় মৃতদেহ পাহারা দেওয়ার সময় কিংবা মৃতের উদ্দেশে জমায়েতের সময় আনান্‌সির গল্প বলার রীতি রয়েছে। ত্রিনিদাদের ছোট ছেলেমেয়েরা এখনও অসংখ্য আনান্‌সে গল্প বলে যেতে পারে। ঘানার লোকপুরাণে আছে, আনান্‌সেই এই পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা, বান্টু লোককথায় আনান্‌সে ও সূর্য ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। এদের ধারণায়, সমস্ত দুনিয়ার জ্ঞান একত্রিত করলেও তা আনান্‌সের বুদ্ধির সমান হবে না। আফ্রিকার মানুষের কাছ থেকেই অন্যান্য জায়গায় মাকড়সার এইসব গল্প ছড়িয়েছে। কেননা, যে সব দেশে আফ্রিকার মানুষ বাগিচা ও খনি শ্রমিক হয়ে গিয়েছিলেন সেখানেই আনান্‌সের গল্প পাওয়া যাচ্ছে যার মূল অংশ পাওয়া যাবে আফ্রিকায়। এইক্ষেত্রে এই গল্পগুলোর মাইগ্রেশন হয়েছে। পৃথিবীর লোককথার মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য প্রাণী ট্যাটন হল মাকড়সা, খরগোশ, খেঁকশেয়াল, কচ্ছপ। মানুষের মধ্যে গল্পগুলো যে সহজে পাওয়া যায় নি তার ইঙ্গিত রয়েছে মাকড়সার কষ্টকর অভিযানের মধ্যে। আশান্তি আদিবাসী অধিকাংশ গল্পের শেষে বলেন, আমার গল্প শেষ হল।... তবে তাই হোক।

নিষিদ্ধ ফল। ওরুবার ইফে আদিবাসী লোকপুরাণ। লোকপুরাণটি পড়লেই হিব্রু লোকপুরাণ, বাইবেলের 'বুক অব জেনেসিস'-এর জ্ঞানবৃক্ষের ফল গল্পটির কথা মনে পড়ে। আদম আর ইভ সাপের প্ররোচনায় এই নিষিদ্ধ ফল খেয়ে অভিশপ্ত হয়েছিল। ইফে গল্পে গর্ভবতী নারী নিজেই লোভের বশে স্বামীকে তাহু গাছের ফল দিতে বলেছে। পরিণামে মৃত্যু এল মানুষের মাঝে। ইভও জানত, ফল খেলে মৃত্যু নেমে আসবে। কিন্তু সাপ বলেছিল, মৃত্যু নয়, তোমরা জানবে জ্ঞান কাকে বলে। জ্ঞানবৃক্ষের ফল হল বাইবেলের ঐতিহ্য অনুসারে আপেল। পাপের কথা রয়েছে হিব্রু লোকপুরাণে, ইফে গল্পে মৃত্যুতেই গল্পের শেষ। পাপের ধারণা তারা এভাবে ব্যক্ত করেছেন। নিষিদ্ধ ফল খাওয়া ও তার পরিণতিতে মৃত্যু—এই ধারণার গল্প অসংখ্য রয়েছে। আফ্রিকার বানটু আদিবাসীর মধ্যে নিষিদ্ধ ফল বিষয়ে সাতটি বিভিন্ন লোকপুরাণ রয়েছে। ক্যামেরুনের জ্যাঙ্গা ও বেগাদের মধ্যেও কয়েকটি গল্প রয়েছে। ইউরোপীয়, সেমিটিক, সাইবেরীয়, লাতিন আমেরিকা ও ইন্দোনেশীয় লোকপুরাণে নিষিদ্ধ ফলের লোককথা অসংখ্য। বহু সমাজেই এক একটি বিশেষ ফল এক একটি বিশেষ গোষ্ঠীর কাছে ট্যাবু হিসেবে বহুকাল আগে থেকেই প্রচলিত হয়ে আসছে।

শেয়াল কেন চাষ করে না। ছোটনাগপুরের মুন্ডা আদিবাসী পশুকথা। ওরাওঁ আদিবাসীদের মধ্যেও এই পশুকথাটি শোনা যাবে। কয়লাখনি কিংবা শিল্পকারখানায় কাজ করার সুবাদে পাশাপাশি থাকার ফলে এই লোককথাটি দুটি সমাজেই পাওয়া যায়। কিংবা নিরপেক্ষভাবে এর উৎসার ঘটতে পারে। বিহারের গিরিডি জেলার বেনিয়াডিতে একজন শবর শ্রমিকের মুখেও এই গল্পটি একটু অন্যভাবে শুনেছিলাম। সেখানে মাহাতোর পরিবর্তে জমিদার ছিল এক নেকড়ে। আর নেকড়ের চার প্রহরী ছিল চারটি হায়না। ভূমিহীন কৃষকের কৃষিজমির জন্য যে আকাঙ্ক্ষা সেই মনোভাবটি এখানে প্রকাশ পেয়েছে। একখণ্ড জমি, সুন্দর ফসল, ভরা সংসার ও শান্তি,--এর চেয়ে বড় কামনা গ্রামীণ মানুষের আর কি হতে পারে? কিন্তু এই সাধারণ আশাও পূরণ হবার নয়। শেয়াল ও শেয়াল-বউয়ের কথাবার্তার মধ্যে গ্রামীণ একটি পরিবারের অপরূপ চিত্র প্রকাশিত হয়েছে।

পিহ্‌মুয়াকি আর তার গান। লুসাই পাহাড়ি এলাকার লুসাই আদিবাসী রূপকথা। নিষ্ঠুর পাহাড়ি প্রকৃতির মধ্যে পারিপার্শ্বিক প্রতিকূলতা সত্ত্বেও এক আশ্চর্য কবিমনের পরিচয় মিলবে তাদের লোককথায়। এরা অত্যন্ত স্বাধীনতাপ্রিয়, এক সময় এদের কোন কোন গোষ্ঠী নৃ-মুণ্ড শিকারি ছিলেন। অনেক লোককথায় সে ঐতিহ্যের রেশ রয়ে গিয়েছে। খ্রিস্টীয় মিশনারি ও ইংরেজ প্রশাসকেরা লুসাইদের পুরনো গ্রামীণ সংস্কৃতির ওপর আঘাত হানলেও, লোকসংস্কৃতির মহান ঐতিহ্যকে তারা এখনও বাঁচিয়ে চলেছেন। তাদের লোকসংগীত, বর্ণময় লোকনৃত্য এবং সমৃদ্ধ লোককথা আজও বিস্ময় জাগায়। আজকে পুরনো দিনের অনেক কিছু হারিয়ে যাওয়ার বেদনার কথা এই রূপকথাটির প্রথমেই রয়েছে। নিজের মর্যাদা হারাবার ভয় ও হিংসা মানুষকে কীভাবে নিষ্ঠুর পশু করে তোলে তার বাস্তব চিত্র রয়েছে এই রূপকথায়। গান লুসাইদের জীবনের কতখানি জুড়ে রয়েছে, রূপকথার শেষ অংশটি তার দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে।

আগুন। মধ্যভারতের ধোবা আদিবাসী লোকপুরাণ। মান্ডলা জেলায় বৈগা আদিবাসীদের পাশাপাশি এরা বাস করেন, যারা জামা-কাপড় কাচেন সেই ধোবি সম্প্রদায়ের সঙ্গো এদের কোন সম্পর্ক নেই। ধোবাদের এই লোকপুরাণটি আশ্চর্য ব্যতিক্রম। কেননা, মানুষের সমাজের বিবর্তনে যেভাবে স্তরগুলো পার হওয়ার কথা নৃতাত্ত্বিকেরা বলেন তার নিখুঁত বর্ণনা রয়েছে এই গল্পে। আগে আগুন ছিল না, হঠাৎ প্রচণ্ড খরায় দাবানল জ্বলল, দাবানল-দগ্ধ পশুর মাংসে বেশি স্বাদ পেল, কাঁচা মাংস আর খেতে চইত না, কিন্তু তখনও আগুনের ব্যবহার জানলেও তা জ্বালাতে জানে না, দাবানলের আগুন এনে পশু ঝলসাতে শিখল, প্রথমে ভুল হল, পরে সব জানল, আগুনকে জ্বালিয়ে রাখবার বুদ্ধি প্রয়োগ করল, অভিজ্ঞতার মাধ্যমে শক্ত পোড়া পাত্র পর্যন্ত তৈরি করল। একই গল্পে আগুন দিয়ে রান্না শেখা ও পাত্র তৈরি করার কথা রয়েছে। গল্পটি পড়লে মনে হবে, কোন নৃবিজ্ঞানী বোধহয় গল্পের মাধ্যমে সভ্যতার বিবর্তনের কথা বলছেন। আগুন সম্পর্কে অন্তত আড়াইশো লোকপুরাণ অনুবাদ করেছি, গল্প হিসেবে অনন্য নজির অনেক লোকপুরাণে পেয়েছি, কিন্তু বিজ্ঞানভিত্তিক এমন লোকপুরাণ আর পাইনি।

বনের কুকুর গাঁয়ে এল। খাসি-জয়ন্তিয়া আদিবাসী পশুকথা। খাসি ও জয়ন্তিয়া পাহাড়ে এরা বাস করেন। অনেকে মনে করেন, বহু কাল আগে এরা মোঙ্গালিয়া থেকে এসে এখানে স্থায়ী বসবাস শুরু করেন। এক সময় এরা সমতল ভূমিতেই বাস করতেন, কিন্তু আক্রমণের ফলে এরা পাহাড়ি এলাকায় চলে যান। এদের শিল্প পোশাক মৌখিক-সাহিত্য অত্যন্ত উন্নতমানের। এই আদিবাসী গোষ্ঠী সরল, সৎ, পরিশ্রমী ও স্পষ্টবাদী। এই পশুকথাটির মধ্যে কুকুরের গৃহপালিত হবার পেছনে যে করুণ কাহিনি রয়েছে তা সুন্দরভাবে বর্ণিত হয়েছে। হিংস্র বন্য পশুর গায়ের গন্ধ কেন তাও গল্পে বলা হয়েছে। গরিব কুকুরের অপমানিত হবার পর যে প্রতিশোধ-স্পৃহা জেগে উঠেছে তা যেন মানুষের মনের কথা। এই আদিবাসী গোষ্ঠীর মধ্যে যে আর্থিক দারিদ্র ও প্রতিকূলতা রয়েছে, কুকুরের বেদনার মধ্যে তা ফুটে উঠেছে। 'বাড়িতে অনেকগুলো ছেলেমেয়ে। সারাদিন হয়তো খাওয়া হয়নি।'—এই অভিজ্ঞতা তো এদের নিত্যদিনের সঙ্গী।

ধনেশ পাখির পালক। বিস্তৃত নাগা পাহাড়ের জেমি-নাগা আদিবাসী রূপকথা। বর্তমানে নাগাল্যান্ড রাজ্য গঠিত হলেও উত্তর-পুর্ব ভারতের বর্মা সীমানা পর্যন্ত এদের বাস। এরা আও, সেমা, কোনিয়াক, আনগামি, লোথা, রেঙ্গামা, জেলিয়েঙ, ফোম্ প্রভৃতি পনেরোটি প্রধান ভাগে বিভক্ত। এদের ঐতিহ্য বর্ণময়, এদের সংস্কৃতি উন্নত। এরা অত্যন্ত আত্মমর্যাদাসম্পন্ন আদিবাসী। পাহাড়ের অপরুপ প্রকৃতির স্পর্শ মিলবে এদের লোককথায়। অনেক লোককথা যেন গদ্যকাব্য। এই রূপকথাটির মধ্যে মাতৃহারা একটি বালকের করুণ কাহিনি রয়েছে। সৎ মায়ের অত্যচার ও সামাজিক হীনমন্যতা সহ্য করতে না পেরে সে আকাশে দূর বনে পাখি হয়ে উড়ে গিয়েছে। ধনেশ পাখির রঙিন পালক খসে পড়ার মুহূর্তে গল্পটিও যেন কাব্য হয়ে উঠল।

বিচিত্র-রঙা ময়ূর-ময়ূরী। গারো পাহাড়ের গারো আদিবাসী রূপকথা। গোয়ালপাড়া জেলার বিস্তৃত এলাকা ছাড়াও এরা ব্রহ্মপুত্রের পশ্চিমে পাহাড়ি এলাকায় ও বর্তমান বাংলাদেশে বাস করেন। গারো আদিবাসী নিজেদের 'আচিক' বলে পরিচয় দেন এবং বিদেশিদের সামনে গারো নাম ব্যবহার করেন না। এই আদিবাসী গোষ্ঠী দীর্ঘদিন ধরে

রক্তাক্ত আক্রমণের শিকার হয়ে এসেছেন। এদের লোকসংস্কৃতিও খুব উন্নত। আসলে, পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর লোককথার মধ্যে এক অনন্য কবিমনের সন্ধান পাওয়া যায়। ময়ূর বিচিত্র-রঙা সুন্দর পাখি, ময়ূরী কিছুটা কম রূপসী,—প্রাকৃতিক এই সত্যটিকে নিয়ে কি অনবদ্য রূপকথা সৃষ্টি করলেন এরা। পশু ও পাখিদের মধ্যে পুরুষ সবসময়েই সুন্দর। এই পুরুষ পাখি ও পশুর সৌন্দর্য কেন বেশি তা নিয়ে পৃথিবীর নানান দেশে অসংখ্য সুন্দর গল্প রয়েছে। গারো এই গল্পটির অনুরূপ গল্প রয়েছে তিব্বতের রূপকথায়, মঙ্গোলিয়ার পশুকথায় ও তাইল্যান্ডের একটি লোকপুরাণে। সব গল্পেই ময়ূর-ময়ূরী মানব-মানবী ছিল, অভিশপ্ত হয়ে পাখি হয়েছে। এই তিন দেশের গল্পে রেশমি কাপড়ের কথা নেই। গারো গল্পটির শেষাংশও কাব্য হয়ে উঠেছে।

হাঃ হাঃ দুই কান কাটা। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের লখের আদিবাসী রূপকথা। লখের আদিবাসীদের সংগীত ও লোককথা খুব সমৃদ্ধ। দৈহিক প্রতিবন্ধীদের নিয়ে যেসব লোককথা রয়েছে, তাতে প্রতিবন্ধী মানুষদের ব্যঙ্গ করা হয়েছে। তাদের ভুল ভ্রান্তিকে নিয়ে হাসির গল্প গড়ে উঠেছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সামাজিক সহানুভূতির কোন চিহ্ন নেই। কিন্তু এই গল্পটিতে অন্ধ দুই ভাইয়ের করুণ অবস্থাটি বর্ণনা করা হয়েছে। একজন অসাধু মানুষ তাদের ঠকিয়েছে, তারা তো চোখে দেখতে পায় না। দুই অন্ধ ভাইয়ের এই কষ্টে মনে ব্যথা জাগে, পাঠকের চোখ সজল হয়ে ওঠে। তারা পথিককে যোগ্য শাস্তি দিতে পেরেছে এই আনন্দে যখন পথ চলে তখন পাঠক বেদনায় বিদ্ধ হন। সমাজে এমন কিছু নিষ্ঠুর মানুষ থাকে যারা স্বার্থের জন্য অন্ধ মানুষকেও প্রতারণা করে। কদর্য মানসিকতা হলেও এটা সত্য। এই লোককথাটি প্রচলিত ঐতিহ্য থেকে আলাদা, কেননা এদের নিয়ে কোন রঙ্গ-উপহাস করা হয়নি।

সিঁথির সিঁদুর। বিহারের রাঁচি ও ছোটনাগপুর অঞ্চলের ওরাওঁ আদিবাসী রূপকথা। ওরাওঁ, সাঁওতাল, মুন্ডা প্রভৃতি আদিবাসী পাশাপশি বসবাসের ফলে এই রূপকথাটি তাদের মধ্যেও শোনা যাবে। তবে ওরাওঁদের মধ্যেই এটি বেশি জনপ্রিয়। জলপাইগুড়ির বানারহাটের কাছে মোগলকাটা চা বাগানে একজন শ্রমিকের বৃদ্ধা মায়ের কাছেও এই গল্পটি শুনেছিলাম। বৃদ্ধার বাবা রাঁচি থেকে এই চা বাগানে আসেন। অনেককাল আগের কথা। বৃদ্ধা এখনও গল্পটি মনে রেখেছেন। তার কাছেই শুনেছি, তাদের বিয়েতে এখনও মামা এবং দাদা কনেকে গয়না ও কাপড় দেন। তা পরেই বিয়ে হয়। এই রূপকথার মধ্যে সামাজিক রীতিনীতির কথাই প্রকাশ পেয়েছে। সামাজিক রীতিনীতি-আচার-আচারণ, আইন-ন্যায়-অন্যায়বোধ প্রভৃতিকে ঘিরে বহু রূপকথার সৃষ্টি হয়। এর মধ্যে দৈব আদেশের কথাও ঢুকিয়ে দেওয়া হয়, যাতে মানুষ সেগুলো মেনে চলে। এই রূপকথাতেও আগন্তুক মানুষটির সিদ্ধান্ত সবাই মেনে নিয়েছে। সামাজিক প্রথাকে এভাবেই জনপ্রিয় করা হয়ে থাকে।

দূর আকাশের তারা। ওড়িশা রাজ্যের কোরাপুট এলাকার গাদাবা আদিবাসী রূপকথা। আকাশের সূর্য চন্দ্র ও অসংখ্য তারা কীভাবে সৃষ্টি হল তার কাহিনি। লোকপুরাণের আভাস, অস্পষ্ট প্রকাশ রয়েছে। পৃথিবীর অধিকাংশ জনগোষ্ঠীর মধ্যেই সূর্য-চন্দ্র-তারার জন্মের লোকপুরাণ রয়েছে। এই প্রাকৃতিক বস্তুগুলি পূজিতও হয়ে থাকে। এই রূপকথাটি শুনলেই আদিকবি বাল্মীকির শ্লোক-রচনার গল্পটি মনে পড়বে। দুটি গল্পেই শোক থেকে

মূল মানসিকতার উৎসার ঘটছে। আদিকবির মুখ থেকে অভিশাপ বেরিয়েছে, সঙ্গে সঙ্গে সৃষ্টি হয়েছে অপরূপ কাব্যের। আর সুম্‌রো স্বামীর প্রতি স্ত্রীর ভালবাসার ঘটনায় তাদের অমর হবার কামনা জানিয়েছে। এ গল্পের শেষাংশও কাব্য। কোরাপুট এলাকায় বোন্‌দো আদিবাসীদের মধ্যেও এই রূপকথাটি একইভাবে শোনা যাবে।

রামধনু আর বৃষ্টি। বর্তমান অন্ধ্র রাজ্যের শ্রীকাকুলাম জেলার পার্বতীপুর এলাকার শবর আদিবাসী লোকপুরাণ। দক্ষিণ ভারতে বাস করলেও এই ভাষা মুন্ডারি গোষ্ঠীর। কোরাপুট এলাকার সাওরা আদিবাসীদের মধ্যেও এ লোকপুরাণ শোনা যাবে। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ, রামায়ণ, মহাভারত ও অন্যান্য সংস্কৃত কাব্যে শবরদের উল্লেখ রয়েছে। এরা বৃহৎ সমাজের বাইরে পাহাড়ি জঙ্গল এলাকায় বিচ্ছিন্ন হয়ে বাস করতে ভালোবাসেন। আকাশের রামধনু মানুষের কাছে এক বিস্ময়। তাকে নিয়ে সারা পৃথিবীতে অসংখ্য গল্প রয়েছে। আকাশের দেবতাদের সঙ্গে পৃথিবীর মানুষের যে সহজ যোগাযোগ ছিল সেই আদিক্যালে, এখানেও সে কথার আভাস রয়েছে। এই গল্পে শোকস্তব্ধ পিতা পুত্রকে অমরত্ব দান করলেন। আর স্বামীর মৃত্যুতে সতী নারী সমস্ত জীবন চোখের জল ফেলে চলেছেন। আদিবাসী গোষ্ঠীর মানুষের মধ্যে যে কবিমন লুকিয়ে থাকে, লোককথায় তা এভাবেই প্রকাশিত হয়।

দুঃখ এল মানুষের জীবনে। ওড়িশা রাজ্যের কোরাপুট এলাকার বোন্‌দো আদিবাসী লোকপুরাণ। পৃথিবীর লোকপুরাণের ঐতিহ্য হল, আদিপিতা কিংবা দেবতা অনেক কিছু সৃষ্টি করলেন, তিনি মানুষও সৃষ্টি করলেন। আমার যেটুকু সামান্য জানা আছে তাতে কোথাও দেখিনি,—সবার আগে এল মানুষ, তারপরে দেবতাদের জন্ম হল। কীভাবে এই গোষ্ঠীর মধ্যে এরকম মানসিকতার জন্ম হল তা এক বিস্ময়। বোধহয়, বলা ভাল এ গল্প এক স্পর্ধিত ব্যতিক্রম শুধু নয়, মানুষ তার দুঃখ-লাঘবের জন্য দেবতাদের পায়ে সবসময় নত হয়ে থাকে। আর এরা বলছেন, দেবতারাই তাদের দুঃখের কারণ, পুজো প্রচলন হওয়াতে তারা গরিব হয়ে গেলেন। আমার অনুমান, বোন্‌দো আদিবাসীদের যারা পুরোহিতগোষ্ঠী, তারা সাধারণ মানুষের মধ্যে অতিরিক্ত ভয় জাগিয়ে সবসময় নানা ধরনের পুজোর বিধান দিতেন। এই অনুর্বর এলাকার মানুষ এমনিতেই বড় গরিব, তার ওপরে এই অত্যাচার। পেটের জ্বালা সহ্য করতে না পেরে ক্ষোভে-দুঃখে তারা দেবতাদের সম্পর্কে এমন ঐতিহ্য-বহির্ভূত ধারণা পোষণ করলেন। এ ব্যাখ্যা সত্য কিনা জানিনা, কিন্তু এ ধরনের মনোভঙ্গি আমার জানা আর কোন লোকপুরাণে পড়িনি। আগে পুজো ছিল না,—এরকম কোন চিন্তার সন্ধানও কোথাও পাইনি। এ লোকপুরাণটি বিস্ময় জাগায়।

এক পাল বুনো মোষ। বিহার রাজ্যের সিংভুম জেলা, ছোটনাগপুরের হো আদিবাসী রূপকথা। সাঁওতাল পরগনার সাঁওতাল আদিবাসীদের মধ্যেও এ গল্প শোনা যাবে। বুনো মোষ দুর্ধর্ষ, রাগি ও হিংস্র, আবার এই মোষই গৃহপালিত হয়ে কেমন নিরীহ,—এটা কেমন করে হল? সেই প্রশ্নের উত্তর রয়েছে এখানে। বনের পশু কেমন করে গহপালিত হল তার অনেক গল্প রয়েছে আদিবাসী জনগোষ্ঠীর লোককথায়। মোষ অনেক আদিবাসী গোষ্ঠীর অর্থকরী পশু। তার প্রতি কৃতজ্ঞতার শেষ নেই। এই কৃতজ্ঞতাবোধ থেকেই মোষ সম্পর্কে অসংখ্য লোককথার জন্ম হয়েছে। উত্তর অমেরিকার

রেড ইন্ডিয়ান, উত্তর ডাকোটার হিদাট্‌সা, কিওওয়া, আপাচে প্রভৃতি আদিবাসী গোষ্ঠীর মধ্যে মোষের অনেক লোককথা রয়েছে। মোষকে ঘিরে এইসব গোষ্ঠীর মধ্যে অনেক লোকাচারও গড়ে উঠেছে। একটি ভালো সরল গরিব মানুষ কীভাবে মোষের দয়ায় তার ভাগ্য ফেরাল, অতি নিপুণভাবে তার বর্ণনা এই গল্পে রয়েছে। তার উপকার করবার প্রবণতার পুরস্কারস্বরূপ সে এসব পেয়েছে। লোককথায় এই মোটিফ্‌টি খুব পরিচিত।

আদ্যিকালের কথা। লিট্‌ল্‌ আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের ওংগে আদিবাসী লোকপুরাণ। লোকপুরাণটির মধ্যে গল্পের বাঁধুনি কিছু ঢিলেঢালা। যদিও বছর ষাটেক আগে গল্পটি সংগৃহীত হয়েছে, তবু এরকম হবার কারণ কি? লোকপুরাণের বাঁধুনি সাধারণত খুব সংহত হয়। আসলে ওংগে আদিবাসী জনগোষ্ঠী এই শতাব্দীর গোড়া থেকেই চরম ধ্বংসের পথে এগিয়ে চলেছেন। তারা প্রায় নিশ্চিহ্ন হবার মুখে। ১৯০১ সালে তাদের সংখ্যা ছিল ৬৭২, ১৯৩১ সালে নেমে এসে দাঁড়ায় ২৫০-এ, ১৯৭১ সালে আরও কমে দাঁড়াল ১১২-তে। ১৯৮১ সালে দুটি নবজাতক জন্মায়, আর একবছর পরে ১৯৮২ সালের ২৬ অগাস্টে আর একটি শিশুর জন্ম হয়েছে। বর্তমান জনসংখ্যা ১১৫। দশ বছরে তিনজন মাত্র বেড়েছে। এইরকম ভয়াবহ বিপর্যয়ের মধ্যে লোকসংস্কৃতিও শুকিয়ে যায়। সেই কারণে তাদের অধিকাংশ লোককথাই খুব ঢিলেঢালা গোছের। ভারতের নৃতত্ত্ববিদেরা এই দ্রুত নিশ্চিহ্ন হযে যাওয়া গোষ্ঠীকে বাঁচিয়ে তোলার আপ্রাণ চেষ্টা করছেন। তিনটি শিশুর জন্মের পর আশার আলো দেখা দিয়েছে। পূর্বতন সোভিয়েত ইউনিয়নের সুদূর উত্তরে চুক্‌চি আদিবাসী গোষ্ঠীরও এই শতাব্দীর গোড়ায় ওংগেদের মতোই অবস্থা হয়েছিল। নৃতত্ত্ববিদ্‌দের চেষ্টায় সেখানে এখন আশার আলো দেখা দিয়েছে। ওংগেদের ঘিরেও সেই আশা দেখা দিয়েছে। পৃথিবীর আদিমতম নেগ্রিটো জনগোষ্ঠীর অন্যতম হলেন ওংগে আদিবাসী। তারা এখনও প্রধানত শিকারি ও মৎসজীবী। গল্পটিতে আগুন পাওয়ার কাহিনিও রয়েছে।

সাবাই ঘাসের জন্মকথা। সাঁওতাল পরগনার সাঁওতাল আদিবাসী রূপকথা, ভারতীয় আদিবাসীদের মধ্যে সবচেয়ে সমৃদ্ধ লোককথা হল সাঁওতালি লোককথা। এদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য যেমন সুপ্রাচীন তেমনি উন্নত। সাঁওতালি সংস্কৃতি ও ভাষা ভারতের পূর্বাঞ্চলের অনেক জনগোষ্ঠীকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করেছে। পুকুরে জল আনবার প্রচেষ্টায় কুমারী কন্যাকে উৎসর্গ করার কথা রযেছে এই রূপকথায। বহু পুরনো কালে বৃষ্টি ও জলের জন্য কুমারী বলির প্রথা প্রচলিত ছিল। তার আভাসমাত্র এখানে রয়েছে। প্রাচীন লোকাচার এভাবেই রূপকথার মধ্যে রূপকের আড়ালে লুকিয়ে থাকে। প্রাচীন আন্দীয় সভ্যতায়, ইন্‌কা ও আজ্‌টেক লোকাচারে কুমারী উৎসর্গের ব্যাপক প্রচলন ছিল। আফ্রিকার বহু আদিবাসী গোষ্ঠীর মধ্যে এই শতাব্দীর গোড়ায়ও বৃষ্টির জন্য এই লোকাচারের ব্যাপক প্রচলন ছিল। আফ্রিকার কেনিয়া দেশের আকিকুযু আদিবাসীদের মধ্যে অনুরূপ একটি গল্প আছে। বছরের পর বছর ধরে প্রচণ্ড খরায বিপর্যস্ত হয়ে তারা কুমারী ওয়ান-জি-রু-কে গাছের নীচে উৎসর্গ করল। মেয়ের পা যত মাটিতে বসে যাচ্ছে, বৃষ্টি নামছে তত জোরে। মেয়ে মাটির নীচে অদৃশ্য হল, বৃষ্টি নামল প্রলয়ের আকারে। অবশ্য এই মেয়েকে পরে পৃথিবীর গভীর তলদেশ থেকে উদ্ধার করে এক শিকারি।

মেয়ের সঙ্গো তার বিয়ে হয়। সাঁওতালি গল্পেও জল উঠেছে ছল্‌ছল্‌ করে, মেয়েকে ভাসিয়েছে, পুকুর উপচে পড়েছে। এ মেয়েও পরে বেঁচে উঠেছে। সাবাই ঘাস এই গোষ্ঠীর অর্থকরী ফসল, বড় প্রয়োজনীয় সামগ্রী। তার জন্মকথাও বিবৃত হয়েছে কৃতজ্ঞতা থেকে। দুঃস্থ ভাইদের প্রতি বোনের ভালোবাসা এই গল্পে অনবদ্য আন্তরিকতায় প্রকাশ পেয়েছে। ফুল নিতে যাওয়ার মুহূর্তে 'সাতভাই চম্পা'র গল্পের কথা মনে পড়ে।

অনেক সয়েছে সে। উত্তরপ্রদেশের উত্তরে হিমালয়ের পাদদেশ ঘিরে অনেক আদিবাসী গোষ্ঠীর মধ্যেই এই পাশুকথাটি শোনা যাবে। কুমায়ুনি ও গাড়োয়ালি জনগোষ্ঠীর খুব প্রিয় পশুকথা। মুসৌরির চাক্রাতা এলাকায়, কেমটি জলপ্রপাতের কাছে একজন গাড়োয়ালি সহিসের মুখেও ভাঙা ভাঙা হিন্দিতে এই পশুকথাটি শুনেছিলাম। পশুকথায় শেয়াল এককথায় দিগ্বিজয়ী। তার তীক্ষ্ম ক্ষুরধার বুদ্ধির কাছে, অপূর্ব চাতুর্যের ফলে সকলেই পরাজিত হয়। শেষ পর্যন্ত সে বিজয়ী হবেই। খুব অল্প পশুকথায় শেয়ালের পরাজয়ের কাহিনি শোনা যাবে। সে যতই প্রবঞ্চনা করুক না কেন, গল্পের মধ্যে তাকে পরাভূত করার মানসিকতা লক্ষ্য করা যায় না। ছোট্ট প্রাণীর বিজয়ের মধ্যে দিয়ে পর্যুদস্ত মানুষ শান্তি পেতে চেয়েছে। এই গল্পটি কিছুটা ব্যতিক্রমী। লক্ষ্য করেছি, যেসব গল্পে শেয়ালের পতন ঘটেছে সেখানে দম্ভই তার মূল। যেমন ভারতের 'নীলবর্ণ শৃগাল'। এই গল্পেও তাই ঘটেছে। লোকসমাজ অনেক কিছু সহ্য করলেও দম্ভকে বোধহয় সহজে মেনে নিতে পারেন না। এই ধরনের একটি পশুকথা রয়েছে আফ্রিকার কংগো দেশের বুশোংগো আদিবাসীদের মধ্যে। সেখানে বিয়ে হয়েছিল শেয়ালের সঙ্গো সিংহীর। শেয়ালের একই পরিণতি হয়েছিল।

বড় ভালো বউ তারা দুজন। ভারতের উত্তর পূর্বাঞ্চলের আদি আদিবাসী রূপকথা। আদিদের মধ্যে পান্‌গি, মিনিয়ং, পদম্‌, আশিং, বোকার, শিমোং প্রভৃতি ভাগ রয়েছে। আশিং-দের মধ্যেই এই রূপকথাটি বেশি জনপ্রিয়। সিয়াং উপত্যকায় এদের বাস। এই গল্পে কয়েকটি আদি শব্দ রয়েছে। উইয়ু হল আদিদের আত্মা। এদের অধিকাংশ লোককথায় এই উইয়ুর কথা রয়েছে। উইয়ু হল আকাশের আত্মা। তালেঙ হল আকাশের অপদেবতা, দুষ্টু আত্মা। এই রূপকথাটি তিব্বতেও শোনা যাবে। বহু শতাব্দী আগে থেকেই আদিদের সঙ্গো তিব্বতিদের যোগাযোগ খুব ঘনিষ্ঠ ছিল। ব্যবসায় আদান-প্রদান ছিল ব্যাপক। তিব্বতিরা নিতে আসতেন মিথুন, হরিণের হিং, চাল আর আদিরা কিনতেন নুন, পোশাক, রেশম ও পুঁতির মালা। এই আদান-প্রদানের ফলে লোককথার মিশ্রণও ঘটেছে। একই নামের দেবতা-আত্মা-অপদেবতা দুই জনগোষ্ঠীর মধ্যেই পাওয়া যাবে। এই এলাকার লোককথাগুলিতে অতিপ্রাকৃত বিষয়ের প্রভাব বড় বেশি। জীবনাচরণে প্রতি মুহূর্তে এগুলোকে মেনে ও বিশ্বাস করে চলার রীতি রয়েছে, তাই লোককথায়ও সেগুলো স্থায়ী আসন করে নিয়েছে। কুকুর কেন শুয়োর দেখলে তেড়ে যায়, তারও একটি উত্তর খুঁজেছেন তারা এই গল্পে। স্বামীর প্রতি সতী বউয়ের ভালোবাসার চিত্রটিও বড় মধুর।

জেগে-ওঠা ভাগ্য। মধ্যপ্রদেশের ভিল আদিবাসী রূপকথা। উত্তরপ্রদেশের উত্তরে কুমায়ুন এলাকার আদিবাসীদের মধ্যেও এই একই ধরনের রূপকথা রয়েছে। বলতে গেলে, কোনই রূপান্তর ঘটেনি। লোককথায় ভাগ্যবান ছোটভাই বা ছোট ছেলে একটি

অত্যন্ত জনপ্রিয় মোটিফ। এই ছোট ছেলে শেষ পর্যন্ত বিজয়ী হবেই। সাধারণত এরা তিন ভাই হয়। ছোট ভাই অধিকাংশ সময়েই হয় বোকা, সরল, স্বল্পবুদ্ধি,—কয়েকটি গল্পে অবশ্য তাকে দেখানো হয়েছে অত্যন্ত চতুর ও বাস্তববাদী হিসেবে। এই ছোট ভাই বড় ভাইদের দ্বারা ভীষণভাবে অত্যাচারিত হয়, বিশেষ করে বউদিরা তার সঙ্গে খুব কুৎসিত ব্যবহার করে। কখনও তাকে মৃত্যুর মুখেও ঠেলে দেওয়া হয়। কোন সম্পদ লাভ করার জন্য অভিযানে যায় একের পর এক ভাই, সকলেই ব্যর্থ হয় কিংবা ষড়যন্ত্রের জালে পড়ে মারা যায়। সফল হয় ছোট ভাই, ফিরে আসে বিজয়ী হয়ে। এই রূপকথাটিতে ছোট ভাই অত্যন্ত সরল, সে সব কিছু বিশ্বাস করে। ঘুমিয়ে-থাকা ভাগ্যের কথা সে বিশ্বাস করেছে, বেরিয়েছে অভিযানে। একের পর এক উপকার করেছে, তার পুরস্কারও পেয়েছে। ভালো মানুষের প্রতি সমাজের দুর্বলতা থাকে। বোধহয় সমাজে তাকে পর্যুদস্ত হতে হয়। এখানেও বঞ্চিত হতভাগ্য ছোটভাই গুপ্তধন পেয়েছে। পেয়েছে সর্দারের কন্যাকে। ছোট ভাইয়ের এই সফলতার কাহিনি পৃথিবীর অধিকাংশ লোকসমাজের গল্পেই রয়েছে। নাইজিরিয়ার হাউসা আদিবাসীদের একটি দীর্ঘ রূপকথা আছে,—ভাগ্যবান ছোট ছেলে। এই গল্পের সঙ্গে বিশেষ মিল রয়েছে।

ট্যাটন। উত্তর পূর্বাঞ্চলের মিকির পাহাড়ের মিকির আদিবাসী রূপকথা। এরা অত্যন্ত পুরনো সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য বহন করে চলেছেন। মূলত কৃষিজীবী। সমাজ খুব সংহত। সমাজে গাঁও বুড়ার সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত। অনবদ্য সব লোককথা রয়েছে এদের মধ্যে। সমাজে মামা-ভাগ্নের সম্পর্ক যত মধুরই হোক না কেন, আমাদের দেশের লোককথায় এই সম্পর্কটি কিন্তু আদৌ মধুর নয়। বিশেষ করে ভাগ্নে যদি পিতৃহীন হয়। আবার ভাগ্নে যদি ট্যাটন হয় তবে মামারা তার প্রতিফল ভোগ করেন। যেমন করেছেন এই গল্পে। মানুষ ট্যাটনের বহু লোককথা ভারতে রয়েছে। মামা-ভাগ্নেকে নিয়ে অন্য দেশে তেমন লোককথা গড়ে ওঠেনি, কিন্তু আমাদের দেশে অসংখ্য গল্প রয়েছে। বোধহয় এখানকার সমাজের পারিবারিক বন্ধনের বিশেষত্বই এর কারণ। এই গল্পের ট্যাটন কিছুটা নিষ্ঠুর ও প্রতিশোধ-পরায়ণ। তবে মামা-ভাগ্নেকে নিয়ে লঘু-চালের লোককথাই বেশি।

যে গল্পের শেষ নেই। প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে ফিলিপিনস্ দ্বীপপুঞ্জের বাগোবো আদিবাসী গোষ্ঠীর পশুকথা। আপো আগ্নেয়গিরি পর্বতের পুবপারে দাভাও উপসাগর এলাকায় এদের বাস। ১৮৫০ খ্রিস্টাব্দে পাশ্চাত্য জাতির সংস্পর্শে আসবার পর থেকে এদের সংখ্যা বিস্ময়করভাবে হ্রাস পেতে থাকে। বর্তমান জনসংখ্যা মাত্র আড়াই হাজার। এই ধরনের লোককথা গোটা ইউরোপে রয়েছে, তবে সবচেয়ে জনপ্রিয় হাঙ্গেরিতে। জাপানের হনশু ও শিকোকু দ্বীপপুঞ্জে এই রকম অনেক গল্প সংগৃহীত হয়েছে। ভারতীয় লোককথায় অসংখ্য নিদর্শন মিলবে। বর্তমান বাংলাদেশের পাবনা জেলার সিরাজগঞ্জ মহকুমায় এ গল্পের অনেক রকম রূপ আছে। ইঁদুর ছাড়াও অন্যান্য অনেক ছোট পশু গল্পে এসেছে। লোককথাটির মধ্যে আপাত হাল্‌কা রসের আড়ালে সামাজিক এক গভীর বেদনা লুকিয়ে রয়েছে। প্রাকৃতিক বিপর্যয় মানুষের জীবনে কীভাবে দুর্বিষহ হয়ে উঠতে পারে তারই প্রতীক যেন আত্মহননের মাধ্যমে ফুটে উঠেছে। খরা-বন্যা-ঝড় লোকসমাজের নিত্য সঙ্গী। এর বিরুদ্ধে লড়াই করেই বাঁচতে

হয়। তবু অসহায়তা মাঝে-মধ্যে বড় দুর্বল করে দেয়। সামাজিক কাঠামো যেন ভেঙে পড়ে। সেই মানসিকতার উজ্জ্বল প্রকাশ এই লোককথাটি।

আমরা এলাম কোথা থেকে। একটি সৃষ্টি-বিষয়ক লোকপুরাণ। মিনদানাও দ্বীপের বিসায়া আদিবাসী গোষ্ঠীর লোককথা। এই দ্বীপ ফিলিপিনস্-এর দক্ষিণে। ফিলিপিনস্-এর তাগালোগ আদিবাসীদের মধ্যেও এটি প্রচলিত রয়েছে। এই গল্পে দ্বীপ, সূর্য ও চন্দ্রের সৃষ্টির পৌরাণিক কাহিনি রয়েছে। আকাশের বাসিন্দা কীভাবে এই পৃথিবীতে এল তারও কাল্পনিক ব্যাখ্যা দেওয়া আছে। ভারতের সাঁওতাল আদিবাসী গোষ্ঠীর সৃষ্টি-বিষয়ক লোকপুরাণের সঙ্গে আশ্চর্য সাদৃশ্য রয়েছে। বিশেষ করে বুনো হাঁস এবং জলের তলা থেকে মাটি তুলে আনবার অংশের সঙ্গে। পৃথিবী-জোড়া সমস্ত জনগোষ্ঠীর লোকপুরাণে রয়েছে,আগে পৃথিবীতে মানুষ-সূর্য-চন্দ্র-মাটি-দেশ-বনভূমি ছিল না, ছিল শুধু অকূল দরিয়া। তারপরে সব হল। কীভাবে সৃষ্টি হল এই 'কেন'-র উত্তর খুঁজতেই সৃষ্টি-বিষয়ক লোকপুরাণের জন্ম। গাছ-গাছড়া থেকে ওষুধ পাওয়ার বাস্তব সত্যটিও গল্পে এসেছে। গল্পটির শেষাংশে কাব্যময় বর্ণনার মধ্যে লোকসমাজের কবি-মনের পরিচয় পাওয়া যায়। পড়ে-যাওয়া মেয়েকে রক্ষা করবার আকুতির মধ্যে মানবিকতা সুস্পষ্ট।

ভুল খবর। প্রশান্ত মহাসাগরীয় এলাকার মাইক্রোনেশিয়ার উলিথি দ্বীপের উলিথি আদিবাসী লোককথা। অল্প দক্ষিণের ইয়াপ ও পালাউ দ্বীপপুঞ্জের আদিবাসীদের মধ্যেও বহুল প্রচলিত গল্প। আফ্রিকার দাগোম্বা আদিবাসীর মধ্যে একই রকম গল্প প্রচলিত রয়েছে। সেখানে দেবতার নাম হল উনি। এই ছোট্ট লোককথাটির মধ্যে সামাজিক বেদনা ও অবিচারের এক মর্মান্তিক কান্না ঝরে পড়েছে। মানুষের জীবনে সবচেয়ে বড় করুণ অভিশাপ হল দাসত্ব। সামন্তপ্রভুর অধীনে তারা ক্রীতদাস। এই দাসকে কিছুর বিনিময়ে কিনতে হয় না, জন্মলগ্ন থেকেই সে শৃঙ্খলিত। সামাজিক ও অর্থনৈতিক শৃঙ্খল। এই বন্ধন থেকে তারা মুক্তি চেয়েছিল, কিন্তু আজও পায়নি। সেই জীবন একইভাবে বয়ে চলেছে। অন্যদিকে, মানুষের কদর্য শত্রুদের মধ্যে একটি হল লোভ। এই লোভের তাড়না যে কত ভয়াবহ দুর্বিপাক ঘটাতে পারে তাও প্রকাশ পেয়েছে কুকুরের আচরণে। প্রতীকের আড়ালে এই লোককথায় মানুষের সামাজিক পরাধীনতার এক করুণ ইতিহাস লুকনো রয়েছে।

অতৃপ্ত হৃদয়। মাইক্রোনেশিয়ার উত্তরে মারিয়ানা দ্বীপপুঞ্জের ছামোরো আদিবাসী গোষ্ঠীর লোককথা। ইউরোপীয় ঔপনিবেশিক শক্তি যে অবিচার অত্যাচার ছামোরো গোষ্ঠীর ওপর করেছে, একমাত্র তাসমানিয়ার আদিবাসী গোষ্ঠী ছাড়া আর কেউ তেমন সহ্য করেনি। অল্প দক্ষিণে গুয়াম দ্বীপের ছামোরো গোষ্ঠীর মধ্যেও গল্পটি প্রচলিত রয়েছে। চিনের দং আদিবাসীর হুবহু এরকম লোককথা আছে। লোককথাটির মধ্যে যে পুরোহিত রয়েছেন তার আচরণ ও দেবার্চনার রীতি বৌদ্ধ শ্রমণকে মনে করিয়ে দেয়। সামাজিক বৈষম্য ধরা পড়েছে সর্দারের আচরণে। বাস্তব পরিবেশে রাখালের প্রেম পূর্ণতা পায়নি, সর্দার-কন্যার মর্যাদার প্রশ্নটি প্রাচীর তুলে বিভেদ সৃষ্টি করেছে। কিন্তু পবিত্র প্রেম শেষ পর্যন্ত জয়ী হয়েছে। এ জীবনে না হলেও আত্মারূপে সে পরিতৃপ্তি পেয়েছে। এটি একটি ব্যক্তিগত ব্যর্থ প্রেমের কান্না-ঝরানো গাথা। বলবার

ভঙ্গিতে লোককথাটি একটি কবিতা হয়ে উঠেছে। রাখালের পিতা যখন বলে,—আমিও পিতা—, তখন মানুষের মানবিক শাশ্বত একটি সত্য উচ্চারিত হল। মূলত ব্যর্থ প্রেমের কাহিনি হলেও লোকসমাজ সামাজিক অবস্থার কথাও প্রকাশ করেছেন। কেননা, সমাজ ও সামাজিক মনের অভিব্যক্তি প্রকাশ ছাড়া এদের মৌখিক সাহিত্য সৃষ্টি হয় না।

আমাদের ছোট বোন। মাইক্রোনেশিয়ার একেবারে পুবে গিলবার্ট দ্বীপপুঞ্জের তাবুতেইউ আদিবাসী গোষ্ঠীর লোকপুরাণ। দক্ষিণে বের দ্বীপেও গল্পটি প্রচলিত রয়েছে। উত্তর সেলিবিসের গালেলা আদিবাসী গোষ্ঠীর মধ্যে একই ধরনের লোকপুরাণ আছে। গল্পটির প্রথমাংশ রূপকথা ও শেষাংশ লোকপুরাণ। রূপকথা-লোকপুরাণ মিশে বেশ কিছু লোককথা তাবুতেইউদের মধ্যে রয়েছে। বিচিত্র ধরনের ধান, ভুট্টা, নারকেল কীভাবে দ্বীপে প্রথম জন্মাল তারই পুরাণনির্ভর কাহিনি। ছোট বোন সমস্ত সমাজেই এক বিশেষ মোটিফ, যেমন ভাগ্যবান ছোট ছেলে। পরিবারে ছোট মেয়ে বা ছেলে সবচেয়ে আদরের। বড় ছয় বোন পাহাড়ি ঢালুতে গড়িয়ে পড়ল। কিন্তু ছোট বোনের প্রতি মমতা বেশি প্রকাশ পেল। আবার জীবনের প্রতি তীব্র আকর্ষণও ফুটে উঠেছে ছোট মেয়ের মানসিকতার মাধ্যমে। কি সুন্দর দিন, নিথর হতে ইচ্ছে করছে না। জীবনের প্রতি এই অনুরাগ কত বাস্তব, কত সত্য। লোকপুরাণেও তা সুপ্ত থাকে নি। মানুষের সমাজে যা কিছু মহৎ সৃষ্টি তা আত্মোৎসর্গের মাধ্যমেই আসে। এ ধারণার অভিব্যক্তিও রয়েছে।

স্মৃতি-ঘেরা পাথর। মেলানেশিয়ার পাপুয়া নিউ গিনির নামাউ আদিবাসী গোষ্ঠীর রূপকথা। এরা পাপুযার উপসাগরে পুরাবি ব-দ্বীপ এলাকায় বাস করেন। নিউ গিনির তাংগু কেরেওয়া ও এলেমা আদিবাসীদের মধ্যেও এই রূপকথা প্রচলিত আছে। জাপান ও চিনে এই রূপকথা শোনা যাবে। জাপানে এই রূপকথার তিরিশটি বিভিন্ন রূপ সংগৃহীত হয়েছে। সেখানে রাক্ষসের নাম ওনি। ইউরোপে এই জাতীয় রূপকথা নেই। সাধারণ রূপকথার মোটিফ থেকে এই রূপকথাটি আশ্চর্য ব্যতিক্রম। রাজকন্যা বা হারানো মেয়েকে খুঁজতে যায় রাজপুত্র কিংবা রাজকন্যার ভাই অথবা পিতা। কিন্তু এখানে মেয়েকে উদ্ধার করতে বিপদের মুখে এগিয়ে গিয়েছে মা। এবং শেষ পর্যন্ত মা সফল হয়েছে। রূপকথার জগতে মায়ের এই অভিযান অভিনব। অদিবাসী সমাজে মেয়েরাও যেহেতু পুরুষের সঙ্গে সমানভাবে কাজ করে, হয়তো মেয়েদের মর্যাদাও নামাউ সমাজে সমান, তাই মা-ই গিয়েছে অভিযানে। কিংবা মাতৃতান্ত্রিক সমাজের চিন্তা-চেতনার রেশ থেকে যেতে পারে এই রূপকথায়। পূজারিণী, মা ও মেয়ে পৃথিবীর সবচেয়ে পবিত্র দু'টি বুক দেখিয়ে রাক্ষসকে বোকা বানিয়েছে। রূপকথাটির জাপানি রূপে রয়েছে, তারা রাক্ষসকে দেখিয়েছে তাদের গোপন অঙ্গ, জঘন অংশ,—সবচেয়ে প্রয়োজনীয় অঙ্গ। নারীদেহের এই অংশ দেখলে অশুভ শক্তি পরাভূত হয় বলে তাদের বিশ্বাস। নামাউ গোষ্ঠীতেও এই বিশ্বাস রয়েছে। পাথরের স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণের কল্পনাটি অসাধারণ গীতিময়।

অগ্নিকুমার। মেলানেশিয়ার সোলেমন দ্বীপপুঞ্জের বোগেনভিল অঞ্চলের দক্ষিণে ছোট্ট দুটি দ্বীপের মোন্-আলু আদিবাসী গোষ্ঠীর রূপকথা। এরা এখনও অনেকাংশে যাযাবর। তার প্রভাব পড়েছে এই গল্পটিতেও। ফিলিপিনস্-এর মিনদানাও এলাকার কুলামান আদিবাসীর মধ্যে ও জাপানের ওকিযেরাবু দ্বীপে অনুরূপ রূপকথা রয়েছে।

সৎ মা, অজেয় নায়ক, পুরুষ সিন্ডেরেলার ঐতিহ্য, নায়কের বিপদে সাহায্যকারিণী মেয়ে ও দুষ্টের দমন মোটিফগুলি এই গল্পে খুব স্পষ্ট। সৎ মায়ের অত্যাচারে অগ্নিকুমার ঘর ছাড়তে বাধ্য হয়েছে। সে দূরের পথে ভাগ্য অন্বেষণে গিয়েছে। অধিকাংশ রূপকথায় দেখি, ছেলে অন্য রাজ্যের মেয়েকে বিয়ে করে অর্ধেক রাজত্ব ও বউ পেয়ে সেখানেই থেকে যায়। আর ফেরে না সে। দু-একটি ব্যতিক্রম অবশ্য রয়েছে। বাংলার রূপকথায়ও আছে। এবং সেখানেই গল্প শেষ হয়,— রাজপুত্র ও রাজকন্যা সুখে শান্তিতে রাজত্ব করতে লাগল। এই রূপকথায় অগ্নিকুমার ফিরে এসেছে,—বাবা-মাকে সে দেখতে চায়। কিন্তু মূল উদ্দেশ্য সৎ মাকে শাস্তি দেওয়া। দুষ্ট মা বেঁচে রয়েছে। এটা লোকসমাজের ঠিক পছন্দ নয়। হতচ্ছাড়া ছেলেটা ফিরে এল নাকি? সৎ মা উদ্বিগ্ন। সমুচিত শাস্তি সে পেল। লোকসমাজ মনে মনে যা চায়, বাস্তব পরিবেশে তা সফল না হলেও গল্পের মধ্যে সে আশা মিটিয়ে নেয়। ইচ্ছাপূরণের ব্যাপ্ত বিচরণ-ক্ষেত্র হল লোককথা। সৎ মায়ের কাছে বাবার অসহায়তাও বড় করুণ। ছেলের প্রতি স্নেহ থাকা সত্ত্বেও দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীর কাছে স্বামী অসহায়। চরম সামাজিক বাস্তব চিত্র। অগ্নিকুমার যখন বউকে নিয়ে দূরে মিলিয়ে যাচ্ছে তখন সর্দার পিতার কামনাটি বড় মানবিক, বড় পবিত্র : ওরা সুখে থাকুক, ভালো থাকুক। চিরন্তন পিতৃত্বের অসাধারণ চিত্র।

পুরনো বাড়ির ফুটো ছাদ। মেলানেশিয়ার একেবারে দক্ষিণে টোরেস প্রণালীর পাশে ইয়াম দ্বীপের কেরাকি আদিবাসীদের রূপকথা। ফরমোজার পাঈগুয়ান আদিবাসী, চিনের হুনান প্রদেশের মিয়াও আদিবাসী গোষ্ঠীর মধ্যে এই রূপকথা আছে। জাপানে এই গল্পের সাতাত্তরটি ও চিনে ছয়টি রূপ সংগৃহীত হয়েছে। ভারত ও কোরিয়ায এ ধরনের অসংখ্য গল্প আছে। এই রূপকথার প্রথম অংশে নেকড়ে বাঘের ভয় পাওয়া পর্যন্ত কাহিনিটি বাংলার রূপকথায় খুব পরিচিত। পশুপাখির দেহের বিভিন্ন অঙ্গের বিশেষ বিশেষ বৈশিষ্ট্য কেমন করে হল তা নিয়ে দুনিয়া-জোড়া বিচিত্র সরস পশুকথা রূপকথা রয়েছে। এগুলোর মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে মানুষের 'কেন'-র উত্তর খোঁজার কৌতূহল, অন্যদিকে লোকসমাজের রসসিক্ত মনের পরিচয়। বানরের মুখে কোন লোম নেই, মুখ কেন লাল, লেজ কেন ছোট,—এইসব নিয়ে অজস্র কাহিনি প্রচলিত রয়েছে। এই রূপকথার কাহিনিটি বলবার ভঙ্গিতে অপরূপ মনোগ্রাহী হয়ে উঠেছে।

জোনাকি। মেলানেশিয়ার নিউ হেব্রাইডিস ও তান্না দ্বীপের মালেকুলা আদিবাসী গোষ্ঠীর রূপকথা। চিনের ঝুয়াঙ আদিবাসী ও লাওস-এর লামেত আদিবাসীদের মধ্যেও এ রূপকথা রয়েছে। এই রূপকথায় জোনাকির পিট্‌পিট করে আলো দেবার কারণ খুঁজতে গিয়ে লোকসমাজ একটি করুণ সমাজচিত্র এঁকেছেন। এখানেও সেই সৎ মায়ের মোটিফ। মায়ের অত্যাচার সহ্য করেছে ছেলে, আতঙ্কিত দিন যাপন করেও সে অসহায়ভাবে মায়ের কাছে থাকতে বাধ্য হয়েছে। খিদের অসহ্য যাতনা ছেলে অনুভব করেছে। তবু কিছু করার নেই। সামাজিক ও পারিবারিক প্রথায় সে শৃঙ্খলিত। বাবাও স্বাভাবিকভাবেই সৎ মায়ের পক্ষে। ছেলের জীবনে চরম অভিশাপ হল ভয়। মায়ের ভয়ে তাকে দিন-রাত কম্পমান থাকতে হয়। যে ভয়ের চরম পরিণতি হল মৃত্যুতে। মৃত্যুতেই রূপকথা শেষ হল না। সে জোনাকি হয়ে পয়সা খুঁজছে। আশ্চর্য প্রতীক। সমাজের নিষ্ঠুরতা কি মৃত্যুতেই শেষ হয়ে যাবার নয়? লোকসমাজ যেন এই অবিচারকে

মূর্ত করে রেখেছেন এই রূপকথায়। জোনাকির মতো সুন্দর একটি পতঙ্গের আলো জ্বালার কারণ খুঁজতে সমাজের চিত্রই উদ্ভাসিত হয়ে উঠল।

ছায়াপথ। মেলানেশিয়ার অ্যাস্‌ট্রোলের উপসাগরীয় এলাকার বিলিবিল আদিবাসী গোষ্ঠীর রূপকথা। নিউ ব্রিটেন ও তামি দ্বীপের উপকূলভাগে এদের বাস। মালয়েশিয়ার পশ্চিমে টোরাজা দ্বীপের পালু-গুমবাসা উপত্যকার কাইলি আদিবাসী, চিনের দাই আদিবাসী, মাঙ্গোলিয়ার দাউর আদিবাসী গোষ্ঠীর মধ্যে একই গল্প রয়েছে। রূপকথাটি মৌখিক গদ্যে বিবৃত, কিন্তু একটি গাথাকাব্য হয়ে উঠেছে। সহজ পবিত্র প্রেম, মেঠো ভালবাসা ও করুণ সমাপ্তি রূপকথাটিকে কাব্যময় করে তুলেছে। এ যেন চিরন্তন ব্যর্থ প্রেমের মেঠো গান। আকাশে ছায়াপথ দেখা দেয়, তার কাল্পনিক উৎস-সন্ধান করতে গিয়ে লোকসমাজ এই রূপকথা সৃষ্টি করলেন। প্রতীক্ষার পরে মিলন অনেক আনন্দের। প্রতিদিনের মেলামেশায় যা একঘেয়ে হয়ে ওঠে, বছরের মাত্র একটি দিনে সেই মিলন স্বর্গীয় আনন্দে পূর্ণ হয়ে উঠবে। প্রতীক্ষাতেই প্রেম গাঢ় হয়। কিন্তু মিলনের মুহূর্তেই আবার বেদনা, বিচ্ছেদের কান্না। তারা মিলিত হচ্ছে আর কাঁদছে। বৈষ্ণব পদাবলীতেও এই মিলন মুহূর্তের বিচ্ছেদ ভাবনা রাধা-কৃষ্ণকে ব্যাকুল করেছে। চিরন্তন মানবমন অসম সামাজিক বিকাশ সত্ত্বেও একইভাবে অনুভূতি প্রকাশ করেন। এইখানেই সব মানবিক সত্তা একাকার হয়ে যায়।

এসব আমাদের মা দিয়েছে। মেলানেশিয়ার সান্টা ইসাবেল ও মালাইতা দ্বীপের রোরো আদিবাসী রূপকথা। ফরমোজার কানাকানাবু আদিবাসী ও চিনের ইযাও আদিবাসীর মধ্যেও প্রচলিত। এই রূপকথার শেষাংশে সৃষ্টিবিষয়ক লোকপুরাণের আভাস রয়েছে। মায়ের কাছে সন্তান কি তা যেমন ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়, তেমনি সন্তানের কাছে মা-ও এক অব্যক্ত অনুভবের বস্তু। দুটি সম্পর্কই অনুভূতির। বিশেষ করে গ্রামীণ লোকসমাজে যেখানে সামাজিক বন্ধন ও মূল্যবোধ খুব নিবিড় ও দৃঢ়। দুই ছেলে মাকে হারিয়ে ও পিতা স্ত্রীকে হারিয়ে দিশেহারা হয়ে পড়েছে। সমাজে যা কিছু বৈভব ও সম্পদ তা এসেছে মায়েরই অকৃপণ দানে ও আত্মত্যাগে। দ্বীপে গোলাভরা শস্য, মাটিতে উর্বর ফসল, টলটলে পানীয় জল, গৃহপালিত পশুর দল— সবই মা দিয়েছে। মা আশিস জানিয়েছে, আমি আর ফিরব না, কিন্তু তাতে দুঃখ নেই। তোমারা সুখি হবে। মাতৃত্বের পূর্ণ বিকাশ তো সন্তানদের সমৃদ্ধি কামনায়। চিরন্তন মাতৃত্বের অনন্য চিত্র।

শিকারি ও কুকুর। মেলানেশিয়ার পাপুয়া উপসাগরীয় এলাকার গোয়ারিবারি দ্বীপের কেরেওয়া আদিবাসী রূপকথা। এরা দুর্ধর্ষ শিকারি গোষ্ঠী, নির্ভীক ও বলিষ্ঠ। শোনা যায় এরা একসময় নরমুণ্ড শিকার করতেন। উৎসব গৃহ কিংবা নৌকা বানাবার পরে তার উদ্‌বোধনের দিনে নরমুণ্ড শিকার করা হত। এদের অধিকাংশ লোককথাই শিকারকে কেন্দ্র করে, পূর্বতন সোভিয়েত ইউনিয়নের একেবারে উত্তরাংশে নেনেত্‌ আদিবাসী গোষ্ঠীর মধ্যেও এই রূপকথা একইভাবে পাওয়া যায়। ভীত বুনো কুকুর নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে দোরে দোরে ঘুরছে। কিন্তু সে বুঝেছে, সকলেই অন্য শক্তির কাছে ভীত। এটাই প্রকৃতিক নিয়ম। কিন্তু একজন রয়েছে যে অজেয়। সবচেয়ে বিস্ময়ের, এই অজেয় জীবটির নখ নেই, থাবা নেই, ধারালো দাঁত নেই দেহের শক্তিও তেমন নয়। কিন্তু, এই প্রাণীটি বাড়তি কিছু ব্যবহার করতে জানে যা অন্য কেউ পারে না। দশ

আঙুলে সে বাড়তি যা ব্যবহার করে সেই অস্ত্র-শস্ত্র অন্যের নেই। এই মানসিকতা থেকেই রূপকথাটির জন্ম। কুকুর কীভাবে মানুষের সঙ্গী হল সেই ব্যাখ্যা দিতে গিয়েই অপরাজিত নির্ভীক শিকারির চিত্র এল।

জাদু থলে ও রুপোর শিং। মেলানেশিয়ার মাসিম দ্বীপের দোবু আদিবাসী রূপকথা। অল্প দূরে ট্রেব্রিয়ান্ড দ্বীপপুঞ্জেও একই গল্প রয়েছে, এই দুই এলাকার আদিবাসী গোষ্ঠী একই ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী। পূর্বতন সোভিয়েত ইউনিয়নের দক্ষিণাংশে ও চিনের সীমান্ত এলাকার কাজাক আদিবাসী গোষ্ঠীর মধ্যেও রূপকথাটির সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। আপাতদৃষ্টিতে রূপকথাটির মধ্যে অতি-পরিচিত এক সরস কাহিনী রয়েছে বলে মনে হবে। কিন্তু অভিপ্রায় বিশ্লেষণ করলে উদঘাটিত হবে সামন্ত-সমাজের এক করুণ নির্মম চিত্র। যে সমাজে গোষ্ঠীপতি কিংবা সমান্তপ্রভু সর্বেসর্বা, সেখানে তিনিই আইন। তার ইচ্ছার বিরোধিতা করে সমাজে বসবাস করা অসম্ভব।

বুড়ো যে সম্পদ দান হিসেবে পেয়েছিল সর্দার তা কেড়ে নিয়েছে। তার ইচ্ছাই জয়ী হযেছে। বুড়োবুড়িরা অবর্ণনীয় দারিদ্র ও বেদনার মধ্যে সামন্ত সমাজের কৃষকের প্রাণের কান্না ধ্বনিত হয়েছে। সমশ্রেণির প্রতি দুর্বলতা, অনুরাগ, আকর্ষণ ও পক্ষপাতিত্ব স্বাভাবিক সামাজিক-অর্থনৈতিক নিয়ম। গরিব বুভুক্ষু বুড়োবুড়ি অন্নের উৎসের সন্ধান পেয়ে আমন্ত্রণ জানিযেছে সমশ্রেণির মানুষদের, গাঁয়ের না খেতে-পাওয়া গরিবদের। অন্যদিকে সর্দার সমশ্রেণির সামন্তপ্রভুদের আমন্ত্রণ জানিয়েছে, যে সমাজ এই রূপকথা বলেছে, তারা সচেতনভাবেই এই চিত্র এঁকেছেন। কেননা, এ তাদের প্রতিদিনের অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান, অতিচেনা সামাজিক অভিজ্ঞতা। সাধারণ হাট-বাটের গ্রামীণ মানুষ বাস্তবে সেই অত্যাচারী সর্দারের বিরুদ্ধে হয়তো প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারেনি। কিন্তু সে মনে মনে প্রতিশোধ নিয়েছে। এখানেও ঘটেছে তার ইচ্ছাপূরণ। নিজেদের শক্তিতে যখন প্রতিশোধ নেওয়া সম্ভব হচ্ছে না, তখন অতিলৌকিক অবাস্তব শক্তির মাধ্যমেই মানসিকভাবে প্রতিশোধ নিয়ে সে কিছুটা শান্তি পায়। কিন্তু মনোগত ইচ্ছাটি চাপা পড়েনি, শুধুমাত্র রূপকের আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়েছে। নির্মম অত্যাচারীর বিরুদ্ধে কাল্পনিক প্রতিশোধ গ্রহণের এ এক অনন্য সাহিত্যিক প্রকাশ।

কেশবতী কন্যা। পলিনেশিয়ার সোসাইটি দ্বীপপুঞ্জের আরিওই আদিবাসী গোষ্ঠীর রূপকথা। চিনের দং আদিবাসীদের মধ্যেও রূপকথাটি পাওয়া গিয়েছে। বাংলার রূপকথার কেশবতী কন্যার অনেক কাহিনি রয়েছে, কিন্তু তার আখ্যানবস্তু অন্য ধরনের। এই রূপকথায় লোকপুরাণের কিছুটা আভাস রয়েছে। গাঁয়ের পাশ দিয়ে কীভাবে জলধারা বয়ে গেল সেই সৃষ্টিবিষয়ক লোকপুরাণের কথা বলতে গিয়ে রূপকথার আদলে কন্যার আত্মত্যাগের কাহিনি শোনানো হয়েছে। এখানেও কেশবতী কন্যার চরম আত্মত্যাগের মাধ্যমেই চাষের সম্পদ জলধারা বয়ে এসেছে। কন্যা শেষ পর্যন্ত মৃত্যুবরণ করেনি। এখানে একজন শিল্পীর কথা রয়েছে, যিনি অপরূপ দক্ষতায় পাথরের নারীমূর্তি গড়েছেন। লোককথায় শিল্পীদের উল্লেখ সাধারণত থাকে না। খুব অল্প গল্পেই শিল্পীরা লোককথায় স্থান করে নিতে পেরেছেন। অথচ প্রতি লোকসমাজেই অনন্য সব লোকশিল্প রয়েছে। পারিবারিক দুঃখের কথাও এসেছে। বুড়ি মাকে ঘিরে কন্যার কষ্টের সংসার। তবু প্রকৃতির

বুকে পালিত পশুকে নিয়েই সুখি ছিল। এই মেয়ে যেন প্রকৃতি-কন্যা। প্রকৃতি থেকে তার আলাদা কোন সত্তা নেই। মেয়ের মনে করুণার ঝরনা-ধারা। তাই বুড়োর জলের পাত্র ভেঙে যাওয়ায় সে ব্যক্তিগত যন্ত্রণা সহ্য করেও জলধারা বইয়ে দিয়েছে। গাঁয়ের কাউকে সে যন্ত্রণার অংশীদার করেনি। জলধারা বয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে নিশ্চয়ই সবুজ ফসলে ক্ষেত ভরে যায়নি। কিন্তু মেয়ের চোখে এটি আগামীদিনের বাস্তব ছবি,—এই মুহূর্তের স্বপ্ন। গাঁয়ের মানুষের দুঃখ ঘোচাতে পেরেছে বলেই মেয়ের এমন আনন্দ।

মানুষ ওষুধ পেল কেমন করে। পলিনেশিয়ার সামোয়া দ্বীপের কারোঙগোয়া আদিবাসী গোষ্ঠীর লোককথা। পাশের দ্বীপ উপোলু ও সাভাইএও এই গল্প রয়েছে। মধ্যপ্রাচ্যের কয়েকটি দেশেও এই লোককথার সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। এই লোককথায় কযেকটি স্পষ্ট ভাগ রযেছে। আদ্দিকালে মানুষ ও পশু একই সঙ্গে বনে বাস করত। পরে ছাড়াছাড়ি হযে গেল। এই একটি বিষয় নিয়েই অসংখ্য লোককথা আছে, বিশেষ করে আফ্রিকার আদিবাসীদের মধ্যে। বিরোধিতা চলছিল কিন্তু শত্রুতা চরমে উঠল বুড়োর চামড়া আনার দিন থেকে। মানুষ পশুশিকার শুর করল। পশুর চামড়ায় মানুষের পোশাক হল, এই স্মৃতিও রয়েছে এখানে। পরের অংশে পশুরা প্রতিশোধ নিতে চাইল। লোকসমাজ নানাভাবে পশুর ওপরে নির্ভরশীল। পশুরা তাদের দেবতা, রক্ষাকারী, পরলোকের পথপ্রদর্শক, চিকিৎসক। পশুদের মধ্যে অনেক রহস্যের সন্ধান করেছে লোকসমাজ। তাই পশু যে জাদু জানে এই বিশ্বাস বহু পুরনোকালের। এখানেও তার কথা রযেছে, গল্পের শেষে কথক বলছেন,— ছেলেমেয়েরা, তোমরা যদি চোখ মেলে চেয়ে দেখ, দেখতে পাবে সব গাছ-গাছালি থেকেই ওষুধ তৈরি হয়। গ্রামীণ মানুষের অভিজ্ঞতালব্ধ এ জ্ঞান প্রাচীন ভারতের জীবকের কথা মনে করিয়ে দেয়। সমস্ত বনভূমি ঘুরে এসেও জীবক এমন কোন গাছগাছালি খুঁজে পায়নি যা থেকে ওষুধ তৈরি হয় না। গুরু সেদিন উপলব্ধি করলেন যে শিষ্য জীবকের চিকিৎসা শাস্ত্র অধ্যয়ন সম্পূর্ণ হয়েছে। প্রাকৃতিক পরিমণ্ডলে থাকার ফলেই এই অভিজ্ঞতা তাদের জন্মেছে।

শেয়াল ও সিংহ। পলিনেশিয়ার রাইয়াতিয়া দ্বীপের রারোটোঙগা আদিবাসী গোষ্ঠীর পশুকথা। আফগানিস্তানের কাফির ও আফ্রিদি আদিবাসীদের মধ্যেও পশুকথাটির সন্ধান মিলেছে। পলিনেশীয় লোককথায় সিংহের উপস্থিতি প্রায় নেই বললেই চলে। এই হিসেবে এই পশুকথাটি ব্যতিক্রম। পৃথিবীব্যাপী সমস্ত লোকসমাজের একটি সাধারণ বৈশিষ্ট রয়েছে। যখন তারা লোককথা বলেন, প্রায় সমস্ত ক্ষেত্রে দুর্বল ছোট পশুপাখিকে জয়ী করেন। হিংস্র শক্তিশালী বৃহদাকার পশু-পাখি পরাজিত হয় ছোটদের কাছে। অবশ্য কখনই শক্তিতে এই জয় আসে না, জয় আসে বুদ্ধি-কৌশলে। বাংলার রূপকথায় টুনটুনি, পঞ্চতন্ত্রের শেয়াল এর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। এখানেও বোধহয় ইচ্ছাপূরণের বিষয়টি সক্রিয় থাকে, তার সঙ্গে মেশে দুর্বলের প্রতি সহানুভূতি। এইসব পশুকথায় বলবার ভঙ্গিতে বেশ কৌতুক থাকে যার ফলে পশুকথাগুলি সরস ও মনোগ্রাহী হয়ে ওঠে। শেয়ালের আচরণেও এই অভিব্যক্তি প্রকাশ পেয়েছে। অসম বন্ধুত্বের উপদেশটিও বলা হয়েছে।

আদাপা আর দখিনা বাতাস। পলিনেশিয়ার হাতুতু, হিভা-ওয়া দ্বীপের মারকুইসা আদিবাসী গোষ্ঠীর রূপকথা। হাজার হাজার বছর আগের আসিরীয় সভ্যতার আমলে

পাথরের ওপরে উৎকীর্ণ রয়েছে এই রূপকথাটি। কীভাবে আদাপা নামসহ এই রূপকথাটি পলিনেশীয় আদিবাসীদের মধ্যে পাওয়া গেল তা আজও নৃবিজ্ঞানীদের কাছে এক পরম রহস্য হয়ে রয়েছে। শুধু তাই নয়, যে কালে স্বর্গ ও দেবতা ছিল মানুষের সবকিছুর নিয়ামক, সেই আসিরীয় লোককথায় বলা হচ্ছে,—পৃথিবী বড় সুন্দর মানুষের পৃথিবী। জীবনের প্রতি এমন প্রগাঢ় ভালোবাসা ও আকর্ষণ সেই প্রাচীনকালে কীভাবে রূপ পেল তা ভাবলে অবাক হতে হয়। মারকুইসা আদিবাসীদের লোকপুরাণে পারলৌকিক জীবনের প্রতি তীব্র আকর্ষণ রয়েছে, স্বর্গকামনায় তারা অতি আগ্রহী। তা সত্ত্বেও আদাপার মতো আশ্চর্য চরিত্র তারা লোককথায় সৃষ্টি করেছেন, যে স্বর্গের দেবরাজকে বিনীতভাবে জানিয়েছে, বাবার কাছে সে প্রতিজ্ঞা করেছে পৃথিবীতে ফিরে যাবে। পৃথিবীর জীবনে অনেক কষ্ট, তবু স্বর্গের অমৃত চায় না। কেননা, পৃথিবী সুন্দর । দেবরাজের ভিক্ষা ফিরিয়ে দেওয়ার মতো বলিষ্ঠ মানসিকতা যে সমাজের মানুষ প্রকাশ করতে পারেন তাদের জীবনবোধ কত গভীর তা সহজেই উপলব্ধি করা যায়। লোককথার বিশ্বে এ এক আশ্চর্য ব্যাতিক্রম।

কাঠবাদামের গাছ। পলিনেশিয়ার টোঙ্গা দ্বীপপুঞ্জের হাপাই আদিবাসী গোষ্ঠীর পশুকথা। ভাভাও দ্বীপেও গল্পটি প্রচলিতি আছে। পূর্বতন সোবিয়েত ইউনিয়নের এশিয়া অংশে কয়েকটি আদিবাসীদের মধ্যে থেকেও এই গল্প সংগৃহীত হয়েছে। কাঠবাদামের গাছ একসঙ্গো অনেকগুলো থাকে। কেন এমন হল এই উত্তর দিতে গিয়ে হাপাইরা কাহিনিটি বলেছেন। একটি ছোট্ট ঘটনার সূত্র ধরে কাহিনি বেড়ে চলে, এরকম কাহিনি-বিস্তার লোককথায় খুব বেশি। সমস্ত লোকসমাজেই এই বিশেষ ভঙ্গিটি রয়েছে। কাঠবেড়ালকে নিহত করল খেঁকশেয়াল,—পরের পর এই একই ঘটনা ঘটতে লাগল। কিন্তু গল্পের শেষাংশে অন্য বক্তব্য। কাঠাবাদামের গাছ মাটিতে মিশে অনেক সন্তানের জন্ম দিল। সূত্র ধরে কাহিনি বিস্তারে এই ধরনের কাব্যিক পরিণতি অন্য কোন গল্পে দেখা যায় না। শেষাংশে একটি উপদেশও রয়েছে, ওরা একা নয়, তাই ভয়ও নেই। সংঘবন্ধ জীবনের কামনা।

ধ্রুবতারা ও শুকতারা। পলিনেশিয়ার তাতাকোতো দ্বীপের তুয়োমোতু আদিবাসী রূপকথা। সোভিয়েত মধ্য এশিয়ার চিনের তারিম নদীর পশ্চিমে সীমান্তে এলাকার কিরঘিস্ আদিবাসী গোষ্ঠীর মধ্যেও রূপকথাটির সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। পলিনেশীয় লোকপুরাণ ও রূপকথায় ধ্রুবতারা, শুকতারা, সপ্তর্ষিমন্ডল, রামধনুর প্রভার খুর বেশি। অসংখ্য লোককথায় বারবার এদের কথা ঘুরে ঘুরে এসেছে। এই লোককথাটির মধ্যে একজন গোষ্ঠীপতির দুরন্ত ছেলের জীবনের কথা রয়েছে। একটি অন্যায় কাজ তার চিন্তাকে সম্পূর্ণ অন্য খাতে বইয়ে দিল। সে অভিযানে বেরিয়েছে, মাঝে-মধ্যে তার দুষ্টবুদ্ধি জেগে উঠেছে। স্বভাবকে সহজে বদলানো যায় না। কিন্তু সে নিজেকে সংযত রেখেছে। অজেয় মানুষ প্রকৃতিজগৎকে বশীভূত করেছে, কিন্তু মৃত্যুর কাছে হেরে গিয়েছে। তাকে কীভাবে জয় করা যায় সে ভাবনা বহু পুরনো কালের। এই দুষ্টু ছেলেকে মৃত্যু ধাওয়া করেছে, কি অসাধারণ বেদনাময় অভিব্যক্তি। মৃত্যুকে সে বারবার ঠেকিয়েছে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত পারেনি। বাস্তব অভিজ্ঞতা। লোকসমাজের কাব্যিক মনের অনন্য প্রকাশ ঘটেছে এখানে। সব কিছুর ব্যাখ্যা দেবার প্রবণতাই মানুষের বিজ্ঞান-চেতনার প্রথম উন্মেষ ঘটাতে সাহায্য করেছে।

আকাশের উজ্জ্বল তারকা ধ্রুবতারা ও শুকতারার সৃষ্টির পেছনে সে নিজের মতো করে উত্তর খুঁজেছে। লোককথাটি শেষ পর্যন্ত একটি করুণ গাথাকাব্য হয়ে উঠেছে। অমর রাজ্যের রাজা স্বভাবতই নিষ্ঠুর। সে দুষ্টু ছেলেকে বারবার হত্যা করতে চেয়েছে। গোষ্ঠীপতিদের মানসিকতা এরকমই হয়। মেয়েরা তার ব্যক্তিগত সম্পদের মতো, সহজে সে তাদের অন্যের হাতে তুলে দিতে চায় না। প্রাচীন বহু সমাজই ছিল মাতৃতান্ত্রিক। তার রেশ রয়ে গিয়েছে এই রূপকথায়। দুষ্টু ছেলে রাজকন্যাকে বিয়ে করে অমররাজ্যেই রয়ে গেল। সামাজিক ইতিহাস এভাবেই লুকিয়ে থাকে লোককথার মধ্যে। রূপকথার শেষাংশে লোককপুরাণের আমেজ লক্ষ্য করা যায়।

কার ফসল কে ঘরে তোলে। পলিনেশিয়ার অস্ট্রাল দ্বীপপুঞ্জের রুরুতু আদিবাসী গোষ্ঠীর পশুকথা। আফ্রিকার বাভেন্দা ও ইকোই আদিবাসীদের মধ্যেও পশুকথাটি রয়েছে। সমাজের একটি নির্মম সত্য রূপকের মাধ্যমে এখানে প্রকাশিত হয়েছে। সামন্ততান্ত্রিক গ্রামীণ সমাজে কিছু মধ্যশ্রেণী থাকে যারা সমাজের অনেক কিছু নিয়ন্ত্রণ করে। পরিশ্রম না করেও শুধু দেহের শক্তিতে কিংবা কৌশলে সম্পদ ভোগ করে। যে কৃষক ফসল ফলায়, অনেক সময়েই ফসল তার গোলায় ওঠে না। এখানে মাকড়সা ও শেষকালে বাজ পাখি ফসল অধিকার করেছে। অধিকার করার পেছনে দুজনেরই যুক্তি রয়েছে। শুধু যুক্তি নেই কাঠবেড়ালের। যে কাঠবেড়াল মাথাব ঘাম পায় ফেলে, রোদে পুড়ে, জলে ভিজে ফসল ফলিয়েছে, সে-ই কেবল নীরবে সরে দাঁড়িয়েছে। সর্দার পশুরাও স্বাভাবিক কারণেই শক্তিমানের পক্ষে। কৃষক কাঠবেড়াল শূন্য হাতে ঘরে ফিরল,—বাচ্চদের মুখের দিকে তাকিয়ে তার বুক কেঁপে উঠল। সে ভয় পেয়েছে থাবা-নখ-ওয়ালা পশুদের। আবার মাকড়সা অনিচ্ছা সত্ত্বেও সরে দাঁড়িয়েছে বাজপাখির রক্তচক্ষুর সামনে। এভাবেই দুর্বলের কাছ থেকে সবলেরা লুঠ করে। প্রতি সমাজের এই তো চিত্র! রূপকের আড়ালে জীবনের কথা।

সাতরাঙা রামধনু। পলিনেশিয়ার সর্ব দক্ষিণে নিউজিল্যান্ডের মাওরি আদিবাসী রূপকথা। মাওরি আদিবাসী গোষ্ঠীর তুহোয়ে শাখার রূপকথা। এরা থাকেন উরেত্তয়েরা এলাকায়। নৃবিজ্ঞানীদের ধারণা, ১০০০ খ্রিস্টাব্দে পলিনেশিয়ার মধ্যাঞ্চল থেকে মাওরি আদিবাসীরা নিউজিল্যান্ডে নয়া বসতি গড়ে তোলেন। তাই অনেক দূরত্ব সত্ত্বেও পলিনেশীয় সংস্কৃতির ঐতিহ্য এরা এখন বহন করে চলেছেন। প্রাচীন ঐতিহ্যকে ধরে রাখার এক অনন্য ক্ষমতা রয়েছে আদিবাসী লোকসমাজের। সাতরঙা রামধনুর জন্ম কীভাবে ঘটল তার কাহিনি বলতে গিয়ে একটি করুণ রূপকথার সৃষ্টি হল। শর্ত না মানার ফলে মিলনে এল ব্যর্থতা। আকাশী মেয়ে মাটির পৃথিবীর ছেলেকে ছেড়ে যেতে বাধ্য হয়েছে। সে যেতে চায়নি, কিন্তু তবু যেতে হল। শর্ত ভাঙবার ফলে জীবনে যে নানাবিধ বিপর্যয় ঘটে তার অনেক কাহিনি রয়েছে পৃথিবীজোড়া রূপকথার বিশ্বে। প্রেমের প্রতি কিশোরের নিষ্ঠা গভীরভাবে অঙ্কিত হয়েছে,—মনে শুধু একটি ছবি, সে ছবি কুয়াশাকুমারীর। প্রভাতে প্রকৃতিক পরিবেশে যে চিত্র প্রতিনিয়ত দেখা যায়, তারই ব্যঞ্জনাময় প্রকাশ ঘটেছে শেষ অংশে। প্রাণের প্রেমিকাকে হারিয়ে প্রমিক অশান্ত হয়ে উঠেছে, যতদিন তাকে না পাবে আকাশপথে প্রেমিক খুঁজে চলবে দয়িতাকে। নৈসর্গিক বস্তুর গীতিময় ব্যাখ্যায় কি অসাধারণ দক্ষতা দেখিয়েছেন এই আদিবাসী গোষ্ঠী।

বোকা স্বামী। পলিনেশিয়ার মানগাইয়া দ্বীপের নগারিকি আদিবাসী রূপকথা। জাপানের মৌখিক লোককথায় একই ধরনের গল্প খুব জনপ্রিয়। জাপানে এই রূপকথার উনচল্লিশটি রূপ পাওয়া গিয়েছে। পলিনেশীয় লৌকিক সংস্কৃতিতে দেবদারু ও বাঁশ গাছ দীর্ঘ জীবনের প্রতীক। তাই বিশেষ বিশেষ উৎসবে এই দুই গাছের পাতা দিয়ে বাড়ি-মন্দির সাজানো হয়। এই রূপকথার মধ্যে বলবার ভঙ্গিতে কৌতুক প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু এর মধ্যেই সামন্তসমাজের বীভৎসতার ইঙ্গিতও রয়েছে। সামন্তপ্রভু সমাজের কর্তা ও আইন। যে মেয়েকে তার পছন্দ হবে তাকে সে নিজের ঘরে নিয়ে আসবে বউ হিসেবে কিংবা শুধুমাত্র দেহসঙ্গী হিসাবে। এটাকে না মেনে উপায় নেই। বউ বলেছে কেঁদেকেটে কোন লাভ নেই, আমাকে নিয়ে যাবেই, ওরা এরকমই। বুদ্ধিমতী বউ জানে, বিরোধিতা করলে স্বামীর প্রাণ যাবে। কাহিনির শেষাংশে যা ঘটেছে তা ইচ্ছাপূরণের চাহিদায়। বাস্তবে তা ঘটে না, কিন্তু অসহায় মানুষ গল্পের মধ্যেও জয়ী হয়ে শান্তি খুঁজেছে। কাল্পনিক এই পাওয়ার ইচ্ছা না থাকলে জীবন যে মরুময় হয়ে উঠবে। বাস্তব সংসারের বেদনাও আছে, আবার কল্পনার আকাশও রয়েছে।

সাগরকন্যা ও আকাশের চাঁদ। পলিনেশিয়ার হাওয়াই দ্বীপের হাওয়াই আদিবাসী রূপকথা। পলিনেশিয়ার উত্তরাংশে এই হাওয়াই দ্বীপের কাছাকাছি কাউয়াই, ওয়াহু, নাইহাউ প্রভৃতি দ্বীপেও রূপকথাটি খুব জনপ্রিয়। এই রূপকথার নায়িকার নাম হিনা। পলিনেশীয় লোকসংস্কৃতিতে হিনা একটি আশ্চর্য নাম। হিনা নানা রূপে নানাভাবে লোককথায় ও লোকসংস্কারে এসেছে। পলিনেশীয় লোকপুরাণকে বুঝতে হলে হিনা ও আগ্নেয়গিরির আগুনের দেবী পেলেকে জানতেই হবে। হিনা ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত চাঁদের সঙ্গে, হিনা উর্বরতার আচার-অনুষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত, সুগন্ধযুক্ত ফুলের মালার সঙ্গে হিনার সম্পর্ক, হিনা সবকিছু গচ্ছিত রাখে, হিনার গর্ভ থেকেই সব পশু-পাখি-মাছ জন্মেছে। এই রূপকথার প্রথম অংশে রাজা ও হিনার অপরূপ মিষ্টি প্রেমের কাহিনি রয়েছে। রাজা হিনাকে ভালোবেসে বিয়ে করেছে। এই প্রেম সত্য। কিন্তু রাজা যে সামন্তপ্রভু। প্রেম ভেঙে যেতেও সময় লাগে না। দ্বীপে যে বিপর্যয় নেমে এল তার সব দায়-দায়িত্ব নারীর ওপর চাপিয়ে দেওয়া হল। প্রেম গেল ছুটে। নারী হল দাসী। পৃথিবীর সমস্ত সমাজেই বিপর্যয়ের জন্য দায়ী করা হয় নারীকে। ডাইনি হত্যার পেছনে একই মানসকিতা। ভারতবর্ষের মতো ঐতিহ্যশালী উন্নত হিন্দু দর্শনের অধিকারী সমাজও নারীকে নির্যাতন করেছে এই একই কারণে। মধ্যযুগের ইউরোপেরও একই মনোভাব সক্রিয় ছিল। সামন্তপ্রভু হিনাকে রানীর আসন থেকেই সরায় নি, প্রতিশোধ-পরায়ণ হয়ে উঠেছে। সবচেয়ে কঠিন কঠিন কাজ হিনাকেই করতে হয়। সামন্তসমাজে নারীর এই তো ভবিতব্য। হিনা মুক্তি চেয়েছে মুক্তি সে পেয়েছে। নারী মুক্তি পায় মৃত্যুতে, এখানে হিনার সুন্দর মুক্তির মধ্যে লোকসমাজের নারীর ইচ্ছাপূরণের আকাঙ্ক্ষাটি প্রকাশিত হয়েছে। আকাশি কন্যার সুখের জীবনের মধ্যে নিজেদের শৃঙ্খলিত জীবনের শান্তি খুঁজছে।

উলা আর উইম্‌বো। আস্ট্রেলিয়ার আরান্ডা আদিবাসী পশুকথা। আরান্ডা আদিবাসী মধ্য অস্ট্রেলিয়ার ফিন্‌কে নদীতীরে ও ম্যাকডোনেল রেঞ্জ এলাকায় বসবাস করেন। এরা মূলত শিকারজীবী ও মৎস্যজীবী। এই পশুকথায় সাদা ও কালো টিকটিকির কথা

আছে। আসলে এরা দুই আদিবাসী গোষ্ঠী, সাদা ও কালো টিকটিকি এদের টোটেম। গল্পটি পড়লেই দুই আদিবাসী গোষ্ঠীর কথা স্পষ্ট হবে। আদিবাসী সমাজে যেমন এক টোটেমের ছেলে-মেয়ের মধ্যে বিয়ে হয় না, তেমনি অন্য গোষ্ঠীর সঙ্গে বিবাহবন্ধন সাধারণত সুনজরে দেখা হয় না। সর্দার বিরক্তি প্রকাশ করেছে, গাঁয়ে কি সাদা মেয়ের অভাব আছে? তবু এক গোষ্ঠীর মেয়ে অন্য গোষ্ঠীতে বউ হয়। ইচ্ছা না থাকলেও বাধ্য হয়, যেমন হয়েছে উলা। কিন্তু তখনই বাধে দুই গোষ্ঠীতে সংঘর্ষ, পরিণামে রক্তক্ষয়। এখানেও একই কারণে দুই গোষ্ঠীতে লড়াই বেধেছে। অবশ্য এক গোষ্ঠীর মধ্যে একজনই লড়তে গিয়েছে। বুদ্ধিবলে সে জয়ী হয়েছে। ঠিক জয়ী নয়, কৌশলে অন্য গোষ্ঠীকে নিজেদের গাঁয়ে ফিরিয়ে দিতে পেরেছে। এই রূপকথায় মুখোশ ব্যবহারের চিত্র রয়েছে। খুব কম লোককথায় এই মুখোশ ব্যবহারের চিত্র দেখেছি। বহু পুরনো কাল থেকেই সর্দার বা গোষ্ঠীপতির পদটি উত্তরাধিকার সূত্রে সর্দারের বড় ছেলেই পায়। মানব-সভ্যতার বিবর্তনের ইতিহাসে এই বিষয়টি বহু আলোচিত। কিন্তু অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসী এখনও এমন আদিম সমাজব্যবস্থা বজায় রাখতে বাধ্য হয়েছেন যে সেখানে যোগ্যতর কোন ব্যক্তিই সর্দারের পদ পান। উইম্‌বোর অসাধারণ বুদ্ধি ও দক্ষতায় বর্তমান সর্দার স্বেচ্ছায় তার পদ ত্যাগ করে উইম্‌বোকে করেছেন নতুন সর্দার।—নতুন সর্দার আমাদের, আমাদের উইম্‌বো।

সাত বোন। অস্ট্রেলিয়ার উত্তর এলাকার ওযাবামুন্‌গা আদিবাসী রূপকথা। উত্তর কুইন্সল্যান্ডের আরুনটা আদিবাসীদের মধ্যেও এই রূপকথা রয়েছে। নিউগিনির গেন্‌দে অদিবাসী ও দক্ষিণ-পূর্ব বোর্নিওর ন্‌গাজু দায়াক আদিবাসীদের মধ্যে এই রূপকথার সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। পলিনেশীয় লোকসংস্কৃতির মতো এই রূপকথায় সপ্তর্ষিমন্ডল কালপুরুষ ও শুকতারার কথা রয়েছে। এই রূপকথায় কেন্দ্রিয় চরিত্র হিসেবে সাত বোন থাকলেও টুক্‌রো টুক্‌রো কাহিনিসূত্র দিয়ে গোটা রূপকথার জাল বোনা হয়েছে। সাত ভাই সাত বোনের প্রেমে পড়েছে, কিন্তু সাত বোন বিয়ে করতে অস্বীকার করায় তারা আড়ালে চলে গেল। এল আবার কাহিনির শেষাংশে। সাত ভাইয়ের পরে এল শিকারি, তারও তিনটি জীবন, একটি পারিবারিক, তার পরে যাযাবর, আবার দুই বোনকে বিয়ে করে পারিবারিক সংসার। সাত বোন থেকে দুই বোন বিচ্ছিন্ন হয়েছে, আবার শেষদিকে আকাশ-রাজ্যে মিলিত হয়েছে, কাহিনির জাল বোনাটি বড় বিচিত্র। এই রূপকথার মধ্যে সমাজের ছবিটি বড় নিখুঁতভাবে এসেছে। শিকারি ঘর ছেড়েছে দুটি কারণে, ক্ষুধার জ্বালায় মায়ের প্রতি বিরক্তিতে আর পড়শিদের নীচতায়। কেউ তাকে ক্ষুধার অন্ন ধার দেয়নি। ক্ষুধা যে মানুষকে কীভাবে দিশেহারা করে দেয় তার চিত্র রয়েছে। এই আদিবাসী গোষ্ঠীর কাছে ক্ষুধা যে নিত্যদিনের সঙ্গী। সাত বোন বড় বিচিত্র, একা একা থাকে, কারও সঙ্গে মেশে না। বউ হয়েও সবসময় পালাবার চেষ্টা করেছে। এরকম বিচিত্র নারী-চরিত্র সাধারণত আদিবাসী লোককথায় দেখা যায় না। কেননা আদিবাসীদের সংহত গোষ্ঠীবদ্ধ সমাজে একাকিত্বের স্থান নেই। বড় বিচিত্র এই চরিত্র-চিত্রণ, শিকারি বর্শা নিয়ে যে এমুকে মেরেছে, আসলে সেই গোষ্ঠীর টোটেম হল এমু পাখি। সাত বোনের মেটে আলুর কাঠির কথা আছে। এই কাঠি তাদের লোকসংস্কারের সঙ্গে যুক্ত। একদিকে মেটে আলু তাদের জীবনধারণের অন্যতম

খাদ্যসম্পদ, অন্যদিকে প্রধান খাদ্যসম্পদের একটি অংশ সংস্কারের সঙ্গো যুক্ত হয়ে গিয়েছে। লোকসমাজে গাছ-গাছালি সংস্কারের সঙ্গো গভীরভাবে যুক্ত। স্বামীর কাছে বউ হল অধীনস্থ প্রাণীর মতো। স্বামীর মতামতকে মেনে চলাই বউয়ের একমাত্র কর্তব্য। সামন্তপ্রভুদের মানসিকতা। তাই দুই বউ যখন দেবদারু গাছের বাকল কাটতে চায়নি, তখন স্বামী রেগে গেল, স্বামীর কথা অমান্য করা ? আগুন নিভে যাওয়ার একটি ঘটনা রয়েছে। নতুন করে আগুন জ্বালানো যাবে না। কেননা, সে কৌশল সে জানে না। এখনও পৃথিবীর আনাচে-কানাচে বহু আদিবাসী গোষ্ঠী রয়েছে, যারা অবিরাম আগুন জ্বালিয়ে রাখে। কোন এক সময়ে আগুন পেয়েছিল দাবানল কিংবা অন্য কোন উৎস থেকে, তাকে আর নিভতে দেয়নি, কেননা, নতুন করে আগুন জ্বালাবার কৌশল তারা জানে না। এভাবেই লোককথার মধ্যে পুরনো কালের সমাজের ইতিহাস লুকিয়ে থাকে।

ডিরিরি আর বিব্‌বি। অস্ট্রেলিয়ার একেবারে উত্তরে আর্‌ন্‌হেম ল্যান্ডের যুলাম্‌বা আদিবাসী গোষ্ঠীর রূপকথা। পলিনেশীয় লোকসংস্কৃতিতে বার বার যেমন রামধনুর কথা এসেছে, এই রূপকথাতেও তেমনি রামধনু রয়ছে। তবে ভিন্ন প্রসঙ্গো। একজন পুরুষ তার অসাধারণ শক্তির প্রকাশ দেখাতে রামধনুর সৃষ্টি করেছে। জাগতিক মৃত্যুর পরেও সে চেষ্টা করে চলেছে আর একটা রামধনু তৈরি করতে। কিন্তু এখনও পারে নি। এই রূপকথায় একটি নিঃসঙ্গা নারী ও একটি নিঃসঙ্গা পুরুষ রয়েছে। নারী ডিরিরি স্বামীর মৃত্যুর পরে চার মেয়েকে নিয়ে ভয়ে ভয়ে দিন কাটায়। মেয়েদের প্রতি স্নেহে সে অন্য কোন পুরুষকে আর গ্রহণ করতে সাহস পায়নি। কিংবা পূর্ব স্বামীর প্রতি ভালোবাসায়। নতুন পড়শি বিব্‌বি আসাতে সে আরও ভীত হয়েছে। আবার চরম ভয়ের মুহূর্তে বিব্‌বির সন্ধান করেছে। বিচ্ছিন্ন হয়ে প্রাকৃতিক পরিবেশে একা একা বাঁচা যায় না। নারীর দরকার পুরুষ, পুরুষের দরকার নারীকে। এটাই স্বাভাবিক। মেয়েদের দিকে তাকিয়ে ডিরিরি বিব্‌বিকে গ্রহণ করতে চায়নি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বিব্‌বির শক্তি দেখে ও তার ভয় পাওয়ানো কথায় ডিরিরি তাকেই বিয়ে করেছে। তারা সুখি স্বামী-স্ত্রী হয়েছে। যে সমাজে স্বামীর মৃত্যুর পরে বিয়ে করায় কোন সামাজিক বিধিনিষেধ নেই সেখানে একা জীবনযাপন করা নিরর্থক। বিশেষ করে বউয়ের বয়স যখন কম তখন অকারণ ভয়ে ভয়ে থাকবার কোন কারণ নেই। কাঠঠোকরার বিচিত্র সুন্দর দেহ ও গাছে ঠোঁট দিয়ে আঘাত করা নিয়ে আদিবাসী সমাজে অনেক পশুকথা-রূপকথা আছে। খঞ্জন পাখি ও কাঠঠোক্‌রার চিত্র দুটি বড় সুন্দর। একজন মৃত্যুর পরেও ভয়ে কেঁদে চলেছে, অন্যজন অসীম ধৈর্যে আর একটি সৃষ্টিকার্যে জীবনপাত করছে।

নারকেল গাছ। এই রূপকথাটি হাওয়াই দ্বীপ ছাড়া পলিনেশিয়ার প্রতিটি দ্বীপের আদিবাসীদের সবচেয়ে জনপ্রিয় গল্প। এখানে যে মাছের কথা আছে তা হল বাইন মাছের মতো সর্পাকৃতি ইল মাছ। পলিনেশিয়ার পুবদিকের প্রত্যন্ত দ্বীপ ইস্টার দ্বীপে নারকেল গাছ ও ইল মাছ নেই, সেখানেও রয়েছে এই রূপকথাটি। অর্থাৎ হাওয়াই দ্বীপ ছাড়া উত্তরে মোরেল, দক্ষিণে কারমাডেক, পশ্চিমে নানোমিয়া এবং পুবে ইস্টার দ্বীপ

সর্বত্র এই রূপকথা ছড়ানো। এই বিশাল বিচ্ছিন্ন দ্বীপময় এলাকায় এই রূপকথার যে জনপ্রিয়তা তা আর কোন একটি রূপকথার ক্ষেত্রে দেখা যাবে না। 'নারকেল গাছ' রূপকথায় যে সুন্দরী মেয়ে রয়েছে সে ভয় ভাঙবার পরে মাছরূপী দেবতাকে ভালোবেসেছে। এই প্রেম বড় মধুর। মধুর প্রেমের পরিণতি বড় ভয়াবহ হল নিঃসন্দেহে, কিন্তু প্রেমিক জীবন দিয়ে যে অমূল্য সম্পদ দিয়ে গিয়েছে তারও তুলনা নেই। কেননা, পলিনেশীয় দ্বীপপুঞ্জের মানুষের কাছে নারকেল গাছ হল জীবন। The coconut tree is a great provider. The young leaves can be plaited into baskets, hats and fans; the husks used to make sennit for caulking canoes and for making ropes and mats. The scooped out dry shells make containers and cups. The flesh can be eaten, the milk drunk and the oil rubbed on the body. Even broken skulls were mended with a piece of coconut shell. (Ocenaic Mythology : Roslyn Poignant. page 48) রূপকথার মধ্যেও এর ইঙ্গিত রয়েছে। এই অর্থকরী ফলটিকে ঘিরে তাই জনপ্রিয় রূপকথাটির ব্যাপ্তি ঘটেছে। টোঙ্গা আদিবাসী তাদের কাভা উৎসবে সুর করে এই রূপকথা বলেন, সেখানে সুন্দরী মেয়ের নাম হিনা, হিনা উচ্চ বংশের পবিত্র কুমারী। থাকে সামোয়া দ্বীপে। কিন্তু স্বচ্ছ সরোবরে স্নান করবার সময় ইল মাছ হিনাকে অপবিত্র করে, তার কুমারীত্বের অবসান ঘটায়। দ্বীপের ক্ষুব্ধ মানুষ ইলকে হত্যা করে। তারা বেদনার গান গায় রূপকথার আদলে :

Kaloafu and Teuhie
It is said had a pet child,
But it was a god,
Fled they madly because of their fear.
They fled into the foaming sea.
The eel went to Samoa
And lived in Hina's water of life;
By and by Hina became pregnant.
'Oh Hina! Tell me who is your man?
'It is the eel, the Shining One.'
Came all Samoa and cleaned,
And bailed the pool till it was empty;
Lifted out the eel and cut it to pieces,
Cut up and ate while Hina wept.
'Bring here the head to me.
Then bury it in the burying place,'
Nights five passed and then it appeared:
Frist came the leaf pod and fibre;
It was wonderful the way it grew;

And the coconut with light husks
Were heavy with oil for their child.
Cut down its body for a sun shelter.
(Tongan Myths and Tales : E. W. Gifford. Page 122).

তাহিতি দ্বীপে অন্য একটি রূপ রয়েছে। হিনা ও তার প্রেমিক ইল মাছ তুনার কাহিনি। পলিনেশীয় পৌরাণিক বীর মাউই ইলকে হত্যা করে ইলের মাথাটি হিনাকে দেয়। বলে, এটা মাটিতে পুঁতে দিও, এর থেকে যে গাছ হবে তাতে দ্বীপ সম্পদে ভরে যাবে। হিনা মাথাটি নিয়ে সরোবরের পাশে রেখে দিল। প্রেমিকের বিচ্ছেদে সে মাউইর কথা ভুলে গেল, আনমনে স্নান করতে লাগল। অনেকক্ষণ পরে তার সে কথা মনে পড়ল। তাড়াতাড়ি জল থেকে নিরাবরণ দেহে উঠে এল। ততক্ষণে ইলের মাথা থেকে শেকড় বেরিয়ে মাটিতে ঢুকে পড়েছে। ছোট্ট নারকেল গাছের চারা জন্মেছে। যে সম্পদ হিনার একার হতে পারত, তা দ্বীপের সকলের সম্পদ হয়ে গেল।

এইভাবে হিনা ও ইলকে ঘিরে নারকেল গাছ হবার রূপকথাটির নানা রূপ রয়েছে।এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত রূপকথাটি সোসাইটি, কুক, অসট্রাল দ্বীপপুঞ্জের। এই রূপটির মধ্যেই মধুর প্রেমের কথা রয়েছে, দেবতার অপরূপ আত্মোৎসর্গের বিবরণ রয়েছে। কোন প্রতিশোধ-স্পৃহা নয়, কোন হত্যা নয়। আত্মবিসর্জনের কাহিনি। মৃত্যুর পরেও দয়িত-দয়িতা এক দেহে রয়ে গেল। নারকেল জল নোনতা। মেয়ের অশ্রুবিন্দু ও দেবতার মাথা দুয়ে মিলে প্রেম সম্পূর্ণতা পেল। এমন মধুর কাহিনি রোমান্টিক ভাবনা ছাড়া সম্ভব নয়। বাস্তবের একটি অতি প্রয়োজনীয় বস্তুর জন্মের কাহিনি বলতে গিয়ে লোকসমাজ নিবিড় পবিত্র অনন্য চিত্র এঁকেছেন। লোককথার মধ্যে লোকসমাজের মৌখিক সাহিত্যের মহান ঐতিহ্যের পরিচয় এভাবেই পাওয়া যায়।

ছোট্ট রবিন পাখি। লাতিন আমেরিকার মেক্সিকো দেশের পশুকথা। প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে এই দেশে অনেক আদিবাসী জনগোষ্ঠীর বাস। অবশ্য দীর্ঘদিনের ঔপনিবেশিক শাসনের ফলে রেড ইন্ডিয়ান, স্পেনীয় ও আমেরিকার সংস্কৃতির মধ্যে বেশ মিশ্রণ ঘটেছে, ভাষাতেও প্রভাব পড়েছে। রেড ইন্ডিয়ান-স্পেনীয় গোষ্ঠীকে ওখানে বলা হয়, 'মেস্‌টিজো', এই গোষ্ঠীর পশুকথা 'ছোট্ট রবিন পাখি'। লাতিন আমেবিকার বহু দেশে রবিন পাখিকে ঘিরে ভিন্ন ভিন্ন অনেক পশুকথা রয়েছে।

১৫১৬ খ্রিস্টাব্দে স্পেন এই দেশ দখলের আগে আজটেক মায়া জাপোটেক্ মিক্সটেক টোলটেক্ প্রভৃতি সভ্যতা প্রায় আড়াই হাজার বছর ধরে এখানে সজীব ছিল। মেক্সিকোর লোককথার ঐতিহ্যে এসব স্মৃতি এখনও রয়ে গিয়েছে।

যারা সত্যসন্ধানী যারা আত্মত্যাগী তারা কোন অমূল্য সম্পদের অধিকারী হলে তা কখনও নিজের ভোগের জন্য সীমিত করে রাখেন না, বিলিয়ে দেন সমাজের স্বার্থে। রবিন আগুন এনেছে, তাকে দগ্ধ হতে হয়েছে, সেই অমূল্য সম্পদ সে লোকসমাজের উপকারে বিলিয়ে দিয়েছে। মহৎ প্রাণের মহত্ত্ব এখানেই। দেবরাজ জিউসের কাছ থেকে আগুন এনে প্রমিথিউসও একই কাজ করেছিল, পরিণামে তাকে অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়েছে। রবিন পাখিও প্রমিথিউস।

পাখি ও পশুদের মধ্যে যুদ্ধ। অমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ-পশ্চিমে আরিজোনা ও নিউ মেক্সিকোর পুয়েবলো ইন্ডিয়ান আদিবাসীদের পশুকথা। এই এলাকার পুয়েবলো ইন্ডিয়ানরা এখনও বৃহত্তর সমাজের বাইরে অনেকাংশে বিচ্ছিন্ন হয়ে বসবাস করেন। সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবিচার আজও তাদের নিত্যসঙ্গী। স্পেনীয় নাবিকেরা একসময তাদের এই নামকরণ করেছিল, পুয়েবলো মানে মানুষ। এদের পাঁচটি শাখা,—তানো, কুইরে, হোপি, জেমেজ ও জুনি। প্রতি শাখাতেই এই পশুকথাটি খুব জনপ্রিয়। শীতকাল ছাড়া এরা কখনও লোককথা শোনায় না,—তাদের বিশ্বাস অন্য সময় লোককথা বললে জমির ফসল নষ্ট হযে যাবে কিংবা কোন বিষধর সাপ তাদের কামড়াবে।

এই পশুকথায় যে অভিপ্রায় প্রকাশ পেয়েছে তা দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতার ফসল। তারা জেনেছে, শুধুমাত্র দৈহিক শক্তিতে সব যুদ্ধ জয় করা সম্ভব নয়, প্রয়োজন পড়ে কৌশল ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধির। অর্থাৎ সেই সারমর্ম,—বুদ্ধি যার বল তার। শুধু তাই নয়, যুদ্ধে শত্রুর দুর্বলতা ও পরিকল্পনা আগে থেকে জানা থাকলে যুদ্ধের ছক তৈরি করা অনেক সহজ হয়ে যায়। পাখিরা শক্তিতে কম, কম শক্তি নিয়ে লড়তে গেলে কৌশল ও বুদ্ধির প্রয়োজন। এই বুদ্ধি দৈহিক শক্তির ঘাটতি কমিয়ে আনতে পারে। আর একটা শিক্ষা, সম্মিলিত শক্তিতে কাউকেই তুচ্ছ করতে নেই, কে কীভাবে উপকার করবে তা কে বলতে পারে। পিঁপড়ে ও মৌমাছির ভূমিকা এখানে অনন্য।

ছোট্ট খরগোশ ও পশুরাজ। লাতিন আমেরিকার দেশ বলিভিয়ার আদিবাসী পশুকথা। বলিভিয়ার কুয়েনচুয়া আদিবাসীদের বড় প্রিয় গল্প। এ দেশও ছিল স্পেনের উপনিবেশ সেই ষোড়শ শতাব্দী থেকে। স্প্যানিশ ভাষার প্রচলন সবচেয়ে বেশি হলেও কুয়েনচুয়া ও আয়মারা আদিবাসী ভাষাও সেখানে স্বীকৃতি পেয়েছে। বালিভিয়া ইনকা সভ্যতার আওতায় ছিল। এখানে প্রচুর পাহাড় থাকলেও মধ্যভাগে বিস্তৃত তৃণভূমি রয়েছে। উত্তর-পূর্বাংশে ঘন বনভূমি। আদিবাসীরা মূলত বনভূমি ও পাহাড়ে বাস করার ফলে লোককথায় বুনো পশুপাখি ও প্রকৃতির প্রাধান্য রয়েছে।

ছোট্ট খরগোশ এখানে প্রতিবাদী শক্তি, সামন্তপ্রভুর বিরুদ্ধে তার অভিযান। ছোট্ট পশু খরগোশ মজার মানুষ, কৌতুকপ্রিয ও সাহসী। প্রতিবাদী মানুষকে খুব সতর্ক থাকতে হয়, যে কোন মুহূর্তে বন্দি হওয়ার আশঙ্কা। কিন্তু যে মানুষ শক্তিমানের বিরুদ্ধে সাধারণ হাটবাটের মানুষকে সংগঠিত করার কাজে ব্যস্ত থাকে, তাকে পরম বুদ্ধিমান হতে হয়। আত্মত্যাগ ও চিন্তায় সে অন্যদের চেয়ে বেশি অগ্রসর। খরগোশও মৃত্যুর মুখোমুখি হয়ে সাহস হারায়নি। নেতৃত্ব দেওয়ার যোগ্য মানুষ এই খরগোশ। কাহিনির মধ্যে পশুরাজকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করে তারা স্বস্তি পেয়েছে, মানসিক তৃপ্তি অনুভব করেছে। বাস্তবে যা সম্ভব হয়নি, পশুকথার মধ্যে তা ঘটিয়ে তারা ইচ্ছাপূরণের স্বাদ পেতে চেয়েছে। ফাঁদে পড়ে পশুরাজের শক্তি ক্ষীণবল হয়ে আসছে,—পশুকথার মধ্যে দিয়ে উত্তরপুরুষকে একথা জানানোর মধ্যেও মনের বাসনা-কামনা-আকাঙ্ক্ষা ও ক্ষোভকে অন্তত প্রকাশ করা গেল।

শুয়োর ও সাদা ইঁদুর। ক্যারিবিয়ান সাগরের ওয়েস্ট ইন্ডিজের সবচেয়ে বড় দ্বীপ জ্যামাইকা। এই দ্বীপের জনগোষ্ঠী মূলত আফ্রিকান,আফ্রো-ইউরোপিয়ান, ইস্ট-ইন্ডিয়ান,

আফ্রো-ইন্ডিয়ান ও আফ্রো-চাইনিজ। ইস্ট-ইন্ডিয়ান ছাড়া সকলেই অন্য দেশ থেকে এসেছেন। এই পশুকথাটি ইস্ট ইন্ডিয়ান আদিবাসীদের।

বড় অত্যাচারিত দেশ। কলম্বাস ১৪৯৪ খ্রিস্টাব্দে জ্যামাইকায় আসেন, স্পেনীয় উপনিবেশবাদীরা আসে ১৫০৯ খ্রিস্টাব্দে আর আখের ক্ষেতে কাজ করার জন্য ক্রীতদাস আমদানি শুরু হয় ১৬৪০ খ্রিস্টাব্দে। ব্রিটিশরা দ্বীপ দখল করে ১৬৫৫ খ্রিস্টাব্দে। লক্ষ লক্ষ ক্রীতদাস আসে আফ্রিকার বান্টু ইবো আশান্তি হাউসা মান্‌দিন্‌গো মোকো নাগো সোবো প্রভৃতি আদিবাসী গোষ্ঠী থেকে। ভারতবর্ষ থেকে ক্রীতদাস আনা হয়। বহিরাগতদের বিপুল আগমনে আদি অধিবাসীরা প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়, এরা হলেন ইস্ট ইন্ডিয়ান আদিবাসী। জ্যামাইকায় এখন আর তাদের খুঁজে পাওয়া প্রায় অসম্ভব।

এই গল্পটির একটি সরল আকার আফ্রিকার বাভেন্দা ও নাগো আদিবাসীদের মধ্যেও পাওয়া যায়। তাই অনেকে মনে করেন, ইস্ট ইন্ডিয়ান আদিবাসীদের কাছ থেকে পশুকথাটি সংগৃহীত হলেও আফ্রিকার মানুষের কাছ থেকে শোনা গল্পই এরা বলেছেন। শুয়োর যে গান শুনেছে তাতে রয়েছে তারই জীবনের সাত দিনের অভিজ্ঞতা। এ তো কোন ব্যক্তিবিশেষের কাহিনি নয়, এ সমস্ত খেটে-খাওয়া গরিব মানুষের জমাট-বাঁধা ক্ষোভ, মিলিত বেদনা। যে দেশেই সে থাকুক না কেন, তার কাহিনি অর্থাৎ জীবন অভিজ্ঞতা এক।

রাঙামুখো বানর ও বুনো গোরু। অতলান্তিক মহাসাগরের বাহামা দ্বীপপুঞ্জের লোককথা। তিন হাজার দ্বীপ ও উপদ্বীপ নিয়ে এই বাহামা দেশ। এখানে জনসংখ্যার পঁচাশি শতাংশ আফ্রিকান, তাদের পূর্বপুরুষ আফ্রিকার বিভিন্ন দেশ থেকে আসা ক্রীতদাসের দল। আদি বাসিন্দা আজ প্রায় বিলুপ্ত। আফ্রিকার ক্রীতদাসদের মুখ থেকে সংগৃহীত যারা আজ বাহামার স্থায়ী বাসিন্দা। ১৪৯২ সালে কলম্বাস এখানে আসেন, ১৬৪৭ খ্রিস্টাব্দে ব্রিটিশ ও বারমুডান ধর্মীয় শরণার্থীরা এখানে স্থায়ী বাসভূমি গড়ে তোলে আর ১৭১৭ সাল থেকে ব্রিটিশ ক্রাউন কলোনি হওয়ার পর থেকে ক্রীতদাস আনা শুরু হয়। তাই আজ বাহামার যে আদিবাসী সংস্কৃতির পরিচয় আমরা পাই তা মূলত আফ্রিকারই ঐতিহ্যলালিত। তাই লোককথার যে বিপুল ভাণ্ডার সংগৃহীত হয়েছে এই দ্বীপপুঞ্জ থেকে তা কোনভাবেই আদি বাসিন্দদের নয়। কিন্তু অল্প কয়েকটি লোককথা উনিশ শতকের গোড়ায় একজন ব্রিটিশ যাজক সংগ্রহ করেছিলেন বাহামার আদি বাসিন্দাদের কাছ থেকে। সংগৃহীত হয়েছিল মায়াগুয়ানা দ্বীপ থেকে। এই পশুকথাটিও রয়েছে সেই সংগ্রহে।

উপনিবেশবাদীদের কৌশল ও অত্যাচারের কথা বলা হয়েছে এই লোককথায়। প্রথম দিকে বন্ধুর মতো ব্যবহার করে রাঙামুখো বাঁদর বুনো গোরুদের ফাঁদে ফেলে। পরে তারাই হয় ক্রীতদাস। বুনো গোরুদের সারল্য, অপরিচিতকে দেখে হতচকিত ভাব, তৃষ্ণার্তদের প্রতি আন্তরিক সহানুভূতি প্রভৃতির মাধ্যমে সাধারণ মানুষের কথা বলা হয়েছে। অন্যদিকে বিরাট বাড়ির মালিক বানর খামার-মালিকের প্রতিভূ। মদের লোভ দেখিয়ে গোরুদের বশ করেছে। এই আচরণও প্রভুদের চিরাচরিত পদ্ধতি। পরাধীনতার প্রতি আদিবাসীদের ঘৃণাও প্রকাশিত হয়েছে।

সোনালি মেয়ে সোনালি ফসল। আমেরিকার আবানাকি রেড ইন্ডিয়ান আদিবাসী লোকপুরাণ। ইরোকুইস সেনেকা ছোরোকি উটে পনি রেড ইন্ডিয়ানদের মধ্যেও এটি

প্রচলিত রয়েছে। নারীদেহ ও কৃষির সঙ্গে যে আদিম উর্বরতার ধারণা ছিল এই লোকপুরাণে তার স্মৃতি রয়ে গিয়েছে।

মানুষের সভ্যতার আদিতে তিনটি কামনা খুব সক্রিয় ছিল। আমাদের জমিতে প্রচুর ফসল হোক, গৃহপালিত পশুর অনেক বাচ্চা হোক, আমাদের বউদের অনেক সন্তান হোক। আর্থাৎ যেসব উর্বরতা গোষ্ঠীসমাজকে নিশ্চিন্ত করতে পারে তারই কামনা। সেকালের মানুষ জমিতে ফসল, নারী ও স্ত্রীপশুর সন্তান হওয়ার বিজ্ঞানভিত্তিক কোন কারণ জানত না। তারা এর পেছনে অলৌকিক ক্ষমতার কথা চিন্তা করত। জমি ও নারীদেহ তাদের কাছে পরম বিস্ময়। তারা আরও ভাবত, মানুষের সমাজে নারীর সন্তান-ধারণের বিশেষ ক্ষমতা জমিতে সঞ্চারিত হলেই জমি ভরে উঠবে সোনালি ফসলে। নারীর নগ্নদেহের সঙ্গে উর্বরতার সম্পর্কের ধারণাও জন্মে এই কালে। তাই দুনিয়াজোড়া এই ভাবনায় গড়ে উঠেছিল নগ্ন নারীদেহকেন্দ্রিক অসংখ্য লোকাচার। বিশেষ করে ঋতুমতী নারীর ফসলের জমিতে নগ্ননৃত্যের মাধ্যমে বৃষ্টি ও জমির উর্বরতার অনেক লোকাচার গড়ে উঠেছিল পৃথিবীব্যাপী আদিম জনগোষ্ঠীর মধ্যে।

এই লোকপুরাণটি খাদ্য সংগ্রাহক জনগোষ্ঠীর। কিন্তু সংগৃহীত হয়েছে কৃষিজীবী সমাজ থেকে। পুরনো কালের ধারণা এরা স্মৃতিতে বহন করে এসেছে বলেই আজও তা ভুলতে পারেনি। আর একটি কথা খুব স্পষ্টভাবে জানা দরকার,—নারীদেহের এই নগ্ন ভাবনার মধ্যে কোন বিকৃতি নেই, রয়েছে পবিত্র কামনার সহজ সরল ধারণা।

হৃদয় রেখে এসেছি। পূর্ব আস্ট্রেলিয়ার উত্তরে মালয় দ্বীপপুঞ্জের অন্তর্গত ইন্দোনেশীয় ইরিযান এলাকায় পাপুয়া নিউগিনি। কোরাল সাগরের দ্বীপ এই নিউগিনি। সেখানকার ছিম্‌বু আদিবাসীদের পশুকথা। নিউগিনির আদিবাসীদের আজও খুব শোচনীয় ও বিপর্যয়কর পরিস্থিতিতে বাস করতে হয়। মূলত অস্ট্রেলীয় প্রভাব খুব বেশি। আদিবাসীদের কোন ভূমিকাই নেই সে দেশে। এমন করুণ অবস্থা খুব কম আদিবাসীরাই মেনে নিয়েছেন।

পশুকথাটি ট্যাটনের পর্যায়ভুক্ত। বানর হল সেই ট্যাটন, অসাধারণ বুদ্ধি তার। ট্যাটনদের স্বভাব হল, হাজারো প্রতিকূলতার মধ্যেও তারা অবিচল থাকে, কোনভাবেই ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে যায়না। অক্টোপাসের কাছে নিজের বিপদের কথা শুনছে বানর, কিন্তু বাঁচতে হবে, মনের কথা যেন কেউ বুঝতে না পারে, ভয় পেয়েছে এটা যেন কেউ না জানে। সে এমন ভাব করল যেন তার তাজা হৃদয় জ্যান্ত অবস্থায় কেটে নেওয়ার সংবাদেও সে বিচলিত নয়, যেন এটা খুব মজার ব্যাপার। তার স্বাভবিক আচরণে রাজা বলতে বাধ্য হল, বানর যে এত মহৎ ও তার মেয়েকে এত ভালোবাসে এটা রাজার জানা ছিল না। বানর বুদ্ধি করে বেঁচে গেল।

এই পশুকথায় আরও দুটি 'কেন'র উত্তর রয়েছে। পশুপাখির দেহ 'কেন' এমন হল তার অসংখ্য দৃষ্টান্ত রয়েছে অসংখ্য পশুকথায়। অক্টোপাসের দেহ এমন কেন হল, হাড় নেই শুধু মাংস ঘুরে বেড়াচ্ছে জলে, শঙ্কর মাছের চ্যাপ্টা দেহ, হাড় বেরিয়ে লেজের বাইরে লেগে থাকল, সেই লেজ লম্বা হয়ে গেল ও দেহের তুলনায় বড় হল, মুখ গেল দেহের নীচে,— এসব প্রাকৃতিক অবস্থার কারণ অনুসন্ধান করেছে লোকসমাজ। পশুকথাটির মধ্যে বেশ কৌতুক রয়েছে।

হায়রে কুকুর হায়রে ব্যাঙ। পূর্বতন সোভিয়েত ইউনিয়নের উরালের পূর্বদিকে সাইবেরিয়া। সেখানকার নানাই আদিবাসী পশুকথা। সাইবেরিয়ার প্রাকৃতিক প্রতিকূলতা ভুবনবিখ্যাত। রাশিয়ার জার 'দেশদ্রোহীদের' নির্বাসন দিত সাইবেরিয়ায়, নির্বাসিত খুব কম মানুষই শাস্তি শেষে ফিরে আসতে পারত। সেখানে আদিবাসীরাও প্রাকৃতিক কারণেই অসাধারণ সাহসী, দুর্বিনীত ও দুর্ধর্ষ। কিন্তু কিসব অসাধারণ পশুকথা রূপকথা ও লোকসংগীতের সৃষ্টি করেছেন যা পড়লে ও শুনলে অবাক হতে হয়।

এই পশুকথায় একটি 'কেন'র উত্তর খুঁজছে নানাই আদিবাসী। চাঁদের কলঙ্ক কিংবা স্বচ্ছ চাঁদে যে প্রতিকৃতি দেখা দেয়, নানাই আদিবাসী তাকে দেখেছে কুকুর ও ব্যাঙ হিসেবে। পৃথিবীর নানা প্রান্তে চাঁদের বুকে কালো চিহ্নকে নানাভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে। চড়কা-কাটা বুড়ি থেকে অনেক চিত্রের ভাবনা এসেছে আদিবাসীদের মনে এবং তারই প্রকাশ ঘটেছে পশুকথা ও রূপকথায়।

বেচারা কুকুরকে দিনরাত হাড়ভাঙা খাটুনি খাটতে হত। এই উক্তির মধ্যে সাধারণ মানুষের যন্ত্রণা প্রকাশ পেয়েছে। আর সবুজ ব্যাঙের কষ্ট কুকুরের চেয়েও বেশি। ব্যাঙ ঘুমোতে যেত পেটে খিদে নিয়ে। তাই পূর্ণিমার চাঁদকে ব্যাঙ মিনতি জানিয়েছে, আমাদের দিকে একটু চাও, আমাদের দয়া করো। হয়তো বাস্তবে কুকুর ও ব্যাঙ যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পায়নি, কিন্তু পশুকথার মাধ্যমে ইচ্ছাপূরণের তাগিদে চাঁদের কাছে মুক্তি পেয়েছে। লোমশ কুকুর আর সবুজ ব্যাঙ চাঁদের বুকে আশ্রয় পেয়েছে। এই পৃথিবীতে তারা খেলতে পারেনি, হাসতে পারেনি। চাঁদের বুকে কুকুর ও ব্যাঙ মুক্তির আনন্দ পেয়েছে, সত্যিকার স্বাধীনতা উপভোগ করতে পেরেছে। পশুকথার মাধ্যমে হাটবাটের মানুষ সত্যিকার আনন্দ উপভোগ করতে চেয়েছে।

শিকারি হাইলিবু। মোঙ্গোলিয়ার বুরিয়াত আদিবাসীদের রূপকথা। এই দেশের খাল্‌কা দোরবেড দারিগাংগা ও কাজাঘ্ আদিবাসীদের মধ্যেও এই রূপকথাটি শোনা যাবে। মেঙ্গোলিয়া যাযাবর আদিবাসীদের মাতৃভূমি, ত্রয়োদশ শতকে চেংগিস খানের অধীনে বিশাল মোঙ্গাল সাম্রাজ্যের অধীন হয় এবং বৃহত্তর চিন সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। ভৌগোলিক ব্যবস্থার কারণে এখনও সবচেয়ে বেশি মোঙ্গোলীয় আদিবাসী বাস করে গণপ্রজাতন্ত্রী চিনে। আমরা সাধারণভাবে যাদের আদিবাসী বলি, চিন ও মঙ্গোলিয়ায় তাদের বলা হয় জাতীয় সংখ্যালঘু। বুরিয়াত আদিবাসী সবচেয়ে বেশি বসবাস করেন অন্তর্মঙ্গোলীয় স্বশাসিত এলাকায়। এছাড়াও উত্তর-পূর্ব প্রদেশের জিলিং ও হেইলোং এবং উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের কুইনখাই ও জিনজিয়াং এলাকাতেও এরা বাস করেন। সুপ্রাচীন কাল থেকে এই জনগোষ্ঠীর মহান লৌকিক সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও সংগ্রামী ইতিহাস রয়েছে। এমন উন্নত লোকসংগীত এদের রয়েছে যাতে সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞানীরা এই এলাকাকে বলেছেন 'সংগীতের মহাসমুদ্র'। বুরিয়াত আদিবাসীরা সৎ কর্মঠ বলিষ্ঠ স্বাধীনতা-প্রিয় সরল উদার ও প্রাণোচ্ছল।

এই রূপকথায় একজন মহৎ মানুষের পরিচয় রয়েছে। মানুষের সমাজে যুগে যুগে এমন সব মহৎ মানুষ জন্মান যারা বৃহত্তর সমাজের স্বার্থে নিজের ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখ-বেদনা-কষ্ট ভুলে যান, এমন কি জীবন পর্যন্ত উৎসর্গ করেন। এরা চেয়ে থাকেন ভবিষ্যতের উজ্জ্বল দিনগুলির দিকে, বর্তমানের ক্ষুদ্র চাওয়া-পাওয়াকে বিসর্জন দেন হাসিমুখে। এমনই এক ব্যতিক্রমী চরিত্র হাইলিবু।

অজেয় দুই ভাই। উত্তর প্রশান্ত মহাসাগরের মধ্যে কোস্ট রেঞ্জের কোল জুড়ে রয়েছে কুইন শার্লোট দ্বীপপুঞ্জ। উত্তরে এস্কিমোদের বাসস্থান আলাস্কা ও ভ্যানকুভার দ্বীপ। এই কুইন শার্লোট দ্বীপপুঞ্জের বেল্‌লা কুলা রেড ইন্ডিযান আদিবাসীদেব রূপকথা 'অজেয় দুই ভাই'। মানুষের অজেয় মানসিকতা কীভাবে সকল প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে সংগ্রামে অনুপ্রাণিত করে তারই অনন্য কথা রয়েছে এই রূপকথায়, সবকিছুই অবশ্য বলা হযেছে রূপকের আড়ালে। লোকসমাজ তার মানসিক অভিপ্রায়কে রূপকের আড়ালে বলতেই অভ্যস্ত।

লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতিতে সাহসী দুই ভাইয়ের অনেক লোককথা রয়েছে। এই দুই ভাই শেষ পর্যন্ত সমস্ত প্রতিকূলতাকে পরাভূত করে বিজয়ী হযে ফিরে আসে। অনেক সময় এই দুই ভাই হয় যমজ। এই রূপকথাযও আদি দেবতাও আদি দেবীর দুই সন্তান যমজ।

প্রকৃতিক দুটি বস্তু সূর্য ও চন্দ্রের কীভাবে উদ্ভব ঘটল সেই 'কেন'ব উত্তরও রযেছে এই রূপকথায়। অজেয যমজ দুই ভাই জিবাল্‌বার অন্ধকার থেকে তাদের বাবা ও কাকার আত্মা নিয়ে এসে আকাশে রেখে দিল,—বাবা ও কাকার আত্মা হল সূর্য ও চন্দ্র। মানুষের জীবনে কখনও জয়, কখনও বিপদ, কখনও আঁধার, কখনও আলো—এই পরম সত্যের দর্শনও প্রকাশিত হযেছে এই রূপকথায়।

বুড়ি ও রবিন পাখি। নিউ মেক্সিকোর তাওস পুযেবলো ইন্ডিয়ান আদিবাসীদের রূপকথা। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ পশ্চিমের একটি রাষ্ট্র নিউ মেক্সিকো। পুযেবলো ইন্ডিযানরা একসময এই এলাকায ছিল বিপুল পরিমাণে, কিন্তু আজ সেখানে তারা সংখ্যায অনেক কম। যেসব পুযেবলো ইন্ডিয়ান রয়েছে তাদের মধ্যে এখনও এই রূপকথাটি খুবই জনপ্রিয।

তাওস পুযেবলো ইন্ডিয়ান আদিবাসীরা অত্যন্ত কল্পনাপ্রবণ আদিবাসী। গোটা লাতিন আমেরিকা ও আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের রেড ইন্ডিযানদের মধ্যে রবিন পাখি ও আগুনের বিচিত্র অসংখ্য রূপকথা রযেছে। কিন্তু এই তাওস রূপকথাটির আবেদন সব রবিন পাখির রূপকথার মাধুর্যকে ছাড়িয়ে গিযেছে। এই রূপকথায আত্মত্যাগ ও কষ্টস্বীকারের বিবরণটি অনেক বেশি বলিষ্ঠ অথচ মর্মস্পর্শী। এই রূপকথায রবিন পাখিকে অনেক বেশি বাধা অতিক্রম করতে হয়েছে, অনেক বেশি কষ্ট স্বীকার করতে হযেছে। ছোট্ট রবিন পাখি মানুষের মধ্যে আগুন এনে দিল কিন্তু মৃত্যুকে ববণ করতে হল। এই এলাকার অন্য রূপকথায় রবিনকে কষ্ট স্বীকার করতে হযেছে কিন্তু মৃত্যুকে বরণ করতে হয়নি। এই কাহিনিতে মানুষের অকৃতজ্ঞতার কথাও রযেছে,—যে প্রাণী তাদের এমন অমূল্য জীবনদাযী সম্পদ এনে দিল, বস্তুটি পাওযার পরেই তারা ভুলে গেল সেই অসমসাহসী রবিন পাখিকে। এই অকৃতজ্ঞতাই সমাজে চরম বাস্তব।

বাজ ও সূর্যের আগুন। উত্তর অতলান্তিকের আর্কটিক সাগরের মধ্যে গ্রিনল্যান্ড। সুদূর উত্তরে গ্রিনল্যান্ডের সীমান্ত অঞ্চলে অনেক পশুপালক আদিবাসী জনগোষ্ঠী বাস করেন। কৃষিজীবী জনগোষ্ঠীর লোককথা যতটা উন্নতমানের হয়, পশুপালক গোষ্ঠীর লোককথার ঐতিহ্য সাধারণত সেরকম উন্নত নয়। কেননা কৃষিজীবী লোকসমাজ অনেক নিশ্চিন্তে, স্থিত ও সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারকে বয়ে চলা তাদের পক্ষে অনেক সহজ।

যাযাবর বৃত্তির জন্য পশুপালক গোষ্ঠীর ফসলের জমির সঙ্গে প্রাণের টান কম। কিন্তু গ্রিনল্যান্ডের পশুপালক আদিবাসী গোষ্ঠীর এই লোককথাটি অনবদ্য কেননা কৃষিজীবী মানুষের মানসিকতার সঙ্গে এই লোককথার সম্পর্ক বড় গভীর।

রবিন পাখির পশুকথার সঙ্গে এই কাহিনির মিল রয়েছে। এখানে আত্মত্যাগ করেছে বাজপাখি। বরফ পড়ে দেশে বিপর্যয় ঘটেছে। খাদ্য নেই, আগুন নেই। মৃত্যু অবধারিত। মানুষ ও পশুপাখিকে বাঁচাবার জন্য বাজ দুর্জয় সাহসে সূর্যের দিকে চলেছে। সূর্যের তাপে ঝল্‌সে গেল তার সবুজ দুটি চোখ, পুড়ে গেল তার ডানা-বুক-পালক। তবু অজেয় বাজ আগুন বয়ে এনে পৃথিবীর মানুষকে বাঁচিয়ে তুলল। বাজের আত্ম-বিসর্জনের মধ্যে যে মহত্ত্ব রয়েছে মানুষ নিজস্ব চিন্তায় তাকে সহজ ভঙ্গিতে প্রকাশ করেছে। নিজের মনের উদার ভাবনা বাজের চরিত্রে আরোপ করে উত্তরপুরুষকে স্বার্থ-বিসর্জনে উদ্বুদ্ধ করেছে।

গল্প এল কোথা থেকে

ইঁদুর সব জায়গায় ঘুরে বেড়ায়। সর্দারের শক্ত বাড়ির আনাচে-কানাচে থেকে গরিব মানুষের রান্নাঘর, সব জায়গায় ইঁদুর ঘুবে বেড়ায়। রাতের অন্ধকার, চারিদিকে নিঝুম, শুধু দূরে শেয়ালের ডাক আর বাতাসের শন্‌শন্‌ আওয়াজ। কেউ জেগে নেই। শুধু গোলগোল জ্বলজ্বলে চোখ নিয়ে ইঁদুর ঘুরে বেড়ায়। এমন কোন গোপন জায়গা নেই যেখানে ইঁদুর যায় না, এমন কোন দুর্গম দুর্ভেদ্য জায়গা নেই যেখানে তার নরম ছোট্ট শরীর নিয়ে ঘোরাফেরা করতে পারে না। সব গোপন খবর সে শোনে। অনেক লুকোনো জিনিস সে দেখে।

এ তো সেই অনেক কাল আগের কথা। সেই পুরনো কালে ইঁদুর একটা গল্পের সন্তান তৈরি করল। বরং বলা ভালো, গল্পের সন্তান বুনল, যেমন করে তাঁতে পরনের কাপড় বোনা হয়। সে তো অনেক কিছু দেখেছে। তাই গল্পের সন্তান বুনে তুলতে তার বেশি কষ্ট হল না। এইসব দেখা-শোনা-জানা গল্পকে সে এক এক রকম পোশাক পরিয়ে দিল । তাদের পোশাকের বিচিত্র সব রং। কোনটার লাল, কোনটার নীল, আবার কোনটার কালো। এই গল্পগুলোই হল ইঁদুরের ছেলেমেয়ে। সবসময় তারা অন্ধকার ঘরেই থাকত, ইঁদুরের সব কাজকর্ম করত। ইঁদুরের নিজের তো কোন ছেলেপিলে ছিল না, তাই এই গল্প ছেলেমেয়েরাই তার নিজের হয়ে উঠল।

সেই পুরনো কালে দূরের এক গাঁয়ে থাকত এক ভেড়া আর এক চিতা। অনেক দিন পরে ভেড়ার হল একটা মেয়ে আর চিতার হল একটা ছেলে।

এমন সময় সেই এলাকায় দেখা দিল প্রচণ্ড খরা। এক ফোঁটা বৃষ্টি নেই, জমিজিরেত পুড়ে খাক হয়ে গেল। দেখা দিল ভীষণ দুর্ভিক্ষ। কোথাও খাবার মতো কিছুই নেই।

একদিন চিতা ভেড়ার কাছে গিয়ে বলল, 'বন্ধু, আর তো পারা যায় না! এসো, আমাদের ছেলেমেয়ে দুটোকে মেরে ফেলি, আমাদের খিদে মেটাই।'

ভেড়া মনে মনে ভাবল, 'এখন যদি চিতার কথায় সায় না দি, তাহলে হয়তো জোর করেই সে আমার মেয়েকে মেরে ফেলবে। আমিও কি বাদ যাব?'

একটু ভেবে ভেড়া বলল, 'বেশ তাই হবে।'

চিতা চলে যেতেই ভেড়া তাড়াতাড়ি তার বাড়িতে ঢুকল। খুব নির্জন গোপন জায়গায় তার মেয়েকে লুকিয়ে রাখল। তারপরে, তার ঘরে যা কিছু জিনিসপত্র ছিল, সব কিছু নিয়ে এক প্রতিবেশীর কাছে বিক্রি করে দিল। এসবের বিনিময়ে প্রতিবেশী তাকে কিছুটা শুকনো মাংস দিল। সেই শুকনো মাংস খুব ভালোভাবে রান্না করল। শেষকালে গেল চিতার গুহায়। দুজনে এক সঙ্গে খাওয়া-দাওয়া করল। এধারে চিতা তো তার ছেলেকে মেরে তার মাংস রান্না করেই রেখেছিল। তারা সব খেল।

এক বছর পরে আবার ভেড়া আর চিতার একটা করে বাচ্চা হল। এবারেও

তেমনি খরা, তেমনি দুর্ভিক্ষ। সবাই খিদের জ্বালায় ছট্‌ফট্‌ করছে। কোন পথ নেই বাঁচবার।

একদিন চিতা এল ভেড়ার কাছে। বলল, 'বন্ধু, আর তো পারি না। এবারেও ছেলেগুলোকে মেরে খিদে মেটাই।' ভেড়া ভয়ে রাজি হল।

কিন্তু এবারও সে আগের বারের মতো পরের বাচ্চাটাকেও নির্জন গোপন জায়গায় লুকিয়ে রাখল। দুই বাচ্চা একসঙ্গে রইল। বাচ্চাকে তো বাঁচাল, কিন্তু এখন করে কি? ঘরে যে বিক্রি করার মতো আর কিছুই বাকি নেই। ভেড়া ভিক্ষে করতে বেরুল। ঘুরছে ঘুরছে,—কিন্তু কে দেবে ভিক্ষে। মাথার ওপরে প্রখর তাপ, মাটি আগুন ছড়াচ্ছে, কাছে দূরে রোদ্দুর জ্বলছে। তবু ভেড়া বিশ্রাম নিচ্ছে না। শেষকালে একজন তাকে কিছু শুকনো মাংস ভিক্ষে দিল। দৌড়ে এসে রান্না করল সেই মাংস। আগের বারের মতো চলল চিতার গুহায়। দেহ আর চলে না, তবু যেতেই হবে।

এমনি করে সুখে-দুঃখে কয়েক বছর কেটে গেল। একদিন চিতা এল ভেড়ার কাছে। তাকে দেখেই ভেড়ার মুখ শুকিয়ে গেল, পা-চারটে কাঁপতে লাগল। চিতা হাসিমুখে বলল, 'বন্ধু, আমার গুহায় আজ তোমার নেমন্তন্ন। সাঁঝের বেলায় আসবে কিন্তু।'

ভেড়া গুহায় গেল। দেখল, কাঠের টেবিলের ওপরে বিরাট শুকনো লাউয়ের এক পাত্র। ঢাকনা খুলতেই চোখে পড়ল, পাত্র-ভরা সুগন্ধি খাবার। আর পাশে রয়েছে তিনটে চামচ।

ধারালো দাঁত বের করে হাসতে হাসতে চিতা ভেতরের কপাট খুলে ফেলল। ডাকল, 'ছোট্ট মেয়ে আমার, বেরিয়ে এসো। এসো, একসঙ্গে খাই।'

চিতার মেয়ে বেরিয়ে এল। সবাই একসঙ্গে খেতে বসল। খেতে খেতে মা চিতা বলল, 'সেবার তো ভীষণ দুর্ভিক্ষ। খিদের জ্বালায় আমার প্রথম বাচ্চাটাকে মেরে ফেললাম। কতই না কষ্ট! কতই না কষ্ট! কিন্তু একদিন জানতে পারলাম, তুমি তোমার মেয়েকে মেরে ফেলনি, বাঁচিয়ে রেখেছ, লুকিয়ে রেখেছ। আমিও ভাবলাম, পরের বারে আমিও চালাকি করব। তাই, আমার এই মেয়েকে বাঁচাতে পারলাম! আর ভুল করি নি।' চিতা হাসতে লাগল।

এমনি করে দিন যায়। সুখেই কাটে দিন। ভেড়ার মেয়েদুটো বেশ বড় হয়ে উঠেছে। বেশ মোটাসোটা তারা।

একদিন চিতা এল ভেড়ার কাছে। চিতা বলল, 'আমার মেয়ে বড় একা একা থাকে, তোমার একটা মেয়েকে পাঠিয়ে দাও আমার গুহায়। দুজনে মিলেমিশে আমোদে থাকবে।'

ভেড়া রাজি হল। রাজি না হয়ে উপায় কি? চিতা যে সাংঘাতিক হিংস্র!

এখন হয়েছে কি, ভেড়ার দুটো মেয়েই ছিল মিশ্‌মিশে কালো, মায়ের মতোই তাদের গায়ের রঙ। ঘরের কাজকর্ম দেখাশোনার জন্য ভেড়ার কয়েকটা ছাগল ছিল। তারা ছিল ভেড়ার ক্রীতদাস। এই ছাগলগুলো ছিল ভেড়ার অনুগত। এই ছাগলগুলো ছিল একবারে ধব্‌ধবে সাদা। মেয়েকে চিতার গুহায় পাঠাবার আগে ভেড়া নিজের মেয়ের সারা গায়ে ভালো করে সাদা রং করে দিল। দেহের কোথাও এতটুকু কালো আর রইল না। আর

ক্রীতদাস এক ছাগলকে কালো রঙ করে দিল। তার সারা দেহে আর কোথাও সাদা রং রইল না। তারপরে তাদের দুজনকে একসঙ্গো চিতার গুহায় পাঠিয়ে দিল।

চিতার গুহায় পৌঁছবার পরে চিতা ভাবল, কালো মেয়েটাই নিশ্চয়ই ভেড়ার মেয়ে। তিনজনে খেলাধূলা করতে লাগল। রাত হল। অন্ধকারে চুপিচুপি এল চিতা। থাবার এক আঘাতেই হত্যা করল ছাগলকে। সেই মাংস রান্না করে নিজের মেয়েকে খেতে দিল। চিতা ভাবল,—'খুব হয়েছে, ভেড়ার মেয়েকে কেমন করে মেরে ফেললাম। আমার সঙ্গো চালাকি।'

পরের দিন চিতা আবার গেল ভেড়ার বাড়ি। হাসি হাসি মুখে বলল, 'তোমার অন্য মেয়েটাকেও আমার সঙ্গো যেতে দাও। তাহলে আমাদের তিন মেয়েই বেশ আনন্দে থাকবে, খেলাধুলো করবে।'

ভেড়া রাজি হল। কিন্তু যাবার আগে সে মেয়েকে শিখিয়ে দিল গুহায় গিয়ে তাকে কি কি করতে হবে। খুব সাবধানে সব বলল।

ভেড়ার সেই মেয়ে চিতার গুহায় পৌঁছল। তিনজনকে একসঙ্গো দেখে চিতা বাইরে কোথায় চলে গেল। চিতা চলে যাওয়ার পরে ভেড়ার দ্বিতীয় মেয়ে চিতার মেয়েকে সরবতের মতো মিষ্টি পানীয় খেতে দিল। বলল, ' আমার মা তোমাকে এই উপহার পাঠিয়েছে।' সরবত ছিল খুব মিষ্টি, খেতে অপূর্ব। ঢকঢক্ করে চিতার মেয়ে তা খেয়ে নিল। আসলে সেটা ছিল গাছের রস থেকে তৈরি একরকমের মিষ্টি পানীয়। এটা খেলে ভীষণ ঘুম পায়, চোখ ভারী হয়ে বন্ধ হয়ে আসে। কথা বলতে বলতেই চিতার মেয়ে ঘুমিয়ে কাদা হয়ে গেল। ভেড়ার মেয়েদুটো জেগে রইল।

তারপর, যখন চিতার মেয়ে ঘুমে একেবারে কাতর তখন দুজনে তাকে ধরে তাদের জন্য তৈরি বিছানায় শুইয়ে দিল। আর চিতার জন্য যে বিছানা তাতে ঘাপটি মেরে পড়ে রইল।

রাতের অন্ধকার। গুহার ভেতর আরও অন্ধকার। চোখে কিছুই ঠাহর করা যায় না। চিতা চুপিসারে গুহায় ঢুকল। ভুল করে সে তার মেয়েকে এক আঘাতে মেরে ফেলল। সে তো আর জানে না, ভেড়ার মেয়ের বিছানায় শুয়ে রয়েছে তারই মেয়ে। মনে মনে ভাবল, 'ভেড়া চালাকি করে তার মেয়ে দুটোকে বাঁচিয়েছিল, এবার দুটোকেই শেষ করতে পারলাম। আহ্ কি আনন্দ।'

পরের দিন কাকভোরে চিতা বনে গেল। কাঠকুটো নিয়ে আসতে। ভেড়ার মেয়ের মাংস বেশ জুত করে রান্না করতে হবে। যেই না চিতা বনের পথে এগিয়ে গেল, অমনি ভেড়ার দুই মেয়ে দৌড় দিল বনের অন্য পথে। একজন চলে গেল তার মায়ের বাড়ি, আর আরেকজন একটু ঘুরপথে চিতার পেছন পেছন গেল। চিতা তখন কাঠকুটো কুড়োচ্ছে, দূর থেকে চিতাকে শুনিয়ে শুনিয়ে ভেড়ার মেয়ে চিৎকার করে বলল, 'কেমন চিতা, বেশ হয়েছে। কাল রাতে তুমি আমাকে মারতে চেয়েছিলে। তার বদলে মেরেছ নিজের মেয়েকে। তারও আগে মারতে চেয়েছিলে আমার বোনকে, মেরেছ আমাদের ছাগলকে। কেমন মজা!'

যেই না এ কথা শোনা চিতা লাফ মেরে ভেড়ার মেয়ের পিছু ধাওয়া করল। ভেড়ার মেয়েও তৈরি ছিল, সেও দিল দৌড়। বনের এক জায়গায় এসে ভেড়ার মেয়ে দেখল

অনেকগুলো সরু মেঠো পথ এদিক ওদিক চলে গিয়েছে। কয়েকবার ঘুরপাক খেয়ে একটা পথ বেয়ে ভেড়ার মেয়ে তিরিং বিরিং করে লাফিয়ে লাফিয়ে দূরে চলে গেল। সেখানে এসে চিতা ভাবল, কোনদিকে যাব। তারপরে ভুল পথে উলটো দিকে দৌড় দিল চিতা। ভাবল, ঠিক পথেই চলেছি।

অনেক দূর গিয়ে পথে ভেড়ার সঙ্গে দেখা হল এক বুড়ির। বুড়ির কোমরে ঝুলছে জুজু দেবতার মূর্তি। বুড়ি খুব ক্লান্ত, বহু দূর থেকে সে হেঁটে হেঁটে আসছে। দেহ সামনের দিকে ঝুঁকিয়ে বুড়ি হাঁটছে।

ভেড়ার মেয়ে মিষ্টি গলায় বলল, 'বুড়ি মা, তোমার খুব কষ্ট হচ্ছে। দাও, জুজুকে আমি বয়ে নিয়ে যাচ্ছি।'

বুড়ি তক্ষুনি রাজি। শেষকালে তারা বুড়ির বাড়ি এল। বুড়ি এসেই উঠোনে বসে পড়ল। সে হাঁপাচ্ছে।

ভেড়ার মেয়ে বলল, 'বুড়ি মা, তুমি বরং জিরিয়ে নাও, ততক্ষণে আমি ডোবা থেকে জল আর বাগান থেকে আগুন ধরাবার কাঠকুটো নিয়ে আসি।'

বুড়ি তো খুব খুশি। মাথা নেড়ে সায় দিয়ে বুড়ি ঘরে ঢুকে বিছানায় শুয়ে পড়ল।

পরের দিন অনেক বেলায় ঘুম ভাঙল বুড়ির। সারা গায়ে তখন তার ব্যথা। ভেড়ার মেয়েকে বলল, 'বাছা, থানের ওপরে যে গাছ-গাছড়ার ওষুধ আছে, আমাকে একটু এনে দেবে?'

ভেড়ার মেয়ে বলল, 'হায় কপাল, তুমি কি ভুলেই গেলে? ওই ওষুধ থেকেই তো কাল রাতে আমার জন্ম হল। আর ওষুধ থাকবে কি করে?'

বুড়ি গেল বেজায় রেগে। মুখ ঝামটা দিয়ে সে লাফিয়ে উঠল। তাড়া করল ভেড়ার মেয়েকে। বেগতিক দেখে ভেড়ার মেয়েও দৌড় দিল। এলো-মেলো ছুটে চলেছে ভেড়ার মেয়ে। তার ওপরে সে পথ চেনে না। ছুটতে ছুটতে একটা গাছের গুঁড়িতে এসে সে ধাক্কা খেল। ধাক্কা লেগে গাছের বাকল খসে গেল। আসলে সেটা ছিল সেই ইঁদুরের বাড়ি। বাকলটা ছিল দরজার মতো আঁটা। অনেক পুরনো হয়েছে দরজা। ভেড়ার মেয়ের ধাক্কা সে সহ্য করবে কেমন করে? আলো এসে ঢুকল সেই গাছের ফোকরে। গল্পের ছেলেমেয়ে বেরিয়ে এল। ছড়িয়ে পড়ল চারিদিকে।

বাইরে সূর্যের অপরূপ আলো, বনভূমির সবুজ বিস্তার, মাঠের সবুজ ঘাস, গাছের পাতার শন্‌শন্‌। গল্পের ছেলেমেয়ে আলোয় এল, তারা আর কখনও ইঁদুরের গাছের ফোকরে ফিরে গেল না।

সেদিন থেকে সব গল্প, সব ইতিহাস দিক থেকে দিগন্তে ছড়িয়ে পড়ল। যা ছিল ইঁদুরের একান্ত, তা সবার মাঝে ছড়িয়ে গেল। সেইসব গল্প আর ইতিহাস সেদিন থেকে দুনিয়ার এক দিক থেকে অন্যদিকে মুখে মুখে সবার জানা হয়ে গেল।

কচ্ছপের পিঠে ফাটা ফাটা দাগ কেন

মিষ্টি জলের এক মস্ত বিলে থাকত এক কচ্ছপ আর তার বউ। তাদের এক বন্ধু ছিল। সে শকুন। সময় পেলেই শকুন সেই বিলের ধারে উড়ে আসত দূর পাহাড় থেকে। শুকনো চরায় তিন বন্ধু মিলেজুলে খোশমেজাজে গল্প গুজব করত। কচ্ছপের তো ডানা নেই, সে উড়তে পারে না। তার ভারি দুঃখ। সে বন্ধুর বাড়িতে বেড়াতে যেতে পারে না। এই এক দুঃখে কচ্ছপ সবসময় মনমরা হয়ে থাকে।

একদিন মনে মনে কচ্ছপ এক ফন্দি আটল। বেশ খুশি খুশি মনে বউকে ডাকল। বউ গলা বাড়িয়ে টুকটুক্ করে তার কাছে এল। .

কচ্ছপ বলল, "আচ্ছা বউ, শকুনের কাছে আমরা কেমন দিনদিন ছোট হয়ে যাচ্ছি, এটা তুমি বুঝতে পারছ?"

বউ গোলগোল চোখে অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, "কেন, ছোট হতে যাব কেন? শকুন তো আমাদের বন্ধু।"

কচ্ছপ নরম গলায় উত্তর দিল, "ছোট হওয়ার কারণ আছে। দেখ, বারবার শকুন আমাদের বাড়িতে আসে। আমি তো একবারও তার ওখানে যেতে পারিনি। সে আমার বন্ধু। তার বাড়িতে না গেলে কি সম্মান থাকে বল! সে-ই শুধু আসবে, আর আমি যেতে পারব না?"

বউ আরও অবাক হল, "সে আবার কি কথা। আমি তো মোটেই বুঝতে পারছি না এতে শকুনের কাছে আমরা ছোট হতে যাব কেন। আমাদের তো ডানা নেই, উড়তে পারি না। শকুন তাই ওসব ভাববে কেন। হ্যাঁ, আমাদের যদি ডানা থাকত আর তখন যদি আমরা বন্ধুর বাড়িতে না যেতাম, তাহলে কথা উঠতে পারে বটে। কিন্তু এখন তো সে কথা ওঠে না। কি যে সব মাথামুণ্ডু চিন্তা কর!"

"বউ, তুমি যা-ই বল না কেন, বড্ড ছোট হয়ে পড়ছি। একটু ভেবে দেখ।"

"এতই যদি ভাবনা হয় তাহলে দুটো ডানা গজিয়ে নাও। আর উড়ে উড়ে বন্ধুর বাড়ি চলে যাও!"

"বউ, তা কেমন করে হবে? আমি ডানা পাব কেমন করে? সে-ভাবে তো আমার জন্ম হয়নি!"

"বেশ, তাহলে কি করতে চাও?"

কচ্ছপ মাথা দুলিয়ে বলল, "একটা বুদ্ধি বের করেছি। অনেক ভেবে এক সুন্দর কায়দা মাথায় এসেছে।"

বউ বলল, "তাহলে বলেই ফেল। শুনি তোমার বুদ্ধিটা কি!"

একটু ভেবে নিল কচ্ছপ। এধার ওধার চোখ ঘুরিয়ে সে বলল, "বউ তুমি এক কাজ কর। প্রথমে তুমি আমাকে একটা ঝুড়ির মধ্যে ঢুকিয়ে দাও। তারপরে ঝুড়ির

মুখ তামাক পাতা দিয়ে ভালো করে ঢেকে দাও। তারপরে সবটা ঘাসের দড়ি দিয়ে খুব ভালো করে বেঁধে দাও। সব ঠিকঠাক হয়ে গেল, কেমন ?"

বউ বলল, "তারপর ?"

কচ্ছপ গলাটা আরও লম্বা করে বলল, "শকুন তো বেড়াতে আসবেই। শকুন এলে বোঁচকাটা তাকে দেবে। বলবে, বন্ধু, এর মধ্যে অনেক তামাক পাতা আছে, এগুলো বিক্রি করে আমাদের জন্য কিছু শস্যের দানা আনতে হবে। ব্যাস, তাহলেই হবে।"

বউ তখন পাশের বনে গেল। বেশ কিছু শুকনো তালপাতা কুড়িয়ে আনল। ধীরে ধীরে শক্ত মজবুত এক ঝুড়ি তৈরি করল। তার মধ্যে কচ্ছপকে ঢুকিয়ে, তামাক পাতায় চাপা দিয়ে ভালো করে বেঁধেছেঁদে এক পাশে সরিয়ে রাখল।

শকুন যেমন আসে তেমনি এল। বিরাট ডানা মেলে মাটিতে পা ফেলে এধার ওধার কাত্ হয়ে শান্ত হয়ে দাঁড়াল শকুন। ঠোঁটে দু-একবার পালক পরিষ্কার করে হাসিমুখে বলল, "কি ব্যাপার ? বন্ধুকে দেখছি না যে, কোথায় গেল ?"

বউ বলল, "আর বল কেন বন্ধু, তোমার বন্ধুর যে কি কাণ্ড ! সেই-সকালে অনেক দূরে কোথায় চলে গিয়েছে। কয়েকজন লোকের সঙ্গে দেখা করা নাকি খুব জরুরি। আর এধারে দেখ, বাড়িতে একরতি দানা নেই। খিদেতে মরে গেলাম। তোমার বন্ধুর কথা আর বলে কাজ নেই।"

শকুন বলল, "হায় কপাল ! খাবার কিছু নেই। ইস্ ! তুমি তো খিদেয় বড় কষ্ট পাচ্ছ !"

বউ বলল, "এমন বিপদে কেউ পড়ে না বন্ধু ! কেউ ভাবতেই পারবে না, কি ভীষণ কষ্ট চলছে। আচ্ছা বন্ধু, তোমাদের এলাকায় কিছু শস্যদানা কিনতে পাওয়া যায় না ?"

"কেন পাওয়া যাবে না ! প্রচুর আছে। কিনতে চাইলেই কেনা যাবে। কেন বলত ?"

বউ বোঁচকাটা নিয়ে এল। উঃ, বড্ড ভারি। বলল, "তোমার বন্ধু এই বোঁচকাটা রেখে গিয়েছে। এর মধ্যে অনেক তামাক পাতা আছে। বলে গিয়েছে, বন্ধু শকুন এলে এটা দিতে। সে এর বদলে খাবার-দাবার কিনে আনবে। দেখ, কি করতে পার। আর যে পারি না।"

শকুন তো বড় দয়ালু। সে তক্ষুনি রাজি। সময় নষ্ট না করে, কথা না বাড়িয়ে সে শক্ত ঠোঁটের ফাঁকে বোঁচকা ঢুকিয়ে নিয়ে দুবার ডানা ঝাপটে আকাশে উড়ে গেল। চলল তার বাড়ির পথে, পাহাড়ি এলাকার পথে।

শকুন উড়ছে, উড়ছে। বোঁচকাটা বড় ভারি, তার ডানা দুটো কাঁপছে, ডানা ঝাপটাতে কষ্ট হচ্ছে, জোরে জোরে নিঃশ্বাস পড়ছে, বুক ফুলে ফুলে উঠছে। তবু শকুনকে যে যেতেই হবে ! এ যে বন্ধুর জন্য কষ্ট। এ-তো কষ্টই নয়। আহা, বন্ধুর বউ খিদের জ্বালায় কতই না কষ্ট পাচ্ছে ! উড়ে চলেছে শকুন।

পাহাড় এসে পড়েছে। উঁচু পাহাড়ে শকুনের বাড়ি। সে আরও উপরে উঠেছে। এই তো এসে গেল তার বাড়ি।

ডানার কাজ শেষ হয়েছে। ডানা শান্ত করে নেমে চলেছে শকুন। হঠাৎ শকুন হাওয়ায় শুনতে পেল কে যেন বলছে, "শকুন বন্ধু, আমি তোমার বন্ধু কচ্ছপ। শুনতে পাচ্ছো ? আমার বাঁধন খুলে দাও। বলেছিলাম না, তোমার বাড়ি বেড়াতে আসব ! কেমন !"

হাওয়ায় শন্‌শন্‌ শব্দের মধ্যে কথা শুনে শকুন কেমন যেন হয়ে গেল। তার দেহ যেন কেমন করে উঠল। ঠোঁট ফাঁক হতেই বোঁচকা আলগা হয়ে নীচে পড়তে লাগল।

শকুন নিচু হয়ে দেখতে লাগল, বোঁচকা গাছের ডালের মতো আছড়ে পড়ল পাহাড়ের শক্ত পাথুরে ঢালুতে। পিড়িড়ি-পিড়িড়ি। চৌচির হয়ে গেল কচ্ছপের শক্ত খোলা, টুকরো টুকরো হয়ে ছড়িয়ে পড়ল এধারে ওধারে। আর কচ্ছপ মারা গেল।

সেদিন থেকে কচ্ছপ আর শকুনের বন্ধুত্ব চিরকালের জন্য ছুটে গেল। সে বন্ধুত্বে আর জোড়া লাগেনি। শধু কি তাই? সেদিন থেকে কচ্ছপের পিঠের খোলে অমন ফাটাফাটা দাগ হয়ে গেল। আজও সে দাগ মিলিয়ে যায় নি, তাকালেই দেখতে পাবে।

মাকড়সা সব ধার শোধ করল

এক যে ছিল গভীর বন। আর সেই বনে বাস করত এক মাকড়সা। ঘন-পাতার এক বিরাট গাছের নীচে ছিল তার কুঁড়ে। মাকড়সা ছিল ভীষণ দুষ্টু আর তেমনি আল্‌সে। কোন কাজ সে করত না, বসে বসে খেতেই তার ভালো লাগে। কুঁড়েমি যার স্বভাব, তার কি আর খাটতে ইচ্ছে হয়। আর কুঁড়ে হলেই যত বদ বুদ্ধি আনতেই হবে। কেননা, কাজ না করলে খাবার আসবে কোথা থেকে? কিন্তু খিদে তো পাবেই। খেতেও হবে। আর খাবার জোগাড় করতে ফন্দি আঁটতেই হবে। তাই মাকড়সা সবার কাছে ধার চাইত। বনের এমন কোন পশুপাখি ছিল না যারা তাকে ধার দেয়নি। আহা বেচারা মাকড়সা, না হয় ধার নিলই,—বলেছে তো শোধ দিয়ে দেবে।

বনের সব পশুপাখিই মাকড়সাকে ধার দিয়েছিল। কিন্তু ধার শোধের নামগন্ধও নেই। এমনি করে অনেক কাল কেটে গেল।

এখন হয়েছে কি, একদিন মাকড়সা মিঠে রোদে ফুরফুরে হাওয়ায় ঘাসে ঘাসে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। হঠাৎ একসঙ্গে অনেক পশুপাখির সঙ্গে তার দেখা হয়ে গেল। কেমন করে যেন জানাজানি হয়ে গিয়েছিল, মাকড়সা সবার কাছে ধার নিয়েছে, কিন্তু ধার শোধ করছে না। সবাই ঘিরে ধরল তাকে। সবাই একসঙ্গে তাদের পাওনা চাইল। এধারে মাকড়সা ধার শোধ করবে কেমন করে? তার যে কিছুই নেই। খুব ফাঁপরে পড়ল সে। আর বুঝল আজ আর বাঁচার পথ নেই। কিন্তু দুষ্টুবুদ্ধি মাকড়সার মাথায় এক ফন্দি এল।

সে দাঁড়াগুলো নেড়েনেড়ে বলল, "হায় কপাল, আমি ধার শোধ করে দেব বলেই আপনাদের সঙ্গে দেখা করতে এসেছি। আমি কি তেমন লোক যে ধার নিয়ে শোধ দেব না? শুনুন, আপনারা সবাই শুক্রবারে আমার বাড়িতে যাবেন, আমি সবার পাওনা-গন্ডা মিটিয়ে দেব। হ্যাঁ, এই সামনের শুক্রবারে। ভুলবেন না কিন্তু!"

সবাই রাজি হল। মনে মনে লজ্জাও পেল। ছিঃছিঃ মাকড়সা আমাদের ধার শোধ করবার জন্য এত কষ্ট করে আমাদের সঙ্গে দেখা করতে এসেছে, আর আমরা কিনা ভুল বুঝলাম। মানুষকে এত ছোট কখনও ভাবতে হয়! লজ্জা, লজ্জা! শেষকালে শুক্রবার এল। মাকড়সাও তৈরি হয়ে রইল।

সাত সকালে মাকড়সা বাড়ির পাশে এক গাছতলায় বসে রয়েছে। সূর্য সবে উঠেছে। গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে মিষ্টি রোদ্দুর এসে পড়েছে। এমন সময়ে মুরগি এল। মাথা নামিয়ে তাকে অভিবাদন করে মাকড়সা বলল, "এসো, এসো। তোমার জন্যই বসে আছি, তা, তুমি ঘরের মধ্যে বসে একটু বিশ্রাম কর, আমি তোমার জন্য একটু খাবার বানিয়ে আনি। হাজার হলেও তুমি তো আমার অতিথি। যাও, ঘরে বিশ্রাম করো।"

মুরগি খুশিমনে ঘরে ঢুকল। মাকড়সার বুক ধুক্‌পুক্‌ করতে লাগল। এমন সময় জুলজুল চোখে বনবিড়াল এল। তাকে দেখেই মাকড়সার চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। হাসিমুখে বলল, "বন্ধু বনবেড়াল, তোমার দেনা শোধের ব্যবস্থা করে রেখেছি। আমায় তোমরা যাই বল না কেন, কাউকে আমি ফাঁকি দেব না। যাও, ঘরে যাও। তোমার পাওনা রেখে দিয়েছি।"

"আরে ওসব কথা কেন।"—বলতে বলতে বনবেড়াল ঘরে ঢুকল। মুরগি কিছু বুঝবার আগেই বনবেড়াল ঘাড় মটকে দিল। তারপরে একটু ঝট্‌ফট্‌ করেই মুরগি মরে গেল। বনবেড়াল তাকে দাঁতে চেপে চলে যাবে ভাবছে, তাই একটু জিরিয়ে নিচ্ছে। এমন সময় কুকুর এল। তাকে দেখেই মাকড়সা বলে উঠল, "বাঃ বন্ধু, ঠিক সময়েই এসেছ। তোমার পাওনা ঘরেই রেখে দিয়েছি। আমার কি কখনও কথার খেলাপ হয়? যাও, ঘরে যাও।"

ঘরে ঢুকল কুকুর। বনবেড়াল মুরগিকে দাঁতে চেপে বেরুতে যাবে, সামনে পড়ল কুকুর। এক লাফে পড়ল বনবেড়ালের ওপর। পালাবার পথ খোঁজার আগেই বনবেড়াল মারা পড়ল। মুরগিটা দূরে ছিটকে পড়েছে। কুকুর ভাবল, কাল রাতে তো কিছু জোটেনি। এখন মুরগিটাকে খাই, বনবেড়ালকে বাড়ি নিয়ে গিয়ে ছেলে-বউ সবাই মিলে খাওয়া যাবে। কুকুর দাঁত বসাল মুরগির নরম দেহে।

মাকড়সা বেশ ফুর্তিতেই রয়েছে। এমন সময় হায়না এল। মাটি শুঁকতে শুঁকতে ধারালো দাঁত বের করে সে মাকড়সার সামনে দাঁড়াল।

মাকড়সা বলল, "আঃ আপনার কি সময়জ্ঞান! সব ঠিকঠাক আছে, পাওনা তৈরি। সোজা ঘরে চলে যান।"

হায়না ঘরে ঢুকল। পেছন ফিরে কুকুর মাংস চিবোচ্ছে। হঠাৎ হায়নার গায়ের গন্ধে কুকুর লাফিয়ে উঠল। লেজ গুটিয়ে পালাবার আগেই হায়না লাফিয়ে পড়ল তার ওপরে। একটু ধস্তাধস্তির পরেই কুকুরের দেহ নিথর হয়ে গেল।

হায়না ফ্যাক্‌ফ্যাক্‌ করে হেসে উঠল গোটা কুকুর, আস্ত বনবেড়াল, অর্ধেকটা মুরগি। না, মাকড়সাটা লোক ভালো, কথা রেখেছে। হায়না আধখানা মুরগি চিবোতে বসল। সকালবেলা খিদেটা ভালোই পেয়েছে। এখনি কিছুটা না খেলেই নয়।

মাকড়সা চোখ পিটপিট করছে আর এধার ওধার চাইছে। এমন সময় চিতা এল দুলকি চালে। বিরাট দেহ এলিয়ে দিয়ে সে মাকড়সার সামনে বসল।

মাকড়সা খুব বিনয় করে বলল, "আমি আপনার জন্যই বসে রয়েছি। বনের সবাইকে তো আর আপনার মতো ভক্তি করা যায় না! আপনি হলেন বনের প্রভু। তা, আপনারা যে যাই বলুন, আমি কিন্তু খারাপ নই। কাউকে আমি ফাঁকি দেব না। আপনার পাওনা ও ঘরে তৈরি রেখেছি। যান, ঘরে যান।"

জিভ দিয়ে কয়েকবার গোঁফ চেটে, দুবার হাই তুলল চিতা। লেজ নেড়ে সে ঘরে ঢুকছে।

গন্ধ পেয়েই হায়না লাফিয়ে উঠেছে। টেনে দৌড় দিতে যাবে, এমন সময় মুখের ওপরে পড়ল এক প্রচণ্ড থাবা। উলটে পড়ল হায়না। আবার উঠতে যাবে, আর এক থাবায় তার কোমর গেল ভেঙে। যন্ত্রণায় সে চিৎকার করছে। গলার কাছে চেপে বসল

ধারালো দুটো দাঁত। ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটল। হায়নার দেহ কাঁপতে কাঁপতে পাথর হয়ে গেল, চারটে পা ছড়িয়ে পড়ল কাঠির মতো।

চিতাবাঘ ভাবল, নাঃ মাকড়সা তো মন্দ লোক নয়, বেশ ভালো। বিবেচনা আছে। গোটা তরতাজা হায়না, আস্ত কুকুর, বেশ বড়গোছের একটা বনবেড়াল। আর সবই টাটকা। মাকড়সা খুব ভালো। তারিয়ে তারিয়ে শিকারের খাদ্য দেখছে চিতা। কীভাবে তিনটেকে একসঙ্গো নিয়ে যাবে তাই ভাবছে।

এমন সময় কেশর ফুলিয়ে সিংহ এল গাছের নীচে। তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়াল মাকড়সা। দাঁড়া উঠিয়ে মাথা নিচু করে মাকড়সা বলল, "প্রভু, আপনি বনের রাজা। সেই সাতসকাল থেকে আপনার জন্য এখানে অপেক্ষা করছি। এই বুঝি আপনি আসেন, এই বুঝি আসেন। যাক সব তৈরি। আপনার পাওনা আপনি বুঝে নিন। আপনি আমাদের প্রভু, দোষত্রুটি হলে ক্ষমা করবেন। যান প্রভ, ঘরে যান।"

সিংহ ঘরের দিকে পা বাড়াল। আর মাকড়সা তরতর্ করে গাছের উঁচু মগডালে চেপে বসল।

সিংহ ঘরে ঢুকেই দেখে চিতা তিন শিকারকে এক জায়গায় করছে। এতবড় স্পর্ধা! গরগর্ শব্দ বেরিয়ে এল তার গলা থেকে। কেশরগুলো ফুলেফুলে উঠল। পেছন দিকে টানটান্ হয়ে মস্ত লাফ দিল চিতার ঘাড়ে। চিতাও তৈরি। সেও লাফিয়ে পড়ল।

তুমুল লড়াই শুরু হয়ে গেল সিংহ আর চিতার। মাকড়সার বাড়ি কাঁপছে, এই বুঝি ভেঙে পড়ে। দুজনেই হুংকার ছাড়ছে। আছাড়ি-পিছাড়ি লড়াই চলছে। দুজনের দেহেই অসীম শক্তি, দুজনের দাঁতই ধারালো তিরের মতো, দুজনের থাবাতেই ক্ষুরধার নখ। একজন আর একজনকে হারিয়ে দেবে, অত সহজ নয়। লড়াইয়ে বাড়ি কাঁপছে, বন কাঁপছে। মাকড়সাও কাঁপছে, ধরা পড়ে যাবে না তো?

লড়াই এখন তুঙ্গো। মাকড়সা তৈরিই ছিল। আস্তে আস্তে গাছের মগডালে থেকে নেমে এল। পাতায় মোড়া জিনিসটা লুকনো গর্ত থেকে বের করে তার বাড়ির কাছে গেল। তারা দুজনেই তখন এমন লড়াই করছে যে, মাকড়সাকে দেখতেই পেল না। দেয়াল বেয়ে সামান্য ওপরে উঠে মাকড়সা অপেক্ষা করতে লাগল। আস্তে আস্তে পাতার মোড়ক খুলল। তার ভেতরে ছিল শুকনো লংকার গুঁড়ো। যেই সিংহ-চিতা লড়াই করতে করতে মাকড়সার কাছে এসেছে, অমনি সবটুকু লংকার গুঁড়ো ছিটিয়ে দিল তাদের চোখেমুখে। ছিটিয়েই নেমে এল দেয়াল থেকে। লংকার ঝালে তাদের চোখ কট্‌কট্ করে উঠল, তারা আর কিছুই দেখতে পাচ্ছে না। আন্দাজে লড়াই করে চলেছে।

মাকড়সা বাইরে থেকে মস্ত বড় একটা মোটামোটা গাছের ডাল নিয়ে এল। আর তাই দিয়ে পেটাতে লাগল দুজনকে। নিজেদের মধ্যে লাড়াই করে এমনিতেই তারা ক্ষতবিক্ষত, তার ওপরে চোখে জ্বালা, চারিদিক অন্ধকার। এমন সময় শবু হল ডালের আঘাত। মাকড়সা মারছে তো মারছেই, তারও কাণ্ডজ্ঞান নেই। এরা না মরলে তাকে যে মরতে হবে। মারের পর মার, আঘাতের পর আঘাত। শেষকালে সিংহ ও চিতা দুজনেই কাত হয়ে মাটিতে পড়ে গেল।

সব মাংস জড়ো করে মাকড়সা ঘরের এককোণে রেখে দিল। অনেক অনেক দিন চলবে। সমস্ত ধার শোধ করে দিল মাকড়সা। আর কারও কাছে সে ঋণী রইল না।

কেমন করে পৃথিবীর মানুষ আগুন পেল

মোটু মস্ত এক বাগান তৈরি করল। সেই বাগানে নানা জাতের কলাগাছ আবাদ করল। এমনিতেই বাগানের মাটি খুব ভালো। তার ওপরে মোটু মাটিকে খুব আলগা করে তুলল বারবার চাষ করে। প্রচুর আলো সেই বাগানে। দেখতে দেখতে কলাগাছ বেড়ে উঠল, তাতে মোটা মোটা কলা হল। একদিন সে কলা পেকেও গেল।

মোটু খুশি। আজকের রাত পোহালেই সে সব কলার কাঁদি কেটে নামাবে। কত কলাই না হবে। সূর্য ওঠার সঙ্গে সঙ্গে মোটু কাস্তে নিয়ে বাগানে ঢুকল। কিন্তু একি ? বাগানের অনেক কলাগাছ মাটিতে মুখ থুবড়ে পড়ে আছে। গোড়া থেকে গাছ কাটা। আর সেসব গাছে কলা নেই। সব খোয়া গিয়েছে। হায়! হায়!

কিন্তু ভেঙে পড়লে তো চলবে না! চোরকে ধরতেই হবে। চুরি যাওয়ার পরদিন থেকে মোটু আর বাগানে ঢুকল না। এমন ভাব করে থাকল যেন তার বাগানে কোন কিছুই ঘটে নি। এমনি করে দিন যায়।

বাগানের বেড়ার পাশেই ছিল এক ঘন ঝোপ। রোজ রাতে মোটু সেই ঝোপে লুকিয়ে থাকে। চোরকে সে ধরবেই।

মোটুকে বেশিদিন লুকিয়ে থাকতে হল না। একদিন রাতে সে দেখল, আকাশ থেকে মেঘের দলবল নীচে নামছে। সোজা নেমে এল তার বাগানে। তারা বাগানে নেমেই কয়েকটা কলাগাছ কেটে ফেলল। গোরু আর কুমিরের মতো গাব্‌গাব্‌ করে অনেক খেল। যেগুলো খেতে পারল না, সেগুলো একসঙ্গে বেঁধে আবার আকাশ-পানে রওনা দিল। মোটু ঝোপ থেকে দৌড়ে বেরিয়ে এল, তাড়া করল তাদের। তারাও মেঘের গতিতে উড়ে চলল। পেছনে ছিল একজন মেয়ে মেঘ। সে পালাতে পারল না। ধরা পড়ল মোটুর হাতে। একটু নড়াচড়া করল, কিন্তু মোটুর হাত সে ছাড়াতে পারল না।

মোটু তাকে টানতে টানতে নিয়ে এল নিজের বাড়িতে। কয়েকদিন পরে মোটু মেঘ মেয়েকে বিয়ে করল। মেঘকন্যার নাম রাখল আদরিণী।

আদরিণী মেঘ রাজ্যের মেয়ে, আকাশে সে জন্মেছে, বেড়ে উঠেছে আকাশে। তবু কিন্তু সে খুব বুদ্ধিমতী। সংসারের সব কাজ একা হাতে করে, আবাদে সাহায্য করে মোটুকে, পশুদেরও দেখাশোনা করে যত্নে। ঠিক পৃথিবীর মানুষের বউ যেমনটি করে। সত্যি, আদরিণী খুব ভালো।

তখনও পর্যন্ত কিন্তু মোটু আর তার গাঁয়ের কোন মানুষ আগুন দেখেনি। আগুন যে কি তাও তারা জানে না। তারা সবকিছু কাঁচা খায়। আর কন্‌কনে শীতের রাতে, ঝোড়ো হাওয়ার দিনে কিংবা ঝম্‌ঝম্‌ বর্ষার সময় ঘরের মধ্যে ঠক্‌ঠক্‌ করে কাঁপে। আগুন জ্বালিয়ে ঘর আর দেহ গরম করার কোনকিছুই তারা জানে না। জানে শুধু কষ্ট পেতে।

ঝগড়া মিটে গিয়েছে। মেঘের দলবল পৃথিবীতে নামে, তাদের দেশের মেয়ের সঙ্গো গল্পগুজব করে। আদরিণীকে তারা সবাই বড় ভালোবাসে।

আদরিণী বড় ভালো বউ। এ গাঁয়ের কষ্ট দেখে সেও কাঁদে। একদিন মেঘের দলবলকে বলল, "এবার আসার সময় কিছু আগুন আনিস তো ভাই। এদের বড় কষ্ট।"

পরের বার দেখা করতে এসে তারা আগুন বয়ে আনল। আগুন পেয়ে আদরিণী সবাইকে শিখিয়ে দিল কেমন করে আগুন জ্বালাতে হয়, কেমন করে আগুন জিইয়ে রাখতে হয়, কেমন করে রান্না করতে হয়, শীতের রাতে বর্ষার সময় ঝোড়ো হাওয়ার দিনে কেমন করে আগুনের চারপাশে বসে আগুন পোয়াতে হয়, দেহ গরম করতে হয়।

বউ-এর ওপর বেজায় খুশি মোটু। গাঁয়ের সবাই ভালোবাসে আদরিণীকে। এমনিতেই সে খুব ভালো বউ, তার ওপরে এমন উপকার করেছে গাঁয়ের। সবার প্রিয় আদরিণী।

বরের দেশের মানুষকে খুব ভালোবেসে আদরিণী। কিন্তু নিজের দেশের মানুষকেও সে সব সময় কাছে পেতে চায়। একদিন আদরিণী গল্প করছে মেঘের দলের সঙ্গো। হঠাৎ সে বলল, "তোরা কেউ কেউ এখানে ঘর বাঁধবি? আমার খুব ভালো লাগবে।" তারাও ভালোবাসে তাকে। কয়েকজন রাজি হয়ে গেল। পাকাপাকি ঘর বাঁধল মোটুর গাঁয়ে। তাদের দেশের মেয়ের বরের গাঁয়ে তারাও বাসিন্দা হয়ে রইল।

সুখে দিন কাটে। একদিন আদরিণী ঢাকনা দেওয়া একটা ঝুড়ি পেল। ঘরে নিয়ে এসে কাঠের তাকে সেটা তুলে রাখল। রেখে দিয়ে মোটুকে বলল, "দেখ, আমরা দুজন দুজনকে খুবই ভালোবাসি। গাঁয়ের লোকের সঙ্গোও খুব মিতালি হয়েছে। তুমি তো আমায় প্রাণের চেয়েও বেশি ভালোবাস। কিন্তু আজ থেকে তোমাকে একটা কথা মনে রাখতে হবে। আমার এই কথাটা তুমি কখনও ভুলে যেও না, এ কথাটা রেখো। আমি যখন বাগানে আবাদ করতে যাব কিংবা পশুদের দেখাশোনা করতে যাব তখন কিন্তু তুমি ঝুড়িটা খুলে দেখো না। কক্ষনো খুলবে না। যদি তা কর তবে আমি আর আমার দেশের মানুষজন তোমাদের ছেড়ে চলে যাব। ওই দূর আকাশে মিলিয়ে যাব।"

মোটু সায় দিয়ে বলল, "বাঃ! তা আমি কেন খুলতে যাব? তুমি যখন মানা করলে তখন আমি কক্ষনোই ওটা খুলে দেখব না।"

মোটু তো এখন মনে মনে দারুণ খুশি। কত লোকজন তার চারপাশে, গাঁয়ের লোক তার কথা শোনে, তার রয়েছে বুদ্ধিমতী বউ। বউ-এর জন্যই গাঁয়ের লোক তাকে সর্দারের মতো মান্য করে। তার আর কি-ই বা চাই।

কিন্তু আজ থেকে এক নতুন আপদ এসে জুটল। বেশ ছিল সে। বউ কেন বলল, তুমি ঝুড়িটা খুলো না। তাকে কেন নিষেধ করল।

খট্‌কা নিয়েও দিন কেটে যায়। প্রতিদিন সকালে বউ তাকে ওই কথা মনে করিয়ে দেয়। একদিনও ভোলে না।

কি আছে ঝুড়ির মধ্যে? কি লুকিয়ে রেখেছে তার বউ? তাকে কেন জানতে দিতে চায় না। আদরিণী তো তারই আদরের বউ। তবে? কেন তাকে সকাল হলেই নিষেধের কথা মনে করিয়ে দেয়?

মন তার বাগ মানে না। চনমনিয়ে ওঠে। দেখিই না কি আছে ঝুড়ির মধ্যে! আর তো কৌতূহল চেপে রাখা যায় না? মোটু মনে মনে ঠিক করে ফেলল, আজ ঠিক দেখব।

টকেটকে থাকল, বউ-এর বাইরে যাওয়ার অপেক্ষায় রইল। বউ তাকে নিষেধ করে বাগানে আবাদের কাজে চলে গেল।

এই তো সুযোগ! বুক ওঠাপড়া করছে। নিশ্বাঃস পড়ছে ঘন ঘন। কাঠের তাক থেকে ঝুড়িটা নামাল, পিছন ফিরে দরজার দিকে তাকাল,—শেষকালে খুলে ফেলল ঝুড়ির ঢাকনা। কিন্তু একি! ঝুড়ি তো খালি। কিছুই নেই তার মধ্যে। মুচ্‌কি হেসে ঢাকনা বন্ধ করে আবার তুলে রাখল তাকের ওপরে। যেমনভাবে ছিল ঠিক তেমন করে রেখে দিল।

আবাদের কাজ শেষ করে আদরিণী ফিরে এল ঘরে। বড় ক্লান্ত সে। স্বামীর মুখের দিকে চেয়েই সে চমকে উঠল। কান্না-ভরা চোখে বলল, "তোমাকে বলেছিলাম, তবু তুমি কেন ঝুড়ির ঢাকনা খুলেছিলে? কেন তুমি খুলতে গেলে?"

বউ-এর কথা শুনে মোটু অবাক হয়ে গেল। মুখ দিয়ে তার কোন কথা বেরুল না। শুকনো গাছের মতো, পাহাড়ের মতো চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

এমনি করে দিন যায়। একদিন মোটু শিকার করতে গেল। তির-ধনুক-বর্শা নিয়ে পিঠে লম্বা দড়ি ঝুলিয়ে সে গভীর বনের পথে হাঁটা দিল।

বাড়িতে আদরিণী একা। তার দেশের লোকজনকে সে ডেকে আনল ঘরে। চুপ করে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল সেখানে। তারপর সবাই মিলে মেঘের রাজ্যে ভেসে চলল। পথে ভেসে যেতে যেতে আদরিণী কয়েকবার নীচে পৃথিবীর দিকে তাকাল। শেষকালে পৌঁছে গেল আকাশে, নিজের দেশ মেঘের রাজ্যে। এখান থেকেই একদিন সে গিয়েছিল। অনেকদিন পরে আবার ফিরল।

আদরিণী আর কোনদিন পৃথিবীর বুকে নামেনি।

এমনি করেই পৃথিবীর মানুষ প্রথম তাদের আগুন পেয়েছিল। এমনি করেই শিখেছিল কেমন করে রান্না করতে হয়। আর এমনি করেই বড় বেশি কৌতূহলী হয়ে নিষেধ না মেনে মোটু তার আদরের বউকে হারাল। আদরিণী চলে গেল, গাঁয়ের লোক বড় ব্যথা পেল। তারা জানল, মোটুর জন্যই আদরিণী মেঘকন্যা হয়ে মিশে গিয়েছে দূর আকাশে। তারা তাই মোটুকে আর সর্দারের মতো মান্য করত না। সব হারাল মোটু। আদরিণী চলে গেল, আগুন রইল মানুষের মাঝে।

পোষা পশুপাখির বিশ্বাসঘাতকতা

সেকালের কথা সবাই ভুলে গিয়েছে। সেই ভুলে যাওয়া পুরনো কালে সব পশুপাখি মিলেমিশে আকাশে বাস করত। তাদের মধ্যে খুব ভাব ছিল, কেউ কাউকে হিংসে করত না। মনের সুখে তাদের দিন কাটত। বিপদে-আপদে সবাই সবাইকে দেখাশোনা করত।

এমনি করে দিন কাটে, রাত কাটে। একদিন শুরু হল বৃষ্টি। বৃষ্টি আর থামে না, অঝোরে জল পড়েই চলেছে। এমন বৃষ্টি তারা দেখেনি। বৃষ্টির সঙ্গে দমকা হাওয়া আর হাওয়ার দাপটে তারা শীতে ঠক্‌ঠক্ করে কাঁপছে। এমন কাঁপুনি যে মনে হল তারা বুঝি মরেই যাবে। আর কতক্ষণ সহ্য করা যায় এমন শীত।

কাঁপতে কাঁপতে পাখিরা বলল, "ভাই কুকুর! তুমি তো খুব জোরে ছুটতে পার, তোমার তো শীতও কম লাগে, তুমি নীচে পৃথিবীতে দৌড়ে যাও। কিছুটা আগুন নিয়ে এসো। আগুনে আমরা শরীর গরম করি। নইলে যে সবাই মারা পড়ি।"

কুকুর সব শুনল। বন্ধুদের জন্য আগুন আনতে সে দৌড় দিল। প্রচণ্ড তার গতি, দুর্বার তার বেগ। কিছুক্ষণ পরেই সে পৃথিবীতে পৌঁছে গেল। তাকে যে আগুন নিয়ে যেতে হবে, বন্ধুরা যে শীতে কাঁপছে। আগুনের খোঁজ করতেই কুকুরের চোখে পড়ল,—মাঠের মধ্যে মাংসের কয়েকটা হাড় আর কতকগুলো মাছ পড়ে রয়েছে। লোভে তার জিভ বেরিয়ে এল। জিভ থেকে জল গড়াতে লাগল। ভুলে গেল আগুনের কথা, ভুলে গেল বন্ধুদের কাঁপুনির কথা, ভুলে গেল কেন সে এখানে এসেছিল। সব ভুলে কুকুর হাড় আর মাছ চিবোতে লাগল। খাওয়ার আনন্দে আধবোজা চোখে সে শুধু হাড়ই চিবোতে লাগল।

আকাশে পশুপাখিরা কাঁপতে কাঁপতে চেয়ে আছে কুকুরের ফেরার আশায়। এই বুঝি কুকুর আসে, মুখে তার জ্বলন্ত আগুন। আহ! সেই আগুনে গরম হবে শরীর, শীত পালাবে দূরে, তাকিয়েই থাকে তারা, বন্ধু কুকুর কিন্তু আসে না। অনেক সময় কেটে যায়, তবু কুকুর ফেরে না।

কি আর করে! উপায় না দেখে পশুপাখি সবাই মিলে মোরগকে বলল, "ভাই মোরগ! কুকুর তো এল না, এদিকে আমরা যে শীতে মরি। তুমি তো ধনুকের তিরের মতো নীচে নেমে যেতে পার। তুমিই পৃথিবীতে গিয়ে তাড়াতাড়ি কিছু আগুন নিয়ে এসো। তুমি গেলেই তাড়াতাড়ি ফিরতে পারবে।"

মোরগ সব বুঝল। কুকুরের ব্যবহারে মোরগ বেশ রেগে গেছে। রাগের চোটে লাল-ঝুঁটি নেড়ে মোরগ ধনুকের তিরের মতো ছুটল পৃথিবীর পথে। পশু-পাখি ওপর থেকে দেখল, পা দুটো সোজা রেখে ঝুঁটি লম্বা করে উঁচিয়ে মোরগ নেমে চলেছে, নেমেই চলেছে। পৃথিবীর পথে আরও এগিয়ে চলল মোরগ, ওপর থেকে মেঘের

ধোঁয়ায় আর তাকে দেখা গেল না। কিছুক্ষণ পরেই মোরগ পৌঁছে গেল পৃথিবীতে। তাকে যে আগুন নিয়ে যেতে হবে, বন্ধুরা যে শীতে কাঁপছে।

আগুনের খোঁজ করতেই মোরগ দেখল এক গাছের তলায় অনেক শস্যদানা, অনেক গম আর ছোট ছোট ফল ছড়িয়ে রয়েছে। লোভে মোরগের গলা থেকে অদ্ভুত শব্দ বেরিয়ে এল। লম্বা লম্বা পায়ে ঝুঁটি নামিয়ে এগিয়ে গেল খাবারের দিকে। শক্ত ঠোঁটে ঠুকে ঠুকে মুখে পুরতে লাগল সেইসব শস্যদানা। ভুলে গেল আগুনের কথা, ভুলে গেল বন্ধুদের কাঁপুনির কথা, ভুলে গেল কেন সে এখানে এসেছিল। সব ভুলে মোরগ খাওয়ার আনন্দে গাছের তলা চষে ফেলতে লাগল। মোরগ কুকুরের কোন খোঁজ নিল না, নিজেও আগুন বয়ে নিয়ে যেতে ভুলে গেল।

তুমি যদি সন্ধ্যার সময় কান পেতে শোনো, তবে শুনতে পাবে গাছের ডালে ডালে পাখিরা গান গাইছে, কিচির-মিচির করছে। এ কিন্তু পাখিদের গান নয়, এ পাখিদের কিচির-মিচির নয়। তারা এই শব্দের মধ্যে বলে চলেছে—"কুকুর লোভে পড়ে ক্রীতদাস হয়ে গেল, মোরগ লোভে পড়ে ক্রীতদাস হয়ে গেল, হায়! হায়!"

তাই তোমরা দেখতে পাবে, সব পাখি কুকুর আর মোরগদের দেখলেই তাদের ভাষায় গালাগাল দেয়, তাদের ব্যঙ্গ বিদ্রুপ করে। পাখিরা গালাগাল দেয়, বিদ্রুপ করে—কেননা, তারা আজও ভুলতে পারেনি সেই কথা। কুকুর আর মোরগ বন্ধুদের কথা ভুলে গিয়ে, তাদের আকাশে ছেড়ে এসে নিজেদের দেহ গরম করেছে, নিজেরা পেটপুরে খেয়েছে—তখন তাদেরই বন্ধু সমস্ত পশুপাখি শীতে কেঁপেছে, হাওয়ার দাপটে মরে যেতে বসেছে, আগুনের অভাবে তাকিয়ে থেকেছে পৃথিবীর পথে—যে পথে তাদের বন্ধু দুজন গিয়েছে কিন্তু আর কখনও ফেরেনি।

কুকুর ও মোরগ সেইদিন থেকে ঘরের পোষা পশু ও পাখি হয়ে গেল। তারা হল গৃহপালিত।

আজও শুয়োর মাটি খোঁড়ে

সে অনেককাল আগের কথা। এক বনে দুই বন্ধু ছিল। তাদের একজন শুয়োর আর অন্যজন ছিল কচ্ছপ। দুজনের খুব মনের মিল। কেউ কারও কাছে কোন কথা লুকিয়ে রাখতে পারে না। সব কথাই দুজনে দুজনের কাছে মন খুলে বলত।

এমনি করে দিন যায়। একদিন কচ্ছপ মন ভারি করে শুয়োরের কাছে গেল। তার মুখখানা শুখনো দেখে শুয়োর কেমন মুষড়ে গেল। আমতা আমতা করে সে জিজ্ঞেস করল, 'কি ব্যাপার ভাই কচ্ছপ ? তোমার শরীর-মন ভালো নেই বুঝি ?'

কচ্ছপ দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে আধবোজা চোখে বলল, 'আমি একেবারে ভেঙে পড়েছি ভাই। ছেলে-বউকে খাওয়ানোর মতো সামান্য পয়সাও হাতে নেই। কি যে করি ?'

'এই ব্যাপার ?' বলেই শুয়োর ঠোঁটের ফাঁকে একটু হেসে নিয়ে আবার বলল, 'কিছু ভেবো না। কয়েকদিন আগে আমি কিছু টাকা পেয়েছি। এখন খরচ করার মতো কিছু নেই। তাই তুমি সেটা নিয়ে নাও ভাই, তোমার উপকার হবে।'

কচ্ছপ কিন্তু আরও দীর্ঘনিশ্বাঃস ছেড়ে দুঃখের সঙ্গে বলল, 'তোমার হয়ত ওই টাকাটার দরকার নেই এখন। কিন্তু কালই হতে পারে।'

'কি যে তুমি বল ভাই। বিপদের সময় বন্ধুকে যদি সাহায্য করতে না পারলাম, তবে আর বন্ধুত্ব কিসের ? তুমি আমার বিপদেও এইভাবেই সাহায্য করবে। কি, করবে না ?' শুয়োর বলল।

'এ অবশ্য তুমি ঠিকই বলেছ বন্ধু।' কচ্ছপ মাথা ঝাঁকাল।

'আমি আর তোমায় দেরি করে দেব না,' বলেই শুয়োর তার শোবার ঘরে চলে গেল। ঘরের কোণায় এক গোপন গর্ত থেকে সে কিছু টাকা বের করে গুনল। অর্ধেকটা নিয়ে বাকি অর্ধেকটা গর্তে রেখে গর্তের মুখ বন্ধ করে ফিরে এল কচ্ছপের কাছে।

'এই নাও ভাই কচ্ছপ।' টাকাগুলো সে তুলে দিল কচ্ছপের হাতে।

কয়েক ফোঁটা চোখের জল ফেলে কচ্ছপ বলল, 'তোমায় ধন্যবাদ ! তুমি যে আমার কি উপকার করলে।'

'ভুলে যাও ওসব কথা। আমি তোমায় সাহায্য করতে পেরেই আনন্দিত'।

'এ টাকা আমি তোমায় পনেরো দিনের মধ্যেই ফেরত দেব। আর যদি খুব দেরি হয় তবে একুশ দিন। তুমি কিন্তু কিছু মনে করো না ভাই।'

'তাড়াতাড়ির কোন দরকার নেই। যখন তোমার সুবিধে হবে তখন দিও। তোমায় আমি বিশ্বাস করি, তুমি যে আমার বন্ধু।'

'শুয়োরভাই, তোমার নজর খুব উঁচু। তুমি বড়ই দয়ালু। তোমার মতন এত ভালো মন আমি আর কোথাও দেখিনি।' ধরা গলায় একথা বলে কচ্ছপ বিদায় নিল।

এদিকে টাকা নিয়ে যাওয়ার পর কচ্ছপের আর দেখা নেই। সে এ পথে আর

হাঁটেই না। একমাস যায়, দুমাস যায়। কিন্তু কচ্ছপের কাছ থেকে কোন সাড়াশব্দ পাওয়া যায় না। সে এখন শুয়োরকে পারতপক্ষে এড়িয়ে চলতে চায়।

একদিন একটা কাজে শুয়োর গিয়েছে দূরে। ফিরতে বেশ দেরি হয়ে গেল। ক্লান্ত পায়ে সে যখন বাড়িতে ঢুকছে, তখন বউ তাকে দেখে প্রায় কেঁদেই ফেলল। তাকে দেখে শুয়োরের যেন কেমন মনে হল।

হন্তদন্ত হয়ে সে জিজ্ঞেস করল, 'কি হয়েছে'?

'ওগো আমাদের সর্বনাশ হয়ে গিয়েছে।' এবার সে ঝরঝর করে কেঁদেই ফেলল। কোন কথা না বলে শুয়োরের বউ সোজা তাকে ঘরের কোণে সেই গর্তের কাছে নিয়ে গেল যেখানে শুয়োর টাকাগুলো রেখেছিল।

'আমাদের টাকাগুলো সব চুরি হয়ে গিয়েছে।' ফোঁপাতে ফোঁপাতে সে বলল।

'চুরি গেছে।' অবাক হয়ে গেল শুয়োর। আর কোন কথা বেরুল না তার মুখ থেকে। কেননা, সে ভেবেছিল সে ছাড়া আর কেউ ও গর্তের খবর জানে না।

'আমাদের সব টাকা চুরি হয়ে গেল।'

'আমাদের টাকা মানে।'

'হ্যাঁ, গো, আমাদের দুজনের টাকা। আমি মাঝে মাঝেই এর মধ্যে সামান্য করে টাকা রাখতাম। তোমার আসার আগে আমি গুনতে গেলাম কেমন জমছে আমাদের টাকা। গিয়ে দেখি অর্ধেকটা চুরি হয়ে গিয়েছে। তুমি নিশ্চয়ই চোরকে ধরতে পারবে।'

'ও, অর্ধেকটা, তাই বল। আমার তো হয়ে এসেছিল তোমার কথা শুনে। ওটা চুরি হয়নি বউ।' শুয়োর নিঃশ্বাস ফেলে বলল।

'তাহলে, টাকাগুলো কি হল?' শুয়োরের বউ চিৎকার করে উঠল।

রেগে গিয়ে শুয়োর বলল, 'শোন, টাকা আমার, আর তাই আমার যা ইচ্ছে তাই করব। তোমার নাক গলাতে হবে না।'

'আমার টাকার অংশও তুমি নিয়েছ। তাই আমার জানার অধিকার আছে। কাকে তুমি টাকা দিয়েছ?'

'আমি কাউকেই টাকা দিই নি। শুধু এক বন্ধুকে তার বিপদে সাহায্য করেছি। সে খুব সৎ লোক, শিগ্‌গিরই টাকা ফেরৎ দেবে।' শুয়োর বেশ জোরের সঙ্গে বলে উঠল।

'তুমি ও টাকা আর ফেরৎ পাবে না।' ঝাঁঝের সঙ্গে বলল বউ।

'আমি টাকা ফেরৎ পাবই। বন্ধু কচ্ছপ কখনও আমাকে ফাঁকি দেবে না।'

'হুঃ, তোমার হাতে যখন ফেরৎ-দেওয়া টাকা আমি দেখব, তখনই শুধু বিশ্বাস করব। তার আগে নয়।'

'বেশ। শিগ্‌গির তুমি তা দেখতে পাবে।'

'সেই শিগ্‌গির-ই তোমার কবে হবে শুনি?' শুয়োরের চোখের দিকে সোজা তাকিয়ে বউ জিজ্ঞেস করল।

'এরই মধ্যে একদিন।'

'ও একটা কথা।' হঠাৎ কিছু মনে পড়েছে এইভাবে শুয়োরের বউ বলল, 'আচ্ছা, তুমি কতদিন আগে তোমার বন্ধুকে টাকা ধার দিয়েছ বলতো।'

'মানে, এই— তো কয়েকদিন আগে।' শুয়োর সত্যি কথাটা ভয়ে বলতে পারল না।

কিন্তু অত সহজে ভুলবার পাত্রী শুয়োরের বউ নয়। সে বলে বসল, 'তোমার বন্ধু কচ্ছপকে তো আমি দুমাস আগে একবার এধারে দেখেছিলাম। তারপরে আর তো সে এমুখো হয়নি।'

'বাইরে তার সঙ্গে আমার প্রায়ই দেখা হয়। তার এখন সময়টা খুব ভালো যাচ্ছে না। নইলে',— থেমে গেল শুয়োর তার বউয়ের চোখের দিকে তাকিয়ে।

'তাই বুঝি?' বউ চোখ ঘুরিয়ে বলল।

শুয়োর গেল ক্ষেপে, 'আচ্ছা মুশকিল, ব্যাপারখানা কি বলতো?'

'আমি কালকে বাজারে গিয়ে কচ্ছপের বউকে দেখতে পেয়েছি। সে জলের মতো টাকা খরচ করছে। এটা কিনছে, ওটা কিনছে, সেটা কিনছে।'

এবার সত্যি সত্যি শুয়োরের অবাক হওয়ার পালা।

'তাই বুঝি? কচ্ছপ তাহলে টাকা পেয়েছে। সে যদি টাকা পেয়ে থাকে, নিশ্চয়ই আমাকে টাকা দিয়ে যাবে। তার কাছে যাওয়ার কোন প্রয়োজন নেই। সেই ঠিকসময়ে আমার কাছে আসবে টাকা ফেরৎ দিতে।'

কিন্তু অবাক হল শুয়োর। সেইদিন কিংবা তার পরের দিনও কচ্ছপ এল না। তৃতীয় দিনে শুয়োর বেশ ঘাবড়ে গেল। সে ঠিক করল আজই সে কচ্ছপের সঙ্গে দেখা করবে। এই ভেবে সে রওনা দিল কচ্ছপের বাড়িমুখো।

এদিকে দূর থেকেই গাছের ফাঁক দিয়ে কচ্ছপ দেখতে পেল, দ্রুতপায়ে শুয়োর আসছে তারই বাড়ির দিকে। সবই বুঝল সে। বউকে ডেকে তাই বলল, 'শুয়োরবেটা এই ধারেই আসছে। আমি ওর সঙ্গে মোটেই দেখা করতে চাই না।'

'ওটা তুমি আমার ওপরেই ছেড়ে দাও। দেখ না, কি করি।' কচ্ছপের বউ বলে উঠল।

অল্পক্ষণের মধ্যেই কচ্ছপের বউ ফিরিয়ে দিল শুয়োরকে। শুয়োর বাড়ি ফিরে এসে তার বউকে কোন কথাই বলল না।

দুদিন পরে আবার এল শুয়োর। এবারও সে শুনল কচ্ছপ বাড়িতে নেই, বাইরে গিয়েছে জরুরি কাজে। তার কেমন সন্দেহ হল, কচ্ছপের বউ বোধহয় সত্যি কথা বলছে না।

'আচ্ছা, কখন এলে কচ্ছপের দেখা মিলবে?' মনের সন্দেহ চেপে রেখে শুয়োর জিজ্ঞেস করল।

'সেটা বলা খুবই মুশকিল। সে ইচ্ছেমতো যাওয়া-আসা করে আজকাল।'

'আপনি কি তাকে বলেছিলেন যে, আমি সেদিন তার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলাম?'

'হ্যাঁ, তাকে আমি বলেছিলাম আপনার আসবার কথা। আপনার সঙ্গে দেখা না হওয়াতে তিনি খুব দুঃখ করলেন। আপনি যদি কিছুক্ষণ অপেক্ষা করেন, তবে তার দেখা পেতে পারেন। এরই মধ্যে তিনি এসে পড়বেন মনে হচ্ছে,' কচ্ছপের বউ গাছের ফাঁক দিয়ে দূরে চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগল যেন এখনি কচ্ছপ এসে পড়বে।

এটাও কিন্তু তার মিথ্যে কথা।

আশায় ভর করে শুয়োর জিজ্ঞেস করল, 'আচ্ছা, আমি কখন তাকে পেতে পারি?'

'আমি ঠিক বলতে পারি না। তিনি আজকাল যখন-তখন আসেন আর বাইরে বেরিয়ে যান যে সঠিক করে কিছু বলা কঠিন।'

শুয়োর সেখান থেকে ধীরে ধীরে চলে এল। পথে হাঁটতে হাঁটতে সে ভাবতে লাগল, কচ্ছপ ঠিক যেন বন্ধুর মতো ব্যবহার করছে না। সে বাড়িতে গিয়ে এবার বউকে বলল, 'দেখ, আমার কেমন যেন সন্দেহ হচ্ছে, আমার টাকাটা হয়তো আমি আর ফেরৎ পাব না।'

'কিন্তু ওটা যে আমাদের টাকা?'

'কচ্ছপের এই ব্যবহার আমি ভাবতেই পারিনি। সে আমার এত বন্ধু।'

'যে আদৌ বন্ধু নয়, তাকে যদি হারাতে চাও তাহলে সমান্য টাকা ধার দিলেই যথেষ্ট। সে আর তোমার ঘরমুখো হবে না।'

'তুমি ঠিকই বলেছ বউ। তোমার কথাই ফলল। তুমি প্রথমেই আমাকে একথা বলেছিলে। আমি তখন বিশ্বাস করিনি। কিন্তু আমি টাকা ফেরৎ আনবই, নইলে আমার নাম শুয়োর-ই না।'

'আমি তোমার কথা শুনে খুবই খুশি হলাম। তুমি যত তাড়াতাড়ি একাজ করবে, ততই মঙ্গল।' শুয়োরের বউ ঘরের কাজে মন দিল।

সেদিন ভাগ্য ভালো। হঠাৎ দেখা হয়ে গেল কচ্ছপের সঙ্গে।

'তুমি কেমন আছ ভাই কচ্ছপ?' শুয়োর মনের রাগ চেপে রেখে বাইরে হাসিমুখে জিজ্ঞেস করল।

'খুব ভালো ভাই, খুব ভালো। কিন্তু আজকাল বড্ড ব্যস্ত আমি। বাড়িতে একেবারে থাকতে পারি না ভাই। বউ বলেছিল, তুমি কয়েকবার গিয়েছ আমার সঙ্গে দেখা করতে।'

'কয়েকবার নয়, মাত্র দু'বার।' শুয়োর উত্তর দিল।

কচ্ছপ বলল, 'আমি তোমার সঙ্গে দেখা করতে যাব ভেবেছিলাম। কিন্তু এত ভীষণ ব্যস্ত ছিলাম যে আর যেতেই পারি নি। হ্যাঁ, একটা কথা। সেই সামান্য ব্যাপারটা আমি একেবারেই ভুলে গিয়েছিলাম।'

শুয়োর মাথা নাড়ল, হাসল। তারপর বলল, 'আমি বড় ঝামেলায় পড়েছি। আমার বউও ব্যাপারটা জেনে ফেলেছে। আর তুমি তো জানই মেয়েরা কি ধরনের হয়।'

'যাক্‌গে ঘাবড়িয়ো না ভাই। আমি সব ব্যবস্থা করছি। আচ্ছা, তুমি কাল সন্ধের সময় আসতে পারবে? কোন অসুবিধা হবে না তো?'

'না না অসুবিধার কি আছে? আমি নিশ্চয়ই আসব।'

'খুব ভালো হল। আমি সব ব্যবস্থা করে রাখব।' মিষ্টি সুরে কচ্ছপ বলে ওঠে।

শুয়োর আনন্দে অন্য সবকিছু ভুলে গেল। বাড়ি গিয়ে সে বউকে সব জানাল।

'আমি যদি তুমি হতাম, তাহলে আরও আগে তার কাছে যেতাম টাকা আদায় করতে।' সমস্ত কিছু শুনে শুয়োরের বউ উত্তর দিল।

যাইহোক, সন্ধে লাগার আগেই শুয়োর বাড়ি থেকে রওনা দিল। তাকে আসতে দেখে কচ্ছপের বউ দৌড়ে গিয়ে স্বামীকে খবর দিল। অল্পক্ষণের জন্য কচ্ছপ কি যেন

ভাবল, ঘরের চারিদিকে চেয়ে দেখল, তারপর তাদের শোবার ঘরের মধ্যে যে ঝুড়িটা ছিল তার দিকে আঙুল দেখিয়ে সে বলল, 'আমি ওর মধ্যে লুকোচ্ছি।'

'কেন?'

'এখন খুলে বলার সময় নেই। শুধু সে চলে যাওয়া পর্যন্ত তুমি তার সঙ্গে কথা বলতে থাকো। কিন্তু কখনও যেন সে বুঝতে না পারে, তুমি তাকে তাড়াতে চাইছ। মনে থাকবে তো?'

'আমার যথাসাধ্য চেষ্টা করব।' খুব খুশি না হয়েই বউ জবাব দিল।

'তোমাকে করতেই হবে।' এই আদেশ দিয়ে কচ্ছপ ঝুড়ির মধ্যে ঢুকে বলল, 'আমাকে ঠিক করে কাপড়-চোপড় দিয়ে ঢেকে দাও।'

কচ্ছপের বউ তাকে এমনভাবে ঢেকে দিল যাতে সে নিঃশ্বাসটুকু শুধু নিতে পারে। একটু পরেই শুয়োরের দরজা নাড়ার আওয়াজ পাওয়া গেল।

আদর করে বউ তাকে ঘরে ডেকে আনল। 'আপনি ভালো আছেন তো?' সে শুয়োরকে জিজ্ঞেস করল।

'ভালোই। কচ্ছপ বাড়ি আছে তো?' শুয়োর জিজ্ঞেস করল। 'কিছু মনে করবেন না, আমি একটু আগেই চলে এসেছি।'

'আপনি কি কিছুক্ষণ বসবেন না?' খুব বিনীতভাবে জিজ্ঞেস করল কচ্ছপের বউ।

'হ্যাঁ, বসব।'

তারা দুজন এবার বসল। শুয়োর চেষ্টা করতে লাগল যাতে কচ্ছপের বউ কথাবার্তা বলে, কিন্তু কচ্ছপের বউ কোন কথাই বলছে না। আরও কিছুক্ষণ পরে শুয়োর অস্থির হয়ে পড়ল।

'কালকে আপনার স্বামীর সঙ্গে দেখা হয়েছিল। সে আমাকে আজ সন্ধেবেলা আসতে বলেছিল।'

'আমাকে সে এসব কোন কথাই বলে নি।' পরিষ্কারভাবে রূঢ় গলায় কচ্ছপের বউ একথা জানাল।

এই ধরনের উত্তর কিন্তু শুয়োরের মোটেই ভালো লাগল না।

'ওঃ!' শুয়োর বলে উঠল, 'কচ্ছপ কি এই গাঁয়ের বাইরে কোন কাজে গিয়েছে?'

'তা আমি কি করে জানব?'

'শ্রীমতী কচ্ছপ আপনি ঠিক কথা বলছেন না। আমার তাই মনে হচ্ছে।'

'আমি!' আঁৎকে উঠল কচ্ছপ-গৃহিণী।

'আপনার স্বামী কি ভেতরেই আছেন?' শুয়োরের জিজ্ঞাসায় কচ্ছপের বউ মুখে কেমন শব্দ করে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল।

'আপনি আমাকে কোন কথা বলবেন না জানি, তাহলে, আমিই নিজে দেখি কোথায় কচ্ছপ।' রেগে ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে উঠল শুয়োর।

সে উঠে শোবার ঘরের দিকে যাওয়ার জন্য এগিয়ে গেল। কিন্তু দরজার কাছে তার পথ আটকে দাঁড়াল শ্রীমতী কচ্ছপ।

'আপনি ভেতরে যেতে পারবেন না।'

'তাহলে বলুন, কোথায় আপনার স্বামী লুকিয়ে আছে?'

'সে কোথাও লুকিয়ে নেই। সে বাইরে গিয়েছে কাজে।'

'আপনি কি আমায় কচি ছেলে পেয়েছেন যে, যা বলবেন তাই বিশ্বাস করব? যদি আপনি সত্যি কথাই বলছেন তাহলে আমাকে ভেতরে যেতে দিতে আপনার এত আপত্তি কেন?'

'আমাকে না মেরে আপনি ঘরে যেতে পারবেন না।' তীক্ষ্ণস্বরে কচ্ছপের বউ জানাল।

শুয়োরের তখন ধৈর্যের সীমা পার হয়ে গিয়েছে। রাগে কাঁপতে কাঁপতে সে বলল, 'আমি এক-দুই-তিন গুনব, এর মধ্যে আপনি যদি পথ থেকে সরে না যান তবে যা ঘটবে তার জন্য আপনাকেই পস্তাতে হবে।'

'ঠিক আছে, আপনার যা ইচ্ছে আপনি করতে পারেন।' শান্তভাবে জবাব দিল কচ্ছপের বউ।

'এক-দুই-তিন। আপনি আমার পথ ছাড়বেন?'

কচ্ছপের বউ সেইভাবেই দাঁড়িয়ে রইল, শুয়োর ছুটে এসে মারল প্রচণ্ড এক গুঁতো। কিন্তু ঠিক সময়ে হঠাৎ ফট্ করে সরে গেল কচ্ছপের বউ আর সোজা ঘরের মধ্যে ঢুকে গেল শুয়োর। হাওয়ার বেগে। ঢুকেই সে গুঁতো খেল সেই ঝুড়িটার সঙ্গে। রাগে সে ঝুড়িটাকে তুলে ঘরের বাইরে এনে টেনে ফেলে দিল দূরে। তারপর আবার ঢুকল শোবার ঘরে। সে পই পই করে সবদিক খুঁজল, কিন্তু কাউকে দেখতে পেল না।

যখন সে বাইরে বেরিয়ে এল, তখন যা-নয়-তাই বলে কচ্ছপের বউ তাকে বকতে লাগল। সেও ক্ষেপে ছিল, গলা চড়িয়ে সেও দিল গালাগালি। দুজনের মধ্যে রীতিমত ঝগড়া বেধে গেল।

এদিকে দুজনের মধ্যে যখন প্রচণ্ড বচসা হচ্ছে, তখন কচ্ছপ ঝুড়ি থেকে গুটি গুটি বের হয়ে বাড়ির দিকে এল।

'এখানে সব হচ্ছেটা কি?' গোলমালকে ছাড়িয়ে সে চিৎকার করে উঠল।

হঠাৎ তাদের ঝগড়া গেল থেমে। তারপর কচ্ছপের বউ সব ঘটনা কচ্ছপকে খুলে বলল। আর সমস্ত দোষ চাপাল নিরীহ শুয়োরের ওপর।

'তোমার কিছু বলার আছে শুয়োর?' কচ্ছপ জিজ্ঞেস করল।

'আমি খুব দুঃখিত, আমি আমার ধৈর্য হারিয়ে ফেলেছিলাম।' খুব বিনীতভাবে শুয়োর জানাল।

'আশ্চর্য! আমি ভাবতে পারিনি বন্ধু, তুমি এই ব্যবহার করবে। আমি ভাবতাম তুমি আমার প্রাণের বন্ধু। বাঃ! ওঃ ভাই, আজকে আমি জীবনের সবচেয়ে বড় আঘাতটি পেলাম।' দুঃখের ভান করল কচ্ছপ।

'আমায় ভাই তুমি ক্ষমা করো।'

উপহাস করে রেগে কচ্ছপের বউ বলল, 'জানেন, আপনি আমার ঝুড়ি ভেঙে ফেলেছেন?' তারপর স্বামীর দিকে চেয়ে বলল, 'সেই যে আমার শিল-পাটা, তুমি তো জান, তাতে আমি পেঁয়াজ টমাটো আর লঙ্কা বাটতাম। ভেঙে ফেলেছে। তোমার বন্ধু শুয়োর ঝুড়ির সঙ্গে ওটাও বাইরে ফেলে দিয়েছে।'

'তাই নাকি শুয়োর ভাই?'

'আমি একই সঙ্গে বোধহয় ও দুটোকে ফেলে দিয়েছি।' এই বলে শুয়োর বাইরে গিয়ে ঝুড়িটা নিয়ে এল কিন্তু শিল-পাটা কোথাও দেখতে পেল না।

'আমার বউ-এর শিল-পাটা কোথায়?'

'ওটা তো আমি দেখতে পেলাম না। আচ্ছা, আমি আবার খুঁজে আসছি।'

এবারও খালি হাতে ফিরে এল শুয়োর।

'যতক্ষণ না তুমি ওই শিল-পাটা খুঁজে পাচ্ছ, ততক্ষণ তোমার টাকা কিছুতেই শোধ করব না আমি, তা বলে রাখছি কিন্তু।' এতক্ষণে কচ্ছপ তার রূপ প্রকাশ করল।

'বেশ আমি ওটা খুঁজছি।'

'দেখো শুয়োর, আমার সঙ্গে চালাকি করতে এসো না। আমি আমার বউ-এর সেই শিল-পাটা চাই, অন্য কোনটা আনলে চলবে না। এ আমি তোমায় স্পষ্টই বলে দিচ্ছি।'

ওপরে-নীচে আশে-পাশে সব জায়গায় বন্ধু শুয়োর সেই হারিয়ে-যাওয়া শিল-পাটাটি খুঁজল, কিন্তু কোথাও সেটা সে পেল না। কেননা, শিল-পাটাটি ছিল ঝুড়ির মধ্যে লুকিয়ে থাকা কচ্ছপ নিজেই।

তাই আজও শুয়োরকে নাক দিয়ে মাটি খুঁড়তে দেখা যায়। সেইদিন থেকে মাটি খুঁড়ে সে শ্রীমতী কচ্ছপের শিল-পাটা খুঁজছে। আজও সে খুঁজেই চলেছে, এখনও পায়নি। যেমন ফেরৎ পায়নি সেই টাকা অকৃতজ্ঞ কচ্ছপের কাছ থেকে।

বাদুড়ের স্বভাব

অনেকদিন আগের কথা। সেইকালে একবার পশু আর পাখিদের মধ্যে খুব যুদ্ধ হয়েছিল। সেইসময় পশু আর পাখিদের মধ্যে খুব তর্ক বাধল। তর্ক বাদুড়কে নিয়ে। বাদুড় কোন দলে যোগ দেবে? পশুদের দলে না পাখিদের দলে? বাদুড় খুব চতুর। সে জানে কেমন করে নিজেকে বাঁচাতে হয়। তার খুব বুদ্ধি। অনেক দিক ভেবেচিন্তে সে কাজ করে। পাখিরা যখন প্রভু ছিল, পাখিরা যখন পশুদের ক্রীতদাস করে রেখেছিল, তখন বাদুড় ছিল পাখিদের সঙ্গে। তার ভাগ্যকে সে পাখিদের সঙ্গে মিলিয়ে দিয়েছিল। তখন পাখিরা ছিল রাজা, পশুরা ছিল পরাধীন।

এমনি করে চল্লিশ বছর কেটে গেল। পশুদের অশেষ কষ্ট, শেষকালে সহ্য করতে না পেরে সিংহ ও বাঘ প্রস্তাব দিল যে, অত্যাচারী পাখিদের সঙ্গে আমরা কখনও পেরে উঠব না, তাদের সঙ্গে রেষারেষি বা যুদ্ধ করেও কিছু হবে না, তাই এসো বন্ধুগণ, আমরা শান্তির প্রস্তাব রাখি। তাদের কাছে মাথা নত করলে তারা খুশি হয়ে আর অত্যাচার করবে না।

এই পরামর্শ শোনামাত্র অন্য সব পশু হৈ হৈ করে উঠল। তারা সবাই মিলে শান্তির প্রস্তাব অগ্রাহ্য করল। তারা বলল, এভাবে অত্যাচার বন্ধ হবে না। আমরা লড়াই করব, আর শেষ পর্যন্ত আমরাই জিতব। আমাদের শক্তি তো কম নেই। এসো, সবাই মিলে পাখিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করি। সিংহ আর বাঘ বাধ্য হয়ে মেনে নিল তাদের কথা। আবার যুদ্ধ বাধল অত্যাচারী পাখিদের সঙ্গে।

এতদিন বাদুড় ছিল অত্যাচারী নিষ্ঠুর পাখিদের দলে। কিন্তু যখনই পশু আর পাখিদের মধ্যে যুদ্ধ বেধে গেল, তখন সে আলদা হয়ে থাকল। পাখিদের কাছ থেকে সরে গেল, কিন্তু পশুদের দলেও যোগ দিল না। সে দেখছে কে জেতে। তারপের তার দলে যোগ দেবে। পশুরা নজর রাখল, বাদুড়ের ভাবগতিক দেখল। সবই বুঝতে পারল তারা।

পশুরা জোর লড়াই চালাচ্ছে। সেইসময় তারা শেয়ালকে পাঠাল বাদুড়ের কাছে। শেয়ালকে বলল, বাদুড়কে বন্দি করে নিয়ে এসো।

শেয়াল তক্ষুনি বাদুড়ের কাছে গিয়ে তাকে বন্দি করে নিয়ে এল। পশুদের নেতারা বসে রয়েছে, বন্দি বাদুড়কে নিয়ে আসা হল তাদের সামনে। তারা বলল, বাদুড় দু'রকম চরিত্রের। আগে ছিল পাখিদের দলে এখন আলাদা হয়ে সরে আছে। এ কাজ জঘন্য। বাদুড়কে আমরা অভিযুক্ত করছি। বাদুড় কেন এরকম করছে তার জবাব দিক।

বাদুড় বলল, 'এতে কোন দোষ নেই। এরকম কাজ করতে আমি বাধ্য হয়েছি। আমার বউ আমাকে এই পরামর্শ দিয়েছে। আমার বউ আমাকে বলেছে, গন্ডগোলের

সময় সরে থাকবে। আর যেই একদল জিতবে তখন তার দলে গিয়ে বলবে, আমি তো তোমাদের দলেই ছিলাম। তাতে যুদ্ধ জেতার ফলে যত ভালো ভালো জিনিস, তা সবই পাবে।' আগে আমি বউয়ের কথায় জেতা দল পাখিদের সঙ্গে ছিলাম, আর এখন দেখছিলাম কি হয়। আমার কোন দোষ নেই।'

বাদুড়ের এই দু'রকমভাবে চলাফেরার জন্য সব পশু তাকে ভীষণভাবে গালাগালি দিল। তারপর তাকে নিজেদের জঙ্গালে ঘেরা একটা ঘরে বন্দি করে রাখল। ঠিক হল, যুদ্ধের পরে তার বিচার হবে। এখন যুদ্ধ নিয়ে তারা ব্যস্ত, পরে ঠিকমতো বিচার করা যাবে।

দশ বছর ধরে চলল এই ভীষণ যুদ্ধ। কত পাখি কত পশু মারা পড়ল, কতজন আহত হয়ে পড়ে রইল। শেষকালে পশুরাই জয়ী হল। তারা মরণপণ লড়াই চালিয়ে পাখিদের একেবারে হারিয়ে দিল।

পশুদের মধ্যে যাদের খুব বুদ্ধি তাদের নিয়ে দল করা হল। তারপরে তাদের সামনে বাদুড়কে ডাকা হল। এখন তার বিচার হবে।

বাদুড় বুঝল, সে এবার শক্ত পাল্লায় পড়েছে। এতদিন বুদ্ধি করে সে নিজেকে বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে এসেছে। কিন্তু এবার? ব্যাপারটা খুব শক্ত, তাই সে আরও বুদ্ধিমান একজনকে অনেক ভেট দিয়ে তার হয়ে কথা বলতে বলল। লোভে পড়ে সে রাজি হল।

বাদুড়ের সেই বুদ্ধিমান বন্ধু বলল, 'বাদুড়ের অধিকার আছে যে-কোন দলে যোগ দেবার। তার স্বভাব, তার চেহারা, তার চরিত্র এমনই যে, সে যে-কোন দলে সুন্দরভাবে মিশে থাকতে পারে। আর তাই সে করেছে। যদিও সে পাখি নয়, তবু তার দুটি ডানা আছে, সে আকাশে উড়তে পারে। তাই সে যখন আকাশে উড়ে বেড়ায় তখন কেউ বলবে না যে সে অন্যের এলাকায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। সবাই নিশ্চয়ই মানবে, তার যখন ডানা আছে, তখন তার আকাশে উড়বার অধিকারও আছে। আবার বাদুড়ের অন্যদিকে তাকান, দেখবেন যে, তার সারা দেহ লোমে ঢাকা, তার দাঁত আছে, বেশ বড় কান আছে। অথচ পাখিদের লোম দাঁত এবং কান কোনটাই নেই। লোমের বদলে রয়েছে পালক। তাহলে সে তো পশু। তাই যখন সে পশুদের দলে যোগ দিতে চায় তখন তার বাধা কোথায়? তার দেহই এমন যে, সে পাখি বা পশু যে-কোন দলেই ভিড়ে যেতে পারে। এতে তার নিজের দোষ কোথায়? বিচার করে দেখুন, বুঝতে পারবেন বাদুড় নির্দোষ, তার কোন দোষই নেই।'

ছিঃ কি লজ্জা

গ্রামের মানুষ খুব বিপদে পড়েছে। বিপদ বলে বিপদ, এক মহাবিপদ। তালের গাছ থেকে ফলের সব শাঁস কে যেন চুরি করে নিয়ে যাচ্ছে। এত তালগাছ গাঁয়ে, কিন্তু সব শাঁস চুরি যাচ্ছে। গ্রামের মানুষের কষ্টের সীমা নেই। এই শাঁস থেকে তারা তেল তৈরি করে। সেই তেল দিয়ে রান্না করে, তরিতরকারি বানায়, মাংস রাঁধে। তেল নেই, রান্না করা যচ্ছে না, যাও বা রান্না হয়, মুখে রোচে না। বড় কষ্ট তাদের। এমনিতে কত কষ্ট, কত বিপদ-আপদ, তার ওপরে আর এক নতুন বিপদ।

তারা অনেক চেষ্টা করল, বারবার চেষ্টা করল, অনেক কায়দা করল, বহু ধরনের বুদ্ধি খাটাল— কিন্তু চোর আর ধরা পড়ে না। যতরকম কৌশল করে, বৃথা যায়। চোর অনেক চালাক, বারবার সে তাদের বোকা বানাতে লাগল। তাদের মাথায় হাত। চোর ধরা পড়ল না।

শেষকালে তারা সবাই মিলে সন্ধেবেলা সর্দারের বাড়ির উঠোনে পরামর্শ করতে বসল। নানা রকমের কথা উঠল, নানা ধরনের বুদ্ধি এল, কথা কাটাকাটি চলল। শেষে একজন বুড়োমতন লোক বলল, 'আমি অনেক দেখেছি, অনেক শুনেছি। আসলে বাপু, দেবতা রাগ করেছেন। তিনি রাগ করলে ওসব চোর-টোর ধরা যায় না। অন্য ব্যবস্থা দেখ। সবাই মেনে নিল বুড়োর কথা, সায় দিল তার পরামর্শে।

তারা দেবতার থানে ভক্তিভরে ছাগল বলি দিল, ভেড়া বলি দিল, মুরগির ছানা বলি দিল। যার যেরকম সামর্থ্য তাই দিয়ে দেবাতার পুজো করল। সবাই দিনে-রাতে দেবতার থানে আর্জি জানাল,— হে দয়াল দেবতা, আমাদের সাহায্য করুন, আমাদের বাঁচান, আমরা বড় গরিব।

দিন যায়, রাত যায়। আবার ফিরে আসে দিন, ফিরে আসে রাত। চোর কিন্তু ধরা পড়ে না। কে যে চুরি করে পালিয়ে যাচ্ছে কেউ তা বুঝতে পারল না। সবার মনে ভয়, সবার মনে চিন্তা।

চোর আর কেউ নয়, একটা কচ্ছপ। গভীর রাত, কালো কুকুরের গায়ের মতো কালো আঁধার চারিদিকে, কোন সাড়াশব্দ নেই কোথাও, বাইরে ঘুরছে কেবল বুনো জানোয়ার। সেই সময় কচ্ছপ হামাগুড়ি দিয়ে তার বাড়ি থেকে নিঃশব্দে বেরিয়ে পড়ে, চলার সময় পায়ে কোন শব্দ হয় না। হাতে থাকে একটা ধারালো ছুরি আর একটা বস্তা, বস্তার মধ্যে এক টুকরো শক্ত দড়ি। দড়ি পায়ে জড়িয়ে কচ্ছপ তর্‌তর্‌ করে তাল গাছে উঠে পড়ে, ছুরি দিয়ে তালের শাঁস কাটে,— তারপরে সেগুলো বস্তায় ভরে। নেমে আসে গাছ থেকে। আবার ওঠে অন্য গাছে। রাতের অনেকক্ষণ ধরে তার এই কাজ চলে। তারপরে পুব দিকে লাল থালাটা উঠবার অনেক অগেই নিঃশব্দ পায়ে গুটি-গুটি ফিরে চলে নিজের বাড়িতে। সব রাতেই একভাবে কাজ করে চলে কচ্ছপ।

সকালের দিকে ঘুমটা তার ভালোই জমে। কেনই বা জমবে না।

এমনি করে চলে রাতের পর রাত। এক রাতে কচ্ছপ ছুরি বস্তা দড়ি নিয়ে বাড়ি থেকে বেরুতে যাবে,— এমন সময় বউ বলল, 'আজ ঘরে থাকো, আজ আর যেও না। সত্যি যেও না।'

'কেন?'—লম্বা গলা আরও লম্বা করে কচ্ছপ তাকাল। বিরক্ত হয়ে কথা বলল।

কচ্ছপ-বউ ভয়ে ভয়ে বলল, 'দেখো, বাইরে কী ভীষণ অন্ধকার। কালো চুলের মতো। যদি তোমার কিছু হয়। বড্ড ভয় করছে।'

কচ্ছপ ফিক করে হেসে ফেলল। বলল, 'বউ, আঁধার রাতই তো ভালো। বড় পছন্দ করি আঁধার রাত। কিচ্ছু ভয় নেই। আমি ঠিকঠিক ফিরে আসব।'

বউ জলভরা চোখে বলল, 'না, তুমি যেও না। অন্তত আজকের রাতটুকু ঘরে থাকো। কেন যেন বড় ভয় করছে।'

কিন্তু কাজ হল না। কচ্ছপের লোভ খুব বেড়ে গিয়েছে। অনেক দিন ধরে চুরি করছে, একদিনও ধরা পড়েনি। সাহসও তাই সীমা ছাড়িয়েছে। লোভ ও সাহস তাকে রাতে ঘরে থাকতে দেয় না। আরও তালের শাঁস চাই, আরও আরও। ঘরের দোরের কাছে গিয়ে কচ্ছপ বলল, 'বউ, আজ বড় কালো আঁধার রাত। আজকে আমায় যেতেই হবে। ঠিক আছে, তুমি যখন বলছ কালকে আমি ঘরে থাকব, কালকে বাইরে যাব না। আজকে আমায় যেতেই হবে।'

'হায় কপাল।' বউ কাঁদতে কাঁদতে ঘরের বাইরে এল।

কচ্ছপ অন্ধকার বনে মিলিয়ে গেল। কিন্তু আজকে যেন খুব বেশি অন্ধকার। অন্ধকারে চলতে-ফিরতে কচ্ছপ খুব পারে, অনেক দিন ধরে তার এই অভ্যাস হয়ে গিয়েছে। কোনই অসুবিধা হয় না। কিন্তু তারও আজ কষ্ট হতে লাগল। দু-একবার হোঁচট খেল, মাথাটা গিয়ে লাগল গাছের গুঁড়িতে। এত অসুবিধে তো আগে কখনও হয়নি। ভাবল নাঃ, আজকে নাহয় বাড়ি ফিরেই যাই। আর বউ যখন অমন করে বারবার বলল। বউ পেছন থেকে একবার ডাকলেই সে ফিরে যেত। কিন্তু বউ তখন কাঁদছে। কচ্ছপ ফিরল না। এগিয়ে চলল গুটি গুটি।

কিন্তু এগোনো আজ বড় কঠিন। বেশ ব্যথা পেল কয়েকবার। একবার উল্‌টে এক গর্তে গেল পড়ে। পায়ে কাঁটার খোঁচা লাগল, 'না, আজ বেরিয়ে ভালো কাজ করিনি। ঘরে থাকলেই হত। আজ কাজে যাওয়া ঠিক হয়নি। বেশ বেগতিকে পড়লাম।'

ভাবতে ভাবতেই এক মস্ত শক্ত গাছের গুঁড়িতে তার মাথা প্রায় থেঁতলে গেল। ঝিম্ ঝিম্ করে উঠল মাথাটা। চোখ অন্ধকার হয়ে এল। হঠাৎ চোখ মেলে কচ্ছপ দেখল,— গাছটা এদিক ওদিক দুলছে আর হাসছে, দুলছে আর হাসছে। কচ্ছপ এক মুহূর্ত ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেল। কি অবাক কাণ্ড। তারপরে ঘুরেই দৌড় লাগাল বাড়ির দিকে। ভয়ে পা সেঁদিয়ে যাচ্ছে, তবু সে ছুটছে। মাথার ব্যথার কথা একেবারেই ভুলে গেল। শেষকালে থামল তার বাড়ির দরজায়। হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, 'আমি এসেছি বউ, দরজা খোল।'

বউ খুব খুশি হল। তার কথায় কচ্ছপ শেষকালে ফিরে এসেছে। আবার অবাকও হল। তাকিয়ে রইল তার দিকে। কিন্তু কচ্ছপ কোন কথাই বলল না। যা ঘটেছে তার কথাও কিছু বলল না।

দিন হল। দিন শেষ হল। আবার রাত এল। আবার অন্ধকারে গুটিগুটি এগিয়ে চলল কচ্ছপ। আজ সে বেশ আস্তে আস্তে হাঁটছে। কচ্ছপ তালগাছে উঠল, শাঁস কেটে বস্তায় ভরল, নেমে এল। সে জানে না। সেই গাছ সব কিছু দেখল। যে গাছ আগের রাতে দুলছিল হাসছিল,— সে সব দেখল। কচ্ছপ ফিরে চলল বাড়িতে। না আজ কিছু অঘটন ঘটে নি। সে খুশি।

যে গাছটি হেসেছিল, সে হল আলুমো,—সে হল হাসির রাজা। আলুমো ভীষণ ভয় পেয়ে গেল। সে পাশের গাছগুলোকে কচ্ছপ চোরের কথা বলল। তারাও ভয় পেয়ে গেল।

'চোর!' নারকেল গাছ অবাক হল।

'তাহলে সে তো খুব শয়তান!' আমগাছ বলল।

'কিন্তু কিছু তো করা দরকার।' পেয়ারা গাছ বলল।

'তাহলে? তাহলে আমরা কি করতে পারি?' শিরীষ গাছ জিজ্ঞেস করল।

'ওকে শাস্তি পেতেই হবে। ওসব ছাড়াছাড়ি নেই।' পিপুল গাছ বলে উঠল।

'কি শাস্তি তাকে দেওয়া হবে?' লেবু গাছ মাথা নেড়ে বলল।

অন্য গাছগুলো একসঙ্গে গলা মিলিয়ে চিংকার করে উঠল, 'গাঁয়ের লোকজন কি মরে যাবে? ওদের সাহায্য করতেই হবে।'

সবাই সায় দিল। তারপরে তাকাল আলুমোর দিকে। আলুমো বলল, 'ওকে এমন ভয় পাইয়ে দিতে হবে যে জীবনে না ভোলে। তাহলেই ও জব্দ হবে!'

সব গাছ বলে উঠল, 'খুব ভালো কথা, ভালো কথা। ঠিক বলেছো আলুমো।'

আলুমো একটু চুপ করে রইল। তারপরে আস্তে আস্তে বলল, 'কি করতে হবে পরে আমি তোমাদের বলে দেব। চোর যখন আসবে তখন বুঝিয়ে বলব।'

পরের রাতে কচ্ছপ আবার রাতের আঁধারে বের হল। আজ তার ভয় একটু কম। গত রাতে তো কিছুই অঘটন ঘটেনি। সে হেলেদুলে গুটিগুটি এগিয়ে চলল। তাকে দেখতে পেয়েই আলুমো হাসতে লাগল। সে হাসছেই, হাসছেই।

অশোপাশের গাছগুলো হাসি শুনে জিজ্ঞেস করল, 'ও আলুমো, আলুমো,— তুমি এমনভাবে হাসছ কেন? কি হয়েছে বলই না, তুমি তো হাসির রাজা, আলুমো, এমন করে হাসছ কেন।'

আলুমো তখন হাসি থামিয়ে একটা গান গেয়ে উঠল। তার সঙ্গে গলা মিলিয়ে সব গাছ গেয়ে উঠল :

চলে কচ্ছপ গুটিগুটি,
আলুমো, হাসির রাজা, আলুমো,
রাতের আঁধার পড়ে লুটি,
আলুমো, হাসির রাজা, আলুমো,
ডান হাতে তার ছুরি,
আলুমো, হাসির রাজা, আলুমো,
বাম হাতে তার দড়ি,
আলুমো, হাসির রাজা, আলুমো,

পেছনেতে বস্তা ধরি।

আলুমো, হাসির রাজা, আলুমো।

হঠাৎ তারা গান থামিয়ে দিল। চারিদিকে নিস্তব্ধ। গানের পরে আরও আরও নিস্তব্ধ মনে হল। পাতার শব্দও যেন নেই, সব চুপচাপ।

গাছগুলোর তলা দিয়ে কচ্ছপ এগোচ্ছে। হঠাৎ গাছগুলো তাকে টিট্‌কিরি দিতে শুরু করল, নানাধরনের মজার মজার নামে কচ্ছপকে ডাকতে লাগল। এবার কচ্ছপ সত্যি সত্যি খুব ভয় পেয়ে গেল, চুপ করে দাঁড়িয়ে চারিদিকে দেখতে লাগল। তবু গাছেরা থামে না। কচ্ছপ আর সহ্য করতে পারল না। ভয়ে পেছন ফিরে দৌড় দিল। পথে কোথাও থামল না।

কচ্ছপ শেষকালে বাড়ি পৌঁছল। এবার সে ভীষণ রেগে গিয়েছে। তার সবকিছু ভেস্তে গেল। আজ রাতে শাঁস চুরি করা হল না। তার ওপরে এমন টিট্‌কিরি। এমন আজেবাজে নামে ডাকা। বাড়িতে এসে বউয়ের সঙ্গে সে একটিও কথা বলল না। কিছু খেল না। সোজা বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়ল। কিন্তু ঘুম কি আসে।

এখন হয়েছে কি, সেই রাতে যখন এসব কাণ্ড চলছে তখন সেই পথে গাঁয়ে ফিরছিল এক কিষান। সে সব কিছু শুনল, সব কিছু দেখল। একটু ভয় পেল, খুব অবাক হল। আবার নতুন কিছু জেনে ফেলার আনন্দও আছে। সে সোজা ছুটে এল গাঁয়ে। গাঁয়ে এসেই গোষ্ঠীপতির ঘরে গেল। গোষ্ঠীর সর্দারকে সব কিছু খুলে বলল।

সর্দার বলল, ‘খুব ভালো। আজ তো অনেক রাত হল। তুমিও ছেলে ক্লান্ত হয়ে পড়েছ। বাড়িতে গিয়ে ঘুমোও। কাল সকালে আমার কাছে চলে আসবে।’

কিষানের কি আর রাতে ঘুম হয়। বারবার মনে পড়তে লাগল কিছুক্ষণ আগে দেখা সেই অদ্ভুত কাণ্ডকারখানা। সকাল হতেই সে ছুটে গেল সর্দারের বাড়িতে। গিয়ে দেখে এর মধ্যে আরও কয়েকজন গাঁও-বুড়ো সেখানে হাজির। সবাই মিলে পরামর্শ করতে বসল।

একজন গাঁও-বুড়ো বলল, ‘এতদিন পরে দেবতা তাহলে মুখ তুলে তাকালেন। আমাদের প্রার্থনা জানানো ঠিক হয়েছে। বলিতে দেবতা সন্তুষ্ট হয়েছেন। যাইহোক, আমরা এই কজনা ছাড়া ব্যাপারটা যেন আর কেউ না জানে। খুব সাবধান। আগে চোর ধরি, তারপরে সব বলা যাবে।’

অল্পবয়সি কিষান বলল, ‘কখনই না, আমি আর কাউকে কিছুই বলব না।’

অনেক আলোচনার পর ঠিক হল, রাতের বেলা কিষান ছেলের সঙ্গে দুজন গাঁও-বুড়ো সেই গাছের কাছে যাবে। যেই কচ্ছপ তালের শাঁস চুরি করতে আসবে, অমনি তারা চেপে ধরবে তাকে। সব ঠিকঠাক হয়ে গেল।

পরপর তিন রাত তারা সেই গাছের কাছে গিয়ে লুকিয়ে থাকল। কিন্তু কিছুই ঘটল না,—না হাসি, না গান, না কচ্ছপের দেখা। দুজন গাঁও-বুড়ো ভীষণ রেগে গেল। তাদের ধৈর্য আর কত রাত থাকবে? আসলে, কচ্ছপ সেই যে ভয় পেয়ে বাড়ি ফিরেছিল এই তিন রাত আর বেরোয় নি। তাই ঘটেও নি কিছু।

একজন বুড়ো বলল, ‘কাল রাতে যদি কিছু না ঘটে আমি আর এমুখো হচ্ছি না আর ভালো লাগে না’।

'আমিও আসব না'। অন্যজন বলল।

কিষান আস্তে আস্তে মুখ নিচু করে বলল, 'একটু ধৈর্য তো ধরতেই হবে। চোর ধরা তো সহজ কাজ নয়! চোরেরও বুদ্ধি কম নয়। তাছাড়া, একটা কথা তো বুঝতেই হবে। সেদিনের ব্যাপারে কচ্ছপ নিশ্চয়ই খুব ভয় পেয়েছে। তাই কয়েকটা দিন তো সে আর বাইরে বেরুবেই না, ঘরেই থাকবে। যা ভয় পেয়েছে। তারপরে একটু সাহস ফিরে এলে তবেই না আবার চুরি করতে আসবে! একটু অপেক্ষা করতেই হবে। তবে আমি বলছি, সে আসবেই আজ হোক কাল হোক, তাকে আসতেই হবে। আমরা তাকে ধরবই।'

একজন বুড়ো বলে উঠল, 'সবই তো বুঝলাম। কিন্তু আর যে পারি না। তুমি নাহয় এখন অল্পবয়সি, সে কাল আমাদের অনেকদিন আগে চলে গিয়েছে। আমরা তো বুড়ো হয়েছি। রাতের পর রাত না ঘুমিয়ে থাকি কি করে বল? পারি না। চোখ বন্ধ হয়ে আসে। চোখ কট্‌কট্‌ করে। কি করি বল।'

'আমিও পারি না।' অন্য বুড়ো বলল। অনেক কষ্টে সে চোখ খুলে রেখেছে।

পরের রাত। চারিদিকে আঁধার। আবার তারা তিনজনে গাছের নীচে এল। অনেকক্ষণ কেটে গেল। কিছু শোনা যাচ্ছে না। হঠাৎ তারা শুনতে পেল, মনে হল হাসির শব্দ। কান খাড়া করে তারা শুনতে চেষ্টা করল।

একজন বুড়ো বলল, 'মনে হচ্ছে হাসির শব্দ আসছে?'

কিষান বলল, 'হ্যাঁ, হাসির শব্দ।' উত্তেজনায় তার বুক কাঁপছে, চোখ বড় বড় হয়ে গিয়েছে।

হঠাৎ আলুমোর হাসির শব্দ শোনা গেল, হাসি ছড়িয়ে পড়েছে নির্জন রাতে : হাঃ হাঃ হিঃ হিঃ হোঃ হোঃ।

অন্য সব গাছ এক সুরে বলে উঠল। 'আলুমো ও আলুমো, তুমি অমন করে দুলছ কেন? অমনভাবে হাসছ কেন? হলটা কি?'

আলুমো গান গেয়ে উঠল, সব গাছ গলা মেলাল। রাতের বনভূমি সরব হয়ে উঠল। তারাও শুনল সে গান :

চলে কচ্ছপ গুটিগুটি
আলুমো, হাসির রাজা আলুমো,
রাতের আঁধার পড়ে লুটি,
আলুমো, হাসির রাজা, আলুমো,
শাঁস চুরি, শাঁস চুরি
আলুমো, হাসির রাজা, আলুমো,
ডান হাতে তার ছুরি
আলুমো, হাসির রাজা, আলুমো,
পেছনেতে বস্তা ধরি,

ধরো ধরো ধরো তারে,
আলুমো, হাসির রাজা, আলুমো,

গান থেমে গেল। চারিদিক আবার নিস্তব্ধ। কচ্ছপ সাহসে ভর করে এগিয়ে চলেছে। লোক তিনজন তার পেছনে পেছনে চুপচাপ এগোচ্ছে। তারা হাঁটছে যেন কচ্ছপ মোটেই টের না পায়। চোরকে আজ ধরতেই হবে।

একটা তালগাছের নীচে এসে কচ্ছপ থামল। উপরে তাকিয়ে দেখল গাছভর্তি তাল। বস্তাটাকে গাছের তলায় রেখে দিল। পায়ে জড়িয়ে নিল দড়িটা, ডানহাতে ছুরিটাকে বাগিয়ে ধরে সাবধানে গাছে উঠতে শুরু করল। উঠতে উঠতে দু-একবার নীচে ও আশেপাশে তাকাল। হঠাৎ দুম্‌দাম্‌ তাল শাঁস পড়ার শব্দ হল। পড়ছেই, পড়ছেই। এখন আর চারিদিকে চুপচাপ নেই।

হঠাৎ সেই তিনজন গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল। তাড়াতাড়ি তিনজনে মিলে বস্তাটাকে তুলে নিল। ছয় হাতে সেটাকে বিছিয়ে ধরল। তারপরে চিৎকার করে উঠল, 'এইবার কচ্ছপ কোথায় যাবে?' কচ্ছপ মানুষের গলা শুনে ভয় পেয়ে নীচে তাকাল, লোকদের দেখে তার হাত-পা আলগা হয়ে গেল। ঝুপ্‌ করে পাকা তালের মতো বস্তায় এসে পড়ল। মাটিতে পড়লে তো সে চৌচির হয়ে যেত।

তাকে ধরে নিয়ে তারা গাঁয়ে ফিরল। আঃ কি আনন্দ। চোর ধরা পড়েছে। আর অনেককাল পরে।

সর্দারের বাড়ির উঠোনে বিচার-সভা বসল। তার বিচার হল। তাকে কয়কমাস গাঁয়ের খোঁয়াড়ে রাখার ব্যবস্থা হল। কচ্ছপ কিছু বলল না। সে যে হাতেনাতে ধরা পড়েছে।

খোঁয়াড়ের মেয়াদ শেষ হল। কচ্ছপ ছাড়া পেল। মাথা নিচু করে সে গাঁ থেকে বেরিয়ে এল। ছিঃ ছিঃ কি লজ্জা। তারপর থেকে কাউকে দেখতে পেলে সে দেহের খোলের মধ্যে তার মুখ লুকিয়ে ফেলে। সে যে চোর, ধরা পড়েছিল। মুখ দেখাবে কেমন করে? তাই আজও কাউকে সামনে দেখলেই সব কচ্ছপ অমন করে খোলের মধ্যে মুখ লুকিয়ে নেয়। মনে মনে বলে, ছিঃ কি লজ্জা।

মানুষ-খেকো রাজা

অনেকদিন আগে এক মিষ্টিজলের নদীর পাশে ছিল এক রাজার বিরাট প্রাসাদ। প্রাসাদের অন্যদিকে যতদূর চোখ যায় শুধু বন আর বন। সেই প্রাসাদে থাকত এক রাজা। তাকে সবাই খুব ভয় করত। রাজার প্রাসাদের চারিদিক ঘিরে অনেক প্রজা তাদের বাসা বেঁধেছিল।

একদিন সন্ধেবেলা উঠোনে রাজার খাবার তৈরি হচ্ছে। ওপরে খোলা আকাশ, চাঁদের আলো এসে পড়েছে ফুটন্ত সব খাবারের ওপরে। প্রায় সব রান্নাই শেষ, শুধু মাংসটাই বাকি আছে। আজকে রাজার জন্য ভেড়ার মাংস করা হচ্ছে।

মাংস যখন কড়াইতে ফুটছে সেই সময় উড়ে যাচ্ছিল একটা বাজপাখি, পায়ে তার একটুকরো মানুষের মাংস। সে নদীর পাশে পড়ে-থাকা একটা মৃতদেহ থেকে ছোঁ মেরে মাংস নিয়ে বাসার দিকে উড়ে যাচ্ছিল। হঠাৎ টুপ করে সেটা পড়ে গেল রাজার উঠোনের সেই ফুটন্ত কড়াইয়ের মধ্যে। রান্না যারা করছিল তারা কেউ তেমন খেয়ালই করে নি যে, ওপর থেকে কিছু পড়ল।

রান্না শেষ হলে রাজার ঘরে সব খাবার দিয়ে এল তারা। সব খেল সেই পেটুক রাজা, কিন্তু আজকে যেন একটুকরো মাংসের কেমন চমৎকার স্বাদ লাগল। তিনি জীবনে এমন সুন্দর মাংস খান নি, তার অবাক লাগল—তিনি তো শুধু এই খেয়েই থাকতে পারেন—যদি পাওয়া যায় এমন সুস্বাদু মাংস।

যে রান্না করেছে তার ডাক পড়ল। সে কাঁচুমাচু হয়ে দাঁড়াল আর জানাল যে, সে রান্না করেছে ভেড়ার মাংস।

পরের দিন তিনি ভেড়ার মাংস খেলেন, কিন্তু আগের দিনের সেই টুকরোটার সঙ্গে কোন তুলনাই হয় না। তিনি শেষে ছাগল, গোরু, মোষ, এইসবের স্বাদ নিতে লাগলেন। কিন্তু কিছুতেই সেইরকম স্বাদ লাগছে না। তারপরে তিনি আদেশ দিলেন, প্রতিদিন বনের নতুন পশু মেরে আনতে। এতদিন তিনি যে সব পশুর মাংস খান নি, তাদের মাংস খেতে লাগলেন। তবু তার লোভ মিটল না—কোথায় পাবেন তিনি সেইদিনকার মতো এক টুকরো মাংস।

আসলে সেই টুকরোটা ছিল বাজপাখির পা থেকে খসে-পড়া এক টুকরো মানুষের মাংস। তাই যতই তিনি নানা পশু খান না কেন অমন স্বাদ পাবেন কোথা থেকে?

সেই রাজার একটা কেনা চাকর ছিল। তিনি চাকরকে যখন কিনেই নিয়েছেন, তখন যা খুশি তাই তিনি করতে পারেন তাকে নিয়ে। একদিন হঠাৎ তার মাথায় খেলে গেল, মানুষের মাংস তো খাওয়া হয় নি? সেইদিন সেই কেনা চাকরকে বলি দেওয়া হল আর তার মাংস দিয়েই সেদিন রাজার খাবার তৈরি হল।

মাংসের টুকরো মুখে দিয়েই রাজা উঠলেন লাফিয়ে। এতদিন পরে ঠিক মাংসের হদিস পাওয়া গিয়েছে। আজ থেকে নিত্য তার চাই মানুষের মাংস।

তার পরের দিন থেকে তার প্রাসাদে যারা চাকরি করত তাদের এক একজনকে তিনি বলি দিতে লাগলেন। মনের সুখে জিভের সুখ মেটাতে লাগলেন। জীবনে এতদিনে যেন তিনি বাঁচার সত্যিকার মানে খুঁজে পেলেন। গুন্ গুন্ করে গান করেন, প্রাসাদের ছাদে ঘুরে বেড়ান আর খাওয়ার সময়ের জন্য চেয়ে থাকেন।

এমনি করে প্রাসাদের সব্বাইকে তিনি খেয়ে ফেললেন, এমন কি লোভের নেশায় ছেলে-বউও মারা পড়ল। প্রাসাদ এখন শূন্য, তিনি মাত্র একা, চারিদিকে লোক নেই জন নেই খাঁ খাঁ শ্মশান।

এইসব না দেখে আর রাজার রাক্ষুসেপনা স্বভাবের জন্য প্রাসাদের আশেপাশের লোকজনও নদী ডিঙিয়ে পালাল অনেক দূরে, এমন জায়গায় তারা চলে গেল যেখান থেকে রাজা আর তাদের খুঁজে পাবে না।

কেউ রইলনা মানুষ-খেকো রাজার কাছে, কিন্তু সন্ধে হলেই তিনি ক্ষেপে যেতেন মানুষের মাংস খাওয়ার জন্য। প্রাসাদের ছাদে ঘোরাফেরা করতেন, ছট্‌ফট্ করে বেড়াতেন, হাতের চামড়ায় কামড় বসাতেন।

শেষকালে আর থাকতে না পেরে তিনি নিজের হাঁটুর ওপরের কিছুটা মাংস কেটে রান্না করে তাই খেলেন। অনেক তৃপ্তি পেলেন তিনি। পরের দিন অন্য হাঁটুর ওপরের মাংস কাটলেন। পরের দিন বুকের, অন্যদিন পেটের, আরেকদিন হাতের।

এমনি করে দিন পনেরো যেতেই তার গায়ে শুধু হাড় ছাড়া আর কিছুই থাকল না। গোটা দেহের হাড়ের ওপরে মাথায় কোঁকড়ানো চুল, দেহে মাংসের একরত্তিও নেই। তিনি যখন চলতেন খট্‌খট্ করে হাড়ের আওয়াজ হত, কট্‌কট্ করে পায়ের পাতার হাড়গুলো কথা কয়ে উঠত।

শেষে তিনি বেরিয়ে পড়লেন প্রাসাদের বাইরে, মানুষের মাংস খোঁজ করতে! তিনি চলেছেন এগিয়ে, নদী ডিঙিয়ে, বন পেরিয়ে, মাঠ ছাড়িয়ে। কিন্তু কোথাও নেই মানুষ, সবাই রাজার কথা শুনে সে মুলুক ছেড়ে একেবারে পালিয়েছে। মানুষ আর তাই কোথায় পাবেন রাজা!

তবু হাল তিনি ছাড়েন নি। অন্যের মাংস তার চাইই, নিজের দেহে তো একরত্তিও মাংস নেই।

এমনি করে কয়েকদিন কাটল। না খেয়ে তিনি বড্ড দুর্বল হয়ে পড়েছেন, হাড়গুলো কেমন রোগা রোগা কাঠির মতো হয়ে গিয়েছে। কিন্তু তবু যে তাকে চলতেই হবে। একসময় খুব ক্লান্ত হয়ে বিরাট মোটা একটা গাছের তলায় তিনি ঠক্ করে বসে পড়লেন। হাড়গুলোর খটাখট্ আওয়াজ হয়েই থেমে গেল, তিনি জোরে জোরে নিঃশ্বাস নিতে লাগলেন।

হঠাৎ গাছের অন্য পাশে তিনজন লোক এসে বিশ্রাম করতে বসল। পোঁটলা খুলে কিছু খেল, গল্পগুজব করল। রাজা গুটিসুটি মেরে এমনভাবে বসে রইলেন যেন তারা তার হাড়-দেহ না দেখতে পায়। তিনি নিঃশ্বাসও চেপে চেপে ছাড়লেন, হাত-পা একটুও নাড়লেন না, যদি খট্‌খট্ আওয়াজ হয়।

বেশ কিছুক্ষণ পরে সেই তিনজন লোক তাদের পোঁটলা-পুঁটলি নিয়ে রাস্তা হাঁটতে

শুরু করল। তারা কিন্তু এসেছে অনেকদূর থেকে, তাই মানুষ-খেকো রাজার নাম শোনে নি। তারা উঠতেই রাজা তাদের পিছু নিলেন। আস্তে আস্তে তিনি এগোলেন, খেয়াল রাখলেন একজনের ওপর, একটু কায়দামাফিক পেলেই ধরবেন চেপে তার গলা...আর যেন জিভের রসে রাজা আর চিন্তা করতে পারছেন না।

হঠাৎ একটা মোড় বেঁকতেই খপাৎ করে একেবারে পিছনের লোকটির মুখটা জোরে চেপে ধরলেন তিনি তার হাড়-হাত দিয়ে। অন্য হাতে চেপে ধরলেন গলায় শক্ত মুঠোয়। একে আঘাত, তায় হাড়ের দেহ দেখে লোকটা তক্ষুনি মরে গেল। গড়িয়ে পড়ল তার দেহ। ঘন বনের অন্ধকারে সামনের দুজন ভাবল, বন্ধু বুঝি আসছেই।

রাজা খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন। রাস্তা থেকে দেহটা সরানো দরকার। নইলে অন্য কেউ যদি চলে আসে। তিনি প্রাণপণে দেহটাকে টানতে গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়লেন দেহটার ওপর। এত দুর্বল তিনি হয়ে পড়েছেন না খেয়ে খেয়ে যে পড়েই তিনি মরে গেলেন। তার হাড়ের শরীরের নীচে বলিষ্ঠ লোকটার নরম দেহটি তখনও বেশ গরমই ছিল।

তিন পড়শি

সমস্ত মাঠ ভরে সোনার রঙের ধান ফলেছে। তার ওপর দিয়ে মিষ্টি বাতাস ঢেউ খেলে চলেছে। দুই পড়শি ভালুক আর নেকড়ের আনন্দের সীমা নেই—অন্তত খিদের চিন্তা আর সারাবছর করতে হবে না। কিন্তু কাজ তো কম নয়। তাই তারা তাদের আর এক পড়শি শেয়ালকে ডাকল। ভালুকের দেহ বিশাল, খাটতেও সে পারে তেমনি। শেয়াল খুশি মনে তাদের দলে এল, তারও চিন্তা থাকবে না পেটের। মাঠ ভর্তি যে সোনার রঙের ধান।

ধান কাটা হয়ে গেল। শেয়াল একটুও কাজ করল না, পুরো ফাঁকি দিল। এখন ধান ঝাড়া-বাছার সময় হল। নেকড়ে বলল, 'এখন শুধু কাজের কথা, এই বিরাট কাজ আমাদের তিনজনকে ভাগ করে নিয়ে শেষ করতে হবে।' শেয়াল তৎক্ষণাৎ ঘেরা-দেওয়া কাঠের পাঁচিলের ওপর উঠে গিয়ে বলল, 'এই কাঠগুলো যাতে তোমাদের মাথায় পড়ে না যায় তার জন্য আমি এগুলোকে জোরে ধরে রাখি। এগুলো যদি গোড়া উপড়ে পড়ে তাহলে আর তোমাদের বাঁচতে হবে না।' দুজনে রাজি হয়ে গেল তার ভয়-পাওয়ানো কথায়, সত্যি তারা বড্ড ভয় পেয়েছে।

নীচে হাড়ভাঙা খাটুনি খাটতে লাগল সেই নেকড়ে আর ভালুক। তারা কাঠের পাটাতনে খড় থেকে ধান ছড়াচ্ছে, ধান ভানছে, কুটছে ও ঝাড়ছে। ওপরে ঠায় বসে রইল সেই শেয়াল, গতর সে খাটাবে না। মাঝে মধ্যে শেয়াল ঝুলে-পড়া গাছের ডাল থেকে টুকরো ভেঙে নিয়ে নেকড়ে ও ভালুকের মাথায় মারতে লাগল। ওরা কাজে ব্যস্ত, তাই বুঝল না শেয়ালের শয়তানি। হঠাৎ ভয় পেয়ে ভালুক বলল, 'শেয়াল, এমন হচ্ছে কেন?'

শেয়াল খুব গলা কাঁপিয়ে বলল, 'এই কাঠগুলো ধরে রাখা খুব কঠিন, আমি একা পারছি না। তাও তো দু-একটি কাঠের টুকরোই ছিটকে পড়ছে, তাই রক্ষে। গোটা কাঠ পড়লে তো এক্কেবারেই মরে যাবে। ছোট কাঠের টুকরো মাঝে মাঝে ছুটে যাবে, কিন্তু ওতে ভয় পেয়ো না।' সে শয়তানি করে একটু বাদে বাদেই কাঠ ছুড়তে লাগল।

সমস্ত দুপুর হাড়ভাঙা খাটুনির পরে কাজ শেষ হল। যেই ওপর থেকে শেয়াল দেখল যে, সব কাজ শেষ হয়ে গিয়েছে, অমনি উঁচু থেকে লাফিয়ে পড়ল মাটিতে তাদের মাঝখানে। মাটিতে পড়েই সে চিৎ হয়ে শুয়ে লম্বা জিভ বের করে হাঁইফাঁই করে নিঃশ্বাস টানতে লাগল, যেন সে খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। পাশে নেকড়ে ও ভালুক তখন ক্লান্তিতে ভেঙে পড়েছে, বুকের ভেতরে কে যেন হাতুড়ি পিটছে। শেয়াল বলল, 'ওঃ, আমার খুব আনন্দ হচ্ছে এই ভেবে যে আমার কাজটা আমি খুব ভালোভাবে শেষ করতে পেরেছি। জীবনে এত খাটুনি আমি কোনদিন করি নি।'

নেকড়ে বলল, 'তাহলে এখন আমাদের উচিত এই শস্যগুলো তিনজনের মধ্যে ভাগ করে নেওয়া।'

শেয়াল খুব মিষ্টি গলায় বলল, 'তোমরা যদি আমার কথা শোন, তাহলে আমি একটা কথা বলতে পারি।'

নেকড়ে আর ভালুক একসঙ্গে বলল, 'সেকি কথা! তুমি কিছু বলবে তাতে আর বলার কি আছে! বল বল।'

শেয়াল তখন বলল, 'আমরা এখানে তিনজনে আছি, আর দেখ ভগবানের দয়ায় শস্যও মাটিতে তিনভাগ হয়ে আছে। আমাদের মধ্যে যার দেহ সবচেয়ে বড় সে পাবে বড় ভাগটা, মধ্যের ভাগটা পাবে যার দেহ মাঝারি, আর ছোট ভাগটি পাবে সে যার দেহ সবচেয়ে ছোট। তাই ভালুক পাবে বড় ভাগটি, মধ্যের ভাগটি পাবে নেকড়ে আর সবচেয়ে ছোট ভাগটি পাব আমি শেয়াল। কি তোমরা খুশি তো?'

বোকা নেকড়ে ও হাঁদারাম ভালুক তাই মেনে নিল, ভালুক পেল বিরাট খড়ের গাদা, নেকড়ে পেল জড়ো-করা ধানের তুষের পাহাড়। আর ঝক্‌ঝকে পরিষ্কার আসল ধানের অংশটি পেল শেয়াল।

এইভাবে নিজেদের অংশ পেয়ে তারা চলল ধান ভানতে। তিনজনেই একসঙ্গে ধান-ভাঙার কলের কাছে গেল। প্রথমে ভালুক ও তারপরে নেকড়ে তাদের খড় ও তুস কলে দিল ও আনন্দে নাচতে লাগল। কিন্তু যেই শেয়াল তার অংশ কলে দিল, সেই মুহূর্তে কি রকম একটা ঘরঘর আওয়াজ শোনা গেল, এ আওয়াজ ভালুক ও নেকড়ের ভাগ দেওয়ার সময় হয় নি।

এই আওয়াজ শুনে তারা বলল, 'শেয়াল, আমাদের সময় এরকম শব্দ হল না কেন?'

শেয়াল বলল, 'হায় কপাল। তোমাদের ভাগে বোধহয় বালি মেশাওনি। কিছুটা বালি মিশিয়ে কলে দাও, তোমাদেরটাতেও হব্দ হবে।'

এই কথা শুনে ভালুক ও নেকড়ে তাদের ভাগে কিছুটা করে বালি মিশিয়ে নিল। তখন তাদের শস্যের শব্দ হল, এমন কি শেয়ালের শস্যের চেয়েও বেশি। তারা সাদাসিধে, তাই সেই আনন্দে নাচতে লাগল। সেই ফাঁকে পিঠে চালের বস্তা নিয়ে শাঁকালুর মতো দাঁত বের করে হাসতে হাসতে শেয়াল লেজ ফুলিয়ে বনের পথে মিলিয়ে গেল।

একশো গোরুর বদলে একটি বউ

অনেক পুরনো কালের কথা। সেই কালে এক গাঁয়ে থাকত একজন লোক আর তার বউ। বহুদিন ধরে তারা সেই গাঁয়ে ঘর-সংসার করছে। অনেক অনেক বয়সে তাদের একটা ছেলে হল। দুজনের মনেই খুব আনন্দ। সকাল বেলার রোদের মতো ঘর আলোতে ভরে গেল। সে যে কি আনন্দ তা তারা বোঝাবে কেমন করে?

তাদের অবস্থা মোটামুটি বেশ ভালোই ছিল। কেননা, তাদের ছিল একশো গোরু। যদিও গোরুগুলোর কোন বাছুর ছিল না তবু সুখে দিন কেটে যেত। তাদের জমি-জিরেত ছিল না, কিন্তু একশোটা গোরু কম কিসে!

বাগানের গাছ যেমন দেখতে দেখতে বড় হয়, পুষ্ট হয়, ছেলেও তেমনি বেড়ে উঠল। ছেলের বয়স হল পনেরো। মাঠে-বনে গোরু চরিয়ে ছেলের স্বাস্থ্য হয়েছে সুন্দর, সবল। তাকে এখন জোয়ান মনে হয়।

কিন্তু হঠাৎ ছেলেটির বাবা মারা গেল। একটু মুষড়ে পড়ল সে। আবার কয়েকদিন পরে সব ঠিক হয়ে গেল। বছর তিনেক পরেই তার মা-ও মারা গেল। ছেলেটি খুব কাঁদল। বড় একা সে। বাবা-ও নেই, মা-ও নেই। শুধু বাবা-মায়ের রেখে যাওয়া একশো গোরু সে পেল। আর তো কেউ নেই, তাই সে-ই হল এসবের উত্তরাধিকারী।

কয়েকদিন সে বাড়িতেই রইল। মায়ের শ্রাদ্ধশ্রান্তি করল। যা যা ছেলেদের করতে হয়, সবই ভালোভাবে করল। বাবা-মা যে তার বড় আপনার জন ছিল।

এমনি করে বেশ কিছুদিন কেটে গেল। যতক্ষণ বাইরে থাকে, বেশ থাকে। কিন্তু বাড়িতে এলেই বড় একা লাগে। কথা বলার কেউ নেই, সুখ-দুঃখের গল্প করার কেউ নেই। এমনি করে আর কতদিন চলবে? তাই ছেলেটি ঠিক করল,—সে বিয়ে করবে।

একদিন এক পড়শিকে সে বলল, 'আমি বিয়ে করব। বাবা মা মারা গেল, আর তো আমার কেউ নেই। আমি বড় হয়েছি। একা একা ভালো লাগে না। তাই বিয়ে করতে চাই। তুমি কি বল?'

পড়শি খুব খুশি হয়ে বলল, 'ঠিক কথা, বিয়ে তো করাই উচিত। বড় হয়েছ, তার ওপর বাবা মা নেই। একা একা তো লাগবেই! বিয়ে তো করতেই হবে।'

ছেলেটিও পড়শির কথা শুনে খুব খুশি হল। লাজুক লাজুক মুখে বলল, 'তাহলে, তাহলে মেয়ে তো তোমাদেরই খুঁজেপেতে দিতে হবে। আমি তো কিছু জানি না।'

পড়শি মাথা নেড়ে বলল, 'আরে! সে তো আমাদেরই করতে হবে। এ তো আমাদের কর্তব্য। তোমার বাবা নেই, মা নেই, আমরাই তো এসব দেখব। তোমার জন্য একটা খুব সুন্দরী মেয়ে দেখব, সে তোমার খুব ভালো বউ হবে।'

'তাহলে, তাই দেখ।' ছেলেটি বলল। একটু চুপ করে থেকে আবার বলল, 'একজন যদি মেয়ের খোঁজে বেরিয়ে পড়ে তবে খুব ভালো হয়। তাড়াতাড়ি করাই ভালো।'

পড়শি বলল, 'বনের দেবতা, থানের দেবতা ভালো করবেন। তার ইচ্ছেতেই সব হবে।'

গাঁয়ের সবাই মিলে পরামর্শ করল। বউ হবে সুন্দরী আর খুব ভালো। পরের দিন সকালে একজন পড়শি বেরিয়ে পড়ল মেয়ের খোঁজে। অনেক অনেক দূর যেতে হতে পারে, তাই সঙ্গো নিল খাবার। যতক্ষণ আর যতদিন সে ময়ে খুঁজে না পাবে, ততদিন আর গাঁয়েই ফিরবে না। ঘুরতে ঘুরতে সে ভালো পাত্রী পেল। গাঁয়ে ফিরে এল।

পড়শি ছেলেটিকে বলল, 'হ্যাঁ, শেষকালে পাত্রী পেলাম। কিন্তু সে এ গাঁয়ের মেয়ে নয়, পাশের গাঁয়েরও নয়। সে থাকে এখান থেকে অনেক দূরে। তবে তুমি যেমনটি চাও ঠিক তেমনি।'

ছেলেটি বলল, 'সে কার মেয়ে?'

পড়শি খুব উৎসাহে বলতে লাগল, 'সে মেয়ে খুব বড়লোকের মেয়ে। তার ছয় হাজার গোরু-মোষ আছে। শুধু কি তাই? ওই মেয়েই তার একমাত্র সন্তান। একটাই মেয়ে, আর কোন ছেলেপুলে নেই। বুঝতেই পারছ, সব পাবে ওই মেয়েই।'

একথা শুনেই ছেলেটি খুশিতে ডগমগ হয়ে উঠল। সে ভাবল, এমন মেয়েকেই বিয়ে করতে হয়। এ মেয়েকেই সে বিয়ে করবে। মুখে বলল, 'ভাই, আমি রাজি। এই মেয়েকেই আমি বিয়ে করব। তুমি কালকেই মেয়ের বাবাকে মতটা জানিয়ে দিতে পারবে?'

পড়শিও পাত্রী ঠিক করতে পেরে খুব খুশি। তার পছন্দ-করা মেয়েকে ছেলেটি বিয়ে করতে চেয়েছে, এটা কি কম কথা? তাই তাড়াতাড়ি বলল, 'আরে, এ আর বেশি কথা কি? বনের দেবতা, থানের দেবতা ভালো করবেন, তার ইচ্ছেতেই সব হবে। কাল সকালেই আমি মেয়ের বাবার গাঁয়ে রওনা হব। কোন কিছু ভেবো না তুমি।'

সবে পুব দিকে সূর্য লাল হয়েছে। লাল ছটা আকাশে রক্ত ছড়াচ্ছে। পড়শি খাবার বেঁধে রওনা দিল দূর গাঁয়ের পথে। সূর্য যখন আকাশে আগুন ছড়াচ্ছে, পথের মাটি যখন উনুনের ধারের মতো গরম হয়ে উঠেছে, তখন পড়শি পৌঁছল সেই গাঁয়ে, মেয়ের বাবার বাড়িতে। ছেলেটির মনের কথা সব জানাল। ছেলেটির কথা সব খুলে বলল।

বাবা বলল, 'বেশ, শুনলাম তোমার কথা। শুনলাম ছেলেটির মনের কথা। কিন্তু বাপু, আমার মেয়ে কেমন তা-তো জানই। কন্যাপণ তো তেমন কম নিতে পারি না। তা যখন ছেলেটির মনে ধরেছে, তখন একশোটা গোরু দিলেই চলবে। ছেলে যদি রাজি থাকে, তবে আমি কথা দিচ্ছি মেয়েকে আমি তার হাতেই দেব। একশোটা গোরু। দেখ, সে রাজি কিনা।'

ঘটক পড়শি বলল, 'বনের দেবতা, থানের দেবতা ভালো করবেন, তার ইচ্ছেতেই সব হবে। আমি একথাই ছেলেটিকে জানাব। তাহলে চলি।'

বাবা বলল, 'হ্যাঁ, ওই কথাই রইল।'

ঘটক পড়শি মাথা নুইয়ে অভিবাদন জানিয়ে সেখান থেকে রওনা হল। গাঁয়ে ফিরে এসে সে সব কথা ছেলেটিকে জানাল। মেয়ের বাবার সঙ্গে যা যা কথা হয়েছিল, সব খুলে বলল।

সব শুনে ছেলেটি বলল, 'ভাই, সব তো বুঝলাম। কিন্তু মেয়ের বাবা একশোটা গোরু চেয়েছে, আর আমার তো ওই একশোই সম্বল। জমি নেই, জিরেত নেই, অন্য কোন কিছুই নেই। মনে কর আমি তাকে সব দিয়ে দিলাম, তাহলে আমি আর বউ খাব কি? বাঁচব কেমন করে? আমার তো একশোটা গোরু ছাড়া আর কিছুই নেই। বাবা-মা আমার জন্য আর তো কিছু রেখে যায়নি। কি করি বলতো?'

পড়শি বলল, 'সে তো ঠিক কথা। সব দিয়ে দিলে তোমরা দুজনে খাবে কি? তা এই যখন অবস্থা, তুমি কি আর সেই মেয়েকে বিয়ে করতে পারবে? তুমি বলে দাও, ও মেয়েকে তুমি বিয়ে করতে পারবে না। বড় বেশি চাহিদা। আমি তাহলে মেয়ের বাবাকে সে কথাই জানিয়ে আসি। আর তোমার যদি বাপু মত থাকে, তাও বলো। সে খবরও পৌঁছে দিতে পারি।'

চুপ করে রইল ছেলেটি, মাথাটি তার ঝুঁকে রয়েছে, হাতদুটো কোলের ওপরে। বেশ চিন্তিত। অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে রইল তারা। ছেলেটি কোন কথা বলছে না দেখে পড়শি উঠে পড়ল। হঠাৎ ছেলেটি বলল, 'নাঃ, যা হবার হবে, ওই মেয়েকেই আমি বিয়ে করব। বাবার শর্তে আমি রাজি। তুমি সেকথাই বল, একশো গোরু আমি দেব, অমন মেয়ের বদলে সবই আমি দেব। মেয়ের বাবাকে খবর দাও, আমি একশো গোরু দিয়ে তার মেয়েকে নিয়ে আসব।'

পরের দিন ভোর হতেই পড়শি চলল দূর গাঁয়ের পথে। আজ সে আরও তাড়াতাড়ি চলছে। অন্য দিনের চেয়ে সে আগেই পৌঁছে গেল। মেয়ের বাবার বাড়িতে পৌঁছেই খবর দিল, 'হ্যাঁ, ছেলে রাজি হয়েছে। সে একশো গোরুই পণ দেবে। যদিও তার আর কিছুই নেই তবু সে সব দেবে। ছেলে মত দিয়েছে।'

বাবা হাসিমুখে বলল, 'তাহলে আমিও রাজি। সে আমার মেয়েকে বিয়ে করে নিয়ে যেতে পারে।'

তারপরে পড়শি ও বাবা খাওয়া-দাওয়া সেরে খুঁটিনাটি সব আলোচনা করল। অনেক কথা হল। শেষকালে ঠিক হল, সেই গাঁয়ের একজন মাতব্বর ছেলেকে আনতে যাবে। সব কথা পাকা করে নিজের গাঁয়ে ফিরে এল পড়শি।

যে দিন ঠিক করা ছিল সে দিন মাতব্বর ছেলেটির বাড়ি এল। খুব যত্নআত্তি করে ছেলেটি তাকে সেবা করল। খুব খাওয়া-দাওয়া হল। তারপর বিয়ে নিয়ে নানান কথা হল।

মেয়েটির সঙ্গে ছেলেটির বিয়ে হয়ে গেল। কথামতো ছেলেটি মেয়ের বাবাকে তার সম্পদ একশোটা গোরু দিয়ে দিল। মেয়েকে বিয়ে করবার পণ হিসেবে। বিয়েতে খুব খাওয়া-দাওয়া হল। পাড়া-পড়শি সবাই প্রাণ খুলে আনন্দ করল। সবাই খুশি।

ছেলেটি বউকে নিয়ে নিজের গাঁয়ে ফিরে এল। মেয়ে-জামাইয়ের সঙ্গে অনেক কিছু খাবার-দাবার এল। সেগুলো মেয়ের বাবাই দিল। চোখের জল মুছে মেয়ে নতুন সংসার পাতল।

এমনি করে দশদিন কাটল। বাবার পাঠানো খাবার-দাবারে বেশ আনন্দেই দিন কাটল। দুজনেই খুব খুশি।

দশদিন পরে ছেলেটি চমকে উঠল। সব খাবার শেষ। অন্য কোন উপায় নেই। এখন সে-ই বা কি খাবে আর বউকেই বা কি খেতে দেবে? পেটে দেবার কিছুই যে অবশিষ্ট নেই। এ কি হল?

ছেলেটি শুকনো মুখে বলল, 'বউ, আমার তো আর কিছুই নেই। তুমি বাপের বাড়ি থেকে যা এনেছিলে সব ফুরিয়ে গেল। তোমার আমার পেট চলবে কেমন করে? সে একদিন ছিল যখন আমার বাড়িতে প্রচুর দুধ হত। অনেক গোরু। আমি দুধ দোহাতাম, অনেক দুধ। আর বিনিময়ে কত কিছুই পেতাম। কিন্তু সব গোরু তোমার বাবাকে দিতে হল। তোমাকে পাবার জন্য আমি সবই দিয়ে দিলাম। বউ এখন কি করি?'

বউ কোন কথা বলল না। চুপ করে মাথা নিচু করে বসে রইল। স্বামীর মুখের দিকেও তাকাল না। ছেলেটি কেমন যেন ভেঙে পড়েছে।

কিছুক্ষণ পরে ছেলেটি আবার বলল, 'বউ, এক কাজ করি। তোমার হয়তো খারাপ লাগবে। কিন্তু উপায় কি বল? আমার গাঁয়ে অনেক পড়শির গোরু মোষ আছে। আমি তাদের দুধ দোহাবার কাজ নি। তাতে দিন-মজুরি পাব। তাতেই পেট চালাতে হবে। অন্য উপায় তো দেখি না বউ।'

বউ আস্তে আস্তে বলল, আমি তোমার বউ,। তুমি যা বলবে তাই হবে। তুমি তাই কর।'

ছেলেটি তো এখন আর ছোট নেই। সে পুরো যুবক হয়ে উঠেছে। অনেক কিছু ভাবতে শিখেছে, অভিজ্ঞতাও বেড়েছে। একদিন তার কত কি ছিল, আজ তার কিছু নেই। তার মনে খুব কষ্ট হল। বিয়ের পর দশদিন যেতে না যেতেই তাকে এমন অবস্থায় পড়তে হল । কিন্তু কি আর করে। পড়শিদের গোরু-মোষের দুধ দুইতে গেল। আর সেদিন থেকে এই গোরু দোহাবার দিন-মজুরিই হল তার পেশা। প্রতিদিন এই কাজে সে সকাল বেলা বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ত। ফিরত দুপুর বেলা, আকাশ যখন আগুন ছড়ায়।

এমনি করে কষ্টে দিন যায়। তারা দিন আনে দিন খায়। স্বামী যতক্ষণ না ফেরে বউয়ের তেমন কোন কাজ নেই। সে এলে তবেই রান্না শুরু হয়। খেতে খেতে প্রতিদিনই অনেক দেরি হয়ে যায়।

একদিন দুপুরবেলা। বউ দোরের সামনে চুপচাপ বসে রয়েছে। গালে হাত দিয়ে নানান কথা ভাবছে। ছেলেবেলার কথা, পুরনো দিনের কথা। এমন সময় সামনের পথ দিয়ে যাচ্ছিল এক যুবক। অপূর্ব সুন্দর দেখতে। যুবক তাকিয়ে দেখে একটি মেয়ে চুপ করে বসে রয়েছে। মেয়েটি খুব সুন্দরী। যুবকটি ভাবল, একে বিয়ে করতে পারলে খুব ভালো হয়। এমন সুন্দরী মেয়ে। কিন্তু মেয়েটি তো অন্যের বউ, সে কি তাকে বিয়ে করবে? দেখাই যাক না।

সে একজন ঘটক ঠিক করল। মেয়েটিকে খুব সুখে রাখবে তাও জানাল। ঘটক একদিন এসে মেয়েটিকে যুবকটির মনের কথা জানাল।

বউ বলল, 'বনের দেবতা, থানের দেবতা শুনলেন তুমি কি প্রস্তাব দিলে। তুমি যা বললে তা দেবতাও শুনেছেন, আমিও শুনলাম। কিন্তু যে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছে তাকে যে কিছুদিন অপেক্ষা করতে হবে। এখনও আমার মত নেই। আমার মত হলেই তোমাকে জানাব, তুমি যুবকটিকে তখন খবর দিও। আমি একটু চিন্তা করে নি। এক্ষুনি আমি কিছু বলতে পারব না।'

ঘটক আশা নিয়ে ফিরে গেল। বউয়ের সব কথা যুবককে জানাল।

আরও তিন মাস কেটে গেল। একইভাবে দিন কেটে যাচ্ছে। হঠাৎ তাদের বাড়িতে বউয়ের বাবা এল। অনেকদিন মেয়ের কোন খোঁজখবর পায় না। কেমন আছে মেয়ে জামাই? এইসব ভেবেই বাবা জামাই-এর গাঁয়ে এল। গাঁয়ে পৌঁছে পড়শিদের জিজ্ঞেস করে মেয়ের বাড়ি পৌঁছল। মেয়ে তখন ভেতরে শুয়ে রয়েছে। কাজ নেই, স্বামী বাইরে। সে আর কি করে? তাই শুয়ে ছিল। দরজায় শব্দ হতেই মেয়ে বলল, 'কে'?

বাবা বলল, 'আরে খোল। আমি এসেছি, তোর বাবা।'

মেয়ের তো চোখে জল চলে এল। আনন্দে বুক কাঁপছে। তাড়াতাড়ি উঠেই সে দরজা খুলে দিল। বাবা মেয়েকে কাছে টেনে নিল। তারপরে ঘরে গিয়ে শুধু গল্প আর গল্প। বাবা বলল, 'তা কেমন আছিস বল্।'

মেয়ে বলল, 'বাবা খুব ভালো আছি। তোমার কিচ্ছু চিন্তা করতে হবে না। খুব ভালো আছি। তুমি বিশ্রাম কর, আমি আসছি।'

মেয়ে অন্য ঘরে যেতে যেতে শুনতে পেল, বাবা বলছে, 'আরে, আমার খাবার জন্য তোকে ব্যস্ত হতে হবে না।'

অন্য ঘরে গিয়ে মেয়ে ঝর্ঝর্ করে কেঁদে ফেলল। চোখের জলে বুক ভেসে যাচ্ছে। কান্না চাপতে গিয়ে দম বন্ধ হয়ে আসছে। এ কি হল? এতদিন পরে বাবা এসেছে মেয়েকে দেখতে, অথচ মেয়ের ঘরে একরত্তি খাবার নেই। সব শূন্য। বাবাকে সে কি খাওয়াবে? বাবার জন্য কি রাঁধবে। এখন কি করে সে মুখ দেখাবে? ভাবছে আর কাঁদছে। কাঁদছে আর ভাবছে।

ভাবতে ভাবতে সে পেছনের দরজায় এল। দরজা খুলে উদাস চোখে স্বামীর আসার পথে চেয়ে রইল। হঠাৎ সেই যুবকটিকে সে দেখতে পেল। বুকে বল পেল। বুদ্ধি এল মাথায়। সে যুবকটিকে ডাকল। যুবকটি কাছে এল।

বউ বলল, 'এখানে একা একা কি করছ?'

যুবকটি বলল, 'বেশ কয়েক মাস আগে তোমার কাছে একজন ঘটক পাঠিয়েছিলাম। তোমায় আমি বিয়ে করতে চাই। তা তখন তুমি রাজি হও নি। এখনও কি তোমার মত পালটায় নি? আমি যে দিনেরাতে তোমাকেই স্বপ্ন দেখছি। তুমি কি আমাকে বিয়ে করবে না? আমার বাড়ি যাবে না?'

বউ বলল, 'তুমি যা বললে বনের দেবতা, থানের দেবতা তা শুনলেন। আমি যা শুনলাম দেবতারাও তা শুনলেন। আমি আর তোমাকে অপদস্থ করব না। তুমি যদি সত্যিই আমাকে চাও, আমি দেরি না করে এক্ষুনি তোমার সঙ্গে যাব। কিন্তু তার আগে

তোমাকে একটা কাজ করতে হবে। আমার বাড়িতে একজন অতিথি এসেছে। তার জন্য কিছুটা মাংস চাই। তাকে রান্না করে খাওয়াতে হবে। রান্না-খাওয়া হলেই আমি তোমার সঙ্গে বেরিয়ে পড়ব, তোমার বাড়ি যাব।' কথা বলে উত্তেজনায় বউ হাঁপাচ্ছিল।

'অতিথিটি কে? কোথা থেকে এসেছে?' যুবকটি জিজ্ঞেস করল।

বউ বলল, 'আমার বাবা। দূর গাঁ থেকে আমার বাড়িতে এসেছে। সে-ই অতিথি।'

যুবকটি বলল, 'কোন চিন্তা নেই তোমার। একটু দাঁড়াও, আমি এক্ষুনি মাংস নিয়ে আসছি।'

আনন্দে যুবক চলে গেল। দরজা ধরে দাঁড়িয়ে রইল বউ। আবার চোখ বেয়ে জল পড়ছে, বুক ফুলে উঠছে। এমন সময় যুবক ফিরে এল। তাড়াতাড়ি চোখের জল মুছে ফেলল বউ। যুবক কাছে এল, তার হাতে পাতায় জড়ানো কিছুটা গোরুর মাংস। বউয়ের চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

মাংস বউয়ের হাতে দিয়ে যুবক বলল, তুমি চেয়েছিলে, তাই এনে দিলাম। বেশিক্ষণ দেরি কর না। কতক্ষণ অপেক্ষা করব?'

বউ বলল, 'বনের দেবতা থানের দেবতা তোমার কথা শুনলেন। আমিও শুনলাম। তোমায় আর বেশি দেরি করতে হবে না।'

যুবকের হাত থেকে মাংস নিয়ে বউ উঠোন পেরিয়ে রান্নাঘরে ঢুকল। তাড়াতাড়ি উনুন ধরিয়ে মাংস রান্না করতে বসে গেল বউ।

যে তাকে মাংস দিয়েছিল সেই যুবক বউয়ের বাড়ি থেকে বেশি দূরে গেল না। আশেপাশে ঘুরঘুর করতে লাগল। সেও উত্তেজনায় কোথাও স্থির হয়ে বসে থাকতে পারছে না। গাছতলায় বসে আবার উঠে পড়ে, আবার অন্য গাছের নীচে বসে। মেয়েটি আসবে তো? না শুধুই মুখের কথা।

মাটির হাঁড়িতে মাংস ফুটছে। পাশে গালে হাত দিয়ে বসে রয়েছে বউ। মনে নানা চিন্তা। এমন সময় দিন-মজুরির কাজ শেষ করে তার স্বামী ঘরে ফিরল। ঘরে ঢুকেই দেখে বউয়ের বাবা বসে রয়েছে। তাকে দেখেই সে আঁৎকে উঠল, মুখে ছলাৎ করে রক্ত উঠে এল। এমন অবস্থা যে, কোন কথা তার মুখে এল না। তাকে দেখে বউয়ের বাবা খুব খুশি হল। হাত বাড়িয়ে তাকে কাছে ডাকল। কেমন আছে, সংসার কেমন চলছে—অনেক কিছু জানতে চাইল। কোনরকমে মাথা নেড়ে উত্তর দিয়ে সে চলে এল বউয়ের কাছে। এসে দেখে বউ কি যেন রান্না করছে।

বউকে জিজ্ঞেস করল, 'বউ, কি রাঁধছ?' বউ বলল, 'মাংস।'

অবাক হল স্বামী। সে জিজ্ঞেস করল, 'মাংস? কোথায় পেলে বউ?'

একটু চুপ করে থেকে বউ বলল, 'পাশের বাড়ি থেকে চেয়ে এনেছি। পড়শির বউ দিয়েছে।'

একথা শুনে তার স্বামী একেবারে চুপ করে গেল। কোন কথা বলল না। হায়! সে এত গরিব। আজ অন্যের কাছে ভিক্ষা করতে হচ্ছে। হায়! এমন অবস্থা তার।

তারপরে অস্তে আস্তে স্বামী বলল, 'বউ, আমরা এখন কি করব? আমাদের দুজনেরই খাবার জোটে না, তার ওপরে একজন অতিথি। কি হবে?'

বউ ধরা গলায় বলল, 'আমি কি বলব বল? কেমন করে চলবে তাই-বা বলি কেমন করে? আমি জানি না।'

স্বামী বলল, 'আমি যাদের যাদের বাড়ি কাজ করি মানে গোরু দোহাই, তারা তো বেশ ধনী। তাদের কাছে গিয়ে বলি,—আমার বাড়িতে অতিথি এসেছে। তার জন্য আমায় যা-হোক কিছু দাও, তাকে রান্না করে খাওয়াতে হবে তো! আমি বেশি খেটে সেগুলো শোধ দিয়ে দেব। নাহয় আরও বেশিক্ষণ খাটব। কি বল বউ?'

বউ কোন কথা বলল না। স্বামী ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। তার মালিকদের গিয়ে সব বলল। আসলে এই লোকটি খুব মনোযোগ দিয়ে কাজ করে। তাই মালিকরা সবাই তাকে ভালোবাসে। তার দুর্দিনে তারা তাকে কিছু কিছু জিনিস সাহায্য করল। তাকে তারা মাংস দিল, দুধ দিল, জোয়ার-বাজরা দিল, সে রওনা দিল বাড়ির পথে।

বউয়ের মাংস রান্না শেষ হয়েছে। এমন সময় স্বামী ফিরে এল। বউয়ের হাতে মাংস-দুধ জোয়ার-বাজরা দিল। বউ সেগুলো রান্নাঘরের একপাশে গুছিয়ে রাখল। স্বামী হাতমুখ ধুতে উঠোনে গেল। হাঁড়ি থেকে মাংস ঢেলে বউ সেটা বারকোশে রাখল। বাবাকে খেতে দেবে।

এদিকে যে মাংস দিয়েছিল সেই যুবক বাড়ির আশেপাশেই ঘুরছিল। অনেকক্ষণ হয়ে গেল, বউ তো এল না? সে ব্যস্ত হল। সাতপাঁচ ভেবে সে বাড়ির খুব কাছে এল। সামনের দিকের দরজা খোলা দেখে সে দাওয়ার নীচে দাঁড়িয়ে উঁকি মারল। হয়তো বউকে দেখা যাবে। দেখল, ভেতরে বসে একজন বুড়ো-মতন লোক ও বউয়ের স্বামী পাশাপাশি গল্প-গুজব করছে। চোখাচোখি হতেই যুবক মাথা নুইয়ে অভিবাদন জানাল, বউয়ের স্বামীও মাথা নোয়াল। স্বামী ছেলেটিকে চেনে না, কিন্তু অভিবাদন যখন করেছে, তখন ভেতরে ডাকাই উচিত। তার ওপরে ভর-দুপুরে একজনকে কি বাইরে দাঁড়িয়ে থাকতে বলা যায়? স্বামী তাকে হাত নেড়ে ডাকল। সঙ্গে সঙ্গে যুবকটি দাওয়া পেরিয়ে ভেতরে এসে ঢুকল আর স্বামীর পাশে বসল।

স্বামী তো আর অচেনা লোকটার মনের কথা কিছুই জানে না, তাই বন্ধুর মতো আলাপ করতে লাগল। সে তো জানে না, এই লোকটিই তার বউকে বাড়ি থেকে বের করে নিয়ে যেতে চায়। সব পাকা করে ফেলেছে। তারা তিনজন আলাপ-আলোচনা কথাবার্তা বলতে লাগল। বউয়ের বাবা, বউয়ের স্বামী আর অসাধু জানোয়ার—এই তিনজন। এই জানোয়ার তাদের ঘরের শান্তি নষ্ট করতে চায়। তারা গরিব তবু শান্তিতে রয়েছে। তারা গরিব তাই শান্তি নষ্ট করা সহজ। সেই সুযোগই নিচ্ছে জানোয়ারটা। পাশাপাশি বসে তারা গল্প-গুজব করছে। কতই না বন্ধুত্ব। হায়!

বউ বারকোশে মাংস নিয়ে ঘরে ঢুকল। তাকিয়ে দেখে তিনজন পাশাপাশি বসে গল্প-গুজব করছে। ছোট ছোট তিনটে বারকোশে মাংস ঢেলে সে এগিয়ে দিল তাদের দিকে। তিনজন যখন হাত বাড়িয়ে খাবার নিতে গেল, তখন বউ বলল, 'এখন তিন বোকা মিলে খাওয়া শুরু কর।'

বাবা অবাক চোখে মেয়ের দিকে তাকিয়ে রইল। বলল, 'আমি বোকা? বোকামির কি কাজ করলাম?'

মেয়ের চোখ ছল্ছল্ করে উঠল। আস্তে আস্তে বলল, 'বাবা, আগে তোমরা খেয়ে নাও। পরে বলব তোমরা তিনজনেই কি বোকামি করেছ।'

বাবা রেগে গেল। বলল, 'আমি কিছুতেই খাব না। এক টুকরোও মুখে দেব না।

আগে তোমায় বলতে হবে কেন তুমি আমায় বোকা বললে? তারপরে তোমার বাড়িতে আমি খাব। নইলে নয়।'

মেয়ে আর কি করে! তাকে বলতে হল। সে বলল, 'বাবা, তুমি এক মহামূল্য জিনিস খুব সস্তায় বিক্রি করে দিয়েছ। মানে। অতি সামান্য জিনিসের বদলে খুব দামি জিনিস বিক্রি করেছ।'

বাবা অবাক হয়ে ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস করল, 'আমি? দামি জিনিস সস্তায় বিক্রি করেছি? মনে পড়ছে না তো! কোন জিনিস?'

মেয়ে মাথা নামিয়ে বলল, 'সে জিনিস আমি। তুমি আমাকে বড় সস্তায় বিক্রি করে দিয়েছ।'

বাবা আরও অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কেমন করে?'

মেয়ে এবার সোজা বাবার চোখের দিকে তাকিয়ে উত্তর দিল, 'বাবা আমি ছাড়া তোমার আর কোন মেয়ে নেই। এমন কি আমার আর কোন ভাইও নেই। আমি তোমার একমাত্র সন্তান। সেই তুমি একশোটা গোরুর বিনিময়ে আমাকে বিক্রি করে দিলে। অথচ তোমার নিজেরই ছয় হাজার গোরু-মোষ রয়েছে। একশোটা গোরু তোমার কাছে অনেক বেশি মূল্যবান হল,—আমার চেয়েও বেশি। তুমি বেশি দামি জিনিসের মূল্য বুঝলে না, তাকে এইভাবে বিকিয়ে দিলে। তাই তোমাকে বলেছি, তুমি মহামূল্য জিনিস খুব সস্তায় বিক্রি করে দিয়েছ। ঠিক না?'

বাবা মাথা নামিয়ে চুপ করে বসে রইল। অল্পক্ষণ পরে বলল, 'ঠিক কথা। আগে কোনদিন ভাবিনি। তুমি ঠিক ধরেছ। এ আমি কি করেছি? সত্যি আমি বোকা।'

তারপরে বউয়ের স্বামী ভয়ে ভয়ে বলল, 'আমি কেন বোকা? আমি কিরকম বোকামি করেছি।'

বউ বলল, 'তুমি আরও বেশি বোকা। বাবার চেয়েও বেশি।'

স্বামী বলল, 'কেমন করে?'

বউ করুণভাবে হাসল। বলল, 'তোমার ছিল একশোটা গোরু। এগুলো তুমি তোমার বাবা-মায়ের কাছ থেকে উত্তরাধিকারী হিসেবে পেয়েছিলে। তুমি জানতে, তোমার গোরুগুলোর কোন বাচা-কাচ্চা নেই, শুধুই একশো গোরু। আমাকে বিয়ে করার লোভে তুমি জ্ঞান হারালে। আমার বিনিময়ে সব গোরু কনেপণ হিসেবে দিয়ে দিলে। তোমার তো আর কিছুই নেই। তোমার গাঁয়ে কত মেয়ে রয়েছে। তাদের কনেপণ ছিল দশটা কি বিশটা গোরু। তুমি তোমার অবস্থা বুঝলে না। তাদের বিয়ে করলে তোমার আরও অনেক গোরু থাকত। শুধু তুমি আমাকেই বিয়ে করতে গেলে। বিয়ের পর তুমি কি খাবে, বউকে কি খেতে দেবে—এসব মোটেই চিন্তা করলে না। বিয়ের দশদিন পরেই সব ফুরিয়ে গেল। আমাদের দুজনের খাওয়ার মতো কিছুই রইল না। তোমার অনেক ছিল, বুদ্ধির দোষে তুমি আজ দিনমজুর। অন্যের দয়ায়, অন্যের অপমান সহ্য করে তোমার দিন চালাতে হয়। অথচ তোমার তো এমন হবার কথা নয়। অন্যদের গোরুর দুধ দুইয়ে তোমার পেট চালাতে হয়। অথচ তোমার অনেক গোরু ছিল। তুমি যদি অর্ধেক গোরু কনেপণ দিয়েও তোমার গাঁয়ের কোন মেয়েকে বিয়ে করতে, তবে আরও অর্ধেক গোরু

তোমার থাকত। খাওয়ার চিন্তা করতে হত না। তাই মনে করে দেখ, তুমি আরও বেশি বোকা কিনা।'

হতচ্ছাড়া জানোয়ার যুবকটি কর্কশভাবে জিজ্ঞেস করল, 'খুব তো বড় বড় কথা হচ্ছে। তা, আমি বোকা কিসে? আমি তো কোন বোকামি করি নি। এবার বল।'

বউ বলল, 'বাবা আর স্বমীর চেয়ে তুমি আরও বেশি বোকা। তিনজনের মধ্যে তোমার বোকামি সবচেয়ে বেশি।'

যুবকটি বলল, 'কেমন করে?'

বউ ঠোঁটের ফাঁকে একটু হেসে উত্তর দিল, 'তুমি আমাকে তোমার বাড়ি নিয়ে যেতে চেয়েছিলে। তুমি আমাকে ঘর থেকে বের করে নিয়ে যেতে চেয়েছিলে। কিসের বিনিময়ে? কিছুটা গোরুর মাংসের বিনিময়ে। হায় কপাল! তুমি আমাকে কিছুটা মাংসের বিনিময়ে কিনতে চেয়েছিলে। সেই আমি যাকে একশোটা গোরুর বিনিময়ে কিনতে হয়েছে। তাই মনে করে দেখ, তুমি কি এদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি বোকা নাও?'

অসাধু জানোয়ার বসার চৌকি থেকে এক লাফে নেমেই দৌড় দিল। একবারও পেছনে তাকাল না, বনের পথে সে মিলিয়ে গেল।

বাবা মেয়ে-জামাই-এর সঙ্গো আরও দুদিন থাকল। তৃতীয় দিনে যাওয়ার জন্য তৈরি হল। মেয়ে জলভরা চোখে বাবাকে বিদায় দিল। বাবার চলে যাওয়ার পথের দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইল। দরজা ধরে দাঁড়িয়ে রয়েছে মেয়ে। বাবাকে আর দেখা যাচ্ছেনা। পথের বাঁকে মিলিয়ে গেল।

বাবা গাঁয়ে ফিরে এসে জামাইয়ের একশোটা গোরুকে এক জায়গায় আনল। নিজের গোরু-মোষ থেকে আরও দুশোটা গোরু-মোষ তার সঙ্গো রাখল। একজন কিষানকে সঙ্গো দিল। কিষান তিনশো গোরু-মোষ নিয়ে মেয়ে-জামাইয়ের গাঁয়ের দিকে রওনা দিল।

মেয়ে-জামাইয়ের আর কোন অভাব রইল না। তারা সুখে শান্তিতে নিজেদের গাঁয়ে বাস করতে লাগল।

আকাশের সূর্য আকাশের চন্দ্র

ঠাকুমা, তাকিয়ে দেখ চাঁদ কত ওপরে উঠে গেল, তবু তুমি গল্প শুরু করলে না।

ঠাকুমা, সূর্য কখন দূর আকাশে মিলিয়ে গেল, তবু তুমি গল্প করলে না!

নাতিপুতিদের অভিযোগ শুনে ঠাকুমা বললেন, 'বেশ, শুরু করছি। চাঁদ-সূর্যের গল্পই বলছি। নাতিপুতি, তোরা কি ভাবছিস সূর্য চিরকাল ওই দূর আকাশেই ছিল? চাঁদও ছিল আকাশে? তা কিন্তু নয়। ওরা চিরকাল ওখানে ছিল না।'

'সেই গল্পই বল তাহলে।' ডাগর চোখে চেয়ে রইল তারা। ঠাকুমা শুরু করলেন।

অনেক অনেক কাল আগে সূর্য আর জল ছিল দুজনের বন্ধু। দুজনের গলায় গলায় ভাব। দুজনেই তখন থাকত পাশাপাশি এই পৃথিবীতে। ওদের ভাব দেখে অন্য অনেকেই খুব হিংসে করত। কিন্তু মুখে কিছু বলত না। ওদের দুজনের দেহেই যে ভীষণ শক্তি।

বন্ধু জলের বাড়িতে সূর্য প্রায়ই বেড়াতে যেত। গল্পগুজব করত। দেখা হলেই দুজনে প্রাণ খুলে মনের কথা বলত। এমনিভাবে অনেক কাল কেটে গেল।

হঠাৎ একদিন সূর্যের মনে হল,—আচ্ছা, আমি তো নিত্যিনিত্যি বন্ধুর বাড়ি যাই। কিন্তু কই, বন্ধু তো একদিনও আমার বাড়ি এল না। আশ্চর্য এ কথা তো আগে কোনদিন মনে হয়নি। আজকে বন্ধুকে এ কথা বলতে হবে।

সূর্য সেদিনও বন্ধু জলের বাড়ি গেল। সে অভিযোগ জানাল,—বন্ধু কেন একদিনও তার বাড়িতে গেল না? এটা কি তার উচিত কাজ বলতে হবে।

জল কিন্তু কিছুই ভাবল না। সে হাসতে হাসতে বলল,— এতে মনে করার কি আছে। দুজনের দেখা হওয়াই আসল কথা, বন্ধুত্ব থাকাটাই আসল। দুজন দুজনকে কত ভালোবাসি, কত সুখ-দুঃখের গল্প করি। তাই না?

সূর্য কিন্তু মনমরা হয়েই রইল। সে অভিযোগ জানাল,—সবই ঠিক। তবু জল যদি তার বাড়িতে একবারও না যায় তাহলে কেমন ভালো লাগছে না।

একদিন অনেকক্ষণ ধরে পীড়াপীড়ি করবার পর শেষকালে জল আস্তে আস্তে বলল, 'বন্ধু, তুমি কিছু মনে করো না। আমি সব খুলেই বলছি। আমার কি ইচ্ছে করে না যে আমি তোমার বাড়ি যাই। খুব ইচ্ছে করে । কিন্তু কি করব বল। আমিই যে আমার শত্রু। তুমি রাগ করো না বন্ধু। তোমার বাড়ি যে বড়ই ছোট। আমি যদি আমার লোকজন নিয়ে তোমার বাড়িতে যাই, তাহলে তুমি যে ভেসেই যাবে, তোমাকে যে ঘরছাড়া হতে হবে। বন্ধু, সেটা কি আমি চাইতে পারি?' জল চুপ করে মাথা নিচু করে সূর্যের দিকে চেয়ে রইল।

সূর্য তবু তাকে একই কথা বলতে লাগল। জল ভাবল, বন্ধুর মনে আর আঘাত দেব না। বেশ তার বাড়িতে সে যাবে।

জল তখন ছলছল শব্দ তুলে বলল, 'বন্ধু, তুমি কিচ্ছু চিন্তা করো না। আমি

তোমার বাড়িতে যাব। কিন্তু তার আগে তোমায় একটা কাজ করতে হবে।'

'কি কাজ? বলেই ফেল।' সূর্য খুব খুশি হল। বন্ধুর তাহলে মত হয়েছে। বন্ধুকে সে যা ভেবেছিল তা নয়।

জল বলল, 'আমি তোমার বাড়ি যাব। তার আগে তুমি একটা বিশাল উঠোন তৈরি করো, আর তার চারপাশে আনেক উঁচু করে বাঁধ দাও। মনে রাখবে উঠোনটা যেন বিশাল আকারের হয়। আমার লোকজন কিন্তু অগুনতি। আর চারপাশের বাঁধও করবে খুব শক্ত করে। আমাদের অনেক অনেক জায়গা লাগে আর দেহের শক্তি বড় কম নয়। কি, এখন খুশি তো?'

সূর্য মহাখুশি। সে রাজি হল জলের কথায়। হ্যাঁ, সূর্য তৈরি করবে বিশাল উঠোন, শক্তিশালী বাঁধ। সে গড়াতে গড়াতে আনন্দে বাড়ি ফিরে গেল। বাড়িতে পৌঁছেই চাঁদকে সুসংবাদ দিল চাঁদও খুশি। চাঁদ তো সূর্যের বউ। সেও মনে মনে খুশি হল। তারপর দরজা বন্ধ করে দুজনে পরামর্শ করতে বসল। ঠিক হল, কাল থেকেই কাজ শরু করতে হবে। বন্ধুকে সে কথা দিয়ে এসেছে। তাই স্বামী-স্ত্রী দুজনেরই যাতে মুখ থাকে তা তো দুজনকেই দেখতে হবে। দুজনে একমত হল।

বেশ কিছুদিন সূর্য আর চাঁদ একেবারে সময় পাচ্ছে না। রাতদিন উঠোন আর বাঁধ তৈরির কাজ করছে। নাওয়া-খাওয়া প্রায় বন্ধ। বন্ধুর খাতিরে এসব তারা ভুলেই গিয়েছে। বন্ধু আসবে তাদের বাড়িতে এই আনন্দেই তারা আত্মহারা।

শেষকালে একদিন উঠোন তৈরি শেষ হল, বাঁধ তৈরি শেষ হল। দুজনে উঠোনের মাঝখানে বসল, চারিদিক চেয়ে চেয়ে দেখল। হ্যাঁ, বন্ধুর উপযুক্ত জায়গাই হয়েছে বটে। অপূর্ব! নিজেরা বেশ খুশি হল। রাতে নিশ্চিন্তে ঘুম হল সেদিন।

পরের দিন সূর্য চলল জলের বাড়ি। বেশ জোরে জোরে গড়াচ্ছে। মনে ফুর্তি। জলের বাড়ি পৌঁছতেই জলের মহা আনন্দ। বন্ধু অনেকদিন তার বাড়িতে আসেনি। সূর্যের মুখে শুনল,—কি করেই বা আসবে? তারা দুজনে মিলে যে উঠোন আর বাঁধ তৈরি করছিল। বন্ধুর যে নেমন্তন্ন! সব ঠিকঠাক তৈরি হয়ে গিয়েছে। এবার জল চলুক সূর্যের বাড়ি। জলও রাজি।

জল তবুও শেষবারের মতো জানতে চাইল, 'বন্ধু সূর্য, তুমি কিন্তু কিছু মনে করো না। তুমি খুব বড় উঠোন বানিয়েছে তো, আর খুব শক্তিশালী বাঁধ। বুঝতেই পারছ আমার লোকজন অনেক।'

সূর্য তো নিশ্চিন্ত হয়েই আছে। তাই এবারে জলের কথায় সে মোটেই রাগ করল না। বরং খুশি হয়ে বলল, 'সব ঠিকঠাক আছে। তোমার কোন ভাবনা নেই। এবার চল।'

সামনে পথ দেখিয়ে এগিয়ে চলল সূর্য। পেছনে চলেছে জল,—আর তার পেছনে আশেপাশে চলেছে নানা জাতের মাছ, কুমির, তিমি, হাঙর, আরও কত জলচর প্রাণী। এগোতে এগোতে তারা এসে পৌঁছল উঠোনের কাছে। নাঃ উঠোন বেশ বড়ই, বাঁধ বেশ মজবুত।

জল ঢুকে পড়ল উঠোনের মধ্যে। জলে কিলবিল করছে অগুনতি মাছ। দেখতে দেখতে জল হাঁটু পর্যন্ত উঠল। এখন জলে অল্প অল্প ঢেউ।

জল বলল, 'বন্ধু, তোমার বাঁধ বেশ নিরাপদ তো! আসব, না এবার ফিরে যাব?'

সূর্য মাথা নেড়ে জানাল, 'কোন ভাবনার কারণ নেই। বড়, খুব মজবুত।'

আরও জল ঢুকল। জলের আরও ঢেউ, মাছের হুটোপুটি আরও বেশি।

জল চিন্তিত হল। জিজ্ঞেস করল, 'বন্ধু, তুমি কি চাও আমার আরও লোকজন তোমার বাড়িতে ঢুকুক? অনেক বাকি।'

সূর্য আর তার বউ একসঙ্গে বলে উঠল, 'নিশ্চয়ই। কেন ঢুকবে না? তোমরা যে বন্ধু, তোমরা যে অতিথি।'

এবার প্রবল গতিতে জল ঢুকতে শুরু করল, তিরতিরিয়ে ঢুকে পড়ল অসংখ্য নাম-না-জানা মাছ, আগে না-দেখা অসংখ্য জলের প্রাণী। এবার ঢেউ উত্তাল হল, শব্দ প্রবল হল।

এই অবস্থা দেখে সূর্য ও চাঁদ বাঁধের ওপের উঠে বসল। নীচে দাঁড়ানো অসম্ভব, জল থৈ থৈ করছে। জল সব বুঝতে পারল। সে ভাবল,—আর নয়। এবার বন্ধু বিপদে পড়বে। কিন্তু সে তো বন্ধুকে বিপদে ফেলতে চায় না।

তাই জল বলল, 'বন্ধু, তোমার বাড়িতে তো এলাম! এবার যাই। কি বল? আমার আরও লোকজন আছে, তা থাক। কিন্তু এবার বোধহয় ফেরা উচিত।'

সূর্য ব্যথা পেল। বলল, 'সে কি? বন্ধু তোমার আর লোকজন বাইরে থাকবে। সে কি হয়? না, না। তোমায় আসতেই হবে।'

কি আর করে জল। ঢুকছে, সঙ্গে তার লোকজন। দেখতে দেখতে জল বাঁধের মাথায় পৌঁছল। মাথা ছাড়িয়ে উপচে পড়ল চারিদিকে। এখন আর বাঁধকে দেখা যাচ্ছে না। চারিদিকেই জল, আর জল। আসছে, জল বাড়ছে, জলের প্রাণীরা আসছেই আসছেই, জল আরও বাড়ছে,—ছড়িয়ে পড়ছে এদিক থেকে ওদিক, ওদিক থেকে সেদিক।

সূর্য আর কি করে। চাঁদ আর কি করে! কোথাও যে দাঁড়াবার ঠাঁই নেই। এ কি হল? সব জায়গায় জল থই থই করছে। শেষকালে, সূর্য চাঁদ আকাশে উঠে গেল। সেখানেই তারা রইল। আর কোনদিন পৃথিবীতে নেমে এল না। তবু পৃথিবীকে ভুলতে পারে না। কতদিন ছিল এই পৃথিবীতে! তাই আজও বারবার প্রতিদিন প্রতিরাত তারা পৃথিবীর চারপাশে ঘোরে। দিনে ঘোরে সূর্য, রাতে ঘোরে চন্দ্র।

জাদু আয়না ও সুন্দরী মেয়ে

সবুজ ঘন বনভূমি আর গান-গাওয়া নদীর পাশে এক গ্রাম ছিল। সেই গ্রামের রাজার ছিল একটিমাত্র মেয়ে। সে ছিল খুব সুন্দরী। তার আলো-করা রূপে মানুষ পশুপাখি সবাই অবাক হয়ে যেত। এমন রূপ তারা আগে কোনদিন দেখেনি।

মেয়ে কিশোরী হল। একদিন তার বিয়ে হল। বিয়ে হল ভিন গাঁয়ে। তার ছিল একটা জাদু আয়না, এই আয়না কথা বলতে পারত। ঠিক মানুষের মতো। যখনই সে সাজগোজ করত, শধু এই আয়নাতেই মুখ দেখত। আর বাইরে বেড়াতে যাওয়ার সময় কিংবা নাচের আসরে যাওয়ার আগে এ আয়না না হলে তো তার সাজগোজই হত না। বড় প্রিয় আয়না।

একটা ঘরে সে এই আয়নাকে রেখে দিত। কাউকে ঢুকতে দিত না সেই ঘরে। এমন কি আপনজনদেরও না। সেই ঘরে একা একা সে আয়নাকে জিজ্ঞেস করত, "ও আমার প্রাণের আয়না, ও আমার আদরের আয়না, বলতো, এই দুনিয়ায় আমার চেয়ে সুন্দরী আর কেউ আছে কিনা!" আয়না সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিত, "কেউ না কেউ না। কেউ নেই কেউ নেই।"

যখনই সে সাজগোজ করত, তখন একই প্রশ্ন করত। একই উত্তর পেত। রোজ রোজ একই প্রশ্ন, একই উত্তর। শুনে শুনে তার বিশ্বাস হল,—তার মতো সুন্দরী দুনিয়ায় আর কেউ নেই। নিজের রূপের গর্বে সে হয়ে উঠল ভীষণ হিংসুটে। দেমাকে যেন মাটিতে তার পা পড়ে না। আর হবেই বা না কেন? আয়না যে সে কথাই বলে। আর এ আয়না যে জাদু আয়না।

দিন কাটে। অনেক দিন কেটে গেল। এমন সময় সেই সুন্দরী মেয়ে একদিন মা হল। তার একটা ফুটফুটে মেয়ে হল। কচি শিশুর রূপ দেখে মা চমকে উঠল। মেয়ের এ কি রূপ? এ যে তার থেকেও সুন্দরী! মায়ের মাথাটা কেমন টল্‌মল করছে।

শিশু মেয়ে বড় হচ্ছে। পুকুরের ফুল যত ফোটে, দেখতে হয় তত সুন্দর! এ মেয়ে যত বড় হচ্ছে রূপও যেন ফেটে পড়ল। এ কি রূপের বাহার! মা বুঝল, রূপে এ মেয়ে তাকে ছাড়িয়ে গিয়েছে। তার ওপরে মেয়ের মিষ্টি কথা। দুয়ে মিলে অপরূপ। কিন্তু মেয়ে তার রূপ জানে না, তা নিয়ে তার কোন মাথাব্যথা নেই, গর্বও নেই। তাকে তাই আরও মিষ্টি লাগে।

মেয়ের বয়স হল বারো বছর। মা ভয় পেয়ে যাচ্ছে, এই বুঝি তার মেয়ে জেনে ফেলে সে কত সুন্দরী! মেয়ে যদি জেনে ফেলে?

একদিন মেয়েকে ডেকে মা বলল, "ওই ঘরে তুমি কখনও ঢুকবে না। কেউ ঢোকে না। তুমিও ঢুকবে না। মনে রাখবে আমার কথাটা।" মেয়ে মাথা নাড়ল।

এমনি করে আবার দিন বয়ে যায়। মা রোজ রোজ একই প্রশ্ন করে, জাদু আয়না একই উত্তর দেয়। উত্তর শুনে শান্তি পায় মা।

একদিন মেয়ের খুব কৌতূহল হল। তাকে সবাই ভালোবাসে, সে সব ঘরে যায়, ঘোরে। শুধু ওই ঘর বাদে। কেন? ও ঘরে কি আছে? সে গেলে কি হবে? সে কেন যেতে পারবে না? সে তো কোন খারাপ কাজ করে না কখনও। তবে? এ নিষেধ তার ভালো লাগে না। কৌতূহল বাড়ে।

মা গিয়েছে নাচের আসরে। বাড়িতে সে একা। সে চাবির গোছা নিয়ে সেই ঘরের কাছে গেল। খুলে ফেলল দরজা। ঘরে ঢুকেই তার খুব আনন্দ হল। কেন এতদিন বাধা দিয়েছে তাকে? কিন্তু ঘরে বিশেষ কিছুই দেখতে পেল না। এমন কিছু নেই যাতে নিষেধ মানতে হবে। সে চাবি দিয়ে দরজা বন্ধ করে ফিরে গেল।

পরের দিন। মা বেড়াতে গিয়েছে। মেয়ে মনে মনে ভাবল, "আচ্ছা, ওই ঘরে যদি কিছু না-ই থাকবে তাহলে মা কেন নিষেধ করল? কেন আমায় ঘরে ঢুকতে বারণ করল? নিশ্চয়ই কিছু আছে।" এই ভেবে সে আবার ঘরে ঢুকল। চারদিকে তাকাতে লাগল। হঠাৎ দেখতে পেল, একপাশে সুন্দর একটা কাঠের ঝুড়ি রয়েছে। ঝুড়িতে কি সুন্দর লতাপাতা নকশা করা। ঢাকনা খুলেই সে একটা আয়না দেখতে পেল। হাতে তুলে ভালোভাবে নাড়াচাড়া করে সে আয়না দেখছে। হঠাৎ আয়না মানুষের মতো কথা বলে উঠল। বলল, "ও মেয়ে! তোমার মতো সুন্দরী তো এই দুনিয়ায় আর কেউ নেই।" মেয়ে তাড়াতাড়ি আয়নাকে ঝুড়ির মধ্যে রেখে দিল। দরজা ঠিকমতো বন্ধ করে নিজের ঘরে চলে গেল।

পরের দিন মা আয়না হাতে সাজগোজ করতে বসেছে। অন্য দিনের মতো মা জিজ্ঞেস করল, "ও আমার প্রাণের আয়না, ও আমার আদরের আয়না, বলতো, এই দুনিয়ায় আমার চেয়ে সুন্দরী আর কেউ আছে কিনা।" জাদু আয়না উত্তর দিল, "হ্যাঁ তোমার চেয়েও একজন সুন্দরী আছে। সে অনেক বেশি রূপসী।"

ঝড়ের বেগে মা ঘর থেকে বেরিয়ে এল। খুব ব্যথা মনে, মুখ শুকনো। সন্দেহ হল, এ ঠিক মেয়ের কাজ। ওই সুন্দরী নিশ্চয়ই তার মেয়ে। রাগে কপাল দপ্‌দপ্ করছে। মেয়ের কাছে গিয়েই ফেটে পড়ল মা, "তুই ঘরে ঢুকেছিলি?

মেয়ের তো বুক কাঁপছে। বলল, "কই না তো! আমি কখন ঢুকলাম?"

মা বলল, "মিথ্যে কথা। তুই ঢুকেছিলি। হ্যাঁ তুই, জাদু আয়না নইলে বলল কি করে আমার চেয়েও সুন্দরী আর একজন আছে। আর তুই-ই শুধু আমার চেয়ে সুন্দরী। আর কেউ নেই। তুই ঢুকিসনি ঘরে?"

মা শুধু যে মেয়েকে ওই ঘরেই ঢুকতে দেয়নি তা নয়, এত বয়স পর্যন্ত কোনদিন তাকে প্রাসাদের বাইরে যেতে দেয়নি। বাইরের কোন লোক মেয়েকে চেনে না, জানে না, দেখেওনি। কেউ যদি মেয়েকে দেখে বলে, মায়ের চেয়েও সুন্দরী! তাহলে! মা রাগে-দুঃখে দিশেহারা হয়ে গেল।

রাতে স্বামীর কয়েকজন বিশ্বাসী সৈন্যকে ডেকে পাঠল মা। তাদের কাছে মেয়ে দিয়ে মা বলল, "এই হতভাগীকে গভীর জঙ্গলে নিয়ে গিয়ে মেরে ফেলবে। কেউ যেন না জানে।"

সৈন্যরা আর কি করবে। তারা মেয়েকে নিয়ে প্রাসাদের বাইরে এল। সঙ্গে দুটো কুকুর। আঁধার রাতে কষ্টে তারা পথ চলতে লাগল। শেষকালে পৌঁছল গভীর জঙ্গলে।

মেয়ে একটি কথাও বলছে না। সৈন্যরা বলল, "কেউ না জানলেও আমরা প্রাসাদ প্রহরীরা জানি তুমি কার মেয়ে। তোমার মা বড় নির্দয়, সে তোমাকে মেরে ফেলতে বলেছে। সে কাজ আমরা কেমন করে করি ? তুমি এত ভালো মেয়ে, তুমি এত রূপসী, তেমার কথা এত সুন্দর। আমরা তোমাকে মারতে পারি না। তোমাকে ছেড়ে দিলাম। তুমি বনে বনে ঘুরে বেড়াও। বনের দেবতা তোমাকে রক্ষা করবেন। তুমি ভালো থেকো।"

সৈন্যদের চোখের পাতা ভিজে এল। মেয়ে বনের পথে হাঁটতে লাগল। বন থেকে বেরুবার আগে সৈন্যরা সঙ্গের কুকুর দুটোকে মেরে ফেলল। তাদের তরবারিতে টাটকা রক্ত লেগে রইল। তারা ফিরে এল প্রাসাদে। মাকে বলল, "আমরা হতভাগী মেয়েটাকে মেরে ফেলেছি। তার দেহের রক্ত লেগে রয়েছে আমাদের অস্ত্রে।" মা বেজায় খুশি। লাফিয়ে লাফিয়ে সে চলতে লাগল।

মেয়ে গভীর বনের কিছুই চেনে না। আপন মনে এদিক-ওদিক ঘুরতে লাগল। বড় একা লাগছে, ভয়ও করছে। গা ছমছম্ করছে। এমন সময় সে একটা সুন্দর ছোট বাড়ি দেখতে পেল। একটাই বাড়ি, আশেপাশে আর নেই। সে দরজার সামনে গেল, দরজায় তালা নেই, ভেজানো রয়েছে। সে ভেতরে ঢুকল, কাউকে দেখতে পেল না। চারিদিকে তাকিয়ে দেখে ঘরটা বড় আগোছালো রয়েছে। কি আর করে। সে ঘর গোছাতে লাগল, সব জিনিস পরিপাটি করে সাজিয়ে রাখল। সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠল। তার পরে একটা খাটের নীচে চুপটি করে লুকিয়ে থাকল।

মেয়ে তো জানত না এই বাড়ি আসলে একদল ডাকাতের। ডাকাতেরা দিনের বেলায় নানা দূর দূর জায়গায় ডাকাতি করতে যেত, আর সন্ধেবেলা ফিরে আসত এই ডেরায়। সেদিনও লুটের মালপত্র নিয়ে ডাকাতরা ফিরে এল। ঘরে ঢুকেই সবাই অবাক হয়ে গেল। একি ? সবকিছু এমন সাজানো-গোছানো কেমন করে হল ? এরকম তো থাকে না ? তারা অবাক হয়ে বলল, "কে ঢুকেছিল আমাদের ঘরে ? কে-ই বা এমন করে সব গুছিয়ে রাখল ?"

বড় ক্লান্ত তারা। রান্নবান্না করে খেয়ে-দেয়ে তারা শুতে গেল। আর ঘুমিয়ে পড়ল। যেখানে তারা খেয়েছিল সে জায়গা তেমনই রইল, পরিষ্কার করল না। সকাল হতেই তারা বেরিয়ে পড়ল ডাকাতি করতে। এইতো তাদের নিত্য দিনের কাজ।

ডাকাতের দল চলে যেতেই মেয়ে খাটের তলা থেকে বেরিয়ে এল। ভয়ে তার বুক দুরদুর করছে, খিদেতে মাথা ঘুরছে। নীচের ঘরে এসে সে রান্নবান্না করল আর মনের সুখে খাওয়া-দাওয়া করল। আগের দিনের মতোই ঘর গুছিয়ে রাখল। এঁটো বাসন-কোসন ধুয়ে রাখল, খাওয়ার জায়গা পরিষ্কার করল। এমনি করে দুপুর গড়িয়ে বিকেল এল। সে রাতের জন্য অনেক কিছু রান্না করে সাজিয়ে রাখল। ডাকাতরা এসে খাবে। সব ঠিকঠাক আছে কিনা ভালোভাবে দেখে নিয়ে আঁধার হতেই সে আবার লুকিয়ে পড়ল।

ডাকাতরা ফিরে এল। তাদের আজ খুব আনন্দ। অনেক জিনিস আজ তারা পেয়েছে। ঘরে ঢুকেই তারা অবাক হয়ে গেল। আগের দিনের মতোই সব গোছানো। শুধু কি তাই ? তাদের জন্য রান্না-করা খাবার সাজিয়ে রাখা হয়েছে। আর কি পরিপাটি করে। তারা বলল, "কে এমন করে সবকিছু গুছিয়ে রাখছে ?"

বেশি কথা বলার সময় নেই। ক্লান্তি আর খিদে। তারা খেতে বসে গেল। এই ডেরায় আসার পরে কেউ কোনদিন তাদের জন্য এমন করে খাবার তৈরি করে রাখেনি।

খাওয়া শেষ হলে তাঁরা খোঁজাখুঁজি করতে লাগল। অনেকক্ষণ ধরে খুঁজল। কিন্তু কাউকেই দেখতে পেল না। নাঃ, কেউ কোথাও নেই।

পরের দিন সকালে ডাকাতি করতে যাওয়ার আগে ইচ্ছে করেই সবকিছু আরও বেশি করে অগোছালো করে রাখল। দেখাই যাক না কি হয়।

তারা চলে যেতেই মেয়ে আবার বেরিয়ে এল লুকোনো জায়গা থেকে। হায় কপাল। ডাকাতগুলো যে কি অগোছালো মানুষ। আহা! ওদের কেউ নেই যে সাজিয়ে গুছিয়ে রাখবে। মেয়ে সব ঠিকঠাক করে রাখল। ভালো ভালো রান্না করল। নিজে খেল। ওদের জন্য গুছিয়ে রাখল। সকালবেলার সে ঘরবাড়ি এখন আর চেনাই যাচ্ছে না। ঘন উঁচু গাছের ওপারে সূর্য ডুবে যেতেই মেয়ে আবার লুকিয়ে পড়ল। বড় ভয় করে যে।

আঁধার হতেই ফিরে এল ডাকাতরা। নাঃ, সেই একইরকম সাজানো-গোছানো, তাদের জন্য রান্না করা। অবাক কাণ্ড। তারা বলল, 'রোজরোজ কে এমন করছে? এত গুছিয়ে রাখছে কে? যদি সে মেয়ে হয়, তাহলে সে হবে আমাদের বোনের মতো। বোন ভাইয়ের সবকিছু দেখাশোনা করবে, বাড়ি আগলাবে। আমরা প্রাণ দিয়ে তাকে ভালোবাসব। তার গায়ে আঁচড় পড়তে দেব না। আমাদের মধ্যে কেউ তাকে বিয়ে করতে চাইবে না,—সে যে আমাদের আদরের বোন। আর যদি সে ছেলে হয় তবে তাকেও আমাদের ডাকাতদলে ঢুকে পড়তে হবে, ছাড়াছাড়ি নেই। সেও হবে ডাকাত।'

পরের দিন খুব ভোরবেলা ডাকাতরা বেরিয়ে পড়ল। কিন্তু আজ তারা ভুল করল না। তাদের মধ্যে একজনকে রেখে গেল। সে বাড়ির পাশে এক ঝোপে লুকিয়ে রইল। আজ ধরতেই হবে, রোজ রোজ কে তাদের ঘরদোর এমন গুছিয়ে রাখে। যে তাদের এমন উপকার করছে তাকে দেখা দরকার, তাকে জানা দরকার।

মেয়ে তো আর জানে না তাকে ধরবার জন্য কেউ লুকিয়ে রয়েছে। তাই সে লুকোনো জায়গা থেকে বেরিয়ে কাজকর্ম করতে শুরু করল। সবকিছু গুছিয়ে রেখে রান্না চাপিয়ে একটু বাইরে এসে দাঁড়াল। কেউ তো নেই। তাকে তো কেউ দেখছে না। বাড়ি তো ফাঁকা। মেয়েকে দেখতে পেয়েই ঝোপ থেকে বেরিয়ে এল সেই লুকিয়ে থাকা ডাকাত। ডাকাতকে দেখতে পেয়েই ভয়ে দৌড় দিল সেই মেয়ে। তাকে ছুটতে দেখে ডাকাত চিৎকার করে বলল, 'ভয় পাচ্ছ কেন? কোথায় যাচ্ছ তুমি? ভয় পাওয়ার কি আছে? তুমি তো কোন খারাপ কাজ করনি। বরং আমাদের কতই না উপকার করেছ। তুমি যে কি ভালো মেয়ে। পালিয়ে যেয়ো না, কাছে এসো।'

দূরে দাঁড়িয়ে থেকে মেয়ে বলল, 'ভীষণ ভয় করছে। তোমরা কি আমাকে মেরে ফেলবে?'

ডাকাত বলল, 'সে কি? ও কথা মুখেও এনো না। তুমি যে আমাদের বোন। কি সুন্দর তোমাকে দেখতে। তেমনি তুমি ভালো। কিন্তু, তুমি এই গভীর বনে এলে কেমন করে? তুমি কে? কাদের মেয়ে?'

মেয়ে আস্তে আস্তে মাথা নিচু করে ডাকাতের কাছে এল। বলল, 'ঘরের অনেক কাজ বাকি। তোমাদের জন্য রান্নাবান্নাও হয়নি। আগে সব শেষ করি, পরে সব বলব।'

ডাকাত অবাক হল। এমন বোন হয়? তাদের ভাগ্য। মেয়ে সব কাজ শেষ করল। রান্না করে দুজনে খেল। অন্যদের জন্য গুছিয়ে রাখল। তারপরে বসল গল্প করতে। সব কথা তাকে খুলে বলল। মায়ের কথা, সৈন্যদের কথা, লুকিয়ে থাকার কথা।

সন্ধ্যা হয়ে আসছে। এখনও তেমন অন্ধকার হয়নি। বাইরের উঠোনে দুজন গল্প করছে। এমন সময় ডাকতরা ফিরে এল। আজ তারা বেশ তাড়াতাড়ি ফিরে এসেছে। বাড়িতে কি হল জানার জন্য সবাই ব্যস্ত। দেখে, দুজনে বসে আপনমনে গল্প করছে।

কাছে এসে তারা বলল, 'তাহলে খুঁজে পেয়েছ?'

ডাকাতটি মাথা নেড়ে শুধু বলল, 'হ্যাঁ।'

ডাকাতরা বলল, 'আঃ কি সুন্দর মেয়ে। আমাদের আদরের বোন। কোন ভয় নেই তোমার। আমরা প্রাণ দিয়ে তোমাকে আগলে রাখব। আজ থেকে তুমি আমাদের বোন হলে। আদরের বোন।'

ঘরে এসে তারা বোনকে সবকিছু বুঝিয়ে দিল। সব জিনিসের ভার দিল তার ওপরে। সব কিছু সেই দেখাশোনা করবে। এমন বিশ্বাসী আর কে আছে? তাদের বোন যে এই মেয়ে। তারা ডাকাতি করে সব এনে দেয় বোনকে। বোন তাদের দেখাশোনা করে। এমনি করে সুখে দিন কেটে যেতে লাগল।

প্রাসাদে মা দিন কাটায়। বেশ আনন্দে-ফুর্তিতে। কিন্তু হঠাৎ একদিন তার কেন যেন সন্দেহ হল, মনটা কেমন করে উঠল। যদি মেয়ে বেঁচে থাকে। সৈন্যরা কি সত্যিই তাকে মেরে ফেলেছে? যদি না মেরে থাকে? তবে? তার কথা হয়তো সৈন্যরা রাখেনি। তাহলে? মেয়ে তবে বেঁচে আছে? সন্দেহ হল কেন? মন এমন করছে কেন? তাহলে নিশ্চয়ই মেয়ে মরেনি, ঠিক বেঁচে আছে। কি করবে মা তা ভেবে নিল।

মায়ের এক দাসী ছিল। সে খুব বিশ্বাসী। সেই ছেলেবেলা থেকে তার কাছে আছে। এখন সে বুড়ি। কিন্তু তাকে না হলে মায়ের চলে না। নিজের ঘরে ডেকে এনে মা সেদিন তাকে সব খুলে বলল। সন্দেহের কথা জানাল। এখন কি করতে হবে তাও মা বলে দিল।

মা চুপচুপ করে বলল, 'বুড়িমা, তুমি এক কাজ করো। তুমিই পারবে। নানা গাঁয়ে তুমি খোঁজ করো। যেখানে সবচেয়ে সুন্দরী মেয়েকে তুমি দেখবে, বুঝবে সেই আমার মেয়ে। তারপরে যেমন করে হোক তাকে তুমি মেরে ফেলবে। আমার জন্য এ কাজ তোমাকে করতেই হবে।'

বুড়ি বলল, 'ওমা, তুমি বলছ আর এ কাজ আমি করব না? দেখনা আমি ফিরে এলাম বলে।' এই কথা বলে বুড়ি রওনা দিল।

ঘুরতে ঘুরতে বুড়ি এল ডাকাতদের বাড়িতে। কাউকে সে দেখতে পেল না। ঘরে ঢুকল। ঢুকেই দেখে অপরূপ সুন্দরী মেয়ে ঘরের কাজ করছে। দেখেই বুঝতে পারল,—এ মেয়ে কে! এই মেয়েকেই তো সে খুঁজছে। যাক, তাহলে সব কাজই ঠিকঠাক করা যাবে। বুড়িকে দেখেই মেয়ের খুব আনন্দ হল। তাকে আদর করে বসতে দিল। খেতে দিল।

বুড়ি তখন বলল, 'মেয়ে, কি সুন্দরী তুমি! এমন রূপ আগে দেখিনি। তা তুমি কে? তোমার বাড়ি কোথায়? তোমার মায়ের নাম কি?' মেয়ে কিছুই সন্দেহ করল না। সব খুলে বলল। বুড়ি ঠোঁটের ফাঁকে হাসতে লাগল।

বুড়ি বলল, 'আহা, তোমাকে দেখাশোনার কেউ নেই। এমন রূপ, অথচ চুলগুলো কি এলোমেলো। দাও, ভালোভাবে চুল বেঁধে দি। কাছে এসো।' মেয়ে রাজি হল। কেউ তো কোনদিন এমন করে আদর করেনি। পেছন ফিরে সে বুড়ির সামনে বসে পড়ল। বুড়ি আদর করে তার চুল আঁচড়িয়ে বেঁধে দিতে লাগল। বুড়ি তার পোশাকের মধ্যে লুকিয়ে রেখেছিল একটা লম্বা ধারালো কাঁটা। চুল বাঁধা শেষ হয়ে এসেছে, বুড়ি হঠাৎ মেয়ের ঘন চুলের মধ্যে কাঁটা ঢুকিয়ে দিল। ধারালো কাঁটা মাথায় ঢুকে গেল। ঢলে পড়ল মেয়ে। নিথর হয়ে গেল তার দেহ। মনে হল সে সত্যি মরে গিয়েছে। নিস্তেজ দেহটার দিকে তাকিয়ে বুড়ি হাসতে হাসতে বলল, 'যাক্। ঠিকঠাক কাজ হয়েছে, কথা রেখেছি।' দেহ সেখানেই পড়ে রইল, বুড়ি রওনা দিল বাড়ির পথে। বুড়ির কাছে সব কথা শুনে মা নিশ্চিন্ত হল। বুড়িমা তো আর তাকে ঠকাবে না। যাক্ আপদ বিদায় হল।

ডাকতরা ফিরে এসে দেখে তাদের আদরের বোন কাটা গাছের মতো পড়ে রয়েছে। তাদের চোখ ছলছল্ করে উঠল। এ কি হল? কেন এমন হল? তারা খুব যত্নে দেহটি পরীক্ষা করল, কোন আঘাতের চিহ্নই দেখতে পেল না। বোন মরে গিয়েছে, কিন্তু দেহ তো এখনও শক্ত কাঠ হয়ে যায়নি। কেমন যেন নিস্তেজ ভাব। বোনের কপালে আর গলায় বিন্দু বিন্দু ঘাম। মুখটা ফুলের মতো তাজা আর সুন্দর। তারা বলল, 'আমরা এমন সুন্দর মুখের বোনকে মাটিতে পুঁততে পারব না। কিছুতেই না।' তাই তারা সকলে মিলে একটা সুন্দর শবাধার তৈরি করল। শবাধারের ওপরে সোনা-হীরে-মুক্তো দিয়ে সাজাল আর তাদের যত সোনার গহনা ছিল সব পরিয়ে দিল আদরের বোনের দেহে। শবাধারের ঢাকনা কাঁটা দিয়ে আটকাল না, আলগোছে ঢাকনা বন্ধ করল। আর হাওয়া-বাতাস ঢোকবার জন্য কয়েকটা ফুটো রাখল। বোনের দেহ যাতে পচে না যায় তাই শবাধার বাইরে আলো হাওয়ায় রেখে দিল। বুনো জন্তুরা যাতে বোনকে স্পর্শ না করতে পারে তাই বুনো লতার সঙ্গে বেঁধে তাকে গাছের ডালে ঝুলিয়ে রাখল। লতাটা ঢিলে করলেই শবাধার নেমে আসবে। সব কাজ শেষ করে তারা চুপ করে গাছের নীচে বসে রইল। গাল-বুক ভিজে যাচ্ছে, আজ তাদের বোন আর বেঁচে নেই। দিন দশেক তারা বাড়িতেই রইল, কাজে গেল না।

তারপরে কাজে যেতে হল। প্রতিদিন যাওয়ার সময় ও বাড়ি ফিরবার পরে তারা শবাধারটাকে নামাত আর বোনকে দেখত। সদ্য-ফোটা ফুলের মতো সতেজ রয়েছে তাদের বোনের মুখ। জীবন্ত মুখ। ঘুমিয়ে রয়েছে আদরের বোন। এমনি করে দিন কাটে।

এখন হয়েছে কি, একদিন ডাকাতরা সকালে কাজে বেরিয়ে গিয়েছে। এমন সময় সেখানে এল একজন লোক। সে গাঁয়ের কথক। নানা জায়গায় সে গল্প শুনিয়ে বেড়ায়। তার ঝুলিতে অনেক অনেক গল্প। তার নাম এসেরেন্‌গিলা। আর তার মনিবের নাম ওগুলা। ডাকাতদের ডেরায় এসে কথক কাউকে দেখতে পেল না। এধার-ওধার তাকাতেই তার চোখে পড়ল সোনালি শবাধারটি। এমন সুন্দর আধার সে আগে দেখেনি। কত জায়গায় সে ঘুরে বেড়ায়। এসেরেন্‌গিলা ছুটে গেল মনিবের কাছে। বলল, 'এক্ষুনি চলো আমার সঙ্গে। এমন জিনিস আগে দেখিনি। কেউ নেই সেখানে। ওটাকে নিয়ে আসতেই হবে।' কথক উত্তেজনায় হাঁফাচ্ছে। ওগুলাও অবাক হল।

দুজনে সেখানে গেল। লতা ঢিল করে কথক শবাধারটি নামাল। কেউ নেই, তবু এসে পড়ে যদি। তাড়াতাড়ি করে দুজনে মাথায় তুলে শবাধার নিয়ে চলল। তারা জানেও না। ভেতরে কি রয়েছে। শেষকালে ওগুলার বাড়ি পৌঁছে গেল। একটা ছোট ঘরে শবাধারটিকে রেখে দিল।

কয়েকদিন কেটে গেল। একদিন ওগুলা ভাবল, আজ দেখব ওর মধ্যে কি আছে। ঢাকনা তো কাঁটা দিয়ে আটকানো ছিল না, আলগা করে বন্ধ ছিল। ঢাকনা খুলতেই ওগুলা অবাক হয়ে গেল। একটি অপরূপ সুন্দরী মেয়ে। কিন্তু মনে হচ্ছে সে বেঁচে নেই। কিন্তু মৃতদেহের গা থেকে যেরকম গন্ধ বের হয় তা তো হচ্ছে না? মানুষ মারা গেলে যেরকম দেখতে হয়, সেরকমও তো মনে হচ্ছে না। কোন রোগে মারা গিয়েছে বলেও তো মনে হচ্ছে না। তবে? সে ভালোভাবে মেয়ের দেহ পরীক্ষা করতে লাগল। কিন্তু কিছুই পেল না। কিছুই বুঝতে পারল না। শুধু আপনমনে বলল, 'এমন ফুটফুটে মেয়ে। কিসে তার মৃত্যু হল?' আশ্চর্য।'

ওগুলা ঢাকনা বন্ধ করল। ভালোভাবে দরজা বন্ধ করে ঘর থেকে বেরিয়ে এল। কিন্তু থাকতে পারল না। আবার ঘরে ঢুকল। আবার ঢাকনা খুলে দেখল। মনে মনে বলল, 'বোধহয় এ মরেনি। আহা। যদি বেঁচে থাকে। আমার মেয়েরও তো এইরকমই বয়েস। আহা। বেঁচে থাকলে দুজনে কেমন ভাব হত, একসঙ্গে খেলত।' দরজা বন্ধ করে আবার সে বাইরে এল। নিজের মেয়েকে বলল, 'ও ঘরে যেও না কিন্তু। কক্ষনো যেও না।' মেয়ে বলল, 'আচ্ছা।' প্রতিদিন বহুবার করে ওগুলা ঘরে যায় ঢাকনা খোলে, মৃত মেয়েকে দেখে।

অনেক দিন কেটে গেল। ওগুলার মেয়ের কেমন কৌতূহল হয়। তাকে ঢুকতে দেয় না, অথচ, বাবা বারবার ঢোকে। তারও ইচ্ছে হয়, দেখি না কি আছে ও ঘরে। একদিন ওগুলা বাইরে গিয়েছে। মেয়ে বলল, 'খালি খালি বারণ করা। কেন ও ঘরে ঢুকব না? ঢুকলে কি হয়? আজ দেখব ও ঘরে কি আছে।' ঘরে ঢুকেই ওগুলার মেয়ে অবাক হয়ে গেল, কি সুন্দর একটা কাঠের আধার। দেখি না ভেতরে কি আছে! কি হয় দেখলে?

ওগুলার মেয়ে আস্তে আস্তে ঢাকনা তুলে ধরল। একটি মেযের মাথা দেখা যাচ্ছে, মাথায় ভর্তি কালো চুল আর সোনার গয়না। পুরো ঢাকনাটি খুলে ফেলল। একটি সুন্দর মেয়ে শুয়ে রয়েছে। তারই বয়সি কি সুন্দর মেয়ে। এত গয়না গায়ে। কি সুন্দর মুখ আর মাথার চুল। সে বুঝতে পারল না, মেয়েটি কেন এর মধ্যে এভাবে ঘুমিয়ে আছে। আপনমনে বলল, 'আহা! ও যদি কথা বলত। কেমন বন্ধু হতাম আমরা। কত গল্প করতাম। ও যদি কথা বলত।' মুখের কাছে মুখ এনে সে ডাকল, 'এম্‌বোলো! এম্‌বোলো!' যেমন করে অপরিচিত কাউকে তারা ডাকে। কোন সাড়া পাওয়া গেল না। আবার ডাকল। জলভরা চোখে বলল, 'এমন করে ডাকছি, তুমি সাড়া দিচ্ছ না কেন? এম্‌বোলো। এম্‌বোলো।' ঢাকনা বন্ধ করে সে ঘর থেকে বেরিয়ে এল।

ওগুলা ফিরে এল। এমন করে দরজা বন্ধ কেন? মেয়েকে বলল, 'তুমি কি ওই ঘরে ঢুকেছিলে?' মেয়ে বলল, 'না তো। তুমি তো আমায় ঢুকতে দাও না। আমি তো যাইনি।'

পরের দিন ওগুলা কাজে বেরিয়ে গেল। মেয়েও ঢুকল ওই ঘরে। না ঢুকে থাকতে পারছে না। ঘরে ঢুকে ঢাকনা খুলে ফেলল। ডাকল, 'এম্‌বোলো, এম্‌বোলো!' কোন সাড়া নেই। মেয়ে ঘুমিয়েই আছে। 'আমি তোমাকে বার বার ডাকছি। তুমি কোন সাড়া দিচ্ছ না। তোমার সাথে খেলতে ইচ্ছে করছে। তোমার চুলগুলো ঠিক করে দেব? মাথায় আদর করব? তোমার চুলের উকুন বেছে দেব?' তবু সাড়া নেই। ওগুলার মেয়ে ঘুমিয়ে-থাকা মেয়ের মাথায় হাত দিল। আঙুল ঢুকিয়ে দিল ঘন চুলের মধ্যে। কি যেন শক্ত মতো হাতে ঠেকল? কোন গয়না বুঝি? চুল ফাঁক করে মেয়ে দেখল একটা লম্বা ধারালো কাঁটা মাথায় ফোটানো রয়েছে। 'ইস ওর মাথায় কাঁটা বেঁধা? আমি ওটাকে তুলতে চেষ্টা করি। আহা! ওর যেন না লাগে।' কাঁটাটা টেনে বের করতেই ঘুমন্ত মেয়ে হেঁচে উঠল একবার, চোখ খুলল, বড় বড় চোখে অবাক হয়ে চেয়ে রইল, চারিদিকে দেখল। আস্তে আস্তে আধারের মধ্যে উঠে বসল। মিষ্টি গলায় বলল, 'ওঃ! কতদিন যে ঘুমিয়ে ছিলাম।'

ওগুলার মেয়ের গলা বন্ধ হয়ে গিয়েছে। চোখ ছল্‌ছল্‌ করছে। সে সামলে নিয়ে বলল, 'শুধুই ঘুমিয়েছিলে?'

মেয়ে বলল, 'হ্যাঁ।'

ওগুলার মেয়ে বলল, 'এম্‌বোলো'।

সুন্দরী মেয়ে বলল, 'আই এম্‌বোলো'।

এবার মেয়ে জিজ্ঞেস করল, 'আমি কোথায়? এটা কোন্‌ জায়গা?

অন্য মেয়ে উত্তর দিল, 'তুমি আমার বাবার বাড়িতে আছ। কেন? এটা তো আমার বাবার বাড়ি।'

মেয়ে বলল, 'কিন্তু আমাকে এখানে কে আনল?' কেমন করে শবাধার দেখতে পেল, কীভাবে ওগুলাকে খবর দিল, কীভাবে তারা সোনালি আধার নিয়ে এল। সব বলল তাকে। তক্ষুনি দুজন দুজনকে খুব ভালোবেসে ফেলল। যেন আপন দুই বোন। দুজন দুজনকে জড়িয়ে ধরল, আদর করল, খেলল, গল্পগুজব করল। অনেকক্ষণ কেটে গেল।

মেয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়ল। বলল, 'বোন, তুমি আমার মাথায় আবার কাঁটাটা ঢুকিয়ে দাও, আমি একটু ঘুমিয়ে থাকি।' ওগুলার মেয়ে তাই করল। মেয়ে ঘুমিয়ে পড়ল। ঢাকনা বন্ধ করে মেয়ে ফিরে এল। ঘুমিয়ে-থাকা মেয়ে আবার মৃতের মতো নিস্তেজ হয়ে গেল। এখন তার মাথায় যে ধারালো কাঁটা বেঁধা রয়েছে!

ওগুলার মেয়ে এখন আর বাইরে অন্য সখীদের সঙ্গে খেলতে যায় না। বাড়ির বাইরে যেতে আর এতটুকু ভালো লাগে না। বন্ধুরা অভিযোগ করে, সে নানা অজুহাত দেখায়। কোনভাবেই তাকে আর তারা পায় না। কেমন করে পাবে? একটি ঘর আর একটি নতুন সাথী তাকে আটকে দিয়েছে। অন্য আর কিছুই তার ভালো লাগে না। যখনই তার বাবা বাইরে যায়, তক্ষুনি সে ঘরে ঢুকে আধারের ঢাকনা খোলে, ঘন চুলের মাঝ থেকে ধারালো কাঁটা টেনে বের করে। মেয়ে জেগে ওঠে, চোখ মেলে। তারা গল্প করে, খেলা করে, কতই আনন্দ। এমনি করে সুখে দিন কাটে। অনেক দিন একটানা ঘুমিয়ে মেয়ে কাহিল হয়ে গিয়েছিল, রোগা হয়ে গিয়েছিল। এখন বন্ধু প্রতিদিন খাবার আনে। মেয়ে আর রোগাটে রইল না। আরও সুন্দরী হয়ে উঠল।

এমনি করে অনেক দিন কেটে গেল। ওগুলা কিছুই জানতে পারল না।

কিন্তু একদিন তারা ধরা পড়ে গেল। অনেকক্ষণ গল্প করছে, খেলায় মেতে রয়েছে। সময়ের খেয়াল নেই। বাবার আসার সময়ের কথা ভুলে গিয়েছে। খেলছে তো খেলছেই। গল্প করছে তো করছেই। হঠাৎ বাবা ফিরে এল। দরজা ভেজানো রয়েছে। হাত দিতেই খুলে গেল। ওগুলা অবাক হয়ে দেখল দুটি মেয়ে গল্প করছে, মাথা-হাত নেড়ে শুধুই বক্‌বক্‌ করে চলেছে। ওগুলাকে দেখে তো মেয়ে ভীষণ ভয় পেয়ে গেল। বাবা কিন্তু তাকে বকুনি দিল না। নরম গলায় বলল, 'ভয় পাওয়ার কি আছে? তা, তুমি কেমন করে এ মেয়ের জীবন ফিরিয়ে আনলে? এর ঘুম ভাঙালে কেমন করে? তুমি কি করলে বল তো?'

মেয়ে বাবাকে সব খুলে বলল। লম্বা ধারালো কাঁটাটার কথা খুব ভালোভাবে বলল। ওগুলা তখন অপরূপ সুন্দরী মিষ্টি মেয়ের পাশে বসে পড়ল। তার সব কথা জানতে চাইল। মেয়েও মন খুলে সব কিছু বলল। তার জীবনের করুণ কাহিনি।

কিছুক্ষণ তিনজনেই চুপ করে রইল। তারপর ওগুলা বলল, 'আমি এক বিরাট এলাকার সর্দার, আমি গোষ্ঠীপতি। তোমার মা যেখানে থাকে সেটাও আমার এলাকা। মা হয়ে এমন কাজ? রূপের গরব এত? আমার এলাকাতে বাস করে মেয়েকে মেরে ফেলার চক্রান্ত? ঠিক আছে, কালকে এসব নিয়ে খোঁজখবর করব। কালকে হবে এলাকার 'ওজাজা'—সবাইকে ডেকে এনে এক সভা হবে। সবাইকে সেখানে থাকতে হবে। তুমিও থাকবে। কেননা, তুমি হবে আমার বউ। বড় আদরের বউ'। একথা শুনে সুন্দরী মেয়ে লজ্জায় মাথা নিচু করে রইল।

সেদিনই চারিদিকে খবর চলে গেল। কাল সকালে হবে এলাকার 'ওজাজা'। সেই বিরাট জমায়েতে সবাই এল। নিষ্ঠুর মা, সৈন্যরা, বুড়িমা সবাই এল। এল না শুধু সেই কয়জন ডাকাত। তারা এই সভার কোন খবর পায়নি। তারা যে গভীর বনে লুকিয়ে থাকে, তাদের বাড়ির খবর কেই বা রাখে? সবাই যার যার কথা বলল। এখানে তো মন খুলে কথা বলতেই আসা।

শেষকালে সভায় এল সেই সুন্দরী মিষ্টি মেয়ে। ওগুলার মেয়ের হাত ধরে আস্তে আস্তে সে সভার মাঝে এল। চারিদিক আলো করে।

যেই না মা সেই মেয়েকে দেখেছে, অমনি লাফিয়ে উঠল সে। রাগে তার সারা শরীর কাঁপতে লাগল। পাশে-বসা বুড়িমার চুল ধরে টেনে জিজ্ঞেস করল, 'ওই তো আমার মেয়ে। ও-তো বেঁচে আছে। মরেনি। তুমি যে বললে তাকে মেরে ফেলেছ?'

বুড়িমা খুব অবাক হয়ে গিয়েছে। মরা মেয়ে বেঁচে ফিরল কি করে? সত্যি কি সেই মেয়ে? বলল, 'হ্যাঁ, আমি তো তাকে মেরেই ফেলেছিলাম। কিন্তু....।'

মেয়েটা একটা উঁচু পাথরে বসল। ওগুলা বলল, 'সবাই এখানে রয়েছে। তোমার জীবনের কথা তুমি বল।'

মেয়ে আরম্ভ করল। তার ছেলেবেলা থেকে শুরু করল। নিঃসঙ্গ জীবনের কথা, মায়ের নিষেধ, তার কৌতূহল, জাদু আয়না, সৈন্যদের কথা, মরে যাওয়ার কথা, বেঁচে ওঠার কথা,—আর শেষকালে ওগুলার বাড়ির কথা। সব বলল সে। মাঝে মাঝে সব ঝাপসা হয়ে উঠছে, চোখের জল বুক ভাসিয়ে দিচ্ছে। বিশেষ করে মেয়ে যখন

ডাকাতদের কথা বলছে·তখন তার কি কান্না! কোথায় হারিয়ে গেল তারা। আর কি কোনদিন দেখা হবে? মেয়ে থামল। মাথাটা নুয়ে রয়েছে।

সবাই একসঙ্গো চিৎকার করে উঠল। এমন নিষ্ঠুর মা। মেয়েকে মেরে ফেলতে চায়? আর এমন মিষ্টি মেয়েকে? শাস্তি চাই, শাস্তি চাই। প্রতিশোধ চাই। ডাইনি কোথাকার। ওকে পুড়িয়ে মারা উচিত। আর সেই বুড়িটাকেও।

এইরকম যখন চিৎকার হট্টগোল হচ্ছে তখন মা আর বুড়িমা ভীষণ ভয় পেয়ে গেল। মেয়ে যদি এক্ষুনি তাদের চিনিয়ে দেয়? তাহলে? ডাইনির শাস্তি? ভিড়ের মধ্যে তারা পেছন দিকে চলে গেল। সভা ছেড়ে পালাল। বনের পথ ধরল। আরও গভীর বন। তারপরে দূর এক দেশে চলে গেল। আর কখনও ফিরল না, কোথায় হারিয়ে গেল দুজনে।

সবার সামনে ওগুলার সঙ্গো মেয়ের বিয়ে হল। সবাই খুশি। গাঁয়ের লোক, ওগুলা, মেয়ে— সবাই। সবার চেয়ে খুশি হল ওগুলার মেয়ে। এমন খেলার সাথী। এখন থেকে তারই কাছে থাকবে।

আর ডাকাতরা? তারা সেই গভীর বনে নির্জন বাড়িতে থাকে। তারা 'ওজাজা'র কথা শোনেনি। সেখানে যায়ওনি। সবই তাদের রয়েছে, শুধু নেই আদরের বোন। শবাধারে মেয়ে ছিল, হোক সে ঘুমন্ত, তবুতো বোনকে প্রতিদিন দেখতে পেত। তাও নেই। তারা ডাকাত। আরও কোন বড় ডাকাত তাদের বোনকে বোধহয় ডাকাতি করে নিয়ে গিয়েছে। তারা প্রতিদিন চোখের জল ফেলে। কাজ করে, সব করে তবু বোনকে ভুলতে পারে না। কি হল তাদের বোনের? কোথায় রয়েছে সে? কোন্ দূর দেশে কোথায় গেল তাদের আদরের বোন।

নিয়ামবি ও কামোনু

তখন কোন কিছুই ছিল না। আদ্যিকালে কোন কিছুই ছিল না। ছিলেন শুধু নিয়ামবি। নিয়ামবি সব কিছু সৃষ্টি করলেন। তিনি গভীর বন সৃষ্টি করলেন। সাগর আর নদী। তারপরে বনের জন্তু জানোয়ার, গাছ আর আকাশের পাখি, জলের মাছ। আরও কত কি।

নিয়ামবি কিন্তু তখন এই পৃথিবীতেই বাস করতেন। বড় সুখে বাস করতেন। তার বউ ছিল নাসিলেলে। সে বড় ভালো মেয়ে। দুজনের সুখের সংসার । আর চারিদিকে নিয়ামবির সৃষ্টি করা কত প্রাণী। কি সুন্দর তাদের দেখতে। খাওয়া-দাওয়ারও কোন অভাব নেই। বড় সুখ বড় শান্তি।

কিন্তু নিয়ামবির মনে অশান্তি দেখা দিল। আরও একটা প্রাণী সৃষ্টি করেছেন। সে অন্যদের মতো নয়, একেবারে আলাদা। অন্যেরা নিজের নিজের স্বভাব নিয়ে থাকে, বেড়ায়, খায়, সংসার করে। এই প্রাণীটি অন্যরকম। এর নাম কামোনু। এই প্রাণী ওড়ে না চার পায়ে হাঁটে না। দু'পায়ে সোজা দাঁড়িয়ে চলে-ফিরে বেড়ায়। শুধু কি তাই? নিয়ামবি যা করে ফেলে, কামোনু সব কাজ ঠিক নিয়ামবির মতোই করে ফেলে। নিয়ামবি কামারশালায় হাপর চালিয়ে লোহা গলিয়ে যন্ত্রপাতি ও অস্ত্র বানাচ্ছেন, কামোনু তক্ষুনি সব শিখে নিল। তৈরি করল যন্ত্রপাতি আর অস্ত্র । নিযামবি খাল কেটে জমিতে জল আনলেন, লাঙল দিয়ে জমি চষলেন, বীজ লাগালেন। কামোনুও তাই করল। কিছু শিখতেই তার দেরি লাগে না। যা করেন নিয়ামবি, তাই নকল করে কামোনু।

নিয়ামবি চিন্তিত হলেন। মনের অশান্তি বেড়ে গেল। শেষকালে তিনি কামোনুকে ভয় পেতে শুরু করলেন। ভাবলেন, কেন সৃষ্টি করলাম কামোনুকে? কিন্তু এখন আর কি করবেন? অনেক দেরি হয়ে গিয়েছে।

কামোনু কামারশালার হাপরে একদিন একটা বর্শা তৈরি করল। নদীর পারে পড়ে-থাকা পাথরে ঘষে ঘষে বর্শাকে খুব চকচকে আর ধারালো করে তুলল। মুখে অদ্ভুত হাসি। বর্শা বাগিয়ে বনের পথে সে ফিরে আসছে। হঠাৎ দেখে একটা পুরুষ হরিণ নিশিন্তে ঘাস খাচ্ছে। ওরা তো ভয় পেতে শেখেনি। নিয়ামবির পৃথিবীতে কেউ কাউকে মারে না। তাই কামোনুকে একবার দেখেই হরিণ আবার ঘাস খেতে শুরু করল। হঠাৎ কামোনু হরিণের পেটে তার ধারালো বর্শা ঢুকিয়ে দিল। রক্ত ঝরল, ছটফট করল, হরিণ মরে গেল। কামোনুর মুখে অদ্ভুত হাসি। পরপর আরও কয়েকটা নিরীহ জন্তু মারা পড়ল কামোনুর বর্শার আঘাতে। বেশ মজা, বেশ লাগছে এই নতুন খেলা।

নিয়ামবি সব জানতে পারলেন। তিনি খুব ব্যথা পেলেন। তারপরে গেলেন রেগে। এসব কি হচ্ছে? তিনি ডেকে পাঠালেন কামোনুকে। কামোনু এল।

নিয়ামবি বললেন, 'কামোনু, তোমাকে আমি মানুষ হিসেবে সৃষ্টি করেছি। তুমি অন্যদের চেয়ে আলাদা। কিন্তু তুমি তো মোটেই ভালো কাজ করছ না। খুব খারাপ কাজকর্ম করে চলেছ। তুমি ওদের মেরে ফেললে। অথচ ওরা তোমার ভাই। তুমি কি জানতে না যে, ওরা সবাই তোমার ভাই? ভাইকে কখনো মারতে হয়? আর যেন না দেখি, তুমি ওদের গায়ে বর্শা ঢুকিয়ে দিয়ো না। মনে রেখো।'

কে শোনে কার কথা। কামোনু আবার ভাইদের মারল। বড় ভালো লাগছে এই খেলা।

এবার নিয়ামবি এমন রেগে গেলেন যে, কামোনুকে দূরের এক দ্বীপে রেখে এলেন। সে আর আসতে পারবে না। চারিদিকে অথৈ জল। জলে নামলেই ডুববে। নিয়ামবি নিশ্চিন্ত হলেন।

কিন্তু কয়েকদিন পরেই কামোনু ফিরে এল। একটা মস্ত বড় শুকনো কাঠে চেপে জলের ওপর দিয়ে ভাসতে ভাসতে সে ফিরে এল। কি আর করেন নিয়ামবি! তারই সন্তান তো! কামোনুকে সেখানেই থাকতে বললেন। তাকে দিলেন মস্ত বড় একটা বাগান। তাকে সেই বাগানে ভালোভাবে চাষবাস করতে বললেন। সে মানোযাগ দিয়ে কাজ করুক, দুষ্টুমি যেন না করে। ওসব ভালো নয়।

চাষে মন দিল কামোনু। বুদ্ধি খাটিয়ে চাষ শুরু করল। খাল কেটে জল আনল, লাঙল দিল, বীজ বুনল। সব কাজই সে খুব ভালোভাবে করতে পারে। সবুজ লক্‌লকে গাছ বাগান ছেয়ে ফেলল। কামোনু দেখে আর গুনগুন করে গান গায়।

একদিন হয়েছে কি, রাত্তিরবেলা অনেক বুনো মোষ বন থেকে বেরিয়েছে। সেই বাগানে সবুজ গাছ দেখে সব মোষ ঢুকে পড়ল। তারা ভয় পেতে শেখেনি। শব্দ হতেই কামোনু বাড়ি থেকে বেরিয়ে বাগানে ঢুকল। মোষ গাছ উজার করে দিচ্ছে। ছুটে গেল বাড়িতে, হাতে তুলে নিল বর্শা। ফিরে এল বাগানে। একের পর এক মোষকে মারতে লাগল। পাগল হয়ে গিয়েছে কামোনু। মোষদের দেখাদেখি বাগানে ঢুকতে যাবে একপাল কৃষ্ণসার হরিণ। কামোনু তাদেরও মেরে ফেলল। তার বাগানের গাছ নষ্ট করা। বুঝুক মজা।

এর কিছুদিন পরে কামোনুর পোষা তেজী কুকুরটা মরে গেল। তারপরে তার খাবার পাত্রটি টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে গেল। তার কয়েকদিন পরে ছেলেটিও মরে গেল। এ কি হল? কামোনু চলল নিযামবির বাড়িতে। তাকে সব খুলে বলতে হবে। এসব কি ঘটছে? কেন হচ্ছে এসব?

নিয়ামবির বাড়িতে গিয়ে কামোনু অবাক হয়ে গেল। সে যেন নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছে না। নিয়ামবির বাড়িতে তার ছেলে আর কুকুর খেলা করছে, তার পাত্রটি উঠোনের পাশে রয়েছে, তার আস্ত পাত্রটি। সে অবাক হল।

নিয়ামবির সামনে বসে পড়ে কামোনু বলল, 'আমাকে আপনার ওষুধ দিতেই হবে। যে গাছ-গাছড়ার ওষুধে ওদের বাঁচিয়ে তুললেন, আমার তা চাই। ওই ওষুধ পেলে আমার সংসারে আর কেউ মরে যাবে না। মরলেই বাঁচিয়ে তুলব। ওষুধ দিন।'

অনেক ঠকেছেন নিয়ামবি। অনেক চিনেছেন কামোনুকে। আর নয়। এতেই নিয়ামবি নাজেহাল হয়ে পড়েছেন, তার ওপরে বাঁচবার ওষুধ? আর নয়, অনেক হয়েছে। তিনি কামোনুকে তাড়িয়ে দিলেন, ওষুধ দিলেন না। কামোনু ফিরে গেল।

নিয়ামবি আরও চিন্তিত হয়ে পড়লেন। অনেক দিন থেকেই তিনি কামোনুকে ভয় পেতে শুরু করেছেন। সেই ভয় আরও বেড়ে গেল। কামোনু তার বাড়ির পথ চিনে গিয়েছে। তার বাড়িতেও এল, সব দেখে গেল। ওষুধ না দেওয়াতে আবার কি করে বসে। নিজের সৃষ্টি এমন বিপদে ফেলবে কে জানত? বড় ভয় নিয়ামবির। চিন্তা করতে বসলেন।

তারপর থেকে নিয়ামবি কামোনুর হাত থেকে বাঁচবার জন্য অনেক কৌশল করলেন। তিনি একবার নদী পেরিয়ে দূরের দ্বীপে চলে গেলেন। সঙ্গে নিলেন তার সংসার ও লোকজন। ওই বাড়ি তো কামোনু চিনে ফেলেছে। এবার অনেক দূরে। কামোনুর নাগালের বাইরে।

কিছুদিন পরেই কামোনু সেই দ্বীপে গিয়ে উপস্থিত হল। নলখাগড়া দিয়ে কামোনু এক ভেলা তৈরি করেছে। তাতে চেপে দিব্যি পৌঁছে গেল নিয়ামবির নতুন দ্বীপে। নিয়ামবি তো অবাক। তিনি আরও ভয় পেয়ে গেলেন।

তখন নিয়ামবি এক বিশাল উঁচু পাহাড় তৈরি করলেন। পাহাড়ের মাথা মেঘ ছাড়িয়ে আকাশে ঠেকেছে। মাটি থেকে দেখাই যায় না পাহাড়ের চুড়ো। সেই চুড়োতে বাস করতে লাগলেন নিয়ামবি, তার সংসার আর লোকজন। নিয়ামবিকে এবার বেশ নিশ্চিন্ত মনে হল। আর ভাবনা নেই।

এমনি করে দিন কাটে, রাত কাটে। হঠাৎ নিয়ামবির নতুন বাড়িতে উপস্থিত হল কামোনু। সে ঠিক আসবার পথ চিনে নিয়েছে, পাহাড়ি পথে উঠবার কৌশল জেনে ফেলেছে। মানুষের হাত থেকে নিস্তার নেই নিয়ামবির। নিয়মাবি যেখানেই যান, সেখানেই তার পিছে পিছে মানুষ চলেছে। এ এক অদ্ভুত প্রাণী।

এদিকে হয়েছে কি, অনেক কাল এমনি করে কেটে গেল। তাই মানুষ অনেক বেড়ে গিয়েছে। আগের মতো আর অল্প নেই। সারা পৃথিবী জুড়েই মানুষের ছড়াছড়ি। নিয়ামবি ভাবলেন, এক মানুষেই আমার যদি এমন দশা হয়, তবে কামোনু অন্যদের আমার পেছনে লাগালে তো সর্বনাশ হয়ে যাবে। আর কামোনুকে আমার পেছনে লাগাতে হবে না, ওরা যখন মানুষ তখন নিজেরাই আমার শান্তি কেড়ে নেবে, আমাকে তাড়িয়ে মারবে। ওরা যে মানুষ। ওরা আমারই সৃষ্টি, তবু ওরা মানুষ। এ এক ভয়ংকর জীব।

শেষকালে কোন উপায় না দেখে নিয়ামবি কয়েকটি পাখিকে ডাকলেন। তারা তো দূর দূর দেশে, মেঘের রাজ্যে অনেক ওপরে উড়ে যেতে পারে। তারা দেখে আসুক এমন এক দূরের রাজ্য যেখানে নিয়ামবি নতুন বাড়ি তৈরি করবেন। তিনি তৈরি করবেন নতুন রাজ্য, তার নাম হবে লিটোমা। সে রাজ্য শুধুই দেবতাদের জন্য।

পাখিরা চারিদিকে উড়ে চলল। দূর আকাশে, গভীর বন পেরিয়ে, উঁচু পাহাড় ডিঙিয়ে, নীল সমুদ্র পেরিয়ে। ফিরে এল কয়েকদিন পরে। না, লিটোমার জন্য তারা কোন ভালো জায়গা পেল না। অনেক ঘুরেছে। ডানা ক্লান্ত হয়েছে, তবু পায়নি তেমন জায়গা। নিয়ামবি আরও ব্যস্ত হয়ে পড়লেন।

শেষকালে তিনি একজন বৃদ্ধ ওঝা-গণককে ডেকে পাঠালেন। বড় বুদ্ধিমান এই ওঝা, ভালো গুনতে পারে। ওঝা অনেক আঁক জোক করে নিয়ামবিকে বলল, 'তোমার

বড় বিপদ। কিন্তু একজন ছাড়া আর কেউ তোমাকে মানুষের হাত থেকে বাঁচাতে পারবে না। সে মাকড়সা। মাকড়সা। মাকড়সার ওপরেই তোমার জীবন নির্ভর করছে।' ওঝা চুপ করে গেল। আর কিছু না বলে পাহাড়ি ঢালুতে নেমে চলল।

দেরি না করে নিয়ামবি মাকড়সাকে ডাকলেন। আঁকাবাঁকা পথে মাকড়সা এল নিয়ামবির বাড়ির উঠোনে। সব খুলে বললেন নিয়ামবি। তার বিপদের কথা, মানুষের দুষ্টুমির কথা, ওঝা-গণকের কথা। মাকড়সা এমন একটা জায়গা ঠিক করুক যেখানে নিয়ামবি নিশ্চিন্তে থাকতে পারবে। সে জায়গার নাম হবে লিটোমা। যেখানে শুধু দেবতারাই থাকবে। কামোনু কিংবা অন্য কোন মানুষ সেখানে পৌঁছতেই পারবে না। আঃ কি শান্তি।

দাঁড়াগুলো নেড়ে মাকড়সা আবার আঁকাবাঁকা পথে ফিরে চলল। সে কথা দিল,—একটা ব্যবস্থা করবেই। লিটোমার জন্য ঠিক জায়গা বেছে আসবেই। নিয়ামবি খুশি হল।

ফিরে এসেই মাকড়সা কাজে লেগে গেল। বসে থাকার পাত্র নয় সে, উপায় বের করে ফেলেছে। পৃথিবীর মাটি থেকে সে ওপরে জাল বুনতে লাগল। জাল ওপরে উঠছে, সেও ওপরে উঠে আবার জাল বুনছে। আরও ওপরে, আরও ওপরে। মেঘ ছাড়িয়ে আরও ওপরে। শেষকালে জাল শেষ করে তর্‌তর্‌ করে জাল বেয়ে নেমে এল মাটিতে। চলল নিয়ামবির কাছে। হ্যাঁ, লিটোমার জন্য সে জায়গা বেছেছে অনেক ওপরে, দূর আকাশে। পথও তৈরি করে ফেলেছে। জালের পথ। সোজা ওপরে যাওয়ার সুন্দর পথ। এবার নিয়ামবি যেতে পারে, কেউ তাকে বিরক্ত করতে পারবে না। না, মানুষও পারবে না, কামোনুও পারবে না।

সেই জালের পথ বেয়ে নিয়ামবি, তার সংসার ও লোকজন আকাশে উঠে গেল। কত দূরে রইল পৃথিবী, গাছ-গাছালি, সমুদ্র-নদী, পাখি-জন্তু-জানোয়ার আর মানুষ। বেশ নিশ্চিন্ত। তবু আরও নিশ্চিন্ত হওয়ার জন্য ওঝা-গণকের পরামর্শে নিয়ামবি মাকড়সার চোখ দুটো উপড়ে ফেলল, আর কোনদিন সে ঠিকপথে জাল তৈরি করতে পারবে না। কোনদিকে যে লিটোমা তা আর দেখতে পাবে না। লিটোমাকে না দেখলে আর এই পথে জাল বুনবে কেমন করে? ওপরে উঠে নিয়ামবি জালটা গুটিয়ে নিলেন, তারপর ছিঁড়ে ফেললেন। মানুষকে বিশ্বাস নেই, বিশ্বাস নেই কামোনুকে।

মাকড়সার চোখ উপড়ে দিলেন নিয়ামবি। এই একবারই তিনি নিষ্ঠুর কাজ করলেন। তার সৃষ্টিকে ব্যথা দিলেন। এই একবারই। কিন্তু তার যে আর কোন উপায় ছিল না। মানুষ বড় ভয়ংকর। তাকে তো বাঁচতে হবে। তিনিও ব্যথা পেলেন।

নিয়ামবিকে আর কেউ কোনদিন এই পৃথিবীতে দেখেনি। যেখানে তিনি গেলেন, এখান থেকে সেখানে নজর যায় না। তিনি অদৃশ্য হলেন।

কামোনু একদিন নিয়ামবির বাড়ি গিয়ে দেখে,—কেউ নেই সেখানে। নিয়ামবি তো নেই-ই, তার সংসারেরও কেউ নেই, নেই তার লোকজন। সব বুঝল কামোনু।

সঙ্গে সঙ্গে ফিরে এল তার এলাকায়। নিজের লোকজনকে ডাকল। যেমন করেই হোক নিয়ামবিকে ধরতেই হবে। ছাড়া চলবে না। সে তার লোকজনকে বলল, 'খুব উঁচু একটা জায়গা বানাতে হবে, তাতে চেপে নিয়ামবির কাছে পৌঁছতে হবেই। ওকে ছাড়া চলবে না। খুব পরিশ্রম করতে হবে। যেভাবে বলব সেভাবে কাজে লেগে যাও।'

কাজ শুরু হয়ে গেল। কুড়োলের আঘাতে বড় বড় গাছ মাটিতে পড়তে লাগল। তাদের ডালপালা কেটে আসল গাছটাকে মাটিতে পুঁতে দেওয়া হল। তার ওপরে গাছ, তার ওপরে গাছ। ওপরে, আরও ওপরে। মেঘ ফুটো করে নিয়ামবির কাছে পৌঁছতেই হবে। কাজ চলছে দিনরাত।

এমনি করে কয়েকদিন কাজ করার পরে অনেক উঁচু হল গাছের মাথা। আরও উঁচু করতে হবে। কাজ চলছে। হঠাৎ হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ল গাছের মাথা। ওপরে বড্ড ভারি হয়ে গিয়েছিল। সোজা রইল না তাদের গাছ। আবার চেষ্টা করা হল। কিন্তু এর ওপরে আর তাদের রাখা যাচ্ছে না। কামোনু হাল ছেড়ে দিল। সে বুদ্ধিমান। বুঝতে পারল, আর কোনদিন নিয়ামবির কাছে পৌঁছনো যাবে না। নিয়ামবি নাগালের বাইরে চলে গিয়েছে।

এতদিন পরে মানুষ কামোনুর মনে দুঃখ এল, কষ্ট হল। সে ব্যথা পেল মনে মনে। কাজটা বোধহয় ঠিক হয়নি। না করলেই হত। নিয়ামবি তো তার কোন ক্ষতি করে নি। কি জানি, কেন সে করল এমন কাজ।

তাই প্রতিদিন যখন সূর্য ওঠে পুব আকাশে, আঁধার মিলিয়ে যায়, তখন কামোনু সূর্যকে প্রণাম জানিয়ে বলে, 'ওই আমাদের রাজা এসেছেন। হাঁ, তিনি এসেছেন, আমাদের মাথার ওপরে। আমাদের রাজা, আমাদের সূর্য, আমাদের নিয়ামবি।' অন্য সব মানুষও সূর্যকে প্রণাম করে, অভিনন্দন জানায় , চিৎকার করে হাততালি দিয়ে আনন্দ করে ওঠে। তাদের সূর্য, তাদের রাজা, তাদের নিয়ামবি। পূর্ণিমার রাতেও তারা চাঁদকে দেখে প্রণাম করে, অভিনন্দন জানায় আনন্দে নৃত্য করে, গান গায়। পূর্ণিমার চাঁদ যে নাসিলেলে, নিয়ামবির বউ, সূর্যের প্রিয়তমা। তাদের রানি।

মাকড়সা কেমন করে আকাশ-দেবতার গল্প পেল

অনেক অনেক কাল আগে এক মাকড়সা ছিল। তার নাম কোয়াকু আনান্‌সে। সবাই জানে, আকাশ-দেবতা হলেন নিয়ান-কোন্‌পোন। কোয়াকু একদিন আকাশ-দেবতার কাছে গেল। সে আকাশ-দেবতার সব গল্প কিনে নিতে চায়। তাই সে এসেছে।

নিয়ান-কোন্‌পোন বললেন, 'তুমি কেমন করে ভাবলে, তুমি আমার সব গল্প কিনে নিতে পারবে?'

মাকড়সা বলল, 'আমি জানি আমি কিনতে পারব। তাই এসেছি।'

আকাশ-দেবতা হাসলেন আর বলবেন, 'কোকোফু, বেক্‌ওয়াই, আসুমেনগিয়া এসেছিল গল্প কিনতে। তারা যেমন বিশাল তেমনি শক্তিশালী। তারা পারে নি। আর তুমি এইটুকু প্রাণী। কিই-বা তোমার আছে? তুমি পারবে কেমন করে?'

মাকড়সা বলল, 'আপনার গল্পগুলোর দাম কত? একবার শুনি-ই না।'

আকাশ-দেবতা বললেন, 'যদি তুমি অজগর সাপ ওনিনি, চিতা ওসেবো, পরি মোয়াতিয়া, আর ভিমরুল মোবোরোকে দিতে পার, তবেই আমার গল্পগুলো কিনতে পারবে।'

মাকড়সা বলল, 'এ সবই আমি দেব। তার সঙ্গে আরও একটা জিনিস ফাউ দেব। সে হল আমার বুড়ি মা, নসিয়াকে।'

আকাশ-দেবতা মাথা নেড়ে বললেন, 'বেশ, তবে তাই নিয়ে এসো। গল্প তুমি পাবে।'

মাকড়সা নেমে এল পৃথিবীতে। সব কথা জানিয়ে বুড়ি মাকে বলল, 'আমার ইচ্ছে আমি আকাশ-দেবতার সব গল্প কিনে নেব। আকাশ-দেবতাকে এর বদলে দিতে হবে অজগর সাপ, চিতা, পরি আর ভিমরুল। আমি বলেছি এসবের সঙ্গে আমি তোমাকেও দিয়ে আসব। তিনি রাজি।'

মাকড়সার বউয়ের নাম আসো। আসোকে সে বলল, 'এখন বুদ্ধি বের করতে হবে কীভাবে অজগর ওনিনিকে ধরা যায়।'

বউ বলল, 'বনে গিয়ে তালগাছের একটা বড় পাতাসমেত ডাল কেটে আনো, আর নিয়ে এসো শক্ত বুনো লতা। তাই নিয়ে গাঁয়ের শেষে ওই হ্রদে যাও।'

আনান্‌সে তাই নিয়ে এল। চলল হ্রদের তীরে। সেখানে গিয়ে আপন মনে বলল, মনে হয় এটা ওর চেয়ে লম্বায় বড়। না, না, তা কি করে হয়। বোধহয় ছোটই হবে। তুমি মিথ্যে বলছ। এটা লম্বায় বড়ই হবে। ওটা তো হ্রদেই থাকে, ওই তো ওখানে।

অজগর জলের ভেতর থেকে এক অদ্ভুত কথাবার্তা শুনল, অবাক হল। জলের ওপরে মাথা তুলে বলল, 'কি হয়েছে? ব্যাপারটা কি?'

মাকড়সা বলল, আমার বউ আসো আমার সঙ্গে খালি তর্ক করছে। বলছে এই

তালপাতার ডালটা লম্বায় তোমার চেয়ে বড়। এত মিথ্যে কথাও সে বলতে পারে মিথ্যাবাদী, একেবারে মিথ্যাবাদী।'

অজগর বলল, 'এত তর্কের কি আছে? আমি জল থেকে উঠছি। মেপে নিলেই হবে।'

অজগর টানটান করে লম্বা হয়ে পড়ল। মাকড়সা তার দেহ ঢেকে দিল তালপাতায়। তারপর বুনো লতা দিয়ে পাতা-সমেত অজগরকে জড়িয়ে ফেলতে লাগল। মুখে মাপবার শব্দ করতে লাগল— নোয়েনেনে, নোয়েনেনে, নোয়েনেনে। কাজ শেষ করে মাকড়সা বলল, 'বোকা কোথাকার! এবার তোমাকে আকাশ-দেবতার কাছে বেচে দেব। আর তার বদলে পাব তার গল্পগুলো। চলো।'

মাকড়সা চলল আকাশ-দেবতার কাছে। বলল, 'নিয়ে এসেছি অজগর ওনিনিকে।'

আকাশ-দেবতা বললেন, 'আমি হাত দিয়ে ওকে স্পর্শ করলাম। যা আছে তাই থাকবে।'

মাকড়সা ফিরে এসে সব কথা বউকে জানাল। বলল, 'এবার ভিমরুলকে ধরতে হবে।'

বউ বলল, 'লাউয়ের একটা খোল জোগাড় করো, তাতে জল ভর্তি করে বনের পথে যাও।'

মাকড়সা সব ঠিক করে নিয়ে বনের পথে রওনা দিল। কিছু দূরেই ভিমরুলের একটা চাক দেখতে পেল। একটা গাছে সেটা ঝুলছে। লাউয়ের খোল থেকে কিছুটা জল নিয়ে মাকড়সা চাকে ছুড়ে দিল, কিছুটা জল নিজের মাথায় ঢেলে নিল। তারপরে ভিমরুলদের বলল, 'খুব বৃষ্টি পড়ছে, ওপর থেকে পাতা বেয়ে জল পড়ছে। এক কাজ করো। আমার এই লাউয়ের খোলের মধ্যে ঢুকে যাও, তাহলে আর বৃষ্টি মোটেই গায়ে লাগবে না।'

ভিমরুলরা বলল, 'কি ভালো তুমি, তোমাকে অনেক ধন্যবাদ জানাই আকু, ধন্যবাদ জানাই আকু।'

এই না বলে বৃষ্টির ভয়ে ভিমরুলরা সব চাক থেকে উড়ে এসে লাউয়ের খোলে ঢুকতে লাগল। মুখটা ঢেকে মাকড়সা বলল, 'বোকা কোথাকার। এবার তোমাদের আকাশ-দেবতার কাছে বেচে দেব। আর তার বদলে পাব তার গল্প। চলো।'

মাকড়সা চলল আকাশ-দেবতার কাছে। আকাশ-দেবতা বললেন, 'আমি হাত দিয়ে ওকে স্পর্শ করলাম। যা আছে তাই থাকবে।'

আবার ফিরে এল মাকড়সা। বউকে বলল, 'এবার চিতা ওসেবোকে ধরতে হবে।'

বউ বলল, 'ঘন বনের মধ্যে চলে যাও আর একটা গর্ত করো।'

মাকড়সা বলল, 'আর বলতে হবে না। আমি বুঝতে পেরেছি।'

মাকড়সা চলল ঘন বনের পথে। চিতার খোঁজে। চিতার খাবার চিহ্ন খুঁজতে লাগল। খাবার চিহ্ন দেখতে পেল। নজর রেখে এগোতে লাগল। একটু এগিয়েই এক বিরাট গর্ত খুঁড়ল। গাছের শুকনো ডালপালা দিয়ে গর্তের মুখটা বন্ধ করে দিল। ফিরে এল বাড়িতে।

পরের দিন খুব ভোরে রওনা দিল মাকড়সা। তখনও সব কিছু চোখে ভালো দেখা যাচ্ছেনা। আস্তে আস্তে যেতে যেতে সব পরিষ্কার হয়ে গেল। কি আনন্দ। গর্তের কাছে যেতেই গর্জন শুনতে পেল। ভেতরে পড়ে রয়েছে চিতা ওসেবো।

মাকড়সা বলল, 'বাপের ছোট্ট ছেলে, মায়ের ছোট্ট ছেলে, তোমাকে আগেই সাবধান করে দিয়েছিলাম। হল তো! বার বার বলেছি, মজানো তালের রস অত খেয়ো না, মাতাল হয়ে পড়বে। হল তো! এমন মাতাল হয়ে পড়লে কাল রাতে যে গর্তেই পড়ে গেলে? আমি আগেই জানতাম। আমি তোমায় গর্ত থেকে তুলতে পারি। আহা! যা হবার তাই হয়েছে। কিন্তু কালকেই তো তুমি সব কিছু ভুলে যাবে। আমাকে কিংবা আমার ছেলেমেয়েদের দেখলেই তেড়ে আসবে। ঠিক বলিনি?'

চিতার মাথা কেমন গুলিয়ে গিয়েছে, চিন্তা তালগোল পাকিয়ে গিয়েছে, সে কিছুই বুঝতে পারছে না। মাকড়সার কথার অর্থও সে বুঝতে পারছে না। কি বিপদেই পড়েছে। তাই তাড়াতাড়ি বলল, 'ওঃ আমি কখনই এ কাজ করতে পারি না।'

মাকড়সা তখন একটু দূরে গেল আর গাছের দুটো ডাল কেটে আনল। একটা এখানে রাখল, আরেকটা ওখানে রাখল। বলল, 'চিতা, তোমার একটা থাবা এখানে দাও, অন্য থাবাটা ওখানে বসাও।'

চিতা তার কথামতো তাই করল। চিতা ওপরে উঠে আসছে, অনেকটা ওপরে,—হঠাৎ মাকড়সা তার চোখের নিমেষে তার ধারালো ছুরিটা বের করেই চিতার মাথায় বসিয়ে দিল। ধপ্ করে শব্দ হল। চিতা পড়ে গেল গর্তের মধ্যে। এখন আর আগের চিতা নেই। মই নিয়ে এসে তর্তর্ করে গর্তের মধ্যে নেমে গেল। চিতাকে গর্তের বাইরে তুলে আনল। যাচ্ছে আর বলছে, 'বোকা কোথাকার! এবার তোমাকে আকাশ-দেবতার কাছে বেচে দেব। আর তার বদলে পাব তার গল্পগুলো। চলো।'

মাকড়সা চলল আকাশ-দেবতার কাছে। আকাশ-দেবতা বললেন, 'আমি হাত দিয়ে ওকে স্পর্শ করলাম। যা আছে তাই থাকবে।'

আবার ফিরে এল মাকড়সা। এবার ধরতে হবে পরি মোয়াতিয়াকে। মাকড়সা একটা কাঠের পুতুল তৈরি করল, পুতুলের মুখটা চ্যাপ্টা। তারপরে গাছের গোড়া থেকে আঠা এনে পুতুলটার সারা গায়ে লেপ্টে দিল। আনেকটা মেটে আলু সেদ্ধ করে মেখে কিছুটা রেখে দিল পুতুলটার হাতে, আর কিছুটা একটা পেতলের বাটিতে রেখে দিল। পুতুলের কোমরে একটা লম্বা দড়ি বাঁধল। পুতুলকে নিয়ে চলল বাগানের ওপাশে, শিমুল গাছের নীচে। প্রতিদিন রাতে ওখানে পরিরা নাচতে আসে একটু দূরে দড়ি ধরে মাকড়সা লুকিয়ে থাকল।

চাঁদনি রাত। উড়ে আসছে একটা ছোট্ট পরি। সোজা নেমে এল পুতুলের কাছে। বলে উঠল, 'আকুয়া, তোমার হাতের আলু সেদ্ধ একটু খাব?' মাকড়সা দড়ি ধরে টান্ দিল, পুতুল মাথা নাড়ল, সম্মতি দিল। আলুসেদ্ধ নিয়ে সে খেল। খুব ভালো আলু। বলল, 'তোমায় ধন্যবাদ।' পুতুল কোন সাড়া দিল না, মাথও নাড়ল না। রেগে গেল পরী। বলল, 'তোমায় ধন্যবাদ জানালাম, তবু উত্তর দিলে না?' পুতুল তবু কিছু বলল না। আরও রেগে গেল পরি। পুতুলের গালে এক চড় মারল। এ কি! হাত পুতুলের দেহে আটকে গেল। অন্য হাতে পুতুলের বুকে রেখে দিয়ে চাপ দিয়ে ছাড়াতে গেল। একি! ও হাতও আটকে গেল! বুক পেট দিয়ে পুতুলকে ধাক্কা মারতে গেল। এ কি! বুক-পেট আটকে গেল। নড়াচড়া করাই কঠিন।

মাকড়সা লুকনো জায়গা থেকে বেরিয়ে এল। দড়ি দিয়ে পরিকে বেঁধে ফেলল।

বলল, 'বোকা কোথাকার! এবার তোমাকে আকাশ-দেবতার কাছে বেচে দেব। আর তার বদলে পাব তার গল্পগুলো। চলো।'

পরিকে নিয়ে মাকড়সা বাড়ি ফিরে এল। মাকড়সার মায়ের কাছে এসে বলল, 'ওঠো, আকাশ-দেবতার কাছে যেতে হবে। তাকে বলেছিলাম তোমাকে ফাউ হিসেবে দেব। পরির সঙ্গে তোমাকেও যেতে হবে। ব্যাস, কাজ শেষ। এবার পাব গল্পগুলো।'

পরি ও মাকে নিয়ে মাকড়সা আকাশ-দেবতার কাছে চলল। সেখানে পৌঁছে বলল, 'আকাশ-দেবতা, এই পরি মোয়াতিয়াকে নিয়ে এসেছি। আর কথামতো আমার বুড়ি মাকে ফাউ এনেছি।'

আকাশ-দেবতা অবাক হলেন। তিনি তার রাজ্যের প্রধানদের ডাকলেন। দুই সর্দার কোন্‌টিরে ও আক্‌ওয়ান এলেন, আরও এলেন গণ্যমান্য আদোনতেন, গিয়াসে, ওয়োকো, আন্‌কো-বিয়া ও কাইদোম। আকাশ-দেবতা তাদের বললেন, 'অনেক অনেক সর্দার এসেছে, আনেক গোষ্ঠীপতি এসেছে। তারা খুব শক্তিশালীও বটে। কিন্তু কেউ আমার গল্পগুলো কিনে নিয়ে যেতে পারে নি। সবাই হেরে গিয়েছে। কিন্তু কোয়াকু আনান্‌সে গল্পগুলোর সব দাম মিটিয়ে দিয়েছে। আমি তার কাছ থেকে অজগর ওনিনি, চিতা ওসেবো, ভিমরুল মোবোরো ও পরি মোয়াতিয়াকে পেয়েছি। তার ওপরে ফাউ পেয়েছি তার মাকে। ওই দেখ, সবগুলো জিনিস ওখানে একসঙ্গে রয়েছে। তোমরা সকলে তার জয়গান কর।'

সবই 'ই' 'ই' বলে চিৎকার করে উঠল। গর্বে মাকড়সার বুক ফুলে উঠল।

আকাশ-দেবতা বললেন, 'কোয়াকু আননসে, আজকে আমি আকাশ-দেবতা আমার সব গল্প তোমাকে দিলাম। আজ থেকে চিরকালের জন্য আমার এইসব গল্প তোমার হল। এ আমার উপহার। যোগ্য পাওনা। কোসে। কোসে। কোসে। আমি তোমায় আশীর্বাদ করছি। আজ থেকে আর কেউ ওগুলোকে আকাশ-দেবতার গল্প বলবে না। আজ থেকে সবাই বলবে,— কোয়াকু আনান্‌সের গল্প, মাকড়সার গল্প। আমিও তাই বলব।'

আমার গল্প শেষ হল। আমি যা বললাম, তা যদি মিষ্টি লাগে, তা যদি মিষ্টি না-ও হয়, তবু অন্যদের এ গল্প বলবে। চারিদিকে ছড়িয়ে দেবে। আবার আমার কাছে ফিরে এসে এ গল্প বলবে। তবে তাই হোক।

নিষিদ্ধ ফল

আগে অনেক কিছু ছিল, মানুষ ছিল না। দেবতা প্রথম মানুষ সৃষ্টি করলেন। তিনি চন্দ্র থেকেই অংশ নিয়ে আদি মানব সৃষ্টি করলেন। তার নাম বা-আত্সি। আস্তে আস্তে আঙুল দিয়ে টিপেটুপে তিনি মানুষটার দেহ গড়ে তুললেন। তারপরে মসৃণ কালো চামড়া দিয়ে দেহটি দিলেন ঢেকে। সুন্দর দেহ তৈরি হবার পরে তিনি দেহের মধ্যে রক্ত ঢেলে দিলেন। মানুষ তখন প্রাণ পেল। আদি মানব,—প্রথম পিতা বা-আতসি চলে-ফিরে বেড়াতে লাগল।

দেবতা বা-আত্সিকে ডেকে কানে কানে বললেন, 'তুমি প্রাণ পেলে। তুমি আমার নতুন সৃষ্টি। এবার থেকে তোমার ছেলেমেয়ে হবে। সেই ছেলেমেয়ে পৃথিবী ছেয়ে ফেলবে। কিন্তু তুমি তাদের একটা ব্যাপারে সাবধান করে দেবে। এই নিষেধ তারা যেন মেনে চলে। নইলে সর্বনাশ হবে। সবাই যেন মেনে চলে। বনে যত গাছ আছে তার ফল তারা খাবে। সব গাছের ফল খেতে পারবে। কিন্তু তাহু গাছের ফল কখনও স্পর্শ করবে না। হ্যাঁ, তাহু গাছের ফল। ছেলেমেয়েদের বলে দেবে।'

অল্পদিনের মধ্যে বা-আত্সির অনেক ছেলেমেয়ে হল। ছেলেমেয়ে একটু বড় হলেই সে দেবতার এই নিষেধের কথা তাদের জানিয়ে দেয়। নিষেধ মেনে চলতে বলে। তারপর একদিন বয়স হলে বা-আত্সি আকাশে দেবতার কাছে চলে গেল। অনেক ছেলেমেয়ে পৃথিবীতে রইল।

প্রথম প্রথম সবাই সে নিষেধের কথা মেনে চলত। আর তাই সবাই খুব সুখে থাকত। বড় আনন্দ, বড় সুখ, বড় শান্তি।

এখন হয়েছে কি, একদিন একটি মেয়ের খুব ইচ্ছে হল সে ওই নিষিদ্ধ ফল খাবে। সে তখন মা হতে চলছে, সে গর্ভবতী। কিছুতেই ইচ্ছে আর লোভকে দমন করতে পারছে না। সে তার স্বামীকে বলল, ওই ফল তাকে দিতেই হবে। সে খাবেই। স্বামী অবাক হল, আদি পিতার নিষেধের কথা বলল। ফল দিতে রাজি হল না। কিন্তু বউ বারবার বলাতে স্বামী ভাবল, লুকিয়ে দিলে কেউ তো আর জানতে পারবে না। বনের গভীরে নিয়ে গিয়ে সে বউকে ফল দিল। বউ ফল খেল। ফলের বীজগুলো পাতায় জড়িয়ে রাখল।

চন্দ্র আকাশ থেকে সব দেখলেন। দেবতাকে বলে দিলেন। দেবতা ভীষণ রেগে গেলেন। মানুষ তার নিষেধ আমান্য করেছে? আর এই নিষেধ না মানার জন্য দেবতা শাস্তি দিলেন। তিনি মানুষের মধ্যে মৃত্যুকে পাঠিয়ে দিলেন।

শেয়াল কেন চাষ করে না

সবুজ পাহাড়ের কোলে ছিল এক গ্রাম। আর সেই গাঁয়ের পাশে ছিল মস্ত এক সবুজ বন। গভীর বনের মধ্যেও ছোট ছোট পাহাড়। সেই ছোট্ট পাহাড়ে থাকত এক শেয়াল আর তার বউ। শেয়ালের অল্পদিন হল বিয়ে হয়েছে। তাদের ছেলেমেয়ে নেই। বেশ সুখে দিন কাটে।

একদিন বুনো মুরগির হাড় চিবোতে চিবোতে শেয়াল-বউ বলল, "দেখ, আমরা তো বেশ সুখেই আছি। কষ্ট করে শিকার ধরতে হয়। কিন্তু অভাব তো আর নেই। বেশ চলে যাচ্ছে। কিন্তু এভাবে তো চিরকাল কাটবে না। আজ বাদে দুদিন পরে আমাদের ছেলেপুলে হবে। সংসার বাড়বে। তখন তো আর শুধু আমরা দুজনে থাকব না! সবাই তাই চায়। কিন্তু যতদিন ওরা বড় না হয়, ততদিন সংসার চলবে কি করে? ভেবেছ কিছু?"

হাড় চিবোনো থামিয়ে দিয়ে শেয়াল বউয়ের দিকে চোখ ফেরাল। বলল, "একেবারে যে ভাবিনি তা নয়। জানি সংসার বাড়বে। কিন্তু ভেবে তো কূল-কিনারা কিছু পাই না। তুমি কিছু ভেবেছ? কি করতে বল? একটা কিছু বুদ্ধি দাও।'

শেয়াল-বউ একটু ভেবে বলল, 'আমি ঘরের বউ, আমার কিই-বা বুদ্ধি। আমি কি বলব?'

'সে কি? তা কি হয়? তুমি ঠিক কিছু ভেবেছ। নইলে একথা মনে এল কেন?" শেয়াল হাসিমুখে বলল।

শেয়াল-বউ লজ্জা-লজ্জা ভাব করে বলল, "হ্যাঁ, তা কিছু ভেবেছি বৈকি। নইলে আর কথাটা তুললাম কেন। তুমি এক কাজ করো। পাশেই তো মস্ত গাঁ। সেখানে তো মাহাতো থাকে। তার কত জমি, সে কত বড়লোক। আর তোমায় তো সে খুব ভালোবাসে। তুমি তার কাছে যাও। তার সঙ্গে দেখা কর।"

শেয়ালের চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। সে বলল, "এ কথা তো আগে ভাবিনি। খুব ভালো বুদ্ধি। গিয়ে কি বলব?"

শেয়াল-বউ বলল, "মাহাতোর কাছে তুমি এক খণ্ড জমি চাইবে। জমিটা যেন ঢালু হয়। ঢালু জমিতে ফসল ভালো হয়। ফসল ফলবে। ফসল আসবে ঘরে। খাবার থাকবে মজুত। ছেলেমেয়েদের জন্য আর ভাবতে হবে না। তুমি কি বল?"

যুক্তি শেয়ালের বেশ মনে ধরেছে। বউ যে এত বুদ্ধিমতী তা সে আগে জানত না। মনে মনে বউকে সে আরও ভালোবাসল। এমন বউ যার ঘরে তার দুঃখ থাকবে না। শেয়াল খুশি হল। পরের দিন ভোরবেলা শেয়াল চলল গাঁয়ের পথে। মাহাতোর সঙ্গে দেখা করতে হবে। সকাল সকাল না গেলে দেখা পাওয়া যাবে না। কাজের লোক। কোথায় হয়তো কাজে বেরুবে। শেয়াল চলেছে খুশি মনে, হালকা পায়ে। বুকে আশা মনে আনন্দ।

গাঁয়ের মাঝখানে মাহাতোর মস্ত বাড়ি। বাইরে একটা ঘরে মাহাতো সকালে বসে। লোকজনের সঙ্গো দেখা করে, কাজের কথা হয়। শেয়াল ঘরে ঢুকেই মাথা নুইয়ে প্রণাম করল। বলল, "দাদা আপনাকে প্রণাম জানাই। আপনার পা ছুঁয়ে প্রণাম জানাই।"

মাহাতো খুশি হল। বলল, "বেশ বেশ। ভাই, সুখে থাকো। শরীর ভালো থাকুক। তা বল কিসের জন্য এসেছ?"

শেয়াল বলল, "শরীর ভালো। সব ভালো। তা এলাম একটা কাজে। একটা আর্জি আছে।"

মাহাতো আনমনা হয়ে মাথা নাড়ল। সে এখন অন্যদিকে তাকিয়ে রয়েছে।

শেয়াল নরম গলায় বলল, "আপনার ভাইবউ তো এবার মা হতে চলেছে। তা ছেলেপুলে হলে খাব কি? তখন তো দুজন থাকব না? তাই সে আপনার কাছে পাঠাল। এক খণ্ড জমি চাষ করতে চাই। জমি ধার নিয়ে চাষ করব। আপনার ভাগের ফসল, আপনার পাওনা ঠিকঠাক দিয়ে যাব। জমিতে খুব খাটব, দুজনেই। তাই এলাম।"

মাহাতো এবার হেসে ফেলল। হাসি থামিয়ে বলল, "আচ্ছা ভাই, বলতো বছরের এই সময়ে তোমায় এখন কোন্ জমি বিলি বন্দোবস্ত করি। এখন তো চারা বোনার সময় হয়ে এল। তা নেহাৎই যখন এসেছ, দেখি ছেলেদের সঙ্গো পরামর্শ করে। তারা কি বলে। এখন তো সবকিছু আর আমি দেখি না। ওরা বড় হয়েছে। যাক, তুমি পরশু এসো।"

আশায় বুক বেঁধে শেয়াল গুহায় ফিরে এল। সব কথা বউকে জানাল। এই নিয়ে বেশ কিছুক্ষণ সলা-পরামর্শ চলল। আশা যখন দিয়েছে মাহাতো, সুরাহা একটা হবেই। দুজনেই খুশি।

মাহাতোর কথামতো শেয়াল আবার সেদিন গেল। বেশ খুশি খুশি ভাব। প্রণাম জানিয়ে শেয়াল বলল, "দাদা, ছেলেদের সঙ্গো জমির কথা বলেছিলেন? তারা মত দিয়েছে তো?"

মাহাতো মুখে চুকচুক আওয়াজ করে বলল, "এঃ, একেবারে ভুলে গেছি। ভাই তুমি কিছু মনে করো না। আচ্ছা, তুমি বরং কালকে এসো।"

শেয়ালের মনটা খারাপ হল। কিন্তু কি আর করবে? ফিরে গেল গুহায়। তবু একেবারে নিরাশ হল না। মাহাতো খুব ব্যস্ত মানুষ, ভুলে যেতেই পারে। সব কথা মনে থাকে! শেয়াল মনকে বোঝাল।

পরের দিন সকাল হতেই মাহাতো তার চারটে তেজী কুকুরকে বসিয়ে রাখল। তারপরে বড় বস্তা দিয়ে তাদের সামনে আড়াল দিল। বাইরে থেকে কেউ বুঝতেই পারবে না, ওখানে কি জিনিস লুকোনো আছে। কুকুরগুলো কয়েকবার ঘেউ ঘেউ করল। মাহাতো গায়ে হাত বুলোতেই তারা চুপ করে গেল। বড় বাধ্য তারা।

সূর্যের আলো ফুটতেই শেয়াল রওনা দিল। পাহাড়ের কোলে তখনও সূর্যের আগুন। কিন্তু দেরি সইছে না শেয়ালের। বুক বড় কাঁপছে।

ঘরের পধ্যে ঢুকেই শেয়াল কাঁপা গলায় বলল, "দাদা, প্রণাম করি। তা ছেলেদের সঙ্গো কথা হয়েছে? ওরা মত দিয়েছে? বউদি মত দিয়েছে তো?" শেয়ালের দেহে উত্তেজনা, বুকে আশা, চোখে-মুখে কেমন ভয়-ভয় ভাব। হবে তো?

মাহাতো গোঁফের ফাঁকে হেসে বলল, "হ্যাঁ, সলা-পরামর্শ হয়েছে। তা ভাই অত দূরে দাঁড়িয়ে কেন? কাছে এসো।"

শেয়ালের বুক আরও বেশি কাঁপতে লাগল। চোখ চক্‌চক্‌ করে উঠল আশায়। এগিয়ে গেল মাহাতোর কাছে। মাথাটা নুইয়ে এগিয়ে গেল। শান্ত হয়ে বসল। আনন্দে শরীর নাচছে, চোখে জল এসে পড়ছে।

মাহাতো হঠাৎ ডানদিকে সরে বসল। খুব ঝটিতে ডান হাত দিয়ে এক টানে বস্তা সরিয়ে ফেলল। চিৎকার করে উঠল, " চৌরা, ভৌরা, তিলকা, লোধা,—ওকে ধর্‌।"

চারটে কুকুর জিভ-দাঁত বের করে ঝাঁপিয়ে পড়ল। শেয়াল কেমন ভড়কে গিয়েছিল। এমন তাড়াতাড়ি আচমকা ব্যাপারটা ঘটে গেল যে সে প্রথমে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গিয়েছিল। কিন্তু শেয়াল বনের পশু। বনে সব সময় সতর্ক থাকতে হয়। স্বভাবই তাই। এক মুহূর্তেই সে ব্যাপারটা বুঝে নিল। তার তেজী ভাব ফিরে এল। ব্যাপার বুঝেই সে লাফিয়ে উঠল। শরীরটা লম্বা করে প্রস্তুত হল। মাহাতোর বাড়ির দরজা দিয়ে এক ঝলকে একটা তির যেন বেরিয়ে গেল। সামনেই উঠোন, উঠোনের ওপারেই রাস্তা পেরিয়ে চষা জমি, জমির শেষেই বন। শেয়াল বনের পথে দৌড় দিল। বনের দিকে বর্ষার হাওয়ার বেগে ছুটছে। পেছনে চারটে কুকুরও মরিয়া হয়ে ছুটছে।

বনের আঁকাবাঁকা পথে, তার চেনা পথে, তার চেনা বনে শেয়াল ছুটে চলেছে। পেছনে আর শুকনো পাতার শব্দ শোনা যাচ্ছে না, মাটি কাঁপছে না। শেয়াল দাঁড়াল। কুকুররা আর আসছে না। ঘরের পোষা কুকুর আদরে মানুষ, তৈরি মাংস খায়। ওরা পারবে কেন বনের শেয়ালের সঙ্গে।

আস্তে আস্তে শেয়াল গুহায় এল। তার পা কাঁপছে। বুক ওঠানামা করছে, জিভ বেরিয়ে গিয়েছে, চোখে অন্ধকার। সে লম্বা হয়ে ছড়িয়ে শুয়ে পড়ল। সামনের পায়ে মুখ রেখে তাকিয়ে দেখতে লাগল। চোখ বন্ধ হয়ে আসছে। বউ অবাক হয়ে তার দিকে তাকিয়ে রয়েছে। তার মুখেও কোন কথা নেই।

একটু শান্ত হয়ে শেয়াল মাথাটা তুলল। ভেজা চোখে বলল, "ও বউ, কি যুক্তিই দিয়েছিলে। আর একটু হলেই প্রাণ যেত। তা তুমিই বা কি করে এসব শয়তানি বুঝবে। তোমার আর কি দোষ। উঃ, বড় বাঁচাই বেঁচে গেছি। জমি চাইতে গিয়ে আর একটু হলেই মরেছিলাম আর কি। জমির বদলে মাহাতো চারটে কুকুর লেলিয়ে দিয়েছিল। কি শয়তান। আগেই বোঝা উচিত ছিল। ওদের তো চিনি। যাক্‌, প্রাণে বেচেছি।" শেয়াল আরও কত কি বিড়বিড় করতে লাগল।

শেয়াল বউ কেঁদে ফেলল। কাঁদতে কাঁদতে বলল, "কে জানত এমন হবে! ভাবলে বুক কাঁপে। দরকার নেই জমির। এখানে অভাব, তবু ওরা তো নেই। প্রাণের ভয় কম। অনেক নিরাপদ। আর মাহাতোর বাড়ি যেয়ো না। আমাদের চলে যাবে। যেমন করে পারি ছেলেমেয়েদের মানুষ করে তুলব। দরকার নেই। এভাবেই চলবে।"

তারপর থেকে শেয়াল আর কোনদিন চাষ করার কথা ভাবেনি। জমি চায়নি। বনের পশু বনেই থেকেছে।

পিহ্‌মুয়াকি আর তার গান

কি সুন্দর আমাদের লুসাই পাহাড়! কি সুন্দর! আর সুন্দর পাহাড়ের কোলে কোলে আমাদের ছোট ছোট গ্রাম। কি সুন্দর!

তখন তো অন্যরকম ছিল। সেই সময় এইসব গাঁয়ে লুসাই কবি আর চারণেরা কত গান গাইতেন। মন ভরে যেত। সেসব মনমাতানো গান পাহাড় থেকে পাহাড়ে প্রতিধ্বনিত হত। সবাই মুগ্ধ হত। আবাক হত। সেদিন কোন মানুষ তখনও এখানে আসে নি। কোন সাদা মানুষও সেদিন এখানে আসেনি। এরাও নিজের এলাকা ছেড়ে কোথাও যেত না। নাড়ির টানে আটকে থাকত। সে কি কম কথা! বাঁধন-হারা লুসাই গান আর পাহাড়ের প্রকৃতি, ঝরনার গান আর সবুজ বনভূমি—কোথায় হারিয়ে গেল সেসব।

অনেক অনেক চারণ-কবির কথা আমরা জানি। তাদের ভুলিনি। তবু এদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি নাম ছিল পিহ্‌মুয়াকির। পিহ্‌মুয়াকিকে কেউ কোনদিন ভুলবে না। তার গলা ছিল বুলবুলির মতো মিষ্টি, ঝরনার মতো মধুঢালা।

ছোট্ট মেয়ে পিহ্‌মুয়াকি। ছোট্ট হলে কি হবে, সবসময় সে গল্প শুনতে ভালোবাসত। বনের পশুর গল্প, মানুষের সুখ-দুঃখের গল্প, নানান দেশের গল্প, পুরাকালের গল্প কিংবদন্তি,—দাদু-ঠাকুমারা যে গল্প বলে তাই সে শোনে। এসব গল্প সেই কোন ভুলে-যাওয়া কাল থেকে দাদু-দিদিমা-ঠাকুমারা শুনিয়েছে তাদের নাতি-নাতনিদের, বাবারা শুনিয়েছে ছেলেদের, মায়েরা শুনিয়েছে মেয়েদের। এমনি করে ডালে ডালে পাতায় পাতায় গল্প বয়ে এসেছে। সেসব কি ভোলা যায়? আর আছে গান। কত উৎসবে, কত পুজোতে এসব গান গাওয়া হত। ভোজের আসরেও গান গাওয়া হত। এই গান এখন আর তেমন শোনা যায় না।

এই গল্পের আসরে, গানের উৎসবে পিহ্‌মুয়াকি থাকবেই। গান শোনার বড় লোভ তার, এসব জায়গায় ছোট্ট মেয়েটি যাবেই যাবে। বছরের অনেক সময় বড় কষ্টে কাটে। কত অভাব, কত দুঃখ। বহু পরিশ্রমেও পেটের দানা জোটে না। কিন্তু সেই সময়? যখন খেতের ফসল ঘরে ওঠে, যখন খামার-গোলা ভরে যায়,—তখন তো কিছুদিনের জন্য আর কোন ভাবনা নেই। তখন আর পরের দিনগুলোর কথা কেই-বা-ভাবে। ভেবেই বা কি হবে? এ ভাবেই তো চলছে চিরকাল। প্রাণ খুলে তখন শুধুই গান গাওয়া, মন খুলে গল্প বলা। কি আনন্দের সেসব দিন।

অন্য মেয়েরা গাঁয়ের পথে খেলে বেড়ায়, ছেলেরা বনে যায় কাঠ কুড়োতে। সেই কাঠে সর্দারের বাড়িতে ভোজের আসর বসবে। পিহ্‌মুয়াকির কিন্তু এসব ভালো লাগে না। সে খেলে না, দূরে কোথাও যায় না। সে অন্যরকম। বুড়োবুড়িরা গান গাইতে শুরু করলেই সে ছুটে আসে, শান্ত হয়ে পাশে বসে পড়ে, ডাগর চোখে তাকিয়ে থাকে—গান শোনে। অনেক সময় ধরে তারা গান গায়, ছোট মেয়ে চুপ করে সেসব শোনে। ক্লান্তি নেই।

পিহ্মুয়াকি যে গান শোনে, যে গল্প শোনে তাই তার স্মৃতিতে গাঁথা হয়ে যায়। কিছুই সে ভোলে না, ভুলতে চায়ও না। ও যে তার প্রাণের জিনিস। কত ছোট সে, কিন্তু সে যত গান শিখেছে, সে যত গল্প জেনেছে—এলাকার কেউ তা জানে না। ছোটরাও জানে না, বড়রাও জানে না। শুধু জানত গাঁয়ের কয়েকজন বুড়ো-বুড়ি। তাদের অনেক বয়স হয়েছে। তারা অনেক দেখেছে, অনেক শুনেছে,—তারা তো অনেক কিছুই জানে।

পিহ্মুয়াকি তো আর চিরকাল ছোটটি থাকবে না। দেখতে দেখতে সেও বড় হল, কৈশোর পেরিয়ে সে যুবতী হল। অপূর্ব তার রূপ, অপরূপ তার লাবণ্য। বড় হল কিন্তু ছেলেবেলার স্বভাব তার বদলে গেল না। স্বভাব একই রকম রইল। ছেলেবেলা থেকে সে অনেক গান শিখেছিল, অনেক অনেক কাল আগেকার চারণ-কবিদের বিষয়ে সে সব কিছু জানত। তার রক্তে ছিল গান, মনে-প্রাণে সেও চারণ-কবি, সে আপনভোলা গায়িকা। তাই বড় হয়েও সে আপনমনে গান গেয়ে বেড়াত,—পাহাড়ে, নদীর তীরে, ঝরনার পাশে, গাঁয়ের পাহাড়ি পথে পথে। আপন খেয়ালে মনের আনন্দে সে গান গাইত, যেমন গায় বনের পাখি।

অনেক গান সে শিখেছে। এবার নিজেই গান বাঁধতে শুরু করল। মনমাতানো সুরের সেসব গান যেন তার কন্ঠ থেকে আপনিই বেরিয়ে আসছে। সহজ সুরের সহজ গান। বাঁধন-হারা সেসব গান শুনলে মন যেন কেমন করত।

মাঠের পথে যেতে যেতে সে গান গাইত। বীজ বুনতে বুনতে নত হয়েও সে গান গাইত। ঝম্ঝম্ বৃষ্টির দিনে ধানগাছের গোড়া থেকে আগাছা তুলতে তুলতে সে গান গাইত, ফসলের গোছা মুঠোয় ধরে কাটতে কাটতে সে গান গাইত। সে বাড়িতেই থাকুক আর আকাশের নীচে খোলা মাঠেই থাকুক,—সে থাকত মনের আনন্দে, সে গাইত গান। এমন গান কবে কে শুনছে? অনেকেই তার কাছে গান শিখত। মনপ্রাণ ঢেলে সে গান শেখাত। তার শেখানো গান তার মিষ্টি সুরের গান এক কণ্ঠ থেকে অন্য কণ্ঠে বইতে বইতে সারা এলাকায় ছড়িয়ে পড়ল। দেশের সবাই গান গাইতে ভালোবাসত। সেই গান তারা গাইত। সে গান তারা শিখেছে বুলবুলি পিহ্মুয়াকির কণ্ঠ থেকে।

এমনি করে সময় বয়ে যায়। সবার মুখে পিহ্মুয়াকির নাম, সবার কণ্ঠে পিহ্মুয়াকির গান, সবার হৃদয়ে বুলবুলি পিহ্মুয়াকি।

কিন্তু এবার বিপদ ঘনিয়ে এল। মানুষের হিংসুটে স্বভাব এই বিপদ ডেকে আনল। সেই গাঁয়ের যে সর্দার, তার দেহে অসীম শক্তি, সে আগলে রাখে গোটা গোষ্ঠীকে। নির্ভীক সর্দারের দেহে যত শক্তি ছিল, বুদ্ধি তেমন ছিল না। তার ওপরে সে ছিল কিছুটা কান পাতলা। বিচারবুদ্ধি না থাকলে লোক তো অন্যের কথাতেই বেশি বিশ্বাস করে। হলও তাই।

সর্দারকে ঘিরে ছিল কয়েকজন গাঁওবুড়ো। তারাই সব কিছু পরামর্শ দিত সর্দারকে। চারিদিকে পিহ্মুয়াকির নাম। যেখানেই উৎসব হয়, নৃত্য-গীত হয় সেখানেই পিহ্মুয়াকির নাম। এতদিন সবাই সব কথায় সর্দার আর গাঁওবুড়োদের কথা বলত। এখন বলে অন্যের কথা। তার ধন-সম্পদ নেই, তার অনেক গোরু-মোষ-মিথুন নেই, তার বাড়ি বড় নয়,—কি আছে তার যে সবাই তার নাম করবে! ঈর্ষা দেখা দিল সর্দারের মনে, ঈর্ষা দেখা দিল গাঁওবুড়োদের মনে। গাঁওবুড়োরা সর্দারের মনে আরও হিংসা জাগিয়ে তুলল।

সর্দারি হল গ্রামের মাথা, আপদে-বিপদে সেই তো রক্ষা করে গাঁয়ের মানুষকে, সেই তো অসময়ে ধান দিয়ে প্রাণ বাঁচায়। কি করেছে পিহ্‌মুয়াকি গাঁয়ের জন্য? বোকা সর্দার উত্তেজিত হয়, গাঁওবুড়োরা মস্ত উনুনে কাঠ জুগিয়ে চলে। আগুন বেড়েই চলে।

কিছুদিনের মধ্যেই সর্দারের মনে হিংসার আগুন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল। পাহাড়ি বনভূমিতে দাবানল লাগল। গাঁওবুড়োদের সর্দার ডাকল, সর্দারের বাড়িতে গোপনে সলা-পরামর্শ করল। সবাই একমত হল,— এমন পাকা ব্যবস্থা করতে হবে যাতে আর কোনদিন পিহ্‌মুয়াকি তাদের বিরক্ত করতে না পারে। তার কন্ঠই সব অনিষ্টের মূল, সেই গানকে চিরকালের জন্য থামিয়ে দিতে হবে। তারা বড় নিষ্ঠুর। হিংসা তাদের পশুর অধম করে তুলেছে। তারা সব কিছু ঠিক করে ফেলল।

পরের দিন সকাল বেলায় তারা গাঁয়ের মধ্যে মস্ত বড় এক গর্ত তৈরি করল। পিহ্‌মুয়াকি তখন এলোচুলে তার ছোট্ট বাছুরকে গায়ে হাত বুলিয়ে আদর করছিল আর আদরের গান গাইছিল। বাছুর গলা লম্বা করে বিশাল চোখ মেলে পিহ্‌মুয়াকির গান শুনছিল। আশেপাশে পাখিরাও গান গাইছিল। হঠাৎ কয়েকজন গাঁওবুড়ো সেখানে এসে পিহ্‌মুয়াকিকে টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে চলল। বাছুরটি হাম্বা করে উঠল, পাখিরা জোরে জোরে কিচির-মিচির শুরু করে দিল। পিহ্‌মুয়াকি তখন অনেক দূরে চলে গিয়েছে।

তারা তাকে গর্তের কাছে এনে ঠেলে ফেলে দিল গর্তের মধ্যে। গর্ত অনেক গভীর। তারা যখন টেনে আনছিল তখনও সে গান গাইছে, গর্তের মুখে যখন মাটি চাপা দিচ্ছে তখনও সে গান গাইছে। মাটি পড়ছে, পাথর পড়ছে, গাছের ডাল পড়ছে,—বুলবুলি পিহ্‌মুয়াকি গাইছে। গাইছে আদরের গান, প্রাণের গান। গর্ত ভর্তি হয়ে আসছে, গানও ভেসে আসছে।

শেষকালে গর্ত ভরে গেল। সর্দার আর গাঁওবুড়োরা ভাবল,—যাক্ সব চুকেবুকে গেল। আর ভাবনা নেই। গান থেমে গেল চিরকালের মতো। তারা বাড়ির পথে হাঁটা দিল।

কিন্তু, না, গান থামল না। তখনও মাটির তলা থেকে মিষ্টি গান ভেসে আসছে, ছড়িয়ে পড়ছে উদার আকাশে, সবুজ বনভূমিতে। এ গান আগের চেয়ে মিষ্টি আরও মিষ্টি।

নিষ্ঠুর মানুষেরা তার দেহকে চিরদিনের জন্য মাটি চাপা দিয়ে দিল, কিন্তু গান বন্ধ করতে পারল না। সে গান ভেসে বেড়াতে লাগল দূর থেকে দূরান্তে।

সেই কবেকার কথা। আজও লুসাইরা সবাই পিহ্‌মুয়াকির কথা বলে, বলে তার গানের কথা। গান হল ফুলের মতো,—ফুলকে মাটিতে মিশিয়ে দিলেও তার বীজ নতুনভাবে সুন্দর হয়ে আগামী দিনে আবার ফুল ফোটাবে। পিহ্‌মুয়াকির গানও বেঁচে রইল,—সে যে মানুষের জন্যই গান গাইত। আহ্ পিহ্‌মুয়াকি।

আগুন

মানুষ যখন প্রথম এই পৃথিবীতে এল, মানুষ যখন প্রথম জন্মাল,— তখন মানুষ কেমন করে রান্না করতে হয় জানত না, স্নান করতে জানত না, কাপড় পরতে জানত না। দেহে তাদের কোনকিছুই থাকত না। তাদের হাত-পায়ের নখগুলো বিরাট বিরাট হয়ে থাকত, কেননা তারা এগুলো কেমন করে কাটতে হবে তা জানত না। তাদের কোন গ্রাম ছিল না, ঘরদোর ছিল না। পাঁচ-দশজন একসঙ্গে এখানে সেখানে ঘুরে বেড়াত। আর ঘন পাতার গাছের নীচে কিংবা কোন পাহাড়ি গুহায় থাকত।

সেই সময়ে এক বছর খুব খরা হল, সব বাঁশগাছ শুকিয়ে গেল। বাঁশের সবুজ রঙ পালটে গেল, ছালগুলো আপনিই খসে খসে পড়তে লাগল। সে কি অসহ্য গরম কাল! বৃষ্টি নেই, তার নামগন্ধও নেই। আকাশে মেঘের ছিটেফোঁটাও দেখা যাচ্ছে না। প্রচণ্ড গরমে শুকনো বাঁশগুলো ফেটে ফেটে যেতে লাগল। প্রচণ্ড বেগে শুকনো হাওয়া বইছে, তোড়ে বাঁশগুলো এধার-ওধার করছে। একটার সঙ্গে আরেকটার ঘর্ষণ হচ্ছে। চারিদিকে বাঁশের ক্যাঁচকোঁচ শব্দ।

হঠাৎ বাঁশে বাঁশে ঘষা লেগে আগুন জ্বলে উঠল। বাঁশগাছ জ্বলছে, অন্য বাঁশগাছে আগুন ছড়াল। বনের সব গাছই শুকনো কাঠের মতো হয়ে রয়েছে। কোন গাছে রস নেই, শুকনো বাকল চড়চড় করছে। তাই বাঁশের আগুন চারিদিকে। দাউ দাউ দাবানল।

বন পুড়ল। শেষকালে একদিন আগুন নিভল। তখন বড় বড় নখওয়ালা সেই মানুষেরা বনের মধ্যে ঢুকল। চারিদিকে পোড়া কাঠ, পোড়া পাতার ছাই। আর চারিদিকে অনেক পশু-পাখি ঝলসে-পুড়ে মরে পড়ে রয়েছে। ছাইগাদার মধ্যে তাদের ঝলসানো দেহ।

একজন মানুষ বলল, 'এগুলো কি? আগে তো কখনও দেখিনি?'

সে সাহস করে একটা পশুর দেহে আঙুল ছোঁয়াল, গরম নরম দেহের মধ্যে নখসমেত তার আঙুল অনায়াসে ঢুকে গেল। আঙুল পুড়ে যাবার মতো অবস্থা। তাড়াতাড়ি আঙুল টেনে বের করে সে ব্যথায় লাফাতে লাগল। আঙুল যেন নিজে নিজেই তার মুখের ভেতর চলে গেল। আঃ। কি সুন্দর ঠান্ডা। মুখে কেমন স্বাদ লাগছে। এ স্বাদ সে তো কখনও আগে পায়নি! আঙুলটা নিয়ে নাকের কাছে ধরল। কি মিষ্টি গন্ধ! এ গন্ধ তো আগে কখনও পায়নি!

আপনমনে মানুষটি বলল, 'এ তো সুন্দর খেতে। গন্ধও বড় ভালো। আগের মতো নয়।'

সে অন্য বন্ধুদের ডাকল। সে যা জেনেছে তা সবাইকে বলল। সবাই অবাক হল। তারপরে সবাই মিলে ঝলসানো পশুর মাংস খেতে শুরু করল। অগুনতি পশু, অল্প মানুষ। সে এক মহাভোজ। সে এক নতুন আনন্দ।

পরের দিন তারা শিকার করতে গেল। অনেক কষ্টের পরে একটা খরগোশ মারতে পারল। আগে হলে তখনই ছাল-চামড়া ছাড়িয়ে খেতে শুরু করত। কিন্তু গতদিনের মাংস খাওয়ার পরে আর কাঁচা মাংস খেতে চাইল না। তারা খরগোশটাকে ঝলসানোর চেষ্টা করল। দেখাই যাক্ না কি হয়।

তারা খরগোশকে একটা গাছের বাকলের সঙ্গে বাঁধল। সেটা ঝুলিয়ে দিল গাছের একটা নিচু ডালের সঙ্গে। বনে তখনও গাছের অনেক ডাল ধিকিধিকি জ্বলছিল। তারই একটা নিয়ে এসে ঝুলন্ত পশুটার নীচে রাখল। শুকনো পাতা নিয়ে এসে জ্বলন্ত কাঠের ওপরে দিল। দাউ দাউ করে পাতাগুলো জ্বলে উঠল। বাকল পুড়ে গেল, খরগোশটা ধপ্ করে আগুনের ওপর পড়ে গেল। আগুন গেল নিভে। তাকিয়ে দেখে, খরগোশের চামড়ার ওপরের লোমগুলো পুড়ে গিয়েছে, কিন্তু দেহের মাংস একই রকম রয়েছে। খুব খিদে,—কি আর করে? সেই মাংসই তারা খেয়ে নিল।

পরের দিন সেই মানুষগুলো আবার শিকার করতে গেল। অনেক কষ্টে একটা হরিণ মারল। বেশ বড় হরিণ। প্রথমেই তারা পশুটার চামড়া ছাড়িয়ে ফেলল। তারপরে মাংসকে টুকরো টুকরো করে কাটল। তারপরে হরিণের চামড়ায় মাংসের টুকরোগুলোকে বেঁধে ঝুলিয়ে দিল। তলায় জ্বালল আগুন। অনেকক্ষণ পুড়ল। শেষকালে চামড়া খুলে মাংসের টুকরো মুখে দিল। বাঃ, চমৎকার লাগছে। বেশ হয়েছে। দলের সবাই খুব খুশি হল। এবার বুঝেছে ব্যাপারটা।

বুড়ো-মতন একজন বুঝল, তারা তো আগুন জ্বালাতে জানে না। আগুন নিভে গেলে কি হবে? তাই বন থেকে জ্বলন্ত একটা কাঠ এনে একটা গর্তের মধ্যে রেখে দিল। আর তাতে সব সময় শুকনো কাঠ দিতে লাগল। বনের আগুন এখন তাদের নিজের হল। আগুন আছে সবসময়, তাই আর কাঁচা মাংস খেতে হচ্ছে না।

কিন্তু সেই লোকগুলোর কোন পাত্র ছিল না। তাই তারা পাত্রের মধ্যে মাংস চড়িয়ে রান্না করতে পারত না কিংবা পাত্রের মধ্যে জল ঢেলে ফুটন্ত জলে কোন কিছু সেদ্ধ করতে পারত না। রান্নার ব্যাপারে চামড়াই একমাত্র সম্বল।

তারা যাযাবর। এখানে-ওখানে-সেখানে ঘুরে বেড়ায়। অনেক কিছু দেখে। অনেক নতুন কিছু শেখে। জানার আগ্রহও বেড়েছে।

বর্ষাকাল। ওপর থেকে বৃষ্টি পড়ে। নীচে কাদামাটি। তারা পথ চলে। পায়ের গোড়ালি ডুবে যায় কাদায়। আঙুলের ফাঁকে আঁটকে থাকে কাদা। একদিন তারা দেখল, পায়ের আঙুলের কাদা শুকিয়ে গিয়েছে, আঙুলে ভালোভাবে আটকে গিয়েছে। গুহায় ফিরে এল। বেশ শীত শীত করছে। আগুনের পাশে বসে হাত-পা গরম করে নিচ্ছে। আরে! একি! আগুনের তাপ লেগে পায়ের আঙুলের মধ্যে জমে-থাকা কাদাগুলো যে আরও শক্ত হয়ে গেল। আশ্চর্য! হাত দিয়ে কাদা ভাঙতে লাগল।

এক বুড়ো একদিন আগুন পোয়াচ্ছে আর বনের দিকে চেয়ে আছে। হঠাৎ সে ভাবল, 'আচ্ছা, আগুনের তাপ লেগে আঙুলের কাদা যদি এমন শক্ত হয়ে যায়, তাহলে কাদা দিয়ে তো বেশ পাত্র তৈরি করা যায়। দেখাই যাক্ না।'

সে ভিজে ভিজে কাদা তুলে আনল গর্ত থেকে। তাই দিয়ে তৈরি করল একটা পাত্র। বেশ কয়েকদিন সেই পাত্রকে খোলা আকাশের নীচে রেখে দিল। সূর্যের তাপ পেয়ে পাত্রটি শুকিয়ে উঠল। বেশ শক্ত-পোক্ত হয়েছে।

একদিন পশুশিকার করে এনে সে মাংসকে টুকরো টুকরো করল। পাত্রের মধ্যে অনেকটা জল ঢেলে চাপিয়ে দিল উনুনে। মাংসের টুক্‌রোগুলো ফেলে দিল পাত্রের জলে। তিনটে পাথর দিয়ে সে উনুন তৈরি করেছিল। হঠাৎ পাত্র ফেটে গেল, সে চম্‌কে উঠল। পাত্রের জল ও মাংস উনুনে পড়ল। আগুন নিভে গেল। বুড়ো ভাবনায় পড়ল। পাত্র তো বেশ শক্তই হয়েছিল। তবে? তবে এমন হল কেন? এত কষ্ট করলাম, শেষে ফেটে গেল? আগুন নিভে গেল?

বুড়ো আবার ভাবতে বসল। ভাবল, 'সূর্যের তাপ তেমন নয়, ওতে পাত্র শক্ত হবে না। যদি আগুন দিয়েই, আগুন জ্বালিয়েই রান্না করতে হয়—তবে আগুন দিয়েই পাত্র তৈরি করতে হবে। আগুনের জিনিস আগুনেই তৈরি করতে হবে।' বুড়ো অনেক ভাবল।

এবার বুড়ো আবার ভিজে ভিজে মাটি দিয়ে মস্ত এক পাত্র তৈরি করল। সেই পাত্র একটু শুকিয়ে এলে তাকে আগুনে দিল। ভালোভাবে পোড়াল। পাত্র কালো হয়ে এল। বেশ শক্ত। আঙুল দিলে কেমন টঙ্‌ টঙ্‌ আওয়াজ হচ্ছে। বুড়ো খুশি।

বুড়ো গেল শিকার করতে। অনেক কষ্টে পেল একটা পশু। তার মাংস টুক্‌রো টুক্‌রো করে পাত্রের জলে ছেড়ে দিল। দাউ দাউ করে উনুন জ্বলছে, টগ্‌বগ্‌ করে জল ফুটছে। পাত্র ঠিক রয়েছে, ফাটছে না, ভাঙছে না। সুন্দর সেদ্ধ হল মাংস। আঃ, কি আনন্দ! আগুন আছে, বনের পশু আছে,—আর এবার তৈরি হল শক্ত পাত্র। আগুনে দিলে এ পাত্র ফাটে না, ভাঙে না। আঃ, কি সুন্দর স্বাদ এই মাংসের!

সেই তখন থেকে মানুষ শক্ত পাত্র তৈরি করতে শিখল। সেই তখন থেকে আগুন দিয়ে রান্না করতে শিখল।

বনের কুকুর গাঁয়ে এল

আজকে পশুতে পশুতে শুধুই ঝগড়া। কিন্তু এমন এক সময় ছিল যখন সব পশুর মধ্যে খুব ভাব-ভালোবাসা ছিল। সে অনেক অনেককাল আগের কথা। তখন তারা সবাই ভাই ও বন্ধুর মতো বাস করত। সে সব দিন ছিল কত সুন্দর!

সেই কালে এক পাহাড়ি ঢালু জমিতে বসত একটা হাট। সে হাটের নাম লুরি-লরা। কাছের দূরের নানা ছোট বড় বন থেকে বুনো পশুরা পাখিরা আসত সেই হাটে। সেই সাত সকালে বসত হাট। সারা দিন ধরে চলত বিক্রি-বাটা। সন্ধের আঁধার নেমে এলে হাট যেত ভেঙে। সবাই গাছের কোটরে, গুহায়, গর্তে ফিরত। সারা দিনে কত খাটুনি, বাড়ি ফিরত ক্লান্ত হয়ে। তবু সেসব দিন ছিল কত-না-আনন্দের!

একদিন নিয়মমতো হাট বসেছে। কুকুরও এসেছে হাটে। সে শুধুই মটরশুঁটি বিক্রি করে। সেদিনও এনেছে তাই। কিন্তু সেগুলো খুব পেকে গিয়েছে। তার ওপরে পথে আসতে আসতে বৃষ্টির জল লেগেছে। সেগুলো কেমন যেন গেঁজিয়ে উঠেছে। কুকুর চিৎকার করে খদ্দের ডাকছে, 'আসুন, আসুন মটরশুঁটি। ভাল মটরশুঁটি। খুব সস্তায়।'

কুকুরের সামান্য একটু মটরশুঁটিও বিক্রি হল না। হবেই বা কেমন করে? প্রায় পচে-ওঠা শুঁটি থেকে কেমন যেন গন্ধ বেরুতে শুরু করেছে। কুকুর বড় গরিব। বাড়িতে অনেকগুলো ছেলেমেয়ে। সারাদিন হয়তো খাওয়া হয়নি। কেউ আসছে না তার দোকানের সামনে। কুকুরের চোখে জল এল।

পাহাড়ের কোলে সূর্য নেমে যাচ্ছে। রোদ পড়ে বিকেল গড়িয়ে আসছে। মটরশুঁটির পচা গন্ধও তত বেড়ে যাচ্ছে। সারা তল্লাট বিচ্ছিরি গন্ধে ভরে যাচ্ছে। গা গুলিয়ে উঠছে। আর তো সহ্য করা যায় না। পশুরা ক্ষেপে উঠল। ধেয়ে এল কুকুরের কাছে। এমন পচা জিনিস কেউ হাটে আনে? সবাই কুকুরকে গালাগাল দিতে লাগল। হট্টগোল বেধে গেল। এরই মধ্যে কয়েকজন শক্তিশালী হিংস্র পশু কুকুরের ঝুড়ি ফেলল উলটে। রাগে তারা কাঁপছে। কুকুর বাধা দিতে গেল। ছিটকে পড়ল দূরে। তারা পা দিয়ে পচা সব মটরশুঁটি দলে-পিষে নষ্ট করে দিল। তারপরে কুকুরকে হাট থেকে তাড়িয়ে দিল। আর যেন কুকুর কখনও না আসে হাটে। কুকুর বড় গরিব! তার পক্ষে কেউই কথা বলল না।

কুকুরের খুব মন খারাপ। এমনভারে অপমান করল! এমন করে সব জিনিস নষ্ট করে ফেলল! বাড়িতে যে তার অনেকগুলো ছেলেমেয়ে! সে ফিরে এল হাটে। নালিশ জানাল বাঘের কাছে। বাঘই হাটের কর্তা। সে পশুদের সর্দার। বাঘের কাছেও তাকে বকুনি খেতে হল। বাঘ বিরক্ত হয়ে বলল, 'তোমার লজ্জা করে না? আবার এসেছ নালিশ করতে? পশুরা ঠিক কাজই করেছে। পচা গন্ধে তুমি কি আমাদের মেরে ফেলতে চাও? বেরোও এখান থেকে। আবার নালিশ?' বাঘ গর্জন করে উঠল। কুকুরের বুক গেল কেঁপে। পেছনের পায়ের মধ্যে লেজ ঢুকিয়ে কুকুর চলে গেল।

সন্ধে প্রায় হয়ে এসেছে। আধো আঁধারে মুখ নিচু করে কুকুর পথ হাঁটছে। চলেছে বাড়ির পথে। কিন্তু পা যেন তার চলছে না। কেউ একটা ভালো কথা বলল না। হায় কপাল!

এমন সময় সে পায়ের শব্দ শুনতে পেল! চমকে উঠল। আজ শুধুই সে ভয় পাচ্ছে, তাকিয়ে থেকে দেখে অন্য এক পথ দিয়ে একজন মানুষ আসছে। মানুষটি তাকে দেখে থামল। খুব মিষ্টি গলায় কুকুরকে বলল, 'কি কুকুর! খুব মন খারাপ মনে হচ্ছে। দুঃখ পেয়েছ নাকি? মনমরা মনে হচ্ছে।'

এমন মিষ্টি সহানুভূতির কথা শুনে কুকুর কেঁদে ফেলল। সে পথিককে সব কথা খুলে বলল। পথিক অচেনা, তবু মনের দুঃখ খুলে বলল। এমন আপন করে তার সঙ্গে আজ আর কেউ কথা বলেনি।

পথিক বলল, 'ও নিয়ে আর মাথা ঘামিয়ো না। যা হবার হয়ে গিয়েছে। আর দুঃখ করে লাভ নেই। আজ থেকে তুমি আমার বন্ধু হলে। চলো আমার কাছেই তুমি থাকবে।'

কুকুর রাজি। সঙ্গে সঙ্গে রাজি। চলল মানুষের পিছে পিছে লেজ নাড়তে নাড়তে। তবু মাঝে মাঝে মন খারাপ হয়ে যাচ্ছে। হাটের কথা সে ভুলতে পারছে না। বারবার সে কথা পথিককে বলে ফেলছে।

পথিক এবার আস্তে আস্তে বলল, 'সত্যি, এসব কথা ভোলা যায় না। ঠিক আছে। তোমার তো বেজায় সাহস। তোমাকে আমি এমনভাবে গড়ে তুলব যাতে তুমি এই অপমানের প্রতিশোধ নিতে পার। ঠিক আছে, তাই হবে। এবার বুঝবে হিংস্র পশুরা।'

কুকুরের দুঃখ মিলিয়ে গেল। মন উঠল আনন্দে নেচে। সে পথ পাবে। অপমানের প্রতিশোধ নেবে। কুকুর মানুষের পাশে পাশে চলল। শেষকালে এল মানুষের গাঁয়ে, পথিকের বাড়িতে। সুখে দিন কাটতে লাগল।

সেই মানুষটি ছিল সে এলাকার এক মস্ত শিকারি। বনের হেন জায়গা নেই যা সে চেনে না। দূর দূর পাহাড়ি জঙ্গলেও সে শিকার করতে যায়। অসাধারণ সাহসী সে। তার ভয়ে গাঁয়ে কোন হিংস্র জন্তু-জানোয়ার ঢুকতে সাহস পায় না। তির, কুঠার আর বর্শা তার সবসময়য়ের সঙ্গী। আজ থেকে আর এক নতুন সঙ্গী হল। সে সেই কুকুর।

সেদিন থেকে শিকারে যাওয়ার সময় মানুষটি কুকুরটিকে সঙ্গে নিতে যেতে শুরু করল। কুকুরও বেজায় খুশি। সেও বনে বনে ঘুরতে ভালোবাসে। সে তো বনের পশুই ছিল। আরও একটা কারণ আছে,—কুকুর চায় প্রতিশোধ, অপমানের প্রতিশোধ। মানুষটি ধীরে ধীরে কুকুরকে শিক্ষা দিতে লাগল। প্রতিশোধের আগুন জ্বলছে কুকুরের সারা মনে—সেও সবকিছু চট্‌পট্‌ শিখে নিতে লাগল। খুব মন দিয়ে সে সবকিছু শিখছে। কিছুদিনের মধ্যেই কুকুর হয়ে উঠল শিকারির সবচেয়ে যোগ্য বন্ধু, তার একমাত্র সহায়। শিকারি আর কুকুর এক হয়ে গেল।

হাটে হিংস্র পশরা কুকুরের পচে-ওঠা মটরশুঁটি ঝুড়ি উলটে ফেলে দিয়ে পা দিয়ে দলে-পিষে দিয়েছিল। আর মটরশুঁটিগুলি সত্যিই তো পচে গিয়েছিল। সেই পচা গন্ধ লেগে রইল হিংস্র পশুদের পায়ে। চার থাবায় সে গন্ধ চিরকালের জন্য আটকে গেল।

আর সেই পচা মটরশুঁটি ছিল কুকুরের নিজের, তাই সে গন্ধ সে খুব ভালোভাবেই চেনে। যেখানেই পশুরা যায়, দেহের সঙ্গে থাকে সেই গন্ধ। কুকুরের অতি-চেনা গন্ধ। তার সঙ্গে রয়েছে কুকুরের তীব্র ঘ্রাণশক্তি, এটা তার জন্ম থেকেই রয়েছে। দুয়ে মিলে কুকুর হয়ে উঠল হিংস্র পশুদের আতঙ্ক। পশুরা যেখানেই যত ঘন ঝোপ কিংবা পাহাড়ি গুহায় লুকোক না কেন, পথের ওপর মাড়িয়ে-যাওয়া খাবার পচা গন্ধ শুঁকে শুঁকে মুখ নিচু করে তর্‌তর্‌ করে এগিয় যায় কুকুর। ঠিক হদিস পেয়ে যায় সেই পশুর। কুকুর এসে থেমে পড়ে ঠিক জায়গায়, একটু দূরে। চোখ তুলে শিকারিকে নিশানা জানিয়ে দেয়। মানুষ তাক্‌ করে আগের চেয়ে অনেক সহজে সেই পশুকে শিকার করে। একদিন সবাই মিলে গরিব কুকুরকে যে অপমান করেছিল, আজ সে তার প্রতিশোধ নিচ্ছে। এই তো হয়! আজ তার আনন্দের দিন।

এমনি করে একদিন বনের পশু দূর বনভূমি ছেড়ে মানুষের কাছে এল, তার সাথী হল। সে হল মানুষের সবচেয়ে বিশ্বাসী বন্ধু। কেনই বা বিশ্বাসী হবে না? মানুষ তো তাকে ভালবেসেছে, ওদের মতো অপমান করেনি।

কিন্তু কুকুর আর কোনদিন অরণ্যে ফিরে যেতে পারল না। বনের পশুরা তাকে তো আর রেহাই দেবে না? সেদিন থেকে কুকুরও বন ছাড়ল। বনের পশুরাও কুকুরকে দেখলেই আরও ক্ষেপে যায়। কুকুরের জন্যই তাদের এমন দশা। শিকারি কুকুরকে পেয়েই তো এত সহজে মানুষ তাদের শিকার করতে পারে। বনের পশু কুকুর গাঁয়ের হল, মানুষের সঙ্গী হল। আজও তেমনই রয়েছে।

ধনেশ পাখির পালক

অনেক অনেক কাল আগে একটি ছোট্ট ছেলে ছিল। খুব ছেলেবেলায় তার মা মারা যায়। আদরের ছোট্ট ছেলেকে ছেড়ে মা চিরকালের জন্য চলে গেল। বাবা তাকে খুব ভালোবাসত। মায়ের অভার বুঝতে দিত না বাবা। সেই ছিল ছেলেটির বাবা, ছেলেটির মা। এমনি করে সুখে দিন কাটতে লাগল।

বেশ কিছুদিন পরে বাবা আবার বিয়ে করল। এই সৎ মা কিন্তু মোটেই ভালো ছিল না। ছেলেটাকে দুচোখে দেখতে পারত না। আকারণে ছোট ছেলেকে সৎ মা বেদম মারত, একটুও দয়ামায়া দেখাত না। ছেলেটি কোন দোষ করেনি, তাই বুঝতে পারত না কেন তাকে মা মারছে! বুঝবেই বা কেমন করে? ও যে বড় ছোট। আর খাওয়া? মা ছেলেকে খেতে দিত আধ-সেদ্ধ যত খাবার। মাংসের ঝোল আর শুধুই হাড় দিত। হাড়গুলোতে একটুও মাংস লেগে থাকত না। তার ওপরে পুরো সেদ্ধ না হওয়ায় ঝোলে-হাড়ে কেমন গন্ধ বেরুত। কি করবে ছোট্ট ছেলে! খিদের জ্বালায় আর মার খাওয়ার ভয়ে তাই খেত। কোন অভিযোগ করত না, প্রতিবাদ করত না, ছোট ছেলেদের মতো গুঁই গুঁই করত না। সব সহ্য করত। হাসিমুখে যা পেত তাই খেয়ে নিত। বড় ভালো মিষ্টি ছেলে।

বাবার চোখে পড়ে গেলে মা বকুনি খেত। অকারণে কেন বাচ্চা ছেলেকে মারছ? ও-তো কোন দোষ করেনি? তবে? বাবা মাঝে-মধ্যে বাধা দিত তাই রক্ষে। না হলে কখনই বাবার কাছে নালিশ করত না।

তাই একইভাবে চলতে লাগল ছেলেটির কষ্টের জীবন।

এই অল্প বয়স। তবু বাড়িতে সকালে-দুপুরে-সন্ধেবেলা ছেলেকে হাড়ভাঙ্গা খাটুনি খাটতে হত। কাজে ভুল হলে কিংবা ঢিলেমি দিলে মায়ের কাছে বকুনি আর মার জুটত। অন্য ছেলেরা কেমন পাহাড়ি ঢালুতে খেলে বেড়ায়,—আর তাকে আটকা থাকতে হয় বাড়িতে। তবু সব কিছু সে সহ্য করে। বড় ভালো ছেলে সে।

আর কিছুদিন পরে মা তাকে পাঠাল অন্যের জমিতে জুমচাষ করতে। পাহাড়ি জমিতে জুমচাষ কত কষ্টের। কি ভীষণ খাটুনি। সারা দুপুর কাজ। তবু মা তাকে খাবার দিত সামান্যই। কাজের ফাঁকে কলাপাতার মোড়ক খুলে সে তাই খেত। এত অল্পে কি পেট ভরে? তার ওপরে ভাত তরকারিতে কেমন ইঁদুর-ইঁদুর গন্ধ। আধ-সেদ্ধ খাবার গন্ধ খাবার খেয়েই তাকে থাকতে হত। কি-ই বা করার ছিল তার! শুধু কি তাই? অন্য অনেক ছেলে-মেয়েও জুমচাষে সাহায্য করত। তাদের কত ভালো খাবার। ওদের সামনে কলাপাতা খুলতে খুলতে তার কেমন লজ্জা-লজ্জা লাগত। তাই খাওয়ার সময় সে একটু দূরে উঁচু জুম-বাড়ির নীচে বসে খেত। একা একা বসে খেত। মনে কত কষ্ট। সে একটু একটু করে খেত। চোখ ভিজে যেত।

প্রথম প্রথম সঙ্গী-সাথীরা কিছুই বুঝত না। পরে তারা সব জেনে ফেলল। তাই মাঝে-মধ্যেই তাকে নিজেদের কাছে ডেকে আনত। নিজেদের খাবার ভাগ করে তাকেও দিত। ওরা তো বন্ধু! বন্ধুর মনের কষ্ট বুঝত। কিন্তু ভালো খাবার খেয়েও তার মনে কোন আনন্দ হত না। বন্ধুরা দিত, সে খেত কিন্তু মনমরা হয়েই সেগুলো সে খেত। বরং তার খারাপ খাবার একা একা খেতেই সে ভালোবাসত। এতে তার অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল। মনে ফূর্তি নেই। ভালো খাবার মুখে রুচবে কেমন করে? খারাপ খাবারেই সে সান্ত্বনা খুঁজে পেত।

একদিন খুব সুন্দর বিকেল। চারিদিকে অপরূপ দৃশ্য, সুন্দর সবুজ পাহাড়ি বন। খাওয়া-দাওয়া হয়ে গিয়েছে। কাজও শেষ। তারা জুম-বাড়িতে বিশ্রাম করছে। একটু পরে সবাই বাড়ি ফিরবে। মনেও আনন্দ। হঠাৎ ছেলেটি বন্ধুদের কাছে তাদের সুন্দর ঝল্‌মলে পোশাক চাইল। সে একবার পরে দেখবে তাকে কেমন লাগে। সে তো কোনদিন এমন সুন্দর পোশাক পরে নি। খুব ইচ্ছে হয়েছে। তার পোশাক নোংরা, ছেঁড়া, কেমন যেন। আর সেগুলো অনেক পুরনো, রঙ-ওঠা , কেমন যেন।

বন্ধুরা তক্ষুনি রাজি। তারা হাসতে হাসতে আনন্দ করে বলল, 'বন্ধু, আমাদের আপন বন্ধু, কি সুন্দর তোমাকে দেখতে। কিন্তু তুমি এমন পোশাক পরে থাকো বলে মোটেই ভালো লাগে না। তোমাকে এমন সুন্দর দেখতে। এমন কি রাজকুমারীও তার ছেলেমেয়ের বাবা হবার জন্য তোমাকে পছন্দ করবে।'

ছেলেটি লজ্জা পেল। বন্ধুরা তাকে পোশাক দিল। নিজেরাই ঠিকঠাক পরিয়ে দিল। আঃ কি সুন্দর। পোশাক পরে ছেলেটি উচ্ছল হয়ে উঠল। তারপরে আস্তে আস্তে বলল, 'ওঃ, যদি আমার এরকম একটাও পোশাক থাকত, তবে আমি পরবের সময় তোমাদের সঙ্গে নাচতাম। আঃ, কি ভালোই লাগত। কি আনন্দ হত।'

বন্ধুদেরও খুব আনন্দ হয়েছে। সবাই তার রূপের প্রশংসা করছে। তারপরে তারা তাকে একটা উঁচু ঢিবির ওপরে দাঁড় করিয়ে দিল। বন্ধুকে তারা আরও ভালোভাবে দেখতে চায়। বন্ধু ওপরে, তারা একটু নীচে। আঃ, কি সুন্দর লাগছে বন্ধুকে।

ছেলেটি ঢিপির ওপরে দাঁড়িয়ে ওপরে দুহাত ছড়িয়ে দিয়ে বলল, 'ধনেশ পাখির মতো উড়ে যেতে ইচ্ছে করছে। বনের ওপর দিয়ে, পাহাড়ের পাশ দিয়ে। ওই উঁচুতে, ওই ওখানে। বন্ধু, তোমরা যদি আমাকে এই সুন্দর পোশাকটি দাও, তবে আমি অনেক অনেক দূরে, অনেক অনেক উঁচুতে, সাদা মেঘের দেশে, সবুজ বনের গভীরে ধনেশ পাখি হয়ে উড়ে যেতে পারি। আর পাখি হয়ে উড়ে যাওয়ার পরে যদি আর কখনও তোমাদের সঙ্গে আমার দেখা না হয়, যদি আর কখনও এই পৃথিবীর মানুষের খুব কাছে না থাকি তবু আমি তোমাদের মনে রাখব। আকাশ-পথে উড়ে যাওয়ার সময় আমার দেহের সবচেয়ে সুন্দর করে রাঙানো পালক আমি উড়িয়ে দেব, তোমাদের ছেলেমেয়েরা সেগুলো কুড়িয়ে নিয়ে নাচের আসরে যাবে। চুলে পরবে, মাথায় গুঁজবে, পোশাকে লাগাবে। আমার দেহের সবচেয়ে সুন্দর পালক। তোমরা জানবে, আমি আর কোনদিন তোমাদের একজন হয়ে তোমাদের পাশেপাশে নাচের আসরে যেতে পারব না, তোমাদের কাছের সঙ্গী হব না। কিন্তু আমি প্রতিজ্ঞা করছি, আমি আবার কিছুদিন পরে আমাদের

গ্রামের ওপর দিয়ে উড়ে যাব। তখন তোমরা আমার ডানাদুটোর আওয়াজ শুনতে পাবে, সে আওয়াজ মিষ্টি গানের মতো। ডানার শব্দে মিষ্টি গান ভেসে আসবে।'

এই কথা শুনে অল্প দূরে দাঁড়িয়ে-থাকা বন্ধুরা অবাক হল। বন্ধুর সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হয়ে যাবে? এ বেদনা তারা ভুলবে কেমন করে? কয়েকজন হাহাকার করে উঠল। এ বিচ্ছেদ, এ বেদনা মেনে নেওয়া যায় না।

কিন্তু তাদের মধ্যেই কয়েকজন বলল,—বন্ধু পাখি হয়ে উড়ে যাক। ধনেশ পাখি হয়ে দূর পাহাড়ে মিলিয়ে যাক। সেই ভালো, সেই ভালো। সে হোক সবুজ বনের সুখি ধনেশ পাখি। নিত্যদিনের যাতনা থেকে এ অনেক ভালো। এক নিষ্ঠুর মা রয়েছে তার বাড়িতে, এত কষ্ট তো আর কেউ সহ্য করেনি! ওর মনের ব্যথা কেউ বুঝবে কেমন করে? সেই ভালো। বন্ধু ধনেশ পাখি হয়ে উড়ে যাক। আমাদের কষ্ট হোক। ওর আর কষ্ট থাকবে না, বনের সবচেয়ে সুস্বাদু মিষ্টি ফল ও খাবে, পচে-ওঠা ইঁদুর-ইঁদুর গন্ধ-মাখা খাবার ওকে আর খেতে হবে না। ও হবে সুন্দর ধনেশ পাখি! বনের পাখিদের রাজ্যে ধনেশ হবে পাখির রাজা। সর্বশ্রেষ্ঠ পাখি। দূর আকাশের, সবুজ বনের, পাহাড়ি বনের পাখি। তাই হোক। ছেলেটি জল-ভরা চোখে ওদের বিদায় জানাল। হাত তুলে বিদায় জানাল। তারপরে সুন্দর পোশাকে-ঢাকা হাতদুটো দুদিকে ছড়িয়ে দিল, ডানার মতো মেলে ধরল। ডানার মতো করে হাতদুটো নাড়তে লাগল, ঢিপি ছেড়ে ওপরে উঠল। ডানা মেলে ধনেশ পাখি হয়ে সাদা মেঘের মধ্যে মিলিয়ে গেল।

বেশ কয়েক বছর কেটে গেল। দিন যায়, রাত আসে। সময় বয়ে যায়। হঠাৎ একদিন হিমেল হাওয়ার বিকেলে একটি ধনেশ পাখি উড়ে এল সেই পাহাড়ি গাঁয়ে। বন্ধুরা, ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা তাকে দেখেই দৌড়ে এল খোলা আকাশের নীচে, মাঠের ওপরে, সেই ঢিপিটার কাছে। হাত তুলে তারা চিৎকার করে বলল, 'ধনেশ পাখি, তুমি কি আমাদের সেই অতি-চেনা বন্ধু? তোমাকে আজও আমরা ভুলতে পারি নি। কোনদিন ভুলবও না। সব সময় মনে পড়ে তোমার কথা। যদি সত্যিই তুমি আমাদের সেই বন্ধু হও, তবে তোমার দেহের সুন্দর একটা রাঙানো পালক আমাদের দাও। তোমার উপহার।'

হঠাৎ ধনেশ পাখির দেহ থেকে সবচেয়ে সুন্দর একটি পালক খসে গেল, ঘুরতে ঘুরতে নেমে এল পালক। পালক এসে পড়ল বন্ধুদের মাঝখানে। রাঙানো পালক। অপরূপ পালক। ওপরে ডানার শব্দে মিষ্টি গান ভেসে আসছে।

অনেক মানুষের মধ্যে সেই মাঠে ছেলেটির সৎ মাও এসেছিল। সেও তাকিয়ে রয়েছে ওপর দিকে। উপহার দেখে সৎ মা বলল, 'ও আমার সোনার ছেলে, আমি তোমার মা, আমাকেও একটা রাঙানো পালক দাও। তোমার উপহার।'

ধনেশ পাখি মায়ের মাথার ওপরে ডানা মেলে স্থির হয়ে রইল। দেহ থেকে কিছুটা নোংরা ফেলে দিল নীচে। তা সোজা এসে পড়ল মায়ের চোখে। মা চিরকালের জন্য অন্ধ হয়ে গেল। এই সুন্দর সবুজ পৃথিবী, সাদা আকাশ, পাহাড়ি বন তার চোখ থেকে মুছে গেল।

পালক হাতে বন্ধুরা নীচে হাত নাড়ছে, সাদা মেঘের ভেলায় ধনেশ পাখি ডানা মেলেছে, মিষ্টি গান ভেসে আসছে,—ডানার গান, বন্ধুর গান।

বিচিত্র-রঙা ময়ূর-ময়ূরী

সেই পুরনো কালে আচিক্ আসোঙ-আসোঙদের মধ্যে এক মস্ত ধনী সর্দার বাস করত। তার ছিল অগাধ সম্পত্তি আর একটি অপরূপ রূপসী মেয়ে। এই মেয়েই তার একমাত্র সন্তান। এই আমাদের জনগোষ্ঠী মাতৃতান্ত্রিক। এই সমাজের নিয়ম অনুসারে সেই মেয়েই হল সবকিছুর উত্তরাধিকারী। সেই পাবে সব। বাবার পরে মেয়েই পাবে সব।

মেয়ে বড় হল। আরও হল রূপসী। অমন রূপ কেউ দেখেনি। তার বিয়ে ঠিক হল তারই এক ভাইয়ের সঙ্গে। বাবার দিকের এক খুড়তুতো ভাইয়ের সঙ্গে। ছেলেটিও খুব সুন্দর দেখতে। একদিন দুজনের বিয়ে হল।

অনেক কিছুই পেল মেয়ে। ধনী সর্দার তার মেয়েকে সব দিল। আর সেইসঙ্গে মেয়েকে দিল আর একটি মহা মূল্যবান বস্তু। এক টুকরো রেশমি কাপড়। খুব অদ্ভুতভাবে বোনা এই রেশমি কাপড়, চিত্র-বিচিত্র নক্শায় বোনা এই রেশমি কাপড়। এ কাপড় দিয়েছিলেন একজন দেবী। এ কাপড় দেবী প্রথম দিয়েছিলেন সর্দারের বউয়ের ঠাকুমার মায়ের মাকে। তখন থেকেই এই কাপড় পরিবারের এক মহারত্ন। এটা এতদিন ছিল সর্দারের কাছে। সর্দার আদরের মেয়েকে এই মহারত্ন বিয়ের সময় উপহার দিল। মেয়ে-জামাই পেল জাদু রেশমি কাপড়।

কেন মহারত্ন এই রেশমি কাপড়? দেবী বলেছিলেন, এই জাদু রেশমি কাপড় হাত দিয়ে ছোঁয়ার আগে একটা বিশেষ মন্ত্র পড়তে হবে। যখনই স্পর্শ করবে, তখনই আগে মন্ত্র পড়ে নিতে হবে। যদি কেউ ছোঁয়ার আগে মন্ত্র পড়তে ভুলে যায়, তবে ছোঁয়ার সঙ্গে সঙ্গে সে পাখি হয়ে যাবে, রেশমি কাপড়টি হবে তার পুচ্ছ, তার পালক, তার ডানা। এ নিষেধ অমান্য করলে তাকে পাখি হতেই হবে।

মেয়ে ছেলেবেলা থেকে দেখছে এই কাপড়। রেশমি কাপড়। জাদু রেশমি কাপড়। বাবা-মা তাকে ছেলেবেলা থেকেই মন্ত্র শিখিয়েছে—বহুবার সে মন্ত্র পড়েছে, কাপড় স্পর্শ করেছে। বারবার করতে করতে মেয়ের কখনও ভুল হয় না, কাপড় স্পর্শ করার আগে মন্ত্র পড়তে ভুল হয় না। তাই মন্ত্র পড়ে ইচ্ছেমতো যখন-তখন সে রেশমি কাপড়ে হাত দিতে পারে। কখনও ভুল হয়নি।

নতুন জামাই কিন্তু এসব কিছুই জানে না। সে অনেকবার দেখেছে এই কাপড়। কিন্তু এ যে জাদু কাপড়, মহামূল্যবান কাপড়, তা সে জানে না। সে ভাবে, অতি সাধারণ একটি কাপড়, শুধু দেখতেই সুন্দর। পুরনো জিনিস, বাবা মেয়েকে আদর করে দিয়েছে।

বাবা বুড়ো হলেন, মা বুড়ি হলেন। একদিন বাবা-মা মারা গেলেন। মেয়ে খুব কাঁদল। কত সুখের স্মৃতি। কত আদর। এখন মেয়েই হল বাড়ির কর্ত্রী, গৃহিণী। একমাত্র উত্তরাধিকারী। সবই এখন মেয়ের হল। তাই যে নিয়ম।

একদিন বেশ রোদ উঠেছে। পরিষ্কার আকাশ। মস্ত উঠোনে মেয়ে সেই রেশমি কাপড় মেলে দিয়েছে। রোদ লাগা দরকার। অনেকদিন রোদে দেওয়া হয়নি। তারপরে স্বামীকে ডেকে বলল, 'এই কাপড়টা রোদে মেলে দিলাম। তুমি এটা ছোঁবে না। যদি ঝমঝম বৃষ্টি নামে, যদি ঝড়ে গাছ থেকে আঙুর পড়ার মতো শিলাবৃষ্টিও হয়, বৃষ্টিতে চারদিক যদি সাদাও হয়ে যায়,—তবু তুমি কিন্তু এই কাপড়ে হাত দেবে না। ভুলেও হাত দিয়ো না। মনে থাকবে তো? এই রেশমি কাপড় ছোঁবে না।' স্বামী মাথা নাড়ল।

মেয়ে গেল পাশের এক ছোট নদীতে। মেয়ে গেল চিংড়ি ধরতে। পেছন ফিরে স্বামীকে আর একবার নিষেধ করে সে পাহাড়ি ঢালুতে নেমে গেল।

পাহাড়ি মেঘ বড় অদ্ভুত। এই ছিল টনটনে রোদ। হঠাৎ দূর থেকে কালো মেঘ বিদ্যুৎ বেগে ধেয়ে এল, ঘনিয়ে তুলল আকাশকে। কালো হয়ে উঠল চারিদিক। দেখতে দেখতে ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি,— মুহূর্তেই ঝমঝম করে বৃষ্টি নেমে এল। সে কি বৃষ্টি!

দাওয়ায় বসে ছিল স্বামী। সে দেখছে বউ আসছে না। সে তো ছোঁবে না রেশমি কাপড়, তুলবে না সেই কাপড়। কিন্তু এদিকে যে বৃষ্টিতে সব দিক ভেসে যাচ্ছে, উঠোনে জলের ধারা। কাপড় ভিজে চুপসে গিয়েছে তবু তো বউয়ের দেখা নেই! সে উতলা হয়ে উঠল। চিৎকার করে বউকে ডাকতে লাগল। মাটিতে বৃষ্টি আছড়ে পড়ছে, গাছের ডালে বৃষ্টি আছড়ে পড়ছে,—চারিদিকে বৃষ্টির একটানা শব্দ। বউ শুনবে কেমন করে? স্বামী আরও উতলা হল। গলা ফাটিয়ে চিৎকার করল সে। এবার বউ শুনতে পেয়েছে। স্বামীর এমন উতলা গলা শুনেই বউ রওনা দিল বাড়ির পথে। কিন্তু পাহাড়ি পথ বড় পেছল, সাদা বৃষ্টি, চোখে ভালো ঠাহর হয় না। তাড়াতাড়ি আসবে কেমন করে বউ?

বউ তবু চলে এসেছে উঠোনের খুব কাছে। বৃষ্টিতে স্বামী তাকে দেখতে পেল না। সুন্দর কাপড়টা নষ্ট হয়ে গেল! স্বামী ভুলে গেল নিষেধের কথা, বউয়ের কথা। সে এমন উতলা হয়ে উঠল যে কোন কিছুই তার মনে পড়ল না। দাওয়া থেকে ঝড়ের বেগে নেমে এল উঠোনে। নেমেই স্বামী এক টানে তুলে আনল সেই জাদু রেশমি কাপড়। সে তো মন্ত্রের কথা কিছুই জানে না। কাপড়ে হাত লাগা মাত্র স্বামী পাখি হয়ে গেল। বিরাট পাখি, সুন্দর পাখি, বিচিত্র-রঙা পাখি। পুরুষ পাখি। দেহে রঙের কি বাহার!

উঠোনে পৌঁছল বউ। চমকে উঠল। তার সামনে স্বামী নেই,—একটি অতি সুন্দর, বিচিত্র-রঙা বিরাট পাখি। তার দিকে অবাক চোখে পাখি চেয়ে রয়েছে। এ কি হল? মেয়ে ভুলে গেল সবকিছু। ভুলে গেল মন্ত্রের কথা। মন্ত্র না পড়েই সে ছুঁয়ে ফেলল জাদু রেশমি কাপড়। কেমন যেন হয়ে গিয়েছে মেয়ে। হায়। হায়! হায়! মেয়ে বলে উঠল, 'একি করলাম? তুমি একি করলে? আমাদের সর্বনাশ হয়ে গেল। হায়।'

মেয়েও আর মেয়ে রইল না। সেও হয়ে গেল পাখি। বিরাট পাখি, সুন্দর পাখি, বিচিত্র-রঙা পাখি। দেহের পালকের কি বাহার! সেও পাখি হল, মেয়ে পাখি।

এই স্বামী-পাখি আর বউ-পাখিই হল ময়ূর-ময়ূরী। তারা আর মানুষ রইল না। কিন্তু একদিন তারা স্বামী ছিল, বউ ছিল। বড় সুখের সংসার।

ময়ূরের দেহের পালক, পুচ্ছ, ডানা বেশি রাঙানো, বেশি চিত্রবিচিত্র, বেশি সুন্দর। কেননা, জাদু রেশমি কাপড়ের বেশি অংশ থেকেই ময়ূরের জন্ম। বউ এসেছিল পরে,

তাই ময়ূরীর পুচ্ছ ময়ূরের মতো বড় নয়। দেহের রঙের অমন বাহার নেই। হায় ময়ূর! হায় ময়ূরী!

আজও যখন আকাশে কালো মেঘ ঘনিয়ে আসে, ঝোড়ো হাওয়া বইতে থাকে, মেঘের ফাঁকে ফাঁকে বিদ্যুৎ চমকায়, কালচে মেঘের আনাগোনায় চারদিক থম্‌থম্‌ করে ওঠে, গলা তুলে ডেকে ওঠে ময়ূর-ময়ূরী। ওই বুঝি বৃষ্টি আসছে, ঝম্‌ঝম্‌ বৃষ্টি! আর সেই বৃষ্টিতে তাদের দেহের বিচিত্র-রঙা পোশাক যদি নষ্ট হয়ে যায়? তাহলে?

হাঃ হাঃ দুই কান কাটা

কোন এক সময় এক গাঁয়ে দুই ভাই বাস করত। তারা দুজনেই অন্ধ। অন্ধ হলে কি হবে, তারা ছিল সুখি। কেননা তারা ছিল বেজায় পরিশ্রমী। কোন কিছু তারা দেখতে পেত না, কিন্তু তারা সুখি ছিল। কেননা, তাদের জীবন ছিল সহজ-সরল। সবসময় তারা কিছু না কিছু কাজ করত। তারা সুখি।

একদিন সন্ধে হয়ে এসেছে। সারা দিন ধরে তারা নিজেদের জমিতে জুম চাষ করেছে। বেশ ক্লান্ত তারা। ক্লান্ত দেহে আস্তে আস্তে বাড়ির পথে রওনা দিল। আহা! তারা তো খুব জোরে জোরে হাঁটতে পারে না! মহা আনন্দে তবু তারা পথ চলছে। তাদের দেখেই মনে হয়, তাদের বড় আনন্দ।

সেই সময় তাদের পাশ দিয়ে যাচ্ছিল এক পথিক। পথিক অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, 'তা এত খুশি খুশি কেন? ব্যাপারটা কি?'

তারা বড় সহজ-সরল। তারা জানাল, মাঠে একটা মৌচাক পেয়েছে। মধু টসটস করছে। মধু-ভরা মৌচাক। আনন্দ হবে না? কতদিন তারা মধু খায় না। অতি উৎসাহে তারা কাঁধের ঝুলি থেকে কলাপাতায় জড়ানো মৌচাক বের করল। কলাপাতা খুলে ফেলল। পথিককে মৌচাক দেখাল। কি যে আনন্দ মনে! মধু-ভরা মৌচাক।

পথিক বলল, 'হ্যাঁ, খুশি হওয়ার মতোই মৌচাক বটে। মধুভর্তি মৌচাক। আনন্দ তো হবেই।'

ভাই দুজন বলল, 'ঠিক বলেছ। তা হাতে নিয়ে পরখ করেই দেখ না কেমন মৌচাক পেয়েছি।'

ভাই দুজন বড় সরল। মনে কোন সন্দেহ নেই। আর তারা যে অন্ধ! সন্দেহ করবেই বা কেন?

পথিকের লোভ হল। হাতে নিয়ে দেখে সুন্দর মৌচাক। অন্ধ ভাই দুজনের সরলতার সুযোগ নিয়ে, অন্ধত্বের সুযোগ নিয়ে সে তাড়াতাড়ি মৌচাকটা তার ঝুলিতে ঢুকিয়ে নিল। পাশে পড়ে ছিল প্রায় শুকিয়ে-ওঠা এক তাল গোবর। তাই তুলে নিয়ে এক ভাইয়ের হাতে দিল। ভাই কলাপাতায় জড়িয়ে ঝুলিতে রেখে দিল সেই শুকনো গোবরের তাল। আহা! তারা জানেও না কি হয়ে গেল এক মুহূর্তে! পথিক অন্য পথে চলে গেল। তারা ধরল বাড়ির পথ। আনন্দে বুক নাচছে।

কিছুক্ষণ হাঁটার পরে তাদের দুজনেরই বড় খিদে পেল। সেখানে এক গাছতলায় তারা বসল। অত বড় মৌচাকের কিছুটা করে মধু তারা এখন খাবে। কলাপাতার মোড়ক খুলতেই কেমন বিশ্রি গোবরের গন্ধ তাদের নাকে ঢুকল। এক ভাই বলল, 'এঃ, পাশেই কোথাও গোবর রয়েছে। খারাপ গন্ধ বেরুচ্ছে।'

অন্য ভাই সায় দিয়ে বলল, 'ঠিক কথা। আমারও তাই মনে হচ্ছে। আর একটু দূরে গিয়ে বসি।' অন্যখানে বসল। সব জায়গায় বিশ্রি গন্ধ। কি আর করে দুজনে। ভাবল, আজকে এই রাস্তার সবখানেই গোবর রয়েছে। কি আর করা! এর মধ্যেই মধু খেতে হবে। যাক্‌গে, মধু খেলে আর ওসব বাজে গন্ধ পাওয়া যাবে না। শেষকালে এক জায়গায় দুজনে বসল। এবার মৌচাক ভেঙে মধু খাবে।

কলাপাতা-জাড়ানো মৌচাক খুলল। দু-টুকরো দুজনে ভেঙে নিল। ওয়াক থুঃ। তাদের বমি উঠে এল। মধুতে এ কি বিশ্রি গন্ধ? গোবরের গন্ধ। বারবার থুথু ফেল্‌তে লাগল। মুখের চেহারা অন্য রকম হয়ে গেল। একটু পরে দুজনের চোখে জল এল তারা সরল, তারা দেখতে পায় না। তারা অন্ধ। তাদের এভাবে কেউ ঠকায়? হায়! কপাল।

অনেকক্ষণ চুপ করে তারা ঘাসের ওপরে বসে রইল। কেউ কোন কথা বলল না। এবার ধীরে ধীরে তাদের দুঃখ ঘুচে গেল, রাগে ফেটে পড়ল তারা। অপমানের প্রতিশোধ চাই। তাদের সারল্য ও অন্ধত্বের সুযোগ নিয়ে যে পথিক এভাবে ঠকাল, তাকে শাস্তি পেতেই হবে। তাকে শাস্তি দিতেই হবে। তাদের অপমান করল, মধু খাওয়াও হল না। পথিক এতবড় ঠগ, এতবড় নিষ্ঠুর!

দুজন অনেকক্ষণ ধরে পরামর্শ করল। একমত হল। পথিককে এ পথেই তার বাড়ি ফিরতে হবে। তারা অপেক্ষা করবে। দুজনে রাস্তার দুপাশে ঝোপে ঝোপে লুকিয়ে থাকবে। বেশ আঁধার হয়ে এসেছে। দুদিকে লুকিয়ে থাকায় সুবিধাও অনেক। দুদিক থেকে তারা পথিকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। হাতে ছুরি বাগিয়ে দুজন দুদিকের ঝোপে লুকিয়ে পড়ল।

অপেক্ষা করছে, অপেক্ষা করছে। অনেকক্ষণ কেটে গেল। কেউ আসছে না। তবু অপেক্ষা করতেই হবে। হঠাৎ রাস্তার পাশের এক ঝোপে খস্‌খস্‌ আওয়াজ হল। দুজনে সতর্ক হল। কান খাড়া করে শুনল। হঠাৎ দুজনে চিৎকার করে উঠল, 'শয়তান! এবার তোমাকে পেয়েছি। এবার পালাবে কোথায়?'

লাফিয়ে পড়ল সামনে। দুজনেই। একজন রাগে বলে উঠল, 'তোমার কল্‌জে ছিঁড়ে নেব। এই ছুরিতে তোমার বুক দুফাঁক করে দেব। শয়তান কোথাকার!'

দুজনেই পথিকের ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ল। শুরু হল মারামারি।

আসলে শব্দটা ঠিকই হয়েছিল। কিন্তু সে শব্দ পথিকের পায়ের নয়। একটা গোরু ঘাস খাচ্ছিল। ঝোপের পাতা মুখ দিয়ে টানতেই অমন খস্‌খস্‌ আওয়াজ হয়েছিল। আহা! ওরা যে অন্ধ! অতশত বুঝবে কেমন করে? ওরা যে চোখে দেখে না।

তারা ঝাঁপিয়ে পড়ল একজন আর একজনের ওপর। এ ভাই ভাবল,—এই তো পথিক। ও ভাই ভাবল,—এই তো পথিক। তারা কিছুই জানল না, এক ভাই আর এক ভাইকে পথিক ভেবে আক্রমণ করে বসেছে। দুজনেই একে অপরকে শযতান পথিক ভাবছে। হায়! কপাল! লাথি মারছে, কিল মারছে, চুল ধরে টানছে আর ছুরি চালাচ্ছে। তারা অন্ধ, তাই অধিকাংশ ছুরির আঘাতই তাদের গায়ে লাগছে না, ফস্‌কে যাচ্ছে। ছুরি হাওয়ায় ঘোরাঘুরি-করছে। নইলে কি যে হত! আহা, বেচারি অন্ধ দুভাই কি করছে তা তারা জানে না, কেননা তারা দেখতে পায় না।

শেষকালে পথিক মরে পড়ে গেল না। তারা ক্লান্ত হয়ে পড়ল। বেশি রাগ হলে শরীর ক্লান্ত লাগে। তার ওপরে এতক্ষণ মারামারি। ভাবল, খুব উচিত শিক্ষা দিয়েছে পথিককে। বুক ওঠানামা করছে, জোরে জোরে নিঃশ্বাস পড়ছে। সারা দেহ ঘামে ভিজে গিয়েছে। দুজনে পাশাপাশি ঘাসে বসে পড়ল। নাঃ, পথিক দুজনের হাত ছাড়িয়ে শেষকালে পালিয়েছে। মরে নি, কিন্তু খুব বুঝেছে মজা। টের পেয়েছে কাকে বলে মার! নিষ্ঠুরতার জবাব পেয়েছে। তাদের হাতে যে মার খেয়েছে, তাতে পথিক কোনদিন দুভাইকে ভুলতে পারবে না।

এক ভাই হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, 'ভাই, আমার কিন্তু তেমন কিছু আঘাত লাগে নি। শুধু শুয়োরটা আমার একটা কান কেটে নিয়ে গিয়েছে। অবশ্য আমিও ছাড়ি নি, আমিও তার একটা কান কেটে রেখেছি। আমার হাতেই রয়েছে সেই কান। তোর খুব লাগেনি তো?'

অন্য ভাই অবাক হয়ে বলল, 'আরে! অবাক কাণ্ড। শুয়োরটা আমারও একটা কান কেটে নিয়ে গিয়েছে। কিন্তু আমিও ছাড়ি নি। তারও একটা কান কেটে রেখেছি। এই তো সেটা আমার হাতে। মজাটা বুঝেছে শয়তান।'

দুজনের ক্ষেত্রে একই ঘটনা ঘটায় তারা অবাক হয়েছে। অল্পক্ষণ দুজনেই চুপচাপ। তারপরে ব্যাপারটা বুঝে ফেলল বড় ভাই। সে কথা বলল।

ক্লান্তি অনেক কেটেছে। শান্ত হয়ে খুশি মনে বড় ভাই বলল, 'খুব ভালো কথা। আমাদের অবস্থা খারাপ। কিন্তু শয়তানটার আরও খারাপ। আমদের গিয়েছে একটা করে কান। আর ওর খোয়া গিয়েছে দুটোই। ওটা এখন দুকান কাটা। এখন থেকে আমরা চুল বড় রাখব। তারপরে একপাশে সিঁথি করে চুলটা অন্যধারে নামিয়ে দেব। ব্যাস, কাটা কান ঢাকা পড়ে যাবে। কেউ বুঝতে পারবে না, আমাদের একটা কান নেই। কিন্তু ওই শুয়োরের বাচ্চা শয়তানটা তো আর দুদিকে চুল নামিয়ে দিতে পারবে না? ওর দুকান কাটাই দেখা যাবে। সবাই ওকে কানকাটা বলে ডাকবে। গাঁয়ে যখন ফিরবে, সবাই ওকে ওই নামে ডাকবে। ওর পরিচয় হবে কানকাটা। সবাই ঠাট্টা করবে, হাততালি দিয়ে ক্ষেপাবে। কেমন মজা হবে বল! আমাদের ঠকানো? আমাদের পেছনে লাগা? এই কষ্ট নিয়েই সারাজীবন কাটাতে হবে। রেহাই নেই, কান ঢাকার উপায় নেই। ওর নিষ্ঠুর কাজের যোগ্য জবাব পেয়েছে। কি বল ভাই?'

এই মজার কথায় দুজনে প্রাণভরে হাঃ হাঃ করে হেসে উঠল। কেমন মজা! এবার টের পাবে। দুজনেই পথিকের দুটো কান কেটে নিতে পেরেছে। একজন একটা, আর একজন আর একটা। মনের সব দুঃখ, সব অপমান ঘুচে গেল। আর কোন ব্যথা-বেদনা মনে নেই। দুজনেই খুশি।

লাফিয়ে উঠল পায়ের ওপর। হাঁটা দিল বাড়ির পথে। হেলে-দুলে আনন্দে হাঁটছে। মনে আজ বড় ফুর্তি। শত্রুকে জব্দ করতে পেরেছে। অন্ধ হয়েও প্রতিশোধ নিতে পেরেছ।

পথে হাঁটছে আর বারবার বলছে,—ওঃ কানকাটা পথিক। হাঃ হাঃ হাঃ! একটু পরে পরেই বলছে আর প্রাণ খুলে হাসছে। ওঃ, কানকাটা পথিক। হাঃ হাঃ হাঃ। বলছে আর হাঁটছে, হাঁটছে আর বলছে। দুজনে চলেছে বাড়ির পথে। আনন্দে।

সিঁথির সিঁদুর

শীতকালে এক পরবের সময় খুব নাচ গান হচ্ছে। খুব জমে উঠেছে নাচের আসর। সেই আসরে নাচতে নাচতে চারজনের মধ্যে খুব ভাব হল, তারা সেদিন থেকে বন্ধু হয়ে উঠল। চারজন চারজনকে খুব ভালোবাসত। এক সঙ্গেই তারা থাকত। মনের বড় মিল।

চার বন্ধুর একজন সিঁদুর বিক্রি করত, একজন কাপড় বুনত, একজন কাঠের মিস্ত্রি, আর একজন সোনার গয়না তৈরি করত। সবাই সবার কাজে খুব পাকা।

একদিন তারা পরামর্শ করল, 'ভাই এখানে আর খুব সুবিধে হচ্ছে না। চলো, দূর দেশে যাই। যেখানে ভালো কাজ জুটবে, সেখানেই চারজনে মিলেমিশে থাকব।' সবাই রাজি হল। যে যার যন্ত্রপাতি সঙ্গে নিয়ে রওনা হল।

অনেক দিন ধরে তারা পথ হাঁটছে। সুবিধেমতো জায়গা এখনও মেলেনি। আরও এগোতে হবে। এমনিভাবে চলতে চলতে একদিন তারা এক জঙ্গলে এসে থামল। সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। একে জঙ্গল, তার ওপরে অচেনা পথ। তাই সেখানেই রাতটা কাটাতে হবে। একটা ঘন আমগাছ দেখে তার তলায় বসল। আরও অন্ধকার ঘনিয়ে এল।

ঘন বন। কোথায় কি আছে তারা জানে না। কি জানোয়ার আছে তাও জানা নেই। সবই অচেনা। তাই সবাই যদি একসঙ্গে ঘুমিয়ে পড়ে, তবে বিপদ হতে পারে। সেটা ঠিক হবে না। তাই পালা করে জেগে থাকাই ভালো। চারজনেই জাগবে, একেক জন কিছুক্ষণ করে জাগলেই রাত কেটে যাবে। যে জেগে থাকবে, সে ভালোভাবে নজর রাখবে। চারজনে রাজি হল।

খাওয়া-দাওয়া হয়ে গেল। তারা বলল, 'ভাই ছুতোর, প্রথম রাতে না হয় তুমি-ই জেগে থাকো! কি রাজি তো?'

ছুতোর বন্ধু বলল, 'এ আর বেশি কি? একজনকে তো জাগতেই হবে! দেরি না করে তোমরা তিনজনে ঘুমিয়ে পড়ো। আমি জাগছি।'

একা জেগে রয়েছে ছুতোর। অন্য সবাই ঘুমোচ্ছে। চারদিকে চুলের মতো কালো অন্ধকার। কতক্ষণ বসে থাকব? তার চেয়ে একটু কাজ করি। একঘেয়েও লাগবে না, ঘুমও আসবে না।

সে থলি থেকে বাটালি বের করল, এক টুকরো কাঠ নিল। তারপরে টুকটুক্ করে বাটালি চালিয়ে কাঠ খোদাই করতে লাগল। সে একটা সুন্দরী মেয়ের পুতুল তৈরি করল। বেশ হয়েছে। পুতুলটাকে দাঁড় করিয়ে রেখে দিল।

এবার তার পালা শেষ হয়েছে। সে স্বর্ণকারকে ডেকে তুলে বলল, 'ভাই, এবার না হয় তুমি-ই জেগে থাকো। আমি এবার ঘুমোই।' স্বর্ণকার উঠে বসল।

কিছুক্ষণ কেটে গেল। বড় একঘেয়ে লাগছে। এধার-ওধার চাইতেই সে পুতুলটিকে দেখতে পেল। বাঃ, কি সুন্দর পুতুল। কিন্তু এ কি? গায়ে যে একেবারেই কোন গয়না নেই! এতে কি মেয়েদের মানায়!

সে কাজে লেগে গেল। বের করল হাপর, কাঠ-কয়লা, জলের পাত্র। লেগে গেল কাজে। অল্পক্ষণের মধ্যেই গলার হার, কানের দুল, হাতের চুড়ি, পায়ের ঘুঙুর আর চুলের টিকলি বানিয়ে ফেলল। পুতুলকে পরিয়ে দিল। বাঃ বেশ লাগছে। এবার ঠিক মানিয়েছে।

তার পালা শেষ হল। সে তাঁতি বন্ধুকে ডেকে তুলল। বলল, 'ভাই, এবার না হয় তুমিই জেগে থাকো। আমি ঘুমোই।'

তাঁতি উঠে বসল। জেগে রইল। বড় একঘেয়ে লাগছে। চোখে ঘুম। এধার-ওধার চাইতেই গয়না-পরা পুতুলকে দেখতে পেল। বাঃ, সুন্দরী মেয়ে পুতুল। কিন্তু এ কি! দেহে কাপড় নেই কেন? শাড়ি না পরলে মানায়? শাড়ি হলেই আরও অনেক বেশি ভালো লাগবে। সুন্দরী লাগবে।

ভাবা মাত্রই সে কাজে লেগে গেল। বের করল তাঁত আর সুতো। শাড়ি বুনতে শুরু করল। শেষ হল সুন্দর একটা রঙ-বেরঙের শাড়ি। পুতুলকে পেঁচিয়ে পরিয়ে দিল সেই শাড়ি। বাঃ, এতক্ষণে মানিয়েছে। তৃপ্তির হাসি তার চোখেমুখে।

তার পালা শেষ। ডেকে তুলল সিঁদুর-বিক্রেতাকে। বলল, 'ভাই এবার নাহয় তুমি-ই জেগে থাকো। আমি ঘুমোই। অবশ্য রাত শেষ হতে আর দেরি নেই। আঁধার অনেক কমে এসেছে। চারদিকের অনেক কিছুই ঝাপসা ঝাপসা দেখা যাচ্ছে।'

হঠাৎ চোখ পড়ল রঙিন শাড়ি-পরা, গয়না-পরা সুন্দর পুতুলটার দিকে। এ কি। এত সুন্দর শাড়ি যার দেহে, এত ভালো ভালো গয়না যার মাথায় গলায় কানে হাতে পায়ে,—তার কিনা মাথায় সিঁদুর নেই। সিঁদুর মাথায় না থাকলে কি মেয়েকে মানায়! তক্ষুনি সিঁদুরের কৌটো বের করল। আর পুতুলের সিঁথিতে সুন্দর করে পিছন দিকে টেনে সিঁদুর পরিয়ে দিল। হঠাৎ পুতুল প্রাণ পেল! সে এক রূপসী নারী হয়ে উঠল। কোথায় গেল পুতুল, কোথায় গেল আঁধার? চারিদিকে ভোরের আলো ফুটে উঠল।

সবাই জেগে উঠল। তাকিয়ে দেখল সুন্দরী মেয়েকে। ছুতোর স্বর্ণকার তাঁতি অবাক হল। সিঁদুর-বিক্রেতা তো আগেই অবাক হয়েছে।

ছুতোর বন্ধু বলল, 'এই মেয়ে আমার বউ হবে, কেননা ওকে প্রথমে আমিই গড়েছি।'

স্বর্ণকার বন্ধু বলল, 'না, এই মেয়ে আমার বউ হবে, ওকে যে আমি গয়না পরিয়ে দিয়েছি।'

তাঁতি বন্ধু বলল, 'তা হবে কেমন করে? এ মেয়েকে আমিই বিয়ে করব। নিজের হাতে শাড়ি বুনে ওকে পরিয়েছি। ও আমার বউ হবে।'

সিঁদুর বিক্রেতা বন্ধু বলল, 'তাই কি হয়? আমি যে ওকে সিঁদুর পরিয়ে দিয়েছি। ওকে তো আমি বিয়েই করে ফেলেছি। আমার বউকে আমার কাছ থেকে অন্যে নেবে কেমন করে? ও-যে আমার বিয়ে-করা বউ।'

বন্ধুত্ব উবে গেল। শুরু হল ঝগড়া। কে বিয়ে করবে সেই মেয়েকে? একজন বলছে, সে সিঁদুর পরাবার সঙ্গোসঙ্গোই তাকে বিয়ে করে ফেলেছে। ঝগড়া বেড়ে চলল। কেউ কারও মত মানছে না। এমনিভাবে সূর্য ওপরে উঠছে।

এমন সময় তারা দেখল,—বনের পথ দিয়ে একজন সাধুমতন লোক আসছে। তারা তাকেই ডাকল, আর বিচারের ভার দিল।

'আমি তাকে প্রথমে গড়েছি।'

'আমি তার দেহে গয়না পরিয়েছি।'

'আমি শাড়ি বুনে তার দেহ ঢেকে দিয়েছি।'

'আমি তার সিঁথিতে সিঁদুর দিয়েছি।'

সাধুমতন পথিকটি একটু হেসে বললেন, 'যে মানুষটি মেয়ের সিঁথিতে সিঁদুর পরিয়েছে, সে-ই মেয়েটির স্বামী। মেয়েটি তার বউ।'

একজন খুব খুশি হল। অন্য তিনজন পথিকের বিচারকে মেনে নিতে পারল না। আবার ঝগড়া শুরু হল। আবার পথ হাঁটা। সূর্য তখন অনেক ওপরে। ঝগড়া থেমে গেল। সকলেই চুপচাপ হাঁটছে। কেমন যেন থম্‌থমে ভাব সবার মুখে।

এমন সময় পথে দেখা হল এক যুবকের সঙ্গো। দেবতার মতো রূপবান যুবকই বিচার করুক। তার কথাই তারা মেনে নেবে।

'আমি তাকে প্রথমে গড়েছি।'

'আমি তার দেহে গয়না পরিয়েছি।'

'আমি শাড়ি বুনে তার দেহ ঢেকে দিয়েছি।'

'আমি তার সিঁথিতে সিঁদুর দিয়েছি।'

তাহলে? এই মেয়ে কার বউ হবে?

খুব শান্তভাবে দেবতার মতো রূপবান যুবক বলল, 'সেই মানুষটি-ই কেবলমাত্র মেয়েটির স্বামী হতে পারে, যার হাতে সে প্রথম সিঁথিতে সিঁদুর পরেছে। যে মানুষটি তাকে প্রথম গড়েছে, সে হল মেয়েটির পিতা। যে মানুষটি তার দেহে গয়না পরিয়ে দিয়েছে, সে হল মেয়েটির মামা। যে মানুষটি তার দেহ শাড়ি দিয়ে ঢেকে দিয়েছে, সে হল মেয়েটির ভাই।'

চারজনে মেনে নিল দেবতার মতো রূপবান যুবকটির বিচার। মাথা নত করে মেনে নিল। মেয়েটি সিঁদুর বিক্রেতার বউ হল। চারজনে বন্ধু রইল। চলল নতুন দেশে। পাঁচজনে পাশাপাশি।

দূর আকাশের তারা

অনেক অনেক কাল আগে এক ঘন জঙ্গালে বাস করত এক মস্ত শিকারি। তার নাম সুম্‌রো। সে একা। তার বউ ছিল না, তার কোন ছেলেমেয়ে ছিল না। শুধু ছিল তির আর ধনুক। এই নিয়ে সুম্‌রো বনের এক দিক থেকে অন্য দিকে শিকার করে বেড়াত। সে কখনও বনের বাইরে আসত না।

তির-ধনুক বাগিয়ে সুম্‌রো একদিন চলেছে। ধনুকে তির লাগানোই রয়েছে, ঘাসের ওপর দিয়ে চলেছে, চোখ ওপরের গাছের দিকে। হঠাৎ সে দেখল, একটা গাছের উঁচু মগডালে বসে রয়েছে দুটো সাদা সারস পাখি। থেমে পড়ল সুম্‌রো। আস্তে আস্তে কোন শব্দ না করে গাছের নীচে দাঁড়িয়ে পড়ল। ধনুক তুলে তাক্ করল। তির ছুটে গেল ওপরে। ধপ্ করে পড়ে গেল একটা পাখি। মদ্দা সারস পাখি। অন্য পাখিটা ডানা ঝট্‌পট্ করে নীচে তাকাল। চুপ করে বসে রইল ডালে।

সুম্‌রো শুকনো কাঠ-পাতা এনে আগুন জ্বালাল। পাখির পালক ছড়িয়ে গোটা পাখিটাকে উলটে-পালটে ঝলসাতে লাগল। মাংস বেশ পুড়ে এসেছে। পোড়া মাংসের ধোঁয়া ওপরে উঠছে। সুম্‌রো বেশ খুশি।

ওপরে সারসের বউ তার স্বামীর মাংসের পোড়া গন্ধ পেল, ধোঁয়া এসে নাকে ঢুকল। ডাল থেকে আলগা হয়ে গেল তার পা, সে ধপ্ করে আছড়ে পড়ল আগুনের মধ্যে। আগুনে পড়ে ঝলসে সারস-বউ মরে গেল।

সুম্‌রো চমকে উঠল। সে মুগ্ধ হল। তার চোখের পাতা ভিজে এল। স্বামীর প্রতি এত গভীর ভালোবাসা! এরকম প্রেমিক-যুগল সে আগে কখনও দেখেনি। সে ঝল্‌সানো পাখিটাকে খেল না। আগুন থেকে দুটো পাখিকে হাতে তুলে নিল।

ওপর দিকে পাখি-দুটোকে তুলে ধরে সুম্‌রো বিড়্‌বিড় করে বলল, 'তোমরা দূর আকাশে চলে যাও। সেখানে সুখে বাস করো। তোমরা হবে আকাশের সবচেয়ে উজ্জ্বল দুই তারা, পাশাপাশি থাকবে। তোমাদের সুখি সংসারে আসবে অসংখ্য সন্তান, তারা আকাশ ছেয়ে ফেলবে। এই মাটির পৃথিবীতে তোমাদের দেহ ছিল সাদা ধব্‌ধবে ও পরিষ্কার। দূর আকাশে তোমরা হবে আরও উজ্জ্বল। এখানকার সব মানুষ তোমাদের দেখবে আর প্রশংসা করবে। যাও তোমরা দূর আকাশে।'

এমনি করেই আকাশ হল তারায় ভরা। সবচেয়ে উজ্জ্বল তারা দুটি এল প্রথমে, তারপরে তাদের ছেলেমেয়ে অন্য সব তারা।

রামধনু আর বৃষ্টি

আমাদের আদি পিতা হলেন কিত্তুঙ। তিনি এই পৃথিবী সৃষ্টি করছেন, তিনি সমস্ত মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। এই আদি পিরা কিত্তুঙ-এর একটি ছেলে ছিল। তার নাম মাবু।

মাবু একদিন ডাগর হল। সে ধনুক হাতে তীর ছুড়তে পারে। তীর-ধনুক তার নিত্যসঙ্গী। তার বিয়ের বয়স হল।

কিত্তুঙ মাবুর বিয়ে ঠিক করলেন এক সুন্দরী মেয়ের সঙ্গে। এই মেয়ে হল বুয়ানগান রাজার মেয়ে। বুয়ানগান রাজা থাকেন সেই দূর আকাশে। বিয়ে হয়ে গেল। সবাই সুখে শান্তিতে বাস করতে লাগল।

এমনি করে দশ বছর কেটে গেল। মাবুর বউয়ের ছোট বোনের বিয়ে ঠিক হয়ে হল। সেই বিয়েতে জামাই মাবু আর মেয়েও গেল আকাশে। অনেকদিন পরে মাবু আবার এল আকাশে।

বরযাত্রীরা এসেছে। বিয়ে শুরু হবে। হঠাৎ কি একটা ব্যাপার নিয়ে বচসা শুরু হল। বচসা থেকে ঝাগড়া। ঝাগড়া থেকে হাতাহাতি-মারামারি। গোলমালের মধ্যে মাবু বুয়ানগান রাজার হাতে খুব মার খেল। বেচারি মাবু। তার হাত থেকে তার নিত্যসঙ্গী অতি প্রিয় ধনুকটা ছিটকে পড়ল। আর মাবু মারা গেল।

এই ছেলের মৃত্যুর খবর এসে পৌঁছল। বাব কিত্তুঙ তাড়াতাড়ি ছুটে এলেন। কেন এমন হল দেখা দরকার। এসে দেখলেন, তার প্রিয় ছেলে মাটিতে পড়ে রয়েছে, পাহাড়ের মতো অচল হয়ে। আর ছেলের হাতের ধনুক আকাশে ঝুলে রয়েছে। অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইলেন কিত্কুঙ।

তারপরে ভেজা গলায় আকাশের পানে তাকিয়ে ধনুককে লক্ষ্য করে বললেন, 'ও আমার প্রিয় মাবু, তুমি আর কোনদিন প্রাণ ফিরে পাবে না। তুমি চিরকালের জন্য চলে গেলে। কিন্তু পৃথিবীর সব মানুষ তোমার ধনুক দেখতে পাবে। তুমি হবে আকাশের রামধনু। তোমার রঙের বাহারে সবাই মুগ্ধ হবে। তোমার রূপের কথা সবাই বলবে। ধনুকের মধ্যেই রামধনু হয়ে তুমি চিরকাল বেঁচে থাকবে।'

আকাশে রামধনু বিচিত্র রঙ ছড়িয়ে এদিক থেকে ওদিক দেখা দেয়। মাবুর বিধবা বউ রামধনু দেখে, বেদনায় সে কেঁদে ওঠে আর তার চোখের জল বৃষ্টিধারা হয়ে আকাশ থেকে ঝরে পড়ে।

দুঃখ এল মানুষের জীবনে

সবার আগে এল মানুষ, তারপরে দেবতাদের জন্ম হল। দেবতাদের আগেই মানুষের সৃষ্টি হল। কিন্তু সেই পুরনো কালে মানুষ দেবতাদের কোন পুজো দিত না, তাদের নামে প্রসাদ দিত না, কোন জন্তুকে বলি দিত না। তারা সারাদিন জমিতে চাষ করত, বনে কাঠ কাটত, খাওয়া-দাওয়া করত,— আর নাচে-গানে সময় কাটিয়ে দিত। এসব করে মানুষের আর কোন সময় হাতে থাকত না, তাই সে দেবতাদেরও পুজো দিত না। ওসব কোন খেয়ালও তার থাকত না। সেই পুরনো কালে দেবতারা দূরে গভীরে বনের মধ্যে বাস করত। তারা মানুষের থেকে অনেক দূরে একা একাই থাকত। বনের ফল আর ফুল খেয়ে কোনরকমে বেঁচে ছিল। আর খেত নদীর জল আর হাওয়া। মানুষ কোন ধম্মকম্ম করত না, তার জন্য কিছু ব্যয়ও হত না। বেশ সুখে দিন কাটাত মানুষ। এমনি করে মানুষ শেষকালে খুব বড়লোক হয়ে উঠল। কোন কিছুরই অভাব নেই তার।

মহাপ্রভু সব দেখলেন। মানুষের সম্পদ দিনে দিনেই বেড়ে যাচ্ছে। তিনি সব বুঝলেন। শেষকালে তিনি মানুষকে ভয় পেতে শুরু করলেন। ভাবলেন,— মানুষ যদি এভাবে সম্পদের অধিকারী হতেই থাকে, তাহলে তো সে কোনদিন কাউকে আর ভয়ই পাবে না। নিজেই নিজেকে নিয়ে থাকবে। তাহলে ? এমন কিছু করতে হবে যাতে তার ধনদৌলত ছিনিয়ে নেওয়া যায়। ধন-দৌলত গেলেই সে কাবু হয়ে পড়বে।

যেমন ভাবা তেমনি কাজ। মহাপ্রভু সব দেবতাকে নিজের কাছে ডাকলেন। তাদের বেশ কিছুদিন তার কাছেই থাকতে বললেন। দেবতারা খুব আরামে রইল। দুধ আর চিনি খেতে লাগল। বড় সুস্বাদু, পুষ্টিকর। তারা মহা আরামে দিন কাটাতে লাগল। এমনি করে বেশ কিছুকাল কেটে গেল।

শেষকালে মহাপ্রভু একদিন দেবতাদের ডেকে বললেন, 'এবার তোমাদের যেতে হবে। অনেকদিন রইলে আমার কাছে। আর, মানুষের মধ্যে গিয়ে তোমাদের থাকতে হবে। না কোন ভয় নেই। মানুষের মধ্যে আমার এক বন্ধু আছে। তার নাম সেতি সিসা। সেই শুধু দেবতাদের মেনে চলে। তোমরা সোজা তার কাছে চলে যাও। সে সব ব্যবস্থা করবে। তোমাদের যা যা দরকার সে সবকিছুই দেবে। তার কথামতো চলবে। যাও, নির্ভয়ে যাও। কোন ভয় নেই।'

দেবতারা চলল সেতি সিসার কাছে। মহাপ্রভু বলেছেন, তবু দেবতাদের মানুষকে বড় ভয়। শেষকালে তারা সেতি সিসার কাছে পৌঁছল। সে তাদের জন্য সব ব্যবস্থা করল। কাকে কোথায় থাকতে হবে সব বলে দিল। দেবতাদের ভয় একটু কমল।

আগে দেবতাদের কোন নামধাম ছিল না। সেতি সিসা তাদের আলাদা আলাদা নাম দিল।

সে একজন দেবতার নাম দিল দুম্‌বার। তাকে থাকতে দিল পবিত্র কুঞ্জবনে, সুন্দর তরুবীথিতে। দুম্‌বার হল পবিত্র কুঞ্জের দেবতা। গাঁয়ের পাশেই এই পবিত্র কুঞ্জবন।

আর একজনকে সে বাঘের দেবতা করল। তার নাম দিল ওর্‌সেলে। পাহাড়ি বনে তাকে থাকতে বলল। গাঁয়ের পাশেই পাহাড়ি বন।

আর একজন দেবতার নাম রাখল বুনক্‌তা। তাকে করল পাহাড়ি নদীর দেবতা। সেখানে তাকে থাকতে বলল। গাঁয়ের কাছেই পাহাড়ি নদী। এখানে মানুষজন স্নান করতে আসে, খাবার জল নিতে আসে।

গাঁয়ের পাশেই উঁচু পাহাড়। সেখানে থাকতে দিল একজন দেবতাকে। তার নাম হল সাওবুলি।

গাঁয়ের কাছেই ঘন বনভূমি। সেখানে রইল আর এক দেবতা। এ দেবতার নাম হল বুগাবোর।

ঝরনার দেবতা হল সিংরাজ। সেতি সিসা নিজের বাড়িতে থাকতে দিল দুজন দেবতাকে। তারা হল ঘরের দেবতা। একজনের নাম দাগোই, অন্যজনের নাম গুরাঙ্‌পোই। একটা পাথরের আসন করে থানের দেবতা করল একজনকে। তার নাম সিন্‌দিবোর।

গাঁয়ের মধ্যে, ঘরের মধ্যে, গাঁয়ের আশেপাশে, বনে-নদীতে-ঝরনায়-পাহাড়ে সব জায়গায় রইল এক এক দেবতা। সেতি সিসার জন্য দেবতারা এখন ভালোভাবে রয়েছে, তাদের ভয় কমেছে।

আগে মানুষ দেবতাদের নিয়ে মোটেই ভাবনা-চিন্তা করত না। তারা থাকত গাঁয়ে, চাষ করত জমিতে, নাচে-গানে সময় কাটত। দেবতারা থাকত দূর বনে। কিন্তু এখন গাঁয়ের মধ্যে, চারপাশে শুধুই দেবতা। বনে-পাহাড়ে-নদীতে,— কোথায় নেই দেবতা?

এত দেবতা চারিদিকে। তাদের খাওয়া-দাওয়ার জন্য তো অনেক খাদ্য চাই। দেবতারা নিজে কোন কাজকর্ম করে না। তাদের খাবার জোগাড় করে দিতে হয়।

তাই সেতি সিসা আদেশ করল, দেবতাদের ভরণ-পোষণের জন্য গ্রামবাসীদের সবাইকে কর দিতে হবে। তারা যা দেবে তাতেই দেবতাদের ভরণ-পোষণ চালাতে হবে। প্রতিটি গ্রামবাসীকেই কর দিতে হবে।

এখন হয়েছে কি, দেবতারা মহাপ্রভুর কাছে ভালো ভালো খাবার খেতে শিখে গিয়েছে। আগের মতো ফল-ফুল-হাওয়া-জল মুখে রোচে না। বনে থাকতে এগুলো খেতেই বাধ্য হত। কিন্তু এখন চাই ভালো খাবার। আর কাজ না করেই যখন পাওয়া যাচ্ছে, তখন সুখি দেবতারা সেসব ছাড়বে কেন? তাদের লোভও অনেক বেড়ে গিয়েছে। মহাপ্রভু দেবতাদের কাছে রেখেছিলেন তো এই জন্যই। তারা জানুক ভালো খাবারের স্বাদ, তারা জানুক বনের ফলমূল ছাড়াও অন্য অনেক ভালো খাদ্য আছে, দেবতাদের লোভ বাড়ুক। বাড়তে বাড়তে সীমা ছাড়িয়ে যাক। তখন আরও দাও, আরও দাও। মহাপ্রভু যে সব বোঝেন।

গ্রামবাসীরা যা দিত দেবতাদের তাতে কিছু হত না। আরও চাই, নতুন জিনিস চাই। চারিদিকে দেবতা, মানুষও ভয় পেয়ে যেতে লাগল। দেবতাদের মন পাওয়ার জন্য আরও জিনিস দিতে লাগল। দেবতারা সাদা চালের ভাত আর মাংস চাইল। মানুষও

তাই দিতে শুরু করল। মানুষের মনে এক নতুন চিন্তা বাসা বাঁধল,— সে হল দেবতা, চারপাশের অনেক দেবতা।

এমনি করে মানুষ একদিন গরিব হয়ে গেল। দেবতার পুজো দিতে দিতে সে দরিদ্র হয়ে গেল। আগে পুজো ছিল না,—মানুষ গরিব ছিল না। এখন পুজো এল, মানুষ গরিব হল। মানুষের জীবেন দুঃখ এল।

এক পাল বুনো মোষ

পাহাড়ি ঘন এক জঙ্গালের পাশে ছিল এক গ্রাম। আর সেই গ্রামে থাকত একটা লোক। সে খুব গরিব। তার চেয়ে গরিব আর কেউ সেই গ্রামে ছিল না। তার কোনো জমি-জিরেত ছিল না, লাঙল ছিল না, ছিল না একটাও হেলে বলদ। এমন মানুষ গাঁয়ে দুটি নেই! তবে তার ছিল এক জোড়া ছাগল। এই তার একমাত্র সম্পদ।

এমনি করে দিন যায়। কিন্তু দিন তো আর কাটে না। কত সহ্য করবে সে। শেষকালে সে মন ঠিক করে ফেলল,— আর নয়, এই এক জোড়া ছাগল দিয়েই চাষ করব। দেখি না কি হয়।

লোকটা ছিল একগুঁয়ে। লেগে গেল কাজে। সে বন থেকে গাছের ডাল কেটে আনল। তাই দিয়ে ছোট্ট একটা লাঙল তৈরি করল। বড় লাঙলে কাজ হবে না। ছাগলদের মাপে ছোট লাঙল তৈরি করল। ছাগল দুটোর ঘাড়ে জুড়ে দিল লাঙল। তারপর চলল জমিতে। তার নিজের কোন জমি নেই। কিন্তু চাষ তাকে করতেই হবে। দূরে উঁচু ডাঙায় রয়েছে জমি। কাঁকুরে মাটি, কেউ কোনকালে সেখানে চাষ করে না। কেননা করেও লাভ নেই, ফসল ফলবে না। সে জমির দিকে কেউ ফিরেও তাকায় না। সে জমি কারও নয়। ছাগল লাঙল নিয়ে লোকটি গেল সেই কাঁকুরে ডাঙা জমিতে। শুরু করল লাঙল চালাতে। বড় পরিশ্রম, ঘাম ঝরছে দেহে, শক্ত মাটি। তবু সে হাল ছাড়ল না। শেষকালে জমি চাষ করা হয়ে গেল।

কিন্তু জমিতে বুনবে কি? তার তো বীজধান নেই। শস্য তো বুনতে হবে। সে গেল এক পড়শির কাছে। ধার চাইল কিছুটা বীজধান। পড়শি হাসল, ফিরিয়ে দিল তাকে। বীজধান নিলে শোধ করবে কেমন করে? ওই জমিতে ফসল ফলবে?

ফিরে এল লোকটি। দুঃখ পেল, হাল ছাড়ল না। আরও কয়েকজন পড়শির কাছে ধার চাইল বীজধান। সবাই ফিরিয়ে দিল। সবার মুখেই এক কথা।

এবার লোকটি গেল আর এক পড়শির কাছে। না, ধার চাইতে নয়। ভিক্ষে চাইতে। তার বীজধান ভিক্ষে চাই না, ধানের অল্প তুষ হলেই চলবে। তুষ ভিক্ষে? সঙ্গে সঙ্গে পড়শি রাজি। ধানের তুষ তাকে দিল। সে ফিরে এল জমিতে।

ধানের তুষে বীজ নেই। ভেতরে চাল নেই। নাই-বা থাকুক। পরম যত্নে আদর করে সে তাই বুনে দিল জমিতে। এমনভাবে বুনছে যেন মনে হল সে বীজধানই বুনছে। সকাল হলেই সে চলে যায় জমিতে। সারাদিন বসে থাকে গাছের নীচে।

অবাক কাণ্ড। কেউ বিশ্বাস করবে না। কিন্তু সত্যি তাই ঘটল। সবুজ লকলকে চারা বেরুল তুষ থেকে। কচি কচি চারা, হাওয়ায় দুলছে। লোকটির চোখে-মুখে আনন্দের ছাপ। চারা বড় হচ্ছে, আরও বড়, আর লকলকে। একদিন তাতে ধান হল, গাছভর্তি ধান। এত ধান আর কারও জমিতে কোনদিন ফলেনি। ধানের ভারে গাছ নুয়ে পড়ছে।

সারাদিন ধরে লোকটি নিজের ফসল দেখাশোনা করে। রাতে অল্পক্ষণের জন্য বাড়িতে যায়। ধান পেকে এল। আর দু-চার দিনের মধ্যেই ফসল কাটার সময় আসবে।

সেই সকালেও সে তাড়াতাড়ি চলল জমিতে। মনে ফুর্তি। এ কি সর্বনাশ ! দূর থেকেই সে দেখতে পেল, জমি কেমন ফাঁকা ফাঁকা। দৌড়ে এল। জমির কাছে এসে দুঃখে মাথায় হাত দিয়ে লোকটি বসে পড়ল। তার সব ধান গাছ দলে পিষে নষ্ট হয়ে গিয়েছে। পাশের পাহাড়ি ঘন বন থেকে এক পাল বুনো মোষ রাতে এসেছিল। যতটা পারে ধান গাছ খেয়েছে, আর তাদের পায়ের চাপে দেহের চাপে সব ধান গাছ নষ্ট হয়ে গিয়েছে। অনেকক্ষণ বসে রইল সে। শূন্য দৃষ্টিতে চেয়ে রইল তার জমির দিকে।

আর তো কিছুই নেই। সব গেল। কি হবে এই গাঁয়ে থেকে ? তার চেয়ে মোষগুলোর পেছন ধাওয়া করাই ভালো। জঙ্গালে ওদের হদিস ঠিক পাওয়া যাবে। সে চলল পাহাড়ি ঘন জঙ্গালের পথে। বুনো মোষের পাল কোনদিকে গিয়েছে তা খুঁজে বের করা মোটেই কঠিন হল না। শত শত খুরের চিহ্ন সারা পথে-মাঠে ছড়ানো। খুরের চিহ্ন-দেওয়া পথ দিয়ে সে এগোতে লাগল। মাঠ ছাড়িয়ে বনে ঢুকল। আরও গভীর বনে। শেষকালে বনের মধ্যে একটা ফাঁকা জায়গায় এসে পৌঁছল। চারিদিকে শাল-মহুয়ার গাছ, মাঝখানে অনেকটা জায়গা। সেখানে বুনো মোষের পাল রাতে ঘুমোয়। সুন্দর জায়গা, আকাশ ফাঁকা , চারিদিকে ঘেরা। সেখানেই ঘুমিয়ে থাকে বুনো মোষের পাল। এরাই তার জমির ধান দলে-পিষে নষ্ট করে এসেছে।

একটা গাছের নীচে অনেকক্ষণ লোকটি বসে রইল। বড় বিশ্রি গন্ধ বেরুচ্ছে। জায়গাটা বড় অপরিষ্কার। রাতের ফেলে-রাখা দলাদলা গোবর। মোষেরা তার ওপরেই শুয়ে থাকে। লোকটিরও কোন কাজ নেই। বড় এমঘেয়ে লাগছে। উঠে পড়ল সে। গাছের লম্বা লম্বা কয়েকটা ডাল ভাঙল। একসঙ্গো করে লম্বা ঝাঁটার মতো তৈরি করল। আর অপরিষ্কার খোলা জায়গাটিকে ঝাঁট দিতে লাগল। অনেক দিনের নোংরা। বাঃ ! বেশ সুন্দর লাগছে। কি পরিষ্কার !

একটা গাছের নীচে সূর্য ডুবে গেল। সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল। অন্ধকার চারিদিকে। এমন সময় লোকটি বহু খুরের আওয়াজ পেল। বুঝল, বুনো মোষের পাল ফিরে আসছে। সে তাড়াতাড়ি একটা শুকনো শাল গাছের কোটরের মধ্যে লুকিয়ে পড়ল। বুনো মোষের পাল তাদের পরিচিত ফাঁকা জায়গায় এসে অবাক হল। আঃ ! কি পরিষ্কার ! শোবার মতো জায়গাই বটে ! তারা অবাক হল, খুশিও হল। কিন্তু ভেবে পেল না, কে তাদের জন্য এমন সুন্দরভাবে জায়গাটা পরিষ্কার করে রেখেছে। ঘুমিয়ে পড়ল তারা। বড় ক্লান্ত।

পরের দিন ভোর বেলা দূর বনে-মাঠে যাওয়ার সময় মোষেরা এধার-ওধার তাকিয়ে দেখল। তারপরে পাল বেঁধে মিলিয়ে গেল ঘন বনের মধ্যে।

লোকটি তো সবকিছু দেখতে পাচ্ছে। সে বেরিয়ে এল গাছের কোটর থেকে। আবার ঝাঁটা দিয়ে তাদের ঘুমিয়ে থাকার জায়গাটি পরিপাটি করে পরিষ্কার করে রাখল। খুব যত্ন করে অনেকক্ষণ ধরে ঝাঁট দিল। তারপরে গাছের নীচে ছায়ায় বসে বিশ্রাম করতে লাগল।

সন্ধ্যার পরে ফিরে এসে মোষের পাল আবার অবাক হল। সেই একই কাণ্ড। এদিন জায়গাটি যেন আরও ঝকঝকে তকতকে লাগছে। কে করছে এমন উপকার ? সে রাতে

তারা ঠিক করল, পরের দিন একজনকে এখানে রেখে যেতে হবে। সে নজর রাখবে কে এমন উপকার করছে।

পরের দিন ভোরবেলা মাঠে-বনে চরতে যাওয়ার সময় তারা একটা মোষকে সেখানে রেখে গেল। সে ছিল খোঁড়া। সবাই চলে গেল। সে রইল খোলা জায়গায়। দুপুর হল। ওপর থেকে আগুন ঝরছে। কোন কাজ নেই। ক্লান্ত হয়ে খোঁড়া মোষটা গাছের নীচে বসে পড়ল। ঘাড়টা বেঁকিয়ে পায়ের ওপরে রাখল। চোখ আপনিই বন্ধ হয়ে এল। সে ঘুমিয়ে পড়ল।

লোকটি সব দেখছে। বেরিয়ে এল গাছের কোটর থেকে। হাতে ডালের ঝাঁটা নিয়ে খুব আস্তে আস্তে ঝাঁট দিতে লাগল। কোন শব্দ না করে। তাড়াতাড়ি কাজ শেষ করে আবার লুকিয়ে পড়ল কোটরে। মোষটা তখনও ঘুমোচ্ছে।

মোষরা ফিরে এল। এবার আরও অবাক হল। কেননা, খোঁড়া মোষটা কাউকেই দেখেনি। অথচ খোলা জায়গাটি তেমনি পরিষ্কার। এবার তারা আর একটা মোষকে ঠিক করল। সে অন্ধ। কিছুই দেখতে পায় না। কিন্তু অন্ধ বলেই তার কান অন্যদের চেয়ে বেশি সজাগ। অল্প শব্দ হলেও সে ঠিক টের পায়।

অন্ধ মোষ দুপুরে গাছের নীচে শুয়ে রয়েছে। কিন্তু সে ঘুমোবে না। ধরতেই হবে তাকে যে এমন উপকার করছে। চোখ বন্ধ করে সে শুয়ে রইল।

লোকটি সব দেখছে। সে বেরিয়ে এল গাছের কোটর থেকে। ডালের ঝাঁটা তুলে নিল হাতে। কান খাড়া করে রইল মোষ। সে সব বুঝতে পারছে। ঝাঁট দেওয়া শেষ হল। লোকটির চলার শব্দ হচ্ছে মাটিতে। এক জায়গায় গিয়ে শব্দ থেমে গেল। মোষ সব বুঝল।

বুনো মোষের পাল ফিরে এল। অন্ধ মোষ সব বলল। দেখিয়ে দিল লোকটির লুকোনোর জায়গা। মোষেরা কোটরের কাছে গেল। উঁকি মেরে দেখল, ভেতরে বসে রয়েছে তাদের উপকারী বন্ধু। তাকে বাইরে আসতে বলল। লোকটি একটু ভয় পেল।

মোষ সর্দার বলল, 'তুমি খুব ভালো লোক। ভয়ের কি আছে ? তুমি আমাদের কত উপকার করছ। আমরাও তোমাকে দেখব। তোমার সব দায়িত্ব আমরা নিলাম। তুমি আমাদের মধ্যেই থাকবে। রাজি তো ?'

লোকটির জমি-জিরেত নেই, সংসার নেই, বউ-ছেলেমেয়ে কেউ নেই। গরিব বলে পড়শিরাও তেমন খোঁজ নেয় না। সে যাবেই বা কোথায় ? সে রাজি। বুনো মোষের পালের সঙ্গেই সে থাকবে। সে রাজি। মোষের পাল খুশি হল। মোষের পাল তার দেখাশোনা করবে, আর সে মোষের পালের ঘুমোবার জায়গা পরিষ্কার করবে। এমনি করে দিন কাটে।

একদিন বনের পথ দিয়ে কয়েকজন পথিক চলেছিল। তাদের সঙ্গে অনেক অনেক জিনিসপত্র। মোষের পাল তৈরি ছিল। শিং বাগিয়ে তেড়ে গেল। বুনো মোষের পাল দেখে পথিকরা যে যার জিনিসপত্র ফেলে পালিয়ে গেল। সব জিনিস শিঙে তুলে নিয়ে চলে এল সেই ফাঁকা জায়গায়। লোকটিকে দিল। জামা-কাপড়-চিরুনি,—অনেক কিছু। লোকটির আর কোন অভাব থাকল না। এরকম মাঝে-মধ্যেই ঘটে। পথিক সে পথে গেলেই মোষের পাল শিং বাগিয়ে তেড়ে যায়। তারাও প্রাণ নিয়ে পালায়। ফেলে যায় তাদের

জিনিসপত্র। শিঙে তুলে মোষেরা সেগুলো আনে লোকটির কাছে। বেশ সুখে দিন কাটছে।

সারা দিন লোকটি একা থাকে। কোথায় কি বিপদ ঘটে তার ঠিক নেই। মোষের পাল তাই চিন্তিত। শেষে একদিন মোষ সর্দার লোকটিকে দুটো শিং দিয়ে বলল, 'বন্ধু তুমি একা একা থাকো। কোথায় কি বিপদ ঘটে কে জানে। কোন বিপদ ঘটলেই তুমি এই শিঙের শিঙা বাজাবে, আমরা যেখানেই থাকি না কেন তোমার কাছে ছুটে আসব। কোন বিপদ তোমার হতে দেব না। কেউ তোমার কিছু করবে তা আমরা সহ্য করব না। তুমি যে আমাদের বন্ধু।'

লোকটি মোষের শিঙের শিঙা সবসময় নিজের কাছে রাখে। বন্ধুর দান। একদিন লোকটি পাহাড়ি নদীতে স্নান করছে। ঘাসের ওপরে শিংদুটো রেখে দিয়েছে। এমন সময় কয়েকটা কাক ঠোঁটে করে তার শিঙা নিয়ে উড়ে কোথায় পালিয়ে গেল। জল থেকে তাড়াতাড়ি সে উঠে এল, ধাওয়া করল কিছুটা পথ। কিন্তু পাখিদের আর দেখা গেল না। তার খুব মন খারাপ হয়ে গেল। কিন্তু এই হারিয়ে যাওয়ার কথা সে আর মোষেদের বলল না। লজ্জা পেল।

আর একদিন স্নান করতে গিয়েছে পাহাড়ি নদীতে। স্নান সেরে নদীর পারে বসে চুল আঁচড়াচ্ছে, কতদিন চুল কাটা হয়নি। বিরাট লম্বা হয়েছে। মাথা থেকে নেমে চুল হাঁটুর কাছে এসেছে। আঁচড়াতে আঁচড়াতে একটা চুল গোড়া থেকে উপড়ে এল। পাশে পড়ে ছিল একটা লোয়া ফল। সে ফলটাকে দুভাগ করে তার মধ্যে চুলটাকে জড়িয়ে ঢুকিয়ে দিল। আবার লোয়া ফলটিকে বন্ধ করে আপন খেয়ালে ফেলে দিল নদীর জলে। লোয়া ফল ভাসতে ভাসতে স্রোতের টানে অনেক দূর চলে গেল। সে তাকিয়ে রইল। আরও দূরে। এখন আর ফলটিকে দেখা যাচ্ছে না। সে ফিরে এল মোষেদের আস্তানায়।

এখন হয়েছে কি, ফল ভাসছে, ভাসছে। ভাসতে ভাসতে অনেক দূর চলে গিয়েছে। নদীর এক জায়গায় স্নান করছিল সেই গাঁয়ের সর্দারের মেয়ে। লোয়া ফল মেয়ের পাশ দিয়ে যেতেই সে সেটাকে ধরে ফেলল। ফাঁক করল। ভেতরে দেখতে পেল লম্বা চুল। তাড়াতাড়ি চলে এল বাবার কাছে। মেয়ে বলল, 'এই লম্বা চুল যে মানুষটির, আমি তাকেই বিয়ে করব। আর কাউকে নয়।'

সর্দার বিরাট ধনী মানুষ। বিরাট বাড়িঘর, মস্ত গাঁ। আর ওই একমাত্র মেয়ে। কত ভালো বর জুটবে মেয়ের। সবই তো পাবে ওই মেয়ে আর জামাই। এখন কোথাকার কে তার ঠিক নেই, তার সঙ্গে এমন মেয়ের বিয়ে ? কিন্তু মেয়ের প্রতিজ্ঞা, মেয়ে নাছোরবান্দা। সে ওই লম্বা চুলের মানুষটিকেই বিয়ে করবে। বড় আদুরে মেয়ে। কি আর করবে বাবা ! নদীর উজান পথে লোক পাঠাল। অনেকে চলল মেয়ের বরের খোঁজে।

খুঁজতে খুঁজতে একজন মোষের পালের আস্তানায় তার দেখা পেল। হ্যাঁ, এই সেই লোক। চুল দেখেই বোঝা যাচ্ছে। তাকে নিয়ে এল সর্দারের গাঁয়ে। সর্দারের মেয়ের সঙ্গে তার বিয়ে হবে।

খুব খাওয়া-দাওয়া, হইচই আর ধুমধামের মধ্যে বিয়ে হয়ে গেল। সর্দারও কথা দিলেন তার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হবে এই জামাই। সুখে-শান্তিতে দিন কাটতে লাগল। আর কোন অভাব নেই।

একদিন জামাই ঘেরা উঠোনে দাঁড়িয়ে রয়েছে। আশেপাশে একটু দূরে কিছু সঙ্গী-সাথী। এমন সময় আকাশ দিয়ে উড়ে যাচ্ছিল কয়েকটা কাক। হঠাৎ তাদের ঠোঁট থেকে মোষের দুটো শিং তার পায়ের কাছে পাড় গেল। সে তাড়াতাড়ি তুলে নিল। হাতে নিয়েই চিনতে পারল। তার হারিয়ে-যাওয়া শিঙের শিঙা। মোষ সর্দার বন্ধুকে দিয়েছিল। আনন্দে মন ভরে গেল।

সে ভালোভাবে দেখছে শিং দুটো। কয়েকজন সঙ্গীসাথী তার কাছে এল। বলল, 'এমন করে দেখার কি আছে? ও-তো মোষের শিং।'

জামাই হাসল। বলল, 'হ্যাঁ, তাই বটে। তবে এর অনেক গুণ। আমি যদি এই শিঙা বাজাই, তবে এক মুহূর্তে এই বিরাট গ্রাম মাটিতে মিশে যেতে পারে। তখন আর গ্রাম বলেই চেনা যাবে না।'

জামাই কি পাগল? বলে কি? শিঙা বাজাবার সঙ্গে সঙ্গে গ্রাম মাটিতে মিশে যাবে কেন? তারা ঠাট্টা করতে লাগল। তাই আবার হয় নাকি? ঠাট্টার কথা শুনে জামাই রেগে গেল। বিশ্বাস হচ্ছে না? আবারও ঠাট্টা। এবার ভীষণ রেগে গেল সে। মুখের কাছে শিঙের শিঙা এনে জোরে ফুঁ দিল। বেজে উঠল শিঙা। সবাই চুপচাপ।

হঠাৎ দূর বনের মধ্যে থেকে ভীষণ শব্দ ভেসে এল। মাটিতে দাপাদাপির শব্দ। মাটি কাঁপছে। শব্দ কাছে আসছে, মাটি আরও বেশি কাঁপছে। বনে গাছপালা নড়াচড়া করছে। আরও শব্দ। হঠাৎ বনের মধ্যে থেকে বেরিয়ে এল এক পাল কালো মেঘ। এক পাল বুনো মোষ। মাথা নিচু করে শত শত বুনো মোষ ধেয়ে আসছে গ্রামের দিকে। যারা দেখছিল তাদের বুক কেঁপে উঠল। হ্যাঁ গ্রাম মাটির সঙ্গে মিশে যেতে পারে বটে।

না, কোন অঘটন ঘটল না। গ্রাম মাটির সঙ্গে মিশে গেল না। লোকটি ঝড়ের বেগে ঘেরা-দেওয়া উঠোন থেকে বেরিয়ে এল। বাইরে খোলা মাঠে। তাকে দেখেই মোষের পাল গতি আস্তে করল। না, বন্ধু অক্ষত আছে। তার কোন বিপদ ঘটেনি। আস্তে আস্তে বন্ধুর সামনে বুনো মোষের পাল দাঁড়িয়ে গেল। মোষ সর্দারের গায়ে হাত রেখে বলল, 'না আমার কোন বিপদ ঘটেনি। আমি ঠিক আছি। অনেকদিন তোমাদের দেখিনি। তাই।'

বন্ধুর কথায় মোষের পাল শান্ত হল। যাক্, বন্ধু ভালো আছে। তারা বসে পড়ল সেখনে। তখন সর্দারের বাড়ি থেকে সমস্ত খড় দানা শস্য বের করে আনা হল। জামাইয়ের বন্ধু বুনো মোষের পালকে খেতে দিতে হবে। তারা অতিথি। প্রাণভরে তারা খেল। চোঁ চোঁ করে পুকুরের জল খেল। তারা আবার ফিরে চলল পাহাড়ি ঘন বনের দিকে। সবাই চলে গেল দুজন ছাড়া।

দুটি মোষ রয়ে গেল বন্ধুর কাছে। সর্দারের বাড়িতে, গাঁয়ে। এই একজোড়া মোষ আর বনে ফিরে গেল না। তারা হল গৃহপালিত, তারা হল পোষা। তাদের বুনো স্বভাব চলে গেল। আজ যে আমরা ঘরে ঘরে এত পোষা মোষ দেখতে পাই, তারা সবাই ওই একজোড়া মোষের বাচ্চা থেকেই এসেছে। ওদের বাচ্চারাই ঘরে ঘরে পোষা হয়ে রইল। বনে রইল বুনো মোষ, ঘরে রইল পোষা মোষ।

আদ্যিকালের কথা

শোনো বাছারা আদ্যিকালের কথা। এ কথা সবাইকে শুনতে হয়। শুনে মনে রাখবে। আবার বলবে তোমাদের ছেলেমেয়েকে, তোমাদের নাতিপুতিদের। শোনো সেই আদ্যিকালের কথা।

সেই আদ্যিকালে কিছুই ছিল না। ছিল শুধু ফুলুগা। আমাদের এই পৃথিবী সৃষ্টি করলেন ফুলুগা। চারিদিকে ঘন জঙ্গল। সেই জঙ্গালের মধ্যে মাথা ছাড়িয়ে উঠেছে একটা মস্ত তালগাছ। আর তারই মাথায় বসানো রয়েছে এই পৃথিবী। নীচে শুধুই ডাঙা। সমুদ্র নেই, তখনও সমুদ্র জন্মায়নি। নীচের অন্ধকার জঙ্গালে বাস করে অনেক অনেক আত্মা। তারা বনের জীবজন্তু শিকার করে আর তাই খেয়ে বনেই থাকে। তারা শুয়ে থাকে এক বিশাল ডুমুর গাছের নীচে। ডুমুরও খায় তারা।

আর একটা জায়গা ছিল। সেটা সেই পুবদিকে। সেখনে থাকে যত শয়তান আত্মা। বড় পাজি তারা। এখানকার সঙ্গে শয়তান আত্মাদের দেশের মধ্যে আসা-যাওয়ার একটা ব্যবস্থা ছিল। সেটা একটা সাঁকো। সব সময় কিন্তু সেই সাঁকোকে দেখতে পাওয়া যায় না। দিন যখন খুব খারাপ যায়, আকাশে ফুটো হয়ে বৃষ্টি নামার কালে, চারিদিকে যখন থম্‌থম্‌ তখন সাঁকো দেখা যায়। সাঁকোর নাম হল রামধনু। মস্ত বড়।

পৃথিবী তো হল। ফুলুগা চিন্তা করলেন। শেষকালে তৈরি করলেন মানুষ। একটা মানুষ। এই মানুষটার নাম দিলেন তোমো। তার গায়ের রং বেজায় কালো, ঠিক আমাদের এখনকার মতো। কিন্তু তার মুখভর্তি লোম আর সে বেজায় লম্বা। আমাদের এখনকার মতো নয়।

তখন সমুদ্র হয়েছে। সমুদ্রের মধ্যে দুটো ডাঙা ছিল। এই দুই ডাঙার মধ্যিখানে আবার এক ঘন জঙ্গাল। তার নাম ওতিমি। মানুষ তোমোকে ফুলুগা রাখলেন সেই ওতিমির জঙ্গালে। গাছে গাছে ফল ধরে রয়েছে, অনেক ফল। ফুলুগা তোমোকে একটা একটা করে ফল চিনিয়ে দিলেন। সব চিনল মানুষ। ফুলুগা বললেন, 'সব সময় গাছের ফল খাবে। কিন্তু আকাশ থেকে যখন জল পড়বে, এক নাগাড়ে অনেক দিন ধরে পড়তে থাকবে তখন কিন্তু কয়েকটা ফল খাবে না। এই কটা বাদ দিয়ে অন্য ফল খাবে। মনে রাখবে।' তোমো মাথা নাড়ল।

ফুলুগা ডাকলেন তোমোকে। দুটো গাছের কয়েকটা শুকনো ডাল ভেঙে আনলেন। প্রথমে মাটিতে রাখলেন এ গাছের একটা ডাল, তার ওপরে ও গাছের ডাল, তার ওপরে এ গাছের। এমনি করে বেশ উঁচু হল ডালের ওপরে ডাল। সূর্যকে ডাকলেন। সূর্য ফুলুগার কথায় ডালের ওপরে বসল। দেখতে দেখতে আগুন জ্বলে উঠল। জ্বলন্ত ডাল দিলেন তোমোকে। একে বাঁচিয়ে রাখতে হবে। মানুষ তোমো আগুন পেল।

এতদিন তো সবকিছু কাঁচাই খেত তোমো। এখন আগুন আছে। রান্না শেখালেন ফুলুগা। বুনো শুয়োর মেরে তার মাংস রাঁধতে শেখালেন। বুনো শুয়োর এখনকার মতো ছিল না। তখন ছিল বেজায় বোকা। তাদের নাক ছিল না, কান ছিল না। নাক নিয়ে তেড়ে আসতে পারত না, কানে শুনে পালিয়ে যেতেও পারত না। শুধুই মারা পড়ত। তোমোর বেজায় সুবিধে। ওরা তখন নিজেরা খেতে জানত না।

মানুষ তোমো সব শিখল। ফুলুগা আর থাকবেন কেন এখানে? তিনি চলে গেলেন ওই দূর পাহাড়ের চূড়ায় কিংবা বোধহয় ওই সাদা মেঘের আকাশে। মানুষ আর কোনদিন দেবী ফুলুগাকে দেখে নি। তিনি আছেন, কিন্তু দেখা পাওয়া যাবে না।

তোমো ছিল পুরুষ। প্রথম নারীর নাম চানা ইলেওয়াদি। তাকেও সৃষ্টি করেছেন ফুলুগা, ফুলুগাই সব সৃষ্টি করেছেন। তবে পুরুষের পরে জন্মেছে নারী। তোমো যখন আগুন পেল তার অনেক পরে নারী জন্মাল। তাকেই তো ঘর গেরস্থালি দেখতে হবে। জন্মাবার পরে সে জলে সাঁতার কাটছিল। তোমোর আস্তানা দেখে, আগুন দেখে জল থেকে উঠে এল তোমোর কাছে। সে হল তোমোর বউ।

এমনি করে দিন যায়। শেষকালে চানা ইলেওয়াদির হল দুটো ছেলে আর দুটো মেয়ে। আমরা এখন যারা এখানে থাকি তারা সবাই ওদেরই বংশধর। হ্যাঁ, ওরাই আমাদের সবচেয়ে পুরনো বাবা-মা।

মানুষ বাড়ছে। বনের শুয়োর বাড়ছে। কিন্তু শুয়োর বাড়ছে অনেক বেশি। বেজায় অসুবিধে। শুয়োররা তো নিজেরা খেতে পারে না। এত শুয়োরকে খাওয়ানোই হল এক দায়। চানা ইলেওয়াদি আর কি করে? সে এক বুদ্ধি করল। ছোট্ট শুঁড়ের নীচে খুঁচিয়ে ফুটো করে দিল। মুখ হল শুয়োরের। এখন নিজেরাই খুঁজেপেতে খাবার খেতে লাগল। ঝামেলা কমল। কিন্তু আবার কষ্টও বাড়ল। শুয়োরগুলো নিজেরা খেতে শিখে চালাক হয়ে উঠল। মানুষের ওপর আর নির্ভর করতে হচ্ছে না। নিজেরাই খাবার-দাবার খুঁজে নিচ্ছে। ঘন বনে ঢুকে পড়ছে। তাদের শিকার করা কঠিন হয়ে পড়ল। তোমো তির-ধনুক নিয়ে অনেক কষ্টে তবেই শুয়োর শিকার করতে পারে। আগে হাতের কাছেই শুয়োর পাওয়া যেত। এখন তির-ধনুক নিয়ে শিকার করতে হয়। অবশ্য তির-ধনুক ভালোই চালাতে পারে মানুষ। কেননা, ফুলুগা আকাশে কিংবা পাহাড়ের চুড়োয় যাবার আগে তোমোকে গাছের ডাল থেকে তির-ধনুক বানাতে শিখিয়েছিল, তির ছুড়তে শিখিয়েছিল। এখন তো তোমো জলেও তির ছুড়তে পারে, মাছের গায়ে বিঁধে যায় সেই তির।

সেই চলে যাওয়ার পরে ফুলুগা আর একবার পৃথিবীতে এসেছিলেন। চানা ইলেওয়াদির কাছে এসেছিলেন। তিনটে কাজ তিনি শিখিয়ে গেলেন। ঝুড়ি আর জাল বুনতে শেখালেন। বড় কাজে লাগল মানুষের। আর মেয়েদের কীভাবে সাজতে হবে তাও শেখালেন। লাল-সাদা কাদামাটি দিয়ে কীভাবে মুখে-হাতে-বুকে-পায়ে ছবি আঁকতে হয় তা শিখিয়ে দিলেন চানা ইলেওয়াদিকে। না সাজলে কি মেয়েদের মানায়?

হ্যাঁ, বলতে ভুলে গিয়েছি। ফুলুগা তো চলে যাবেন, তিনি নিষেধ করলেন কয়েকটা কাজ করতে। ঝম্‌ঝম্ বৃষ্টির সময়ে কয়েকটা ফল খাবে না, ঝম্‌ঝম্ বৃষ্টির সময়ে সূর্য

চলে গেলে চারিদিকে আঁধার হলে তারা যেন কোন কাজ না করে। শুধুই বিশ্রাম। আঁধার হবার পরে কাজ করলে পোকা-জন্তু-জানোয়ার বিরক্ত হবে। তারা বিরক্ত হলে মানুষের ভালো হবে না। সন্ধের পরে কুঠার দিয়ে গাছ কাটবে না, কাঠ কাটবে না। বড় বিশ্রি শব্দ হয়। তাতে মানুষের মাথা ধরবে, ফুলুগারও মাথা ধরতে পারে। বড় বিরক্তিকর। ওসব করবে না। যাওয়ার আগে দেবী ফুলুগা আর একটা মস্ত উপকার করলেন। স্বামী-স্ত্রী, তোমো ও চানা ইলেওয়াদিকে কথা বলতে শিখিয়ে গেলেন। সেটাই তো আমাদের আদি ভাষা।

তোমো একদিন সমুদ্রের ধারে বসে মাছ ধরছে। ধরা পড়েছে একটা বিরাট মাছ। ডাঙার কাছে আসতেই মাছটা এমন জোরে লেজের ঝাপটা দিল যে চারিদিকে চৌচির হয়ে গেল। অনেক ছোট ছোট নদীর জন্ম হল। ছোট ছোট নানা ডাঙা হল। তখন সেইসব ডাঙায় জোড়ায় জোড়ায় নারী-পুরুষ ছড়িয়ে পড়ল। তারা সঙ্গে নিল জ্বলন্ত আগুন আর ঘর-সংসার পাতার টুকিটাকি জিনিসপত্র। লোক তো তখন অনেক বেড়ে গিয়েছে। এমনি করে নানা ডাঙায় নানা ধরনের লোকজন বসতি করল। কত রকমের মানুষজন, কত রকমের ভাষা।

অনেক কাল কেটে গিয়েছে। অনেক ছেলেমেয়ে তোমো ও চানা ইলেওয়াদির। এখন তারা বুড়ো-বুড়ি হয়েছে। চারিদিকে তাদের বংশধর। শেষকালে একদিন তোমো জলে নামল, ডুব দিল,—আর উঠল না। তার পরেই বউ জলে নামল, ডুব দিল,—আর উঠল না। তোমো হয়ে গেল সমুদ্রের তিমিমাছ,—যাকে দেখে সমুদ্রের সব জন্তুই ভয় পায়। এমন কি এতবড় কচ্ছপও ভয় পায়। চানা ইলেওয়াদি হয়ে গেল সমুদ্রের কাঁকড়া। দুজনেই সমুদ্রে মিলিয়ে গেল। আর তারা মানুষ রইল না।

তোমোর চলে যাবার পরে ওতিমির সর্দার হল কোল্‌য়োত। সে ছিল তোমোর নাতি। কোল্‌য়োত ছিল মহা শক্তিশালী পরুষ। যা আগে কেউ পারেনি, সে তা পেরেছিল। সে সমুদ্রের এক বিরাট কচ্ছপকে শিকার করেছিল। আশ্চর্য শক্তি। খুব ভালো সর্দার।

কোল্‌য়োত একদিন বুড়ো হল। সে মারা গেল। তখন থেকেই আমাদের কপাল খারাপ হতে শুরু হল। দেবী ফুলুগা যা যা নিষেধ করেছিলেন, তোমো তা শুনত, কোল্‌য়োত তা শুনত। কিন্তু তাদের পরে আর তেমন কেউ ওসব নিষেধ গ্রাহ্য করত না। যা খুশি তাই করত। নিষেধের কথা মনেই আনত না।

দূর আকাশ কিংবা পাহাড়ের চুড়ো থেকে সবই দেখছেন ফুলুগা। তাকে দেখা যায় না, তিনি সব দেখেন। ভীষণ রেগে গেলেন তিনি। তার নিষেধ অমান্য করা? এবার বুঝবে মজা। বন্যা বইয়ে দিলেন চারিদিকে। সেই পাহাড়ের চুড়ো ছাড়া আর সবকিছু জলের তলায়। সবাই ডুবে মরল। শুধু চারজন বাদে। দুজন পুরুষ ও দুজন মেয়ে তখন নৌকোয় ছিল। জল যত বাড়ছে, নৌকো ওপরে উঠছে। তাই তারা বেঁচে গেল। বন্যা সবাইকে ডুবিয়ে দিল। চারজন শুধু বেঁচে রইল।

অনেক দিন পরে জল নামল। একে একে ডাঙা ভেসে উঠল, জেগে উঠল বন আর মাটি। কোন জন্তু নেই, মানুষ নেই। ওই চারজন ওতিমিতে ফিরে এল। কিন্তু সর্বনাশ হয়ে গিয়েছে। আগুন নেই, আগুন নিভে গিয়েছে। সর্বনাশ।

হাজার হলেও ফুলুগা দেবী। কতক্ষণ আর রেগে বসে রইবেন তিনি? আবার সৃষ্টি করলেন সমস্ত প্রাণী। মানুষ তো আছেই। প্রাণী সৃষ্টি করে তিনি আর কিছু করলেন না।

মানুষের মধ্যে আগুন নেই। দিন কাটে, রাত কাটে। বড় কষ্ট মানুষের। আগুন নেই— যেন কিছুই নেই। মুখে কিছুই রোচে না, রান্না করা যাচ্ছে না। উপায়ও নেই।

একদিন একটা মাছরাঙা পাখি তিরের বেগে ছুটে চলেছে। সে আনবে আগুন। আগুন আছে ফুলুগার ডেরায়। কিন্তু খুব সাবধানে যেতে হবে। ফুলুগা দেখলে আর আস্ত রাখবেন না। ফুলুগা তখন আগুন পোয়াচ্ছিলেন। একটু আনমনা ছিলেন। ঠোঁটে এক টুকরো জ্বলন্ত কাঠ তুলে নিযেই উড়ে চলল মাছরাঙা। ডানার শব্দে চোখ ফেরাতেই ফুলুগা দেখতে পেলেন মাছরাঙার কাণ্ড। একটা জ্বলন্ত কাঠ তুলে নিয়ে মাছরাঙার দিকে ছুড়ে মারলেন। মাছরাঙা এঁকেবেঁকে উড়ছে, জ্বলন্ত কাঠ তার গায়ে লাগল না। ফস্‌কে গেল। জ্বলন্ত কাঠ এসে পড়ল,— পৃথিবীতে, ওতিমিতে। সেই জ্বলন্ত কাঠ তুলে নিল চারজন মানুষ। সে আগুন আর কোনদিন নেভেনি। এখনও জ্বলছে।

ওই চারজন মানুষ থেকে আরও বাড়তে লাগল। ওই চারজন তো বন্যার কথা জানে, ফুলুগা যে বন্যায় ডুবিয়েছে পৃথিবীকে তাও জানে। তারা প্রায়ই এসব কথা বলাবলি করে। সবাই জানে বন্যার কথা, ফুলুগার রাগের কথা। মানুষ তখন ঠিক করল— ফুলুগাকে বরং মেরে ফেলাই ভালো। তারা ভাবল, তাদের পরামর্শের কথা অন্য কেউ জানতে পারবে না। তারা ভুল করল।

ফুলুগা সব জানলেন। শেষ বারের মতো নেমে এলেন পৃথিবীতে, বললেন, 'তোমরা মানুষেরা আমার নিষেধ অমান্য করেছিলে, তাই শাস্তি পেতে হয়েছিল। এখন আমাকে মেরে ফেলবার কথা ভাবছ। আমার দেহ শক্ত কাঠে গড়া। যদি কারও সাহস থাকে আগে আমার দেহে তির ছোড়।'

মানুষেরা ভয়ে বিস্ময়ে চুপ করে রইল। ফুলুগা আবার বললেন, 'আবার তোমরা আমার নিষেধগুলো অমান্য করে চলেছ। আমার নিষেধ মনে রেখো। আমাকে মেরে ফেলার কথা মন থেকে মুছে ফেলবে। নইলে বিপদ হতে পারে।' ফুলুগা চলে গেলেন। আর ফেরেননি।

সেদিন থেকে ফুলুগার সব নিষেধ তারা মেনে চলল। আমরাও মেনে চলেছি। তাই কোন বিপদ আসেনি। ফুলুগার নিষেধ মেনে চললে বিপদ আসবে কেন?

সাবাই ঘাসের জন্মকথা

সে অনেককাল আগের কথা। এক গাঁয়ে ছিল সাত ভাই। আর তাদের ছিল এক আদরের বোন। ভাই-বোনে খুব মিল ছিল। হবে না কেন? সাত ভাইয়ের একটাই বোন।

একবার সাত ভাই ঠিক করল, তারা একটা পুকুর কাটবে। জলের বড় অভাব। লেগে গেল কাজে। সারা দিনমান কাজ করে। অনেক কষ্ট হল, অনেক পরিশ্রম হল। পুকুরও হল অনেক গভীর। কিন্তু তবু জলের দেখা নেই। এতটা মাটি তোলা হল, জল বের হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু পুকুরের তলায় তেমনি শক্ত লালচে মাটি। জল নেই, জলের দেখা নেই। পুকুরে ভিজে ভিজে মাটি নেই। পুকুর শুকনোই রইল।

একদিন সাতভাই পুকুরের পাড়ে বসে রয়েছে। নানা চিন্তা, কত রকমের কথা। কেন জল নেই পুকুরে? অথচ এত গভীর পুকুর। এখন কি করা উচিত? এইসব। হঠাৎ তারা দেখতে পেল, দূরের পথ দিয়ে একজন যোগী এদিকেই আসছেন। তার হাতে একটা লোটা।

পুকুরের কাছে আসতেই সাত ভাই যোগীকে প্রণাম করে জিজ্ঞেস করল, 'আমরা অনেক কষ্টে অনেক দিন ধরে এই পুকুর কেটেছি। দেখুন, কত গভীর করে কেটেছি। তবু জল উঠছে না। কি করি বলুন তো? আপনি তো অনেক কিছু জানেন। কত দেশে দেশে বনে বনান্তরে ঘুরে বেড়ান। অনেক কিছু দেখেছেন। আপনি বলে দিন,—কি করলে পুকুরে জল আসবে? টল্‌টলে জলে পুকুর ভরে যাবে?'

যোগী কিছুক্ষণ চুপ করে থাকলেন। তারপরে সব ভাইয়ের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তোমাদের একটা বোন আছে। আদরের বোন। পুকুরের নামে তাকে যদি উৎসর্গ করো, পুকুর জলে ভরে উঠবে। টল্‌টলে জলে ভরে উঠবে।'

যোগী আর কোন কথা বললেন না। সাত ভাই কি বলবে তা শুনবার জন্য অপেক্ষা করলেন না। দূর বনের পথে এগিয়ে গেলেন।

যোগী চলে যেতেই সাত ভাই চমকে উঠল। এ কি করে সম্ভব? বোন যে তাদের বড় আদরের। একমাত্র বোন। তাকে উৎসর্গ করতে হবে? বোন তো মরে যাবে। তবে? কিন্তু পুকুরেও যে জল নেই। এত পরিশ্রম ব্যর্থ হবে? তারাই বা কি করবে? দেখাই যাক না কি হয়। যোগীর কথামতো একবার চেষ্টা করেই দেখা যাক। সলা-পরামর্শ চলল। একবার মত হয়, আবার মত পালটায়। শেষে বোনকে উৎসর্গ করাই ঠিক হল। সবাই রাজি হল।

পরের দিন সকালে বাড়ি থেকে বেরোবার সময় তারা মাকে বলল, 'আজকে দুপুরে বোন যখন পুকুরে আমাদের খাবার নিয়ে যাবে তখন ওকে খুব সাজিয়ে পাঠাবে। সবচেয়ে ভালো পোশাক পরতে দেবে। আমাদের খাবার দেবে নতুন পাত্রে।

আর বোনের সঙ্গো দেবে একটা নতুন মাটির লোটা। সে ওই লোটাতে করে আমাদের জন্য খাবার পরে জল বয়ে আনবে। ভুলে যেয়ো না কিন্তু।

সাত ভাই রওনা দিল পুকুরের দিকে। পথে কেউ কারও সঙ্গো কোন কথা বলল না। মন খারাপ হয়ে আছে। আহা! তাদের আদরের বোন। কিন্তু উপায় কি?

দুপুর হল। বনে-মাঠে-আকাশে আগুন। বোন আসছে। দূর থেকে দেখা যাচ্ছে। সাত ভাই বোনকে দেখে মাথা নিচু করে ফেলল। বুকের মধ্যে যেন মাদল বাজছে। কষ্টের মাদল। বোন হাসতে হাসতে কাছে এল। কি সুন্দর লাগছে বোনকে। ঝল্‌মলে পোশাক, হাতে-গলায়-কানে ঝক্‌ঝকে গয়না, পরিপাটি চুলে ফুলের বাহার। বোনকে উৎসর্গ করতে হবে? বোন আর বেঁচে থাকবে না? তাদের চোখে জল টস্‌টস্‌ করতে লাগল। বুক ফাঁকা ফাঁকা লাগছে।

ভাইদের চোখে জল দেখে আদরের বোন উতলা হল। তাড়াতাড়ি জিজ্ঞেস করল, 'কি হয়েছে? তোমরা কাঁদছ কেন?'

ভাইরা নিজেদের সামলে নিল। কষ্টের হাসি হেসে বলল, 'দূর পাগলি। কই কিছু হয়নি তো? এমনি।'

খাবার নিল তারা। নতুন মাটির লোটা নিয়ে বোনকে পুকুরে নামতে বলল। খাবার পরে জল দরকার। বোন তো কিছুই জানে না। লোটা নিয়ে হাল্‌কা পায়ে পুকুরের দিকে গেল। উঁচু পাড়ে উঠতেই পুকুরের তলার মাটি থেকে জল উঠতে লাগল। কুল্‌কুল্‌ করে জল উঠছে। নেমে গেল পুকুরের ঢালু বেয়ে। জলের কিনারে যেতেই জল এসে লাগল তার পায়ের পাতাতে। টল্‌টলে জল। সে নতুন মাটির লোটা হাতে নিচু হল,—জল বাড়ছে, জল বাড়ছে, আরও বাড়ছে। লোটা ডোবাল জলে, অনেক জল তবু লোটা ডুবল না। এ কি. এত জল, তবু লোটায় কেন জল ঢুকছে না। আদরের বোন পুকুরের মাঝখান থেকে মিষ্টি সুরে গেয়ে উঠল,

ভাই
জল বাড়ছে জল বাড়ছে জল বাড়ছে,
ডুবছে ডুবছে পায়ের পাতা ডুবছে।
ভাই!
তবু রইল খালি রইল খালি হাতের লোটা,
জলের তলে ডুবছে না তো হাতের লোটা?

জল আরও বেড়ে চলেছে। আরও টল্‌টলে হয়েছে জল। জল আদরের বোনের হাঁটু ডুবিয়ে দিল। লোটা তবু ভরল না। আদরের বোন পুকুরের মাঝখানে থেকে মিষ্টি সুরে গেয়ে উঠল,

ভাই!
জল বাড়ছে জল বাড়ছে জল বাড়ছে,
ডুবছে ডুবছে জলে হাঁটু ডুবছে।
ভাই!
তবু রইল খালি রইল খালি হাতের লোটা
জলেব তলে ডুবছে না তো হাতের লোটা?

জল বাড়ছে। টল্‌টলে জল বাড়ছে। জল আদরের বোনের কোমর ডুবিয়ে দিল। লোটা তবু ভরল না। আদরের বোন পুকুরের মাঝখান থেকে মিষ্টি সুরে গেয়ে উঠল,

ভাই!
জল বাড়ছে জল বাড়ছে জল বাড়ছে,
ডুবছে ডুবছে জলে কোমর ডুবছে।
ভাই!
তবু রইল খালি রইল খালি হাতের লোটা,
জলের তলে ডুবছে না তো হাতের লোটা?

জল বাড়ছে। আরও টল্‌টলে জল। আদরের বোনের গলা ডুবিয়ে দিল। লোটা তবু ভরল না। আদরের বোন পুকুরের মাঝখান থেকে মিষ্টি সুরে গেয়ে উঠল,

ভাই।
জল বাড়ছে জল বাড়ছে জল বাড়ছে,
ডুবছে ডুবছে জলে গলা ডুবছে।
ভাই!
তবু রইল খালি রইল খালি হাতের লোটা,
জলের তলে ডুবছে না তো হাতের লোটা?

শেষকালে জল আরও বেড়ে চলল। টল্‌টলে জল অল্প অল্প ঢেউ তুলে আদরের বোনের চোখ-কপাল-চুল ডুবিয়ে দিল। জল মাথার ওপর দিয়ে বয়ে গেল। আর তখনি নতুন মাটির লোটা টল্‌টলে জলে পূর্ণ হয়ে উঠল। বোন এখন জলের তলায়। হাওয়ার দোলায় জল ছোট ছোট ঢেউ তুলে পুকুরময় ছড়িয়ে পড়ছে। শুকনো পুকুরে টল্‌টলে জল,—আদরের বোন জলের তলায়। বোন ডুবে গেল। জলের তলায় আদরের বোন হারিয়ে গেল।

এখন হয়েছে কি, এই দুঃখী বোনের আগেই বিয়ে ঠিক হয়ে গিয়েছিল। বিয়ের শুভদিনও ঠিক হয়ে গেল। আর সেই দিনের বেশি দেরি ছিল না। সেই দিন এসে গেল। সেদিন সকালে বিয়ের ঘটক এসে মেয়ের ভাইদের জানাল,— বর আসছে, একটু পরেই রওনা দেবে। বিয়ের সব ব্যবস্থা যেন ঠিকঠাক থাকে। ভাইদের মাথায় বর্ষাদিনের বাজ আছড়ে পড়ল।

বর এল। সঙ্গে অনেক বরযাত্রী। বর এল সুন্দর সাজানো পালকিতে। তারা গাঁয়ের বাইরে এসে থামল। খবর পেয়েই সাত ভাই সেখানে গেল। বরকে বরণ করল। তারপরে শুরু হল খাওয়া-দাওয়া, নাচ-গান। আনন্দ, আনন্দ,—মাদলের মিষ্টি সুরে গান আর নাচ।

অনেকক্ষণ এভাবে কেটে গেল। তবু কেন কনে আসছে না? এতক্ষণ তো আসা উচিত ছিল। সাত ভাইও তো তেমন কিছু বলছে না। বরযাত্রীরা কনের কথা জানতে চাইল। আর কতক্ষণ অপেক্ষা করা যায়। এবার কনে আসুক। ভাইরা নানা অজুহাত দেখাতে লাগল। এই তো আসবে। আসলে বোন তার বন্ধুদের সঙ্গে একটু দূরের বনে গিয়েছে, শুকনো কাঠ কুড়োতে। তাই একটু দেরি হচ্ছে। আসলে বোন গিয়েছে কিছু দূরের নদীতে, জল আনতে গিয়েছে। তাই একটু দেরি হচ্ছে। আর কিছুক্ষণ চলুক গান আর নাচ।

আরও অনেক সময় কেটে গেল। কনে তবু এল না। বর ক্লান্ত হয়ে পড়েছে, বরযাত্রীদের বড় একঘেয়ে লাগছে। বিয়ের আনন্দে কনে না থাকলে কি ভালো লাগে? এবার তারা ভীষণ রেগে গেল। সাত ভাইকে যা-তা বলতে লাগল। বিয়ে করতে এসে এমন ব্যবহার কেউ করে? দরকার নেই বিয়ের। তারা এ বিয়ে মানে না। তারা বিরক্ত হয়ে রেগে গিয়ে বাড়ির পথে রওনা দিল। সাত ভাই জলভরা চোখে তাদের যাওয়ার পথের দিকে তাকিয়ে রইল। অন্যেরা জানবে কি করে, তাদের বুকের মধ্যে কত ব্যথা! হায়! আজ তাদের আদরের বোন তাদের কাছে নেই। দুঃখী বোন হারিয়ে গিয়েছে, তাদের দোষেই হারিয়ে গিয়েছে।

বরের পালকি আর বরযাত্রীর দল মাঠের পথ বেয়ে চলে যাচ্ছে। সেই পুকুরের পাশ দিয়ে তারা যাচ্ছে, যে পুকুরে আদরের বোন জলের তলায় হারিয়ে গিয়েছে।

হঠাৎ তারা দেখল, পুকুরের মাঝখানে একটা সুন্দর ফুলের গাছ। আর সেখানে একটিমাত্র ফুল ফুটে রয়েছে।—এমন সুন্দর ফুল তারা জীবনে দেখেনি। রঙের কি বাহার।

বর পালকি থেকে সে ফুল দেখতে পেল। পালকির পাশে চলছিল একজন। সে মাদল বাজাচ্ছিল। বর তাকে বলল, 'ওই সুন্দর ফুল আমার চাই।'

সে নেমে গেল পুকুরে। বুক জলে এসে হাত বাড়াল ফুলের দিকে। ফুল নড়ে উঠল, ওপাশে সরে গেল। ফুল চলে গেল নাগালের বাইরে। হঠাৎ ফুল গান গেয়ে উঠল,

ফুল দেব ফুল নাও, বন্ধু,
ভেঙো না ভেঙো না ডাল, বন্ধু।

মাদল-বাদক চমকে উঠল। ফুল কথা কইছে? ফুল সরে যাচ্ছে? জল থেকে উঠে এল তক্ষুনি। বরকে এসে বলল,— ফুল যে গান গাইছিল। ধরতে গেলে সরে যাচ্ছে। বর অবাক হল। তাহলে সে একবার চেষ্টা করুক। দেখাই যাক না, কি হয়!

পুকুরের পাড়ে এল বর। তাকিয়ে রইল ফুলের দিকে। জলের ধারে নামতে যাবে,—এমন সময় দুলতে দুলতে জল কেটে ফুলের গাছ এগিয়ে আসতে লাগল বরের দিকে। ছোট্ট ছোট্ট ঢেউয়ের মাঝখান দিয়ে সুন্দর ফুল মাথা নেড়ে দুষ্টু মেয়ের মতো এগিয়ে আসছে। তার সামনে এসে থেমে গেল ফুলের গাছ। জলের তলায় হাত ডুবিয়ে মাটি থেকে শেকড় সমতে ফুলের গাছ তুলে আনল বর। ফুল সমেত গাছ নিয়ে পালকির ভেতরে গিয়ে বসল। আজকের দিনে মনে যে ক্লান্তি এসেছিল, বিয়ে করতে এসে যেভাবে বিরক্ত হয়েছিল,—এখন সে সবকিছু ভুলে গেল।

বর চলেছে পালকিতে, পাশে পাশে বরযাত্রীর দল। সবাই ক্লান্ত। যারা পালকি বইছিল, হঠাৎ তারা অবাক হল। এ কি! পালকি হঠাৎ এত ভারী হয়ে উঠল কেন? তারা ক্লান্ত বলে কি? কিন্তু না। পালকি আগের চেয়ে অনেক ভারী। একজন পাশে এসে দরজার ফাঁক দিয়ে ভেতরে চেয়ে দেখল। বরের পাশে ফুটফুটে বউ বসে রয়েছে। ঝলমলে পোশাক দেহে, কানে-হাতে-গলায় ঝকঝকে গয়না। মাথায় ফুলের বাহার। হলুদ রঙের শাড়িতে কি সুন্দর মানিয়েছে বউকে। ফুল হল কনে, বরের বউ। হবেই বা না কেন? ওই সুন্দর হলুদ রঙের ফুলই তো সাত ভাইয়ের আদরের বোন, দুঃখী বোন। সেই বোন যে জলের তলায় হারিয়ে গিয়েছিল।

বিকেল গড়িয়ে গিয়েছে। আলো-আঁধারিতে বেজে উঠল মাদল। বনে বনে অনেক পাখির কিচির-মিচির গান। পাগুলো নেচে উঠল নাচের ছন্দে। গলায় বিয়ের গান। আনন্দে তারা গাঁয়ের দিকে চলল বর আর নতুন বউকে নিয়ে। আনন্দ, আনন্দ—চারিদিকে আনন্দ। সুখের সংসার।

সাত ভাই গাঁয়ে থাকে। তারা এসব কিছুই জানে না। এমনি করে দিন যায়। সাত ভাইয়ের জীবনে দুঃখ নেমে এল। চরম দুঃখ। জমি গেল, ফসল ঘরে আসে না। পেট চলে না, অনাহার। তাই তারা বনে কাঠ কুড়োতে লাগল। সেই কাঠ মাথায় করে গাঁয়ে গাঁয়ে বিক্রি করে। তারা বনে বনে শালপাতা কুড়োতে লাগল। কাঠিতে গেঁথে গেঁথে শালের পাতার থালা তৈরি করে। মাথায় করে গাঁয়ে গাঁয়ে বিক্রি করে। গাঁয়ের মধ্যে তাদের মতো গরিব আর কেউ ছিল না। হায়! সাত ভাই।

এমনি করে কষ্টে দিন চলে। চড়া রোদ্দুরে অনেক দূরের দূরের গাঁয়ে তাদের যেতে হয়। যতক্ষণ বিক্রি না হয়, ততক্ষণ ঘোরে। বিক্রি হলেই পেটের খাবার জোটে, নইলে নয়।

ঘুরতে ঘুরতে সাত ভাই একদিন এসেছে এক নতুন গাঁয়ে। গাঁয়ের পথে হেঁকে চলেছে শুকনো কাঠ, শালপাতার থালা। গাঁয়ের পথে একজন তাদের একটা বাড়িতে যেতে বলল। সে বাড়িতে কদিন পরেই একটা বিয়ের উৎসব হবে। তাই চাই অনেক কাঠ, অনেক শালপাতার থালা। বাড়ির পথ দেখিয়ে দিল সে। তারা চলল সেই বাড়ির পথে। হ্যাঁ, ঠিকই। সে বাড়িতে এসব দরকার।

মাথার বোঝা নামিয়ে তারা বসেছে। দরদাম, গোনাগাঁথা চলছে। হঠাৎ দাওয়ার ওপরে একটি বউ এল। বউ সাতভাইকে দেখে চম্‌কে উঠল, বুক ঠেলে কান্না এল। তার ভাইদের এ কি অবস্থা। দেহে ছেঁড়াখোঁড়া কাপড়, তাও এক চিলতে। কোনরকমে কোমরে জড়ানো। দেহ রোদে পুড়ে পুড়ে উনুনের ঝিঁকের মতো কালো হয়েছে। তাতে খড়ি উঠছে, ফেটে ফেটে গিয়েছে চামড়া, ঠিক যেন কুমিরের দেহের মতো। ভাইদের এমন দশা কেমন করে হল?

বোন উঠোনের পাশে গাছতলায় নামল। আরও কয়েকজন মেয়ে এল তার পাশে। তারা দূর থেকে কাঠ-পাতা কেনা দেখছে। বউ কাঁদতে লাগল, চেপে চেপে কাঁদছে। চোখ বেয়ে গাল বেয়ে জল পড়ছে। বন্ধুরা অবাক হল। বউ কাঁদছে কেন? কি হয়েছে?

বউ বলল, 'কিছুই হয়নি তো। ওই ঘরের চাল থেকে একটুকরো খড় চোখে পড়েছে তাই।'

বন্ধুরা ঘরের চাল থেকে বেরিয়ে আসা খড়ের ডগা ভেঙে দিল। তবু বউ কাঁদছে, চেপে চেপে কাঁদছে। আবার কি হল? আবার কেন চোখে জল?

বউ বলল, 'ও কিছু নয়। একটা পাথর রয়েছে মাটিতে, দেখিনি তো। পায়ে লেগেছে আঘাত। তাই।'

বন্ধুরা মাটি থেকে পাথরটা টেনে তুলল। ফেলে দিল দূরে। তবু বউ কাঁদছে, এবার ঝর্‌ঝর করে কাঁদছে। চোখের জলে বুক ভেসে যাচ্ছে। আবার কি হল? আবার কান্না কেন?

এবার বউ আর মিথ্যে কথা বলতে পারল না। সে কাঁদতে কাঁদতে বলল, 'কেন কাঁদছি? না কেঁদে থাকি কেমন করে? ওই যারা শুকনো কাঠ বিক্রি করছে, ওই যারা শালপাতা বিক্রি করছে,—ওরা কারা জানো? ওই ছেঁড়াখোঁড়া লেংটি-পরা লোকগুলো কে জানো? ওরা আমার আপন ভাই। আমি ওদের আদরের বোন। কেন এমন দশা হল?' আর বলতে পারলনা বউ, কাঁদতে কাঁদতে বসে পড়ল মাটিতে।

খবর শুনল বউয়ের শ্বশুর-শাশুড়ি। সে কি কথা? ওরা সবাই বউমার ভাই? ওরা যে ঘরের অতিথি, আদরের অতিথি! বউকে কাঁদতে নিষেধ করল, তাদের বাড়িতে যখন একবার এসেছে তখন কোন ভাবনা নেই। বউ শান্ত হল। বড় ভালো শ্বশুর-শাশুড়ি।

সাত ভাইকে তখুনি তারা অনেকটা তেল দিল। কাছের নদীতে গিয়ে গায়ে ভালোভাবে তেল মেখে স্নান করে আসুক। এদিকে খাওয়ার তৈরি হয়েই আছে।

সেই সাত সকাল থেকে মাথায় বোঝা নিয়ে সাত ভাই গাঁ থেকে গাঁয়ে ঘুরছে। এখন দুপুর। প্রচণ্ড খিদে। পেট ভেতরে ঢুকে গিয়েছে। চোখে অন্ধকার, মাথা ঘুরছে। খিদের সময় কি কাণ্ডজ্ঞান থাকে? নদীর পথে যেতে যেতে তারা গায়ে তেল মাখার তেল খেয়ে ফেলল। গায়ের নোংরা ওঠাবার জন্য শ্বশুর-শাশুড়ি তেলের সঙ্গো খৈল দিয়েছিল। তাও তারা খেয়ে ফেলল।

ফিরে এল বোনের বাড়ি। দেহের চামড়া তেমনি খসখসে খড়িওঠা রয়েছে। সব বুঝল তারা। আবার দিল তেল আর খৈল। কিন্তু এবার সঙ্গো দিল বাড়ির একজনকে। তার সঙ্গো তারা চলল নদীর পথে। ভালোভাবে তেল মেখে, জলে নেমে খৈল দিয়ে দেহ পরিষ্কার করে সাত ভাই স্নান করল। উঠে এল ওপরে। বাড়িতে এলে তাদের নতুন কাপড় দেওয়া হল। নতুন কাপড় পরে তারা বসল। এতক্ষণে সাত ভাইকে মানুষের মতো মনে হচ্ছে। কি যে অবস্থা হয়েছিল তাদের! তাদের দিকে তাকিয়ে বোন একটু শান্তি পেল।

এবার ঘরে আসন পাতা হল। আমাদের সমাজের নিয়ম মতো বয়স অনুযায়ী সাত ভাই বসল। প্রথমে বড় ভাই, তারপর পরপর বযস বুঝে অন্য ভাইরা বসল, একেবারে শেষে ছোট ভাই। সবার সামনে শালপাতার থালা। থালায় ধোঁয়া-ওঠা গরম ভাত আর গরম সুস্বাদু শুয়োরের মাংস। এমন পরিপাটি করে কেউ তাদের অনেক কাল খেতে দেয়নি। তারা খেতে শুরু করল। সামনে বসে রয়েছে তাদের আদরের ছোট বোন। তারা খাচ্ছে।

বোন আস্তে আস্তে বলল, 'ভাইরা, কতদিন পরে তোমাদের সঙ্গো দেখা হল। আজ খাবার জন্য তোমরা আমার বাড়িতে এলে। তোমাদের কি দশাই হয়েছে। আমারই বাড়িতে বসে তোমরা কত সুখে খাচ্ছ, নতুন কাপড় পরে খাচ্ছ। আর এই তোমরাই আমাকে পুকুরে উৎসর্গ করে দিলে। পারলে কি করে?' বোনের দুচোখ বেয়ে জল পড়ছে।

সাত ভাই লজ্জায় মুখ নিচু করল। এ তারা কি করেছিল? সত্যি, আজ ভাবতে

অবাক লাগে, এ কাজ তারা করল কীভাবে? তাদেরই তো আদরের ছোট বোন! হায়! এ তারা কি করেছিল? লজ্জায় তারা মরে যাচ্ছে। সামনে বোন কাঁদছে।

সাত ভাই আকাশের দিকে চাইল। সেখানে পালাবার পথ নেই, আকাশের পথে মুক্তির পথ নেই। তারা চোখ নামাল। মাটির দিকে চাইল, পৃথিবীতে পালাবার পথ খুঁজল। হঠাৎ সামনের মাটি দুফাঁক হয়ে ফেটে গেল, পৃথিবী দ্বিধা হল। তারা গভীর খাদের মধ্যে ঢুকতে চাইল। লজ্জা থেকে বাঁচতে চাইল। ঢুকে পড়ল গভীর পৃথিবীর মধ্যে। একে একে। হারিয়ে যাচ্ছে একের পর এক ভাই। বোনের চোখের সামনে মাটির গভীরে ভাইরা হারিয়ে যাচ্ছে, অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। বোন পাগলের মতো হয়ে গেল। এ কথা সে কেন বলল ভাইদের? মনে বড় দুঃখ হয়েছিল তাই। কিন্তু ভাইরা এ কি করল? বোন একথা কেন বলল? হায়! হায়! হায়!

ছোট ভাই ছিল বোনের সবচেয়ে কাছে। সে যখন ঢুকে চলেছে গভীর ফাঁকের মধ্যে, বোন আর সহ্য করতে পারল না। বুক ফেটে যাচ্ছে। মরিয়া হয়ে ছোট ভাইকে ধরতে গেল, সে ঢুকে পড়েছে, বোন হাত দিয়ে চেপে ধরল ভাইয়ের চুলগুলো। চিৎকার করে কেঁদে উঠল, 'ভাই, ফিরে আয়, ভাই আমার।' প্রচণ্ড গতিতে ছোট ভাইও হারিয়ে গেল। বোনের হাতের মুঠোয় রইল ভাইয়ের কয়েকটি চুল।

চোখের সামনে চুলগুলো ধরে হাউ হাউ করে কেঁদে উঠল আদরের বোন, ঘরের বউ। এ কথা সে কেন বলল? এ কাজ কেন করল? হায়!

কান্না থামিয়ে বোন উঠল। তাদের সুন্দর সাজানো বাগানের এক পাশে গেল। ছোট ভাইয়ের স্মৃতি, হাতের মুঠোয় ধরা চুলগুলো যত্ন করে চোখের জলে ভিজিয়ে পুঁতে দিল মাটিতে। নরম হাে   ত চাপা দিয়ে ঝুরঝুরে মাটি। ভাইয়ের স্মৃতি থাক ওইখানে, ওই বাগানে।

একদিন সেই মাটি-চাপা স্মৃতির চুলগুলো থেকে সুন্দর ঘাস গজিয়ে উঠল। মানুষের চুল থেকে ঘাস। ভাইয়ের চুল থেকে ঘাস। বোনের হাতে-বোনা ঘাস। আজকের সাবাই ঘাসই হল সেই ঘাস। এমনি করেই সাবাই ঘাস জন্মাল। সবাই বলে, এই হল সাবাই ঘাসের জন্মকথা।

অনেক সয়েছে সে

এখন আমরা যেমন দেখতে পাই, সেই অনেক কাল আগে কিন্তু অন্যরকম ছিল। তখন পাহাড়ের ওই উঁচুতে থাকত যত রাজ্যের শেয়াল আর পাহাড়ের একেবারে নীচের দিকে থাকত যত রাজ্যের বাঘ। শেয়ালরা পাহাড় থেকে নামত না, বাঘরা পাহাড়ে উঠত না।

একদিন, কেন জানি না, তাদের মধ্যে ঠিক হল, তারা নিজেদের এলাকা বদলাবে। একের এলাকায় চলে যাবে অন্যে। শেয়াল আসবে পাহাড়ের নীচের বনভূমিতে, আর বাঘ যাবে পাহাড়ের ওই উঁচু বনভূমিতে। সব ঠিক হয়ে গেল। রাতও ঠিক হয়ে গেল।

দল বেঁধে বাঘেরা চলেছে পাহাড়ের চুড়োর দিকে, দল বেঁধে শেয়ালেরা নামছে পাহাড়ের চুড়ো থেকে। বাঘেরা উঠছে যে পথে, শেয়ালেরা নামছে সেই পথেই। ওপর থেকে নীচে ভালোভাবে সব কিছু দেখা যায়। বেশ দূর পথ থেকেই শেয়ালরা দেখতে পেল, সারি সারি বাঘের পাল উঠে আসছে। এত বাঘ ? তারা ভীষণ ভয় পেয়ে গেল। ওরা যদি তাদের আক্রমণ করে ? এক এক থাবায় তো অনেক শেয়াল মরে যাবে। তাদের মেরে বাঘেরা যদি খেয়ে ফেলে ? সবারই চার পা কাঁপতে লাগল। একই পথে উঠে আসছে অনেক বাঘ।

কিন্তু তারা শেয়াল। এত সহজে দমবার পাত্র তারা নয়। দারুণ তাদের উপস্থিত বুদ্ধি। জোয়ানমতো একটা শেয়াল এদিক-ওদিক চাইতে লাগল। হঠাৎ তার চোখের কোণে ঝিলিক খেলে গেল। পাশেই রয়েছে একটা বিরাট লম্বা গাছ। আর তার তলায় মরে পড়ে রয়েছে একটা বিরাট হাতি। যেন পাহাড়ের একটা মস্ত কালো পাথর। জোয়ান শেয়াল সময় নষ্ট না করে দৌড়ে গেল হাতির কাছে। লাফিয়ে উঠে পড়ল শোয়ানো হাতির পেটের ওপর। অন্য শেয়ালদের কাছে ডাকল, হাতির চারপাশে ঘিরে দাঁড়াতে বলল। বন্ধুর কথায় বন্ধুরা তাই করল।

চুপ করে রয়েছে জোয়ান শেয়াল। চুপ করে রয়েছে চারপাশের অনেক শেয়াল। বাঘেরা সারি বেঁধে ওপরে উঠছে। আরও ওপরে। তাদের প্রায় কাছাকাছি।

হঠাৎ হাতির ওপরে দাঁড়িয়ে-থাকা জোয়ান শেয়াল পেছনের দুপায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে সামনের দুপা নেড়ে নেড়ে বলতে লাগল, 'এই হাতি আমিই মেরেছি। খুব সহজে মেরেছি।' বাঘেরা তখন একেবারে কাছে চলে এসেছে। শেয়াল চিৎকার করে বলল, 'হাতি তো মারলাম। এখন, নিয়ে এস আমার পাথরের অস্ত্র। প্রথম যে বাঘ আসবে তার মাথার খুলি একেবারে গুঁড়িয়ে দেব। আমি তৈরি।'

বাঘের পাল শুনতে পেল শেয়ালের কথা। দেখতে পেল, মস্ত হাতির ওপরে শেয়াল দাঁড়িয়ে রয়েছে। আর ওই বিশাল হাতি ওই শেয়ালই মেরেছে। আশ্চর্য ! বাঘেরা বেশ ভয় পেয়ে গেল। বাঘেদের জটলা বেধে গেল। পেছনের বাঘ সামনের বাঘকে ঠেলে, সামনের বাঘ পেছনে ঢুকতে চায়। ঠেলাঠেলি শুরু হয়ে গেল। ধাক্কাধাক্কি শুরু হল। কেউ আগে যেতে

চায় না, কেউ সামনের সারিতে থাকতে চায় না। ঠেলাঠেলি ধাক্কাধাক্কি থেকে ঝগড়া শুরু হয়ে গেল। পেছন থেকে যারা ঠেলছে তারা কথা বলছে কম, কিন্তু একেবারে সামনে রয়েছে যারা ভীষণ চিৎকার করতে লাগল। প্রচণ্ড গর্জন। পাহাড়ে ধাক্কা খেয়ে সে আওয়াজ শতগুণ হচ্ছে। বাঘেরা সেই একই জায়গায় রয়েছে।

এবার হাতির ওপরে দাঁড়িয়ে-থাকা শেয়াল হাসতে হাসতে বলল, 'ও আমার বাঘ ভাই, তোমরা আমাদের ভয় পেয়ো না, আমাদের দেখে ভয় পাওয়ার কি আছে? আমরা সবাই ভাই ভাই, আমরা সবাই বন্ধু। তাই না? আর তা যদি না হয়, তবে এখন থেকে বন্ধু হতে দোষ কি?'

শেয়ালের কথায় বাঘেরা একটু শান্ত হল। তবু পুরো বিশ্বাস করতে পারছে না। হাতির ওপরে দাঁড়িয়ে-থাকা শেয়ালের ভাবভঙ্গি দেখে তারা ভ্যাবাচাকা খেয়ে গিয়েছে।

শেয়াল আবার শুরু করল, 'ভয় পাওয়ার কিছু নেই। আমাদের দুই আদিবাসী গোষ্ঠীর মধ্যে আদান-প্রদান ভাব-ভালোবাসা শুরু হোক। তোমাদের মধ্যে বিবাহযোগ্যা অনেক মেয়ে আছে। তাদের সঙ্গে আমাদের ছেলেদের বিয়ে-থাওয়া হোক। প্রথমে একজনকে দিয়েই না-হয় শুরু হোক। আমিই প্রথম বিয়ের চলন শুরু করি। কি রাজি তো?'

বাঘেরা বুঝল, এ প্রস্তাবে রাজি না হলে সর্বনাশ, যাক, অল্পের ওপর দিয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে তারা রাজি হল। প্রাণ তো কারও গেল না। সেই ভালো।

সেই মুহূর্তে এক বাঘিনীর সঙ্গে সেই শেয়ালের বিয়ে হয়ে গেল। দুই গোষ্ঠীর মধ্যে আত্মীয়তা গড়ে উঠল। তারা বন্ধু হল। বাঘের দল পাহাড়ের ওপরের জঙ্গালে চলে এল, শেয়ালের দল নেমে এল পাহাড়ের নীচের জঙ্গালে। শেয়াল নতুন বউকে নিয়ে এক পাহাড়ি গুহায় সংসার পাতল।

একদিন শেয়াল আর বাঘিনীর খুব খিদে পেয়েছে। ঘরে কিছুই নেই। বাঘিনী বলল, 'শিকার করা দরকার। চলো, শিকারে যাই।' শেয়াল চুপ করে রইল, আপত্তি করল না। দুজনে চলল শিকারে।

কোথায় বাঘিনী আর কোথায় ক্ষুদে শেয়াল! বনের পথে এক জায়গায় গিয়ে বাঘিনী বলল, 'তুমি এই সরু পথের মোড়ে দাঁড়িয়ে থাক। আমি ওধার থেকে পশুদের তাড়িয়ে আনছি। এই পথ দিয়ে যাওয়ার সময় তুমি ঝাঁপিয়ে পড়বে ওদের ওপরে।' শেয়াল রাজি হল।

একটু পরেই শেয়াল দেখতে পেল, ঘন জঙ্গালের পথ দিয়ে কয়েকটা বড় হরিণ ও পথেই প্রাণভয়ে ছুটে আসছে। এত বড় বড় হরিণ? কি লম্বা ছুঁচলো শিং? বুক কাঁপতে লাগল। শেয়ালের সাহসই হল না, ভয় পেয়ে গেল। কেমন করে সে ঝাঁপিয়ে পড়বে? যদি তার পেট ফেঁসে যায় কিংবা চোখে ঢুকে যায় ছুঁচলো শিং? সে দাঁড়িয়ে রইল। হরিণগুলো বনের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল।

বাঘিনী আসছে আনন্দে। লম্বা জিভে মুখ চাটছে। এল বাঘিনী। অবাক হল সে। একটা হরিণও মরে পড়ে নেই। শেয়াল একা দাঁড়িয়ে আছে। কেন? কি হল? শিকার কই?

শেয়াল ভীষণ রেগে গিয়েছে। রাগে সে কাঁপছে। বাঘিনীর কানের ওপরে প্রচণ্ড এক থাবার চড় মেরে শেয়াল বলল, 'আর কোনদিন যেন এরকম করতে না দেখি। ছিঃ ছিঃ। জন্তুদের ভয় পাইয়ে শিকার করা? এ শিকার কি আমায় সাজে? বেচারা হরিণগুলো! শিকার করতে হবে বীরের মতো। মনে থাকবে তো?'

কি আর করে বাঘিনী! হাজার হলেও সে স্বামী। বউ হয়ে তার কথার জবাব দেবে কেমন করে? সে খুব ভালো বউ। চড় খেয়েও টুঁ শব্দটি করল না। স্বামীকে মেনে চলাই যে বউয়ের ধর্ম। বাঘিনী সব সহ্য করল।

তখন তারা গেল একটু দূরে। সেখানে আনমনা হয়ে অনেক হরিণ ঘাস, গাছের পাতা খাচ্ছে। অনেক অনেক হরিণ। শেয়াল ঝোপে লুকিয়ে রইল। পাশে এসেছে নেহাৎ একটা ছোট্ট বাচ্চা হরিণ। তার গলায় দাঁত বসিয়ে দিল শেয়াল। সে বোধহয় তেমন পালাতে শেখেনি। বাঘিনী দেখল। এতটুকু বাচ্চা হরিণ? এতে কি খিদে মিটবে? এ কি? এত বড় বড় হরিণ ছিল। এখন তো তারা পালিয়েছে। কেন? কি হল? বড় শিকার কেন সে মারল না?

শেয়াল রেগে গিয়ে বাঘিনীকে আর এক কানের গোড়ায় থাবার চড় বসাল। হাজার হলেও স্বামী তো! বাঘিনী এ অপমান সহ্য করল। সে বড় ভালো বউ।

তৃতীয় বার। তারা দুজনে গিয়েছে শিকার করতে। বনের মধ্যে এক ফাঁকা জায়গায় অনেক বুনো মোষ ঘাস খাচ্ছে। বাঘিনীর জিভে জল এল। সে স্বামীকে বলল, এবার তাহলে বুনো মোষ শিকার করুক শেয়াল। শেয়ালের বুকের মধ্যে বর্ষাকালের আকাশের মতো আওয়াজ হতে লাগল। কি বিশাল কালো দেহ, কি ভয়াবহ চোখের চাহনি, কি মারাত্মক মাথার ওপরের দুটো শিং, কি বড় পায়ের খুর। শেয়াল এদিক-ওদিক চাইল। দেরি হয়ে যাচ্ছে। বাঘিনী অশান্ত হয়ে উঠল। কি হল কে জানে! হাজার হলেও বাঘিনী তো! দেহটা লম্বা করে গলাটা বাড়িয়ে বিদ্যুতের বেগে ছুটে গেল বাঘিনী। মোষের পাল পালাচ্ছে, বুনো মোষের পাল। এক লাফে একটার পিঠে উঠল বাঘিনী। অল্প দূরে গিয়েই মোষটা হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল। পিঠের ওপরে বাঘিনী। মোষের গলা লম্বা হয়ে গেল, ছট্‌ফট্ করছে সে, মাটিতে রক্ত বয়ে যাচ্ছে। বাঘিনী ফিরে তাকাল স্বামীর দিকে, দূরে দাঁড়িয়ে রয়েছে শেয়াল।

এবার শেয়াল ছুটে এল বাঘিনীর কাছে। চোখে আগুন, পোড়ানো কাঠ-কয়লার মতো লাল। শেয়াল ছুটে এসেই বাঘিনীর পেছনে মারল এক লাথি। রক্ত উঠে এল বাঘিনীর মাথায়। কিন্তু হাজার হলেও সে স্বামী। মাথা নিচু করে বাঘিনী শান্ত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। চেয়ে রইল শেয়ালের দিকে।

শেয়াল মরা বুনো মোষের দিকে চোখ ফিরিয়ে বসল, 'এটা কি ধরনের শিকার করা? এক আঘাতে কখনও শিকারকে মেরে ফেলতে হয়? লাফিয়ে পড়লাম পিঠে, দাঁত বসালাম গলার নীচে,—ব্যাস শিকার শেষ। শিকারকে খেলাতে হবে। সে এগিয়ে যাবে, ছোট্ট করে দাঁত বসাবে। শিকার দূরে দাঁড়াবে, ভয় পাবে, একটু তেড়ে আসবে। আবার পালাবে। আবার ছোট্ট করে আঘাত। খেলাতে খেলাতে তাকে ক্লান্ত করে তুলতে হবে। এই তো বীরের মতো শিকার। আমি তাই ভাবছি,—আর তুমি ছুটে গেলে? স্বামীকে অমান্য? খবরদার! আর যেন না দেখি।'

বাঘিনী বড় ভালো বউ। সে নিজের ভুল বুঝল। আর হবে না কখনও। শেয়ালের রাগ পড়ল।

আর একবার তারা দুজনে গিয়েছে একটা পাহাড়ি নদীর পাশে। নদীটা পার হতে হবে। বাঘিনী ঝাঁপিয়ে পড়ল নদীতে। দেহ জলের তলায়, মাথাটা জলের ওপরে। সহজেই পার

হয়ে গেল সে। শেয়াল জলে নামল না। কি স্রোত ! সে ভয় পেল। বাঘিনী তখন পারে উঠে পড়েছে। ওপাশ থেকে চিৎকার করে শেয়াল বউকে ডাকল। বাঘিনী এ পারে আসুক, তারপরে স্বামীকে নিয়ে নদীর ওপারে যাক। বাঘিনী তক্ষুনি জলে নেমে পড়ল। পাহাড়ি নদীতে স্রোত ঠেলে এপারে উঠল। পারে দাঁড়িয়ে রয়েছে শেয়াল। পারে উঠে আসামাত্র শেয়াল বাঘিনীকে একটা লাথি মেরে বলল, 'আমি তখনও তোমাকে অনুমতি দিই নি, আমার অনুমতি ছাড়াই তুমি নেমে পড়লে ? এতবড় স্পর্ধা ? স্বামীকে অমান্য করা ? আর যেন কখনও না দেখি।'

হাজার হলেও বাঘিনীর স্বামী ! সে তো বড় ভালো বউ। লাথি খেয়েও চুপ করে গেল। অন্যায় হয়ে গিয়েছে। আর হবে না। শেয়াল খুশি হল। এরকম বউ না হলে কি সংসার চলে ?

আর একবার। আর একটা পাহাড়ি নদী পেরোতে হবে। বাঘিনী আর শেয়াল পারে দাঁড়িয়ে রয়েছে। জলে নামল শেয়াল। জলে নামল বাঘিনী। জলের ওপর মাথা তুলে বাঘিনী সোজা সাঁতার দিয়ে চলেছে। স্রোতের মধ্যে চলেছে বাঘিনী, সে অনায়াসে এগিয়ে যাচ্ছে।

শেয়াল জলে নেমেই বুঝল মস্ত ভুল করেছে। একে পাহাড়ি নদী, তার ওপরে কিছুক্ষণ আগে প্রচণ্ড বৃষ্টি হয়েছে। জলের গতি প্রচণ্ড। শেয়াল যত দেহকে সোজা রাখতে চাইল, স্রোত তত বেঁকিয়ে দিচ্ছে দেহকে। একটু পরেই শেয়াল বুঝল সোজাসুজি নদী পার হওয়া তার পক্ষে অসম্ভব। সে কি ডুবে মরবে ? দু-একবার চেষ্টা করতে গিয়ে জল খেল, নাকে জল ঢুকল। কিন্তু সে তো হেরে যাওয়ার পাত্র নয়। সে দেহ এলিয়ে দিল। কোন চেষ্টা করল না। শেয়ালের দেহ স্রোতের টানে ভেসে চলল। গা ছেড়ে দিয়েছে শেয়াল। এমনি করেই যাওয়া যাক।

বাঘিনী সোজা পার হয়ে গিয়েছে, সোজা পার হয়ে গিয়েছে পাহাড়ি নদী। পারে এসে তাকিয়ে দেখে, নীচের দিকে ভেসে চলেছে তার স্বামী। নদীর তীর বেয়ে ছোট ছোট পাথরের ওপর দিয়ে নীচের দিকে হাঁটতে লাগল বাঘিনী। ওই দিকে চলেছে শেয়াল।

অনেক নীচে গিয়ে শেয়াল তীরে উঠল। হাঁপিয়ে গিয়েছে সে। শুয়ে পড়ে বিশ্রাম নিতে লাগল। বেশ কিছুক্ষণ পরে বাঘিনী এল শেয়ালের কাছে। তাকে দেখেই শেয়াল চিৎকার করে উঠল, তাকে প্রচণ্ড বকুনি দিতে লাগল। বাঘিনী তার বউ, তার পেছনে পেছনে সে আসবে, না একা একা পার হল ? এ কি বউয়ের মতো কাজ ? বড্ড বেড়ে গিয়েছে বউ। শেয়াল এগিয়ে গেল বাঘিনীর দিকে। কি হল কে জানে ! হাজার হলেও বাঘিনী তো ? একটা থাবা এসে পড়ল শেয়ালের মুখে। দূরে ছিটকে পড়ল শেয়াল। ঠিক যেন একটা পাথর। পাথরটা ওখানে পড়ল,—নড়ল না, এপাশ ওপাশ গড়াল না, পড়েই থেমে গেল। শেয়াল লম্বা হয়ে পড়ে রইল। নিথর, এক খণ্ড নরম তুলতুলে পাথর।

বাঘিনী শেয়ালের বউ। কিন্তু অনেক সয়েছে সে। হাজার হলেও বাঘিনী তো !

বড় ভালো বউ তারা দুজন

অনেক কাল আগে এক পাহাড়ি গাঁয়ে থাকত একটা লোক। তার ছিল একটি ছেলে। কিশোর বালক। তার নাম কারে। একদিন বাবা-ছেলে আগুনের পাশে বসে রয়েছে। গল্প-গুজব করছে। হঠাৎ ছেলে বলল, 'বাবা, আমাকে কিন্তু একটা তির-ধনুক দিতে হবে।'

বাবা কোনদিন তির-ধনুক দেখেনি, এরকম কোন জিনিসের নামও শোনে নি। বাবা জানেই না, তির-ধনুক আবার কিরকম দেখতে হয়। তাই বাবা কিছু বলতে পারল না। চুপ করে রইল। যে জিনিস সে কোনদিন দেখেনি, তা নিয়ে সে কথা বলবে কেমন করে?

ছেলে ঘ্যানঘ্যান করতে লাগল। তীর-ধনুক তার চাই-ই। বারবার একই কথা বলতে লাগল, একই জিনিস চাইতে লাগল। বাবা আর কি করবে? জানতে চাইল,—তির-ধনুক কেমন দেখতে হয়। ছেলে বলল। বুঝিয়ে দিল বাবাকে। শেষকালে বাবা ধনুকের মতো একটা জিনিস বানিয়ে দিল। চুল্লি থেকে এক টুকরো কাঠ তুলে নিল, আগুন নিভিয়ে ফেলল আর সেই কাঠ থেকে তৈরি করল একটা তির। ছেলে কারের আনন্দ দেখে কে! সেই তির-ধনুক নিয়ে সারাদিন সে খেলে বেড়াল।

রাত্তির হল। খেলা বন্ধ। ভোর হতেই আবার খেলা শুরু হল। হাতে তির-ধনুক। বাড়ির বাইরে খুব কাছাকাছি খেলছে কারে। পাশ দিয়ে বড় বড় পা ফেলে যাচ্ছিল একটা মুরগি। নিজেদের মুরগি। তির ছুটে গেল কারের ধনুক থেকে। উলটে পড়ল মুরগি। মরে গেল। পরের দিন খেলছে কারে, হাতে তির-ধনুক। শুয়োরের একটা বাচ্চা ছাইগাদায় খাবার খুঁজছে। নিজেদের শুয়োর। তির ছুটে গেল কারের ধনুক থেকে। ছট্‌ছট্‌ করল শুয়োরের বাচ্চা, চিৎকার করল, পা চারটে ছড়িয়ে পড়ল। মরে গেল শুয়োরের বাচ্চা।

বাবা ভীষণ চটে গেল। দু-দুটো প্রাণী মারা পড়ল ছেলের হাতে। অকারণে। বাবা রেগে গিয়ে বলল, 'তুমি যদি এভাবে নিত্যিনিত্যি ঘরের পোষা পশুপাখি মারতে থাকো তাহলে তো সর্বনাশ হয়ে যাবে। কয়েকদিনেই তো সব শেষ হয়ে যাবে। কিছুই বাকি থাকবে না। পশুশিকার যদি করতেই চাও, তবে বনে চলে যাও। সেখানে অনেক বুনো পশুপাখি আছে। ঘরের পশু আর মারবে না। বনে চলে যাও।'

ছেলে সঙ্গে সঙ্গে বলল, 'তাহলে আমাকে সত্যিকারের তির-ধনুক বানিয়ে দাও। বাঁশের তৈরি বাঁকানো ধনুক, বাঁশের তৈরি ছুঁচলো তির। আমি ঠিক বনে চলে যাব।'

কিন্তু তাদের এলাকায় ভালো বাঁশগাছ জন্মায় না। বাবা এখন কী করবে? এধারে বাঁশের ভালো তির-ধনুক না পেলেও তো ছেলে ছাড়বে না? আর মারা পড়বে ঘরের নিরীহ মুরগি আর শুয়োরের বাচ্চা। বাবা আর কি করে? রওনা দিল দূর পাহাড়ি বনে। সেখানে রয়েছে খুব সুন্দর বাঁশের ঝাড়। চলেছে পাহাড়ি পথে, বাবা চলেছে বাঁশ আনতে। শেষকালে বাবা পৌঁছল এক পাহাড়ি গাঁয়ে। চারিদিকে বন। আবিঙ-নিবো-র গাঁয়ে। সেই গাঁয়ের পাশে একটি সমাধি রয়েছে। উইয়ু তোতিক-বোত্তের-সমাধি। সেই সমাধির ওপরে সুন্দর সুন্দর বাঁশের গাছ। এত সুন্দর গাছ আর কোথাও নেই। সেখান থেকে সে কেটে

আনল একটা লম্বা লকলকে বাঁশ। তার থেকে তৈরি করল খুব শক্ত একটা ধনুক আর অনেক ছুঁচলো তির। ফিরে এল বাড়িতে। তুলে দিল ছেলের হাতে। কারে মহাখুশি। হ্যাঁ, এতদিন যা সে চেয়েছে এবার সত্যিসত্যি তাই হাতে পেল। একেই বলে তির আর ধনুক। প্রতিদিন সকাল হলেই কারে চলে যায় পাহাড়ি বনে। মনের সুখে বুনো জন্তু মারে, বুনো মুরগি মারে। মনে আনন্দ, হাতে সঠিক নিশানা। তাদের বাড়িতে অনেক মাংস, অভাব রইল না।

গাছের ডাল ডালে বাঁদররা কারের কাণ্ড-কারখানা দেখে। ভয় পায়। একদিন তারা বলাবলি করছে, 'এই ছেলে তো সাংঘাতিক। এ দেখছি একদিন আমাদেরও মারবে। মেরে শেষ করে দেবে। ওর তো আছে তির-ধনুক। আমাদের যা নেই। কি যে হবে?'

বাদুড় ওদের কথা শুনতে পেল। উড়ে এল বাঁদরদের কাছে। বলল, 'কোন ভয় নেই। আমি আছি। আমি ঠিক তির-ধনুক ছিনিয়ে আনব। তোমাদের দেব। তোমরাও তির-ধনুক পাবে।'

পরের দিন সকালে কারে বেরিয়েছে শিকারে। হাতে ভয়ানক তির-ধনুক। এক তিরের আঘাতে সে মেরে ফেলল একটা বুনো দাঁতাল শুয়োরকে। আশ্চর্য নিশানা তার। বেত গাছের দড়ি দিয়ে শুয়োরকে বাঁধল, পিঠে ফেলে রওনা দিল কারে। শুয়েরের মাথা নীচে ঝুলছে, দুলছে।

বাদুড় উড়ে এল কারের কাছে। বলল, 'কি শক্তিমান তুমি। আশ্চর্য তোমার গায়ের শক্তি। আমি জীবনে তোমার চেয়ে সাহসী আর শক্তিশালী মানুষ দেখিনি। সাবাস!'

কারে হাসল। তৃপ্তির হাসি।

বাদুড় আবার বলল, 'কিন্তু, তুমি ওই বেত গাছের দড়ি নাও কেন? ও কি তোমায় মানায়? আমি আরও ভালো দড়ির খবর জানি। ওই দেখো, ওই গাছ থেকে লম্বা লম্বা লতা ঝুলছে। ওগুলো আরও শক্ত। এই নাও একটা। শুয়োরটাকে আষ্টে-পৃষ্ঠে বেঁধে ফেলো। ঝুলিয়ে নাও পিঠে। বাড়ির দিকে হাঁটা দাও। মানাবে ভালো।' লতাটা কারের পায়ের কাছে ফেলে দিয়ে বাদুড় উড়ে ঘন গাছের ফাঁকে চলে গেল। নতুন কিছু জানার আনন্দে কারে খুশি হল।

দাঁতাল শুয়োরের দেহ থেকে খুলে ফেলল বেত গাছের শক্ত দড়ি । অনেক দিন থেকে সে এই দড়িই ব্যবহার কারে আসছে। শুয়োরের দেহে জড়াতে লাগল নতুন-পাওয়া লতার দড়ি। পিঠে ঝুলিয়ে নিল শুয়োরটাকে। মাথা নীচের দিকে, শুয়োর ঝুলছে, দুলছে।

পটাং করে ছিঁড়ে গেল লতা। পিঠ থেকে শুয়োরের একটা দাঁত এসে বিঁধে গেল কারের পায়ে। যন্ত্রণায় সে চিৎকার করে উঠল। গল্‌গল্‌ করে রক্ত পড়তে লাগল। কারের মুখ-চোখের চেহারা পালটে গেল। খুঁড়িয়ে চলল বাড়ির পথে। বাদুড় ছিল কাছেই। নেমে এল। কারের তির-ধনুক তুলে নিল। সেগুলো দিল বাঁদরদের। তারা মহাখুশি।

কারে যখন বাড়ি পৌঁছল তখন তার পা ভীষণ ফুলে গিয়েছে, যন্ত্রণায় সে ছট্‌ফট্‌ করছে। এসেই সে শুয়ে পড়ল। রক্ত-পড়া বন্ধ হয়েছে। কিন্তু দেহ পুড়ে যাচ্ছে, অসহ্য যন্ত্রণা। কয়েকদিন কেটে গেল। পা আরও ফুলছে। টোটকা ওষুধে কোন কাজ হল না। কারে মারা গেল।

কারের দুই বউ হাউ হাউ করে কেঁদে উঠল। এ তাদের কি হল? এই বয়সে স্বামী মারা গেল? আর তো কিছু করার নেই। যেখানে দাঁতাল শুয়োরটা পড়ে ছিল, যেখানে কারে আহত হয়েছিল,—কারের দেহকে সেখানে নিয়ে গিয়ে তাকে মাটির তলায় শুইয়ে

দিল দুই বউ। সব কাজ করল, কিন্তু সবসময় তারা কাঁদছে। কাঁদতে কাঁদতে বলল, 'তালেঙ উইয়ু এমন কাজ করল, সেই আমাদের স্বামীকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল।' তারা কাঁদছে।

দুই ভালো বউ তখন পাখি হয়ে গেল। পাখি হয়ে উড়ে চলল বনের ওপর দিয়ে। উড়তে উড়তে এল তালেঙ-এর গাঁয়ে। গাঁয়ে পৌঁছে দেখে, তাদের স্বামী কারে একজন উইয়ু হয়ে গিয়েছে। সে রয়েছে সেখানে।

গাঁয়ের ঠিক মাঝখানে ছিল একটা গাছ। দুই পাখি-বউ সেই গাছের ডালে বসল। কাঁদতে কাঁদতে কারেকে ডাকতে লাগল,—স্বামী আসুক বউদের কাছে,—আসুক আসুক আসুক। কাঁদছে আর বলছে, বলছে আর কাঁদছে।

পাখিদের এই কান্না আর চিৎকারে উইয়ুরা ভীষণ রেগে গেল। বড় বিরক্ত করছে তো দুটো পাখি। তারা তাদের দিকে তির ছুড়ল। ফস্‌কে গেল তির। তির তাদের গায়ে লাগল না। তখন তারা কারেকে ডাকল। তাকে তির ছুড়তে বলল। সেই মারুক ওই পাখি দুটোকে। সে তো বিরাট শিকারি। কারে এল, ধনুকে তির লাগিয়ে নিশানা করে ছেড়ে দিল তির। ফস্‌কে গেল নিশানা। পাখিদের গায়ে লাগল না।

কারেকে তির ছুড়তে দেখে অবাক হল দুই বউ। তাদের গায়ে তির লাগল না, কিন্তু ঝপ্ করে নীচের ঝোপে পড়ে গেল। ওপর থেকে পড়েও তারা বেঁচে রইল। কারে গেল কাছে। ঝোপের মধ্যে। তাকে দেখেই পাখি দুটো আর পাখি রইল না। তারা সত্যিকারের বউ হয়ে গেল। তারা মানবী হয়ে গেল। দুজনে কারেকে দুপাশ থেকে ধরে বাড়ির পথে নিয়ে চলল। পাহাড়ি পথে তারা তিনজনে চলেছে। অনেক কষ্টে তাদের স্বামীকে ফিরে পেয়েছে।

এমন সময় তারা এল সেই সমাধির কাছে, যেখানে দুই বউ কারেকে মাটির তলায় শুইয়ে রেখেছিল। সমাধি দেখেই কারে বলল, 'সমাধির মধ্যে আমার অনেক কিছু রয়েছে। সেগুলো নিয়ে যাওয়া দরকার। সেসব তো আমারই।'

কারে সমাধির এক পাশে খুঁড়তে লাগল। নরম মাটি, হাত দিয়ে মাটি তুলছে। একটা গর্তের মতো হল। হাত অনেকটা ভিতরে ঢুকে যাচ্ছে। কারে গর্তের মধ্যে নিজের মাথা ঢুকিয়ে দিল। মাথা দিয়ে নিজের মৃতদেহ স্পর্শ করল। সঙ্গে সঙ্গে কারে হয়ে গেল একটা শুয়োর, আর দৌড় দিল বনের পথে।

বউ দুজন পাশে দাঁড়িয়েছিল। অতশত বোঝেনি। এবার বুকফাটা কান্নায় ভেঙে পড়ল। শুয়োরের দৌড়নোর দিকে তাকিয়ে থেকে তারা আর্তনাদ করে উঠল। কাঁদতে কাঁদতে বলল, 'কত কষ্ট করে তোমাকে ফিরিয়ে আনলাম। তুমি আবার আমাদের হলে। কত কষ্ট! কত কষ্ট। কিন্তু এ তুমি কি করলে? তুমি আবার শুয়োর হয়ে বনের গভীরে হারিয়ে গেলে। হায়!'

তবু তারা ভালো বউ। হাল ছেড়ে দিল না। তারা তাদের পোষা কুকুরকে ডাকল। তাকে পাঠাল বনের গভীরে। স্বামীকে খুঁজতে। তাদের স্বামীকে ফিরিয়ে আনতে।

কুকুররা আজও শুয়োর দেখলেই নিজে থেকেই তেড়ে যায়। তারা আজও কারেকে খুঁজছে, বউ দুজনের স্বামীকে খুঁজছে। আজও পায়নি তাকে।

জেগে-ওঠা ভাগ্য

এক মায়ের পেটের দুই ভাই ছিল। হলে কি হবে, বড় ভাই ভীষণ হিংসুটে আর দুষ্টু স্বভাবের। ছোট ভাইকে দুচোখে দেখতে পারত না। সংসারের যত কঠিন আর নোংরা কাজ ছোট ভাইকে দিয়েই করাত। ছোট ভাই শক্ত পাথুরে জমি চাষ করত, গোরু-মোষদের মাঠে নিয়ে যেত। সারাদিন তার এইভাবে খাটুনিতে কাটত। এত খাটুনি। কিন্তু খেতে পেত চারটে মাত্র চাপাটি। এই খেয়েই তাকে সারাদিন কাটাতে হত।

একদিন ছোট ভাই জমিতে বীজ ছড়াচ্ছে। বেশ কয়েকদিন ধরেই জমিতে লাঙল দিয়ে জমিকে তৈরি করে নিয়েছে। বীজ ছড়াচ্ছে। কিন্তু বীজ কম পড়ে গেল। ফিরে এল বাড়িতে। আরও বীজ নিয়ে যেতে হবে। বাড়িতে ভাই নেই, বড় ভাইয়ের বউও নেই। কোথায় তারা বাইরে গিয়েছে। সে বীজ খুঁজছে। খুঁজতে খুঁজতে সে রান্নাঘরে গেল। একটা হাঁড়ির মুখ খুলতেই দেখল, কি সুন্দর ভাত রান্না করা রয়েছে। কতদিন সে এমন ধপ্‌ধপে সাদা চালের ভাত খায়নি। ঢেকে রাখল হাঁড়ি, অন্য হাঁড়ি থেকে বীজ নিয়ে জমিতে গেল। মনে বড় ফুর্তি। আঃ কতদিন পরে ভাত খাবে।

সারাদিনের কাজের পরে ফিরে এল ঘরে। গোয়ালে রাখল গোরু-মোষ। খেতে দিল তাদের। খেতে বসল সে। সেই অন্য দিনের মতো শুকনো চাপাটি আর অল্প ডাল। সে কি ? সে যে ভাত দেখে গেল হাঁড়িতে ? কোনদিন রাগে না সে। আজ রেগে গেল। বড় ভাইয়ের এ কি ব্যবহার ? বড় ভাইয়ের বউয়ের এ কি নিষ্ঠুর ব্যবহার ? সে রেগে গিয়ে প্রতিবাদ করল। কেন তাকে ভাত দেওয়া হয়নি ? অথচ আজ তো বাড়িতে ভাত রান্না হয়েছে ?

বড় ভাই বলল, ' তোকে চাপাটি খেতে দেওয়া হয়েছে ? রোজ তাই দেওয়া হয় ? কেন জানিস্ না ? তোর ভাগ্য সাত সমুদ্রের ওপারে যে ঘুমিয়ে আছে ! ভালো জিনিস জুটবে কি করে ? ভাগ্য যে ঘুমিয়ে রয়েছে ।' বড় ভাই হাসছে, ঠাট্টা করছে। সে নিষ্ঠুর।

ছোট ভাই অতশত বোঝে না। সে ভাবল, তাই তো, ভাগ্য যদি সাত সমুদ্রের ওপারে ঘুমিয়ে থাকে, তবে ভালো জিনিস জুটবে কেমন করে ? সে বিশ্বাস করল বড় ভাইয়ের কথা, বড় সরল সে। বড় ভাইয়ের নিষ্ঠুর ঠাট্টা সে বুঝতে পারল না। কিন্তু সে বিশ্বাস করেছে ভাগ্যের ঘুমিয়ে থাকার কথা।

বেরিয়ে পড়ল বাড়ি থেকে। ঘুমন্ত ভাগ্যকে জাগিয়ে তুলতে হবে। সাত সমুদ্রের ওপারে যেতে হবে। ছোট ভাই চলেছে গভীর বনের পথে। এই পথেই নাকি সেখানে যেতে হবে। আরও দূরে অনেক দূরে।

যেতে যেতে হঠাৎ সে দেখতে পেল, একটা মস্ত সাপ গাছে ওঠার চেষ্টা করছে। ওপরে তাকিয়ে দেখল, গাছের ডালে একটা মস্ত পাখির বাসা আর তার মধ্যে বাচ্চা পাখিদের কিচির-মিচির শোনা যাচ্ছে। তক্ষুনি সে সাপটাকে মেরে ফেলল। বেঁচে গেল পাখির বাচ্চারা।

সন্ধ্যা হয়ে আসছে। সারাদিন হেঁটেছে। কোথায় আর যাবে? সে সেই গাছের নীচেই শুয়ে পড়ল। ঘুমিয়ে পড়ল।

সেই গাছে ছিল শকুনের বাসা। বাবা-মা ফিরে আসতেই বাচ্চারা বলল। ওই লোকটা নিশ্চত মৃত্যুর হাত থেকে তাদের বাঁচিয়েছে। নইলে সাপ ঠিক তাদের খেয়ে ফেলত। সন্ধেবেলা খাবার এনেছে বাবা-মা, বাচ্চারা তাই খাচ্ছে। নীচের দিকে তাকিয়ে বাবা-মার চোখে জল এল।

সকাল হলেই শকুন-শকুনি বিরাট ডানা মেলে নেমে এল গাছের নীচে। লোকটিকে অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাল। তার জন্যই তাদের বাচ্চারা বেঁচেছে। এখন সে কি চায়? প্রাণ দিয়েও তারা লোকটির উপকার করবে।

ছোট ভাই তার সব কথা বলল। সে যেতে চায় সাত সমুদ্রের ওপারে, তার ভাগ্যকে জাগাতে। এ আর এমন কি কথা? পিঠে চাপিয়ে তাকে সাত সমুদ্রের ওপারে নিয়ে যাবে শকুন। সে তৈরি। ভাগ্যকে জাগানো হয়ে গেলে আবার তাকে পিঠে করে এখানে নিয়ে আসবে।

পাশে এক মস্ত গাছ। সে তাদের কথা শুনতে পেয়েছে। সে বলল, 'তাহলে আমার জন্যও একটা উপায় দেখ। আমার ভাগ্য এমন কেন জেনে এস। আমি এত বিরাট গাছ, কিন্তু দিনে দিনে শুকিয়ে যাচ্ছি। ফিরে এসে জানিও কেন এমন হচ্ছে।' বারবার অনুরোধ করল সেই গাছ।

শকুন-শকুনি উড়ে চলল। তাদের মেলে-দেওয়া ডানার ওপরে বসে রয়েছে ছোট ভাই। শেষকালে সাত সমুদ্রের ওপারের দেশে পৌঁছল তারা তিনজন। ছোট ভাই তার ঘুমিয়ে-থাকা ভাগ্যকে জাগিয়ে তুলল। বলল, 'আমি বড় হতভাগা। আমাকে যে সাহায্য করতে হবে। আর তো ঘুমিয়ে থাকলে চলবে না।' প্রথমেই জেগে-ওঠা ভাগ্যকে সে জিজ্ঞেস করল, 'ওই বিশাল গাছ কেন শুকিয়ে যাচ্ছে? সে বাঁচবে কেমন করে?'

তার ভাগ্য বলল, 'ওই গাছের নীচে রয়েছে এক মস্ত সাপ। সে এক গুপ্তধন পাহারা দিচ্ছে। বহুকাল থেকে ওখানে পোঁতা রয়েছে। তুমি গিয়ে ওই সাপটাকে মারবে। গাছ আবার সবুজ পাতায় ভরে যাবে। আর গাছের নীচে যত মণি-মাণিক্য সোনাদানা আছে সব তুমি নেবে।'

মেলে-দেওয়া ডানায় চেপে সাত সমুদ্রের ওপর দিয়ে ফিরে এল তারা। এসে নামল সেই বনে। সাপ মারা পড়ল। গুপ্তধন বেরিয়ে পড়ল, অনেক মণি-মাণিক্য সোনাদানা। শুকিয়ে ওঠা গাছ আবার সবুজ পাতায় ভরে গেল। জেগে-ওঠা ভাগ্য যা যা বলেছিল তাই হল। শকুন-শকুনির কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ছোট ভাই নিজের দেশে ফিরছে। বনের পথে দেখতে পেল এক বুনো ঘোড়াকে। বুনো ঘোড়াকে সে কৌশল করে ধরল। তাকে পোষ মানাল। দুরন্ত সুন্দর ঘোড়া তার বশ মানল। তার সঙ্গী হল। ঘোড়ায় চাপল সে। বনের পথে রওনা দিল।

যেতে যেতে সে এল এক রাজ্যে। দেখল, সেখানকার সব মানুষ কেমন মনমরা হয়ে রয়েছে। কারণ কি? জানতে পারল, গোষ্ঠীপতির একমাত্র মেয়ে খুব অসুস্থ। ধীরে ধীরে সে শুকিয়ে যাচ্ছে। কত চেষ্টা করা হয়েছে, কত চিকিৎসা করা হয়েছে,

কত গাছ-গাছড়া খাওয়ানো হয়েছে,—কিন্তু কিছুতেই কিছু হচ্ছে না। গোষ্ঠীপতি সব দেবে যে তার মেয়েকে ভালো করে দিতে পারবে।

ছোট ভাই গেল গোষ্ঠীপতির বাড়িতে। নিজের গাঁয়ে থাকতে সে খুব সাধারণ অতি সামান্য একটা টোট্‌কা ওষুধ জানত। অতশত না ভেবে মেয়েকে খেতে দিল সেই ওষুধ। আশ্চর্য! মেয়ে ভালো হয়ে উঠল। অল্পদিনেই সেরে উঠল।

গোষ্ঠীপতির আর আনন্দ ধরে না। ছোট ভাইকে সে অনেক কিছু দেবে, এমন কি মেয়েকেও। সে চাইলে তার জামাইও হতে পারে। সে কি চায়? ছোট ভাই গোষ্ঠীপতির ধন-দৌলত পেল, সবচেয়ে মূল্যবান রত্নও পেল। গোষ্ঠীপতির মেয়ে তার বউ হল।

শেষকালে ছোট ভাই নিজের পাহাড়ি গাঁয়ে পৌঁছল। গুপ্তধন, ধনদৌলত, বউ— সব নিয়ে। তার ভাগ্যকে সে জাগিয়ে তুলেছিল। এখন সুখে শান্তিতে বাস করতে লাগল।

ট্যাটন

সে অনেক কাল আগের কথা। এক বিধবা মায়ের একটিমাত্র ছেলে ছিল। মা বিধবা, তাই ছেলেকে নিয়ে থাকত বাপের বাড়িতে। ছেলেটির ছয় মামা। এমনি করে দিন যায়।

পাহাড়ি নদীতে ঢল নেমেছে। নীচের দিকে টল্‌টলে জল তর্‌তর্‌ করে বয়ে চলেছে। মামারা বলল, 'চলো ভাগ্নে, মাছ ধরতে যাই। বাঁশের ফাঁদ পেতে আসি।' ছেলের মহাফুর্তি। সে সঙ্গে সঙ্গে রাজি।

ছয় মামা নদীর ওপারের দিকে সুন্দর করে বাঁশের জালের আটল বাঁধল। সুন্দর ফাঁদ তৈরি হল। এ ফাঁদ এমনই, মাছ ঢুকবে কিন্তু বেরুতে পারবে না। ছেলেটি কিছুটা নীচের দিকে জালের আটল বাঁধল। সেখানে খুব স্রোত। সে ছোট, ভালো কাজ জানে না। যেমন তেমন করে ফাঁদ পেতে বাড়িতে ফিরে এল।

পরের দিন সকাল হতেই সাতজন গেল তাদের নিজের নিজের ফাঁদের কাছে। আশ্চর্য। তার মামারা কতো ভালোভাবে ফাঁদ পেতেছিল, কিন্তু বাঁশের জালে আটকে পড়েছে কয়েকটা কুচো চিংড়ি। আর কোন মাছ নেই। আর ছেলেটির বাঁশের জালে মাছ ভর্তি। অনেক মাছ। তাদের ছট্‌ফটানিতে এই বুঝি জাল ভেঙে যায়। মামারা অবাক হল।

মামারা বলল, 'ভাগ্নে, এবার আমরা এখানে ফাঁদ পাতি। তুই আরও নীচে নেমে যা। ওইখানে ফাঁদ পেতে রাখ।' ভাগ্নে রাজি। মামারা ভাগ্নের জায়গায় ফাঁদ পাতল। খুব ভালোভাবে আটল বাঁধল। অনেকক্ষণ ধরে কাজ করল। ছেলেটি নদীর নীচের দিকে অনেকটা নেমে গেল। সেখানে আরও বেশি স্রোত। পা রাখাই দায়। পরের দিন সকালে সেই একই কাণ্ড। আরও মজার কাণ্ড। আজ মামাদের ফাঁদে একটা মাছও ঢোকেনি। একটা কুচো চিংড়িও নয়। আর ছেলেটির ফাঁদভর্তি মাছ। চকচকে রুপোলি মাছে তার ঝুড়ি ভর্তি হয়ে গেল। মামাদের চ্যাঙারি শূন্য।

এমনি করে মামারা প্রতিদিন নতুন করে ভাগ্নের জায়গায় ফাঁদ পাতে, আর ভাগ্নেকে পাঠিয়ে দেয় নদীর আরও নীচের দিকে। সকালে ছেলেটির ঝুড়ি ভরে যায় মাছে, মামারা পায় অল্প কিছু মাছ। কোনদিন কিছুই পায় না। প্রত্যেক দিন ছেলেটিকে জায়গা পালটাতে হয়। একদম ভালো লাগে না। কিন্তু কি করবে সে? সে যে ছোট, মামারা বড়। সে যে বিধবা মায়ের অনাথ ছেলে।

এমনি করে দিন যায়। শেষকালে নতুন নতুন জায়গায় ফাঁদ পেতে ছেলেটি ক্লান্ত হয়ে গেল। এক কাজ নিত্যিদিন ভালো লাগে? একদিন সে রেগেমেগে জলের তলায় আর ফাঁদ পাতল না। এক জায়গায় বড় বড় ঘাসের ঘন ঝোপ হয়ে ছিল। তার মধ্যে বাঁশের ফাঁদটিকে ঢুকিয়ে দিয়ে বাড়ি ফিরে এল। মামারা জানে না ভাগ্নে কোথায় রেখেছে তার ফাঁদ।

পরের দিন সকালে মামারা ভাগ্নেকে ডাকল। নদীর কাছে যেতে হবে। ফাঁদে কেমন মাছ পড়ল দেখতে হবে। ছেলেটি অনেক দিন পরে মুখ খুলল। বলল, 'কালকে তো আমি ফাঁদ পাতি নি। আমার ফাঁদ জলের তলায় বসাই নি। ঠিক আছে, আমি তোমাদের সঙ্গো যাচ্ছি। এমনি যাচ্ছি।' মামারা খুশি হল। ছেলেটি মামাদের পেছন পেছন চলল।

নদীর তীরে এসে মামারা নামল জলে। আর ছেলেটি গেল ঘন ঘাসের ঝোপের কাছে। আরে! ভেতরে একটা বনের ঘুঘু পাখি! ঠোঁট দিয়ে বাঁশের সরু কাঠিগুলো ভাঙার চেষ্টা করছে। ছেলেটি বুনো লতা ছিঁড়ে আনল। হাত ঢুকিয়ে ঘুঘুকে বের করল আর তার পায়ে লতার ফাঁস দিয়ে আনন্দে চলল বাড়ির দিকে। আজ সে নতুন কিছু ধরেছে। খুব ভালো লাগল তার।

এই অনাথ ছেলেটির ছিল গোরুর একটা বাছুর। যেমন নাদুস্-নুদুস্ তেমনি মসৃণ চিক্কণ কোমল তার দেহ। অমন সুন্দর বাছুর এ এলাকায় আর কারও ছিল না। ছেলেটি খুব ভালোবাসত তাকে। মামারা হিংসেয় জ্বলে-পুড়ে যেত। তাদের বাছুরগুলো কেন ও রকম সুন্দর নয়? একদিন সুযোগ পেল তারা। ছেলে গিয়েছে বনে। তারা বাছুরটাকে মেরে ফেলল। হিংসে বেশি হলে মানুষ সব পারে।

ছেলে বাড়ি ফিরে দেখে, পাশের বাঁশঝাড়ে তার বাছুর পড়ে রয়েছে। মাটি বেয়ে রক্ত গড়িয়ে যাচ্ছে। কি আর করবে সে! বসে বসে বাছুরের ছাল ছাড়িয়ে ফেলল। কষ্ট হল মনে, কিন্তু উপায় কি? বাছুরের একটা ঠ্যাং কেটে ফেলল। সেটা নিয়ে গিয়ে লুকিয়ে রাখল এক ধনীর বাড়ির গোলাঘরের নীচে। এই লোকটির খুব দেমাক, সে নাকি খুব উঁচুজাতের মানুষ। গোরুর মাংস খাওয়া তো দূরের কথা, ছোঁয়ও না।

ছেলেটি তার বাড়ির এপাশ-ওপাশ ঘুরছে, এমন সময় দেখা হল ধনী লোকটির সঙ্গো। মুখোমুখি হতেই ছেলেটি বলল, 'এঃ, আপনার বাড়ির ভেতর থেকে কেমন যেন গোরুর মাংসের গন্ধ ছড়াচ্ছে।'

ভীষণ চটে গেল সে। এতবড় কথা? রাগে কাঁপতে কাঁপতে বলল, 'শয়তান হতচ্ছাড়া বদমাইস কোথাকার। আমার বাড়িতে গোরুর মাংসের গন্ধ? তোর খুব আস্পর্ধা বেড়েছে। আমি হলাম গিয়ে উঁচুজাতের লোক। আমি কি ওসব খাই? হতচ্ছাড়া পাজি, তোকে বাঘ খায় না কেন? খোঁজ। খুঁজে দেখ। কোথায় গোরুর মাংস। যদি খুঁজে না পাস, তোকে মেরেই ফেলব। এতবড় কথা!' রাগে সে কাঁপছে দুলছে।

'ঠিক আছে, খুঁজে দেখি।' বোকা-বোকা চোখে ছেলেটি বলল। এমন ভাব করল যেন সে কিছুই জানে না।

ছেলেটি আলগা পায়ে উঠোনের মধ্যে ঢুকল। এলোমেলো এধার-ওধার ঘুরতে লাগল। নাঃ, পাওয়া তো যাচ্ছে না। একটু দূরে দাঁড়িয়ে রয়েছে ধনী মানুষটি। আস্তে আস্তে তার মুখে হাসি ফুটছে। ছেলেটি কোমর বেঁকিয়ে নিচু হয়ে নানা জায়গায় উঁকি মারছে। ছেলেটি জানে কোথায় আছে গোরুর ঠ্যাং, কোথা থেকে গোরুর মাংসের গন্ধ বেরুচ্ছে। সে আস্তে আস্তে গোলাঘরের কাছে গেল, নিচু হল। চিৎকার করে উঠল, 'আমি ঠিক বলেছিলাম। এই তো গোরুর মাংস।' লোকটির বুক কেঁপে উঠল। নিচু থেকে ছেলেটি ঠ্যাংটা বের করে আনল। সামনে তুলে ধরল।

লোকটি ভীষণ ভয় পেয়ে গেল। গাঁয়ে একথা জানাজানি হয়ে গেলে তার সর্বনাশ হবে। উঁচুজাতের দেমাক আর থাকবে না। সবার সঙ্গে সমান হয়ে যেতে হবে। হায় কপাল। এ তার কি হল? সে আস্তে আস্তে ছেলেটির কাছে গেল। তাকে গোলাঘরের আড়ালে ডেকে নিয়ে গেল। ছেলেটির গায়ে-মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করে বলল, 'বাছা, তুই বড় অনাথ রে। তা বাবা, কাউকে যেন একথা বলিস না। সোনা ছেলে আমার। আমি তোকে অনেক সোনা-রুপো দেব। বলবি না তো?' তাড়াতাড়ি ঘরের মধ্যে গিয়ে লোকটি অনেক রুপো নিয়ে এল। থলে ভর্তি করে ছেলের হাতে দিল। লোকটি কেমন যেন ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গিয়েছে। ছেলেটি কোন কথা বলল না। জিনিস নিয়ে বাড়ির পথে হাঁটা দিল। গোরুর ঠ্যাংটা পথে ঘন ঝোপের মধ্যে ফেলে দিল।

বাড়ি পৌঁছিয়েই ছেলে মাকে ডাকল। বলল, 'মা, মামারা বেতের যে কুন্‌কেতে ধান মাপে সেটা নিয়ে এসো।'

মা ভাইদের কাছে গিয়ে বলল, 'দেখ, তোদের ভাগ্নে কুন্‌কেটা চাইছে। কেন চাইছে তা তো বাপু জানি না।' ছোট মামা কুনকে নিয়ে দিদির সঙ্গে এল। ভাগ্নে রুপোর চাক্‌তিগুলো কুন্‌কেতে ভরে মাপতে লাগল। এত রুপো? ভাগ্নে পেল কোথা থেকে?

ফিরে এসে অন্য ভাইদের বলল, 'আশ্চর্য! ভাগ্নে অনেক রুপোর চাকতি নিয়ে এসেছে। সেগুলো সব মাপছে। কোথায় পেল কে জানে! অনেক অনেক রুপো!'

মাপা হয়ে গেলে মা কুন্‌কে ফিরিয়ে দিতে এল। ভাইরা বলল, 'ভাগ্নেকে একবার পাঠিয়ে দাও তো।'

মা ফিরে এসে ছেলেকে বলল, 'তোর মামারা তোকে এখুনি ডাকছে। কি সব কথা আছে তোর সঙ্গে। যা দেখা করে আয়।'

ছেলেটি ঠোঁটের ফাঁকে হাসল। গেল মামাদের ঘরে। মামারা একসঙ্গে বলে উঠল, 'তা ভাগ্নে, এত রুপো পেলি কোথায়? হ্যাঁরে, কোথায় পেলি?' মামাদের চোখ চক্‌চক্ করছে।

ছেলেটি খুব শান্তভাবে বলল, 'এগুলো গোরুর মাংসের দাম। তোমারা আমার যে বাছুরটাকে মেরে ফেলেছিলে, তার মাংস বিক্রি করে এই দাম পেলাম। হাটের লোকজন বলল, খুব ভালো মাংস। আরও চাই। আমাকে আরও মাংস আনতে পাঠিয়ে দিল। তাই এলাম। আবার যাব।'

মামারা সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল, 'আচ্ছা, আমরা যদি গোরুর মাংস হাটে নিয়ে যাই, ওরা কিনবে তো? মানে আমাদের কাছ থেকে মাংস কিনবে তো?'

ছেলেটি উৎসাহ দিয়ে বলল, 'কেন কিনবে না? নিশ্চয়ই কিনবে। ওরা তো বসে রয়েছে। মাংস কিনবে বলেই বসে রয়েছে। তোমাদের তো অনেক অনেক গোরু আছে। সেগুলোকে মেরে তাদের সব মাংস যদি হাটে নিয়ে যাও, তবে কত টাকাই না পাবে। আমার তো মোটে একটা বাছুর। তাতেই কত পেলাম। তোমাদের তো ঘর ভরে যাবে।' ছেলেটি হঠাৎ চুপ করে গেল। নিজের ভাঙা ঘরে ফিরে গেল।

এক ভাই তক্ষুনি একটা গোরুকে কেটে ফেলল। বড় বড় ঝুড়িতে চাপিয়ে ছয় ভাই রওনা দিল। ভাগ্নে তাদের ডেকে বলল, 'শোনো মামা, গাঁয়ের ওখানে এক ধনী লোক থাকে। তাকে তো চেনোই। তার বাড়ির কাছে গিয়ে তার কাছে মাংস বেচতে চাইবে।

তার বাড়ির কাছে গিয়ে চিৎকার করে হাঁকবে— কে নেবে গোরুর মাংস? খুব ভালো মাংস। মনে রেখো।'

ছয় ভাই পথ দিয়ে এগিয়ে চলেছে। সবার মাথায় মাংসের ঝুড়ি। একটা বড় গোরুর অনেক মাংস। সেই ধনী মানুষের বাড়ির সামনে এসে হাঁক দিল, 'আমাদের গোরুর মাংস আছে। কে নেবে গোরুর মাংস? ভালো মাংস।'

অনেক লোক বাড়ি থেকে বেরিয়ে এল। হাঁক শুনে বলল, 'হ্যাঁ গোরুর মাংস নেব। নামাও এখানে।' অনেক লোক জড়ো হয়ে গেল। ছয় ভাই তখন ঢুকে পড়েছে ধনী লোকটির উঠোনে। লোকজনও সেখানে ঢুকল। ছয় ভাইকে তক্ষুনি দড়ি দিয়ে বেঁধে ফেলল আর সবাই মিলে বেদম প্রহার করল। একসঙ্গে বলে উঠল, 'হতচ্ছাড়া পাজি কোথাকার! আমাদের পাড়ায় এসেছিস গোরুর মাংস বিক্রি করতে? জানিস না আমরা কত উঁচু জাতের লোক? আমরা খাব গোরু! তোরা এখানে ঢুকলি কি বলে? মাংস বিক্রি করতে সাহস পেলি কেমন করে?' বলছে আর মারছে। বেশ কিছুক্ষণ পরে তারা ছয় ভাইকে পাড়া থেকে দূর করে দিল।

ছয় ভাই ফিরে আসছে বাড়ির পথে। সারা দেহে ব্যথা। চোখ-মুখ ফুলে গিয়েছে, মাথার চুল ছিঁড়ে গিয়েছে। পথে যেতে যেতে নিজেদের মধ্যে তারা বলাবলি করছে, 'ওঃ! কি সাংঘাতিক ভাগ্নে! কীভাবেই না আমাদের বোকা বানালো! অমন সুন্দর গোরুটাকে কেটে ফেললাম? কিছুই বুঝতে পারি নি আগে। শয়তান কোথাকার। গোরুও গেল, মারও খেলাম। ঠিক আছে, দেখাচ্ছি মজা। বাড়ি গিয়েই ওর ঘর পুড়িয়ে দেব। ওকে ঘরছাড়া করব। আমাদের কাছেই থাকবে আর আমাদেরই জ্বালাবে?'

বাড়ি ফিরে এসেই তারা আর কোনদিকে তাকাল না। আগুন জ্বালিয়ে দিল ভাগ্নের ঘরে। বাঁশ আর কাঠের তৈরি ঘর। দাউদাউ করে জ্বলে উঠল। অল্পক্ষণ পরেই ঘর মাটির সঙ্গে মিশে গেল। শুধু পড়ে রইল ছাইয়ের গাদা। কি আর করবে ছেলেটি! ছোট দুটো ঝুড়ি ছিল তার। সেই দুটো ঝুড়িতে বাড়ি-পোড়া ছাই ভর্তি করে নিল। তারপরে রওনা দিল দূরের এক গ্রামের পথে।

ছেলেটি আগেই শুনেছিল, এই গ্রামে সবার ভীষণ চোখের ব্যামো হয়েছে। লাল হয়ে উঠছে চোখ, সবসময় কট্‌কট্ করে, অসহ্য যন্ত্রণা। কিছুতেই চোখের এই রোগ সারছে না। কত লতা-পাতার রস লাগাচ্ছে, কত টোট্‌কা ওষুধ দিচ্ছে,—কিছুতেই কিছু হচ্ছে না। ছেলেটি গেল সেই গাঁয়ে। ছেলেটিকে গাঁয়ে ঢুকতে দেখে কয়েকজন জিজ্ঞেস করল, 'ভিন গাঁয়ের ছেলে মনে হচ্ছে। তা কোন কাজ আছে নাকি? কাকে চাই?'

ছেলেটি খুব নম্রভাবে বলল, 'না কাউকে চাই না। আমি এসেছি আপনাদেরই কাছে। শুনলাম, আপনাদের গাঁয়ের সবার চোখের ব্যামো হয়েছে। বড্ড কষ্ট পাচ্ছেন। কিছুতেই নাকি সারছে না? তাই ওষুধ নিয়ে এলাম। খুব ভালো ওষুধ। চোখের রোগ সারবেই।'

সবার মুখে হাসি ফুটল। বড় ভালো ছেলে, ভিন গাঁয়ের ছেলে হয়েও কত উপকারী। তারা গাঁয়ের সবাইকে ডেকে আনল। কষ্ট আর সহ্য করা যায় না। সবাই এল তাড়াতাড়ি। জড়ো হল এক জায়গায়। যার যা সামার্থ্য তাই দিল ছেলেটিকে। অনেক টাকা। হাতের থলে ভরে গেল। কেনই বা দেবে না? চোখের যন্ত্রণা তো সারবে।

ছেলেটি বলল, 'এক্ষুনি কিন্তু আপনারা এই ওষুধ চোখে লাগাবেন না। এ লাগাবার বিশেষ সময় আছে। দৈব ওষুধ তো! আমি কিছুটা পথ যাওয়ার পরে যেই চিৎকার করে বলব,—এবার ওধুধ চোখে লাগান, তখন ওষুধ চোখে দেবেন। চোখে দিয়ে ঘষবেন।'

বাড়ি-পোড়া ছাইয়ের বদলে অনেক টাকা-ভার্তি থলিটা ছেলেটি পিঠের ওপরে ফেলল। ভালোভাবে জুত করে রাখল। ছুটতে হবে তো? হাঁটছে ছেলেটি। পেছন থেকে শুনতে পেল, 'এখন কি চোখে ওষুধ দেব?' ছেলেটি জোরে পা চালালো, 'এখনও নয়, একটু পরে।' এমনি করে পেছন থেকে কথা ভেসে আসে, তারা অনুমতি চায়। আর দূর থেকে সেই গাঁয়ের মানুষগুলো শুনতে পায়, 'এখনও নয়'।

অনেক এগিয়ে গিয়েছে ছেলেটি। এবার যদি গায়ের লোক তাড়াও করে তবু তাকে ধরতে পারবে না। আর কোন ভয় নেই। দূরের পথ থেকে ছেলেটির গলা ভেসে এল, 'এবার ওষুধ লাগান।' বলেই দৌড় দিল ছেলেটি। পিঠে ভারি বোঝা, দৌড়তে গেলে বোঝা দুলছে এধার-ওধার। কিন্তু গ্রামবাসীরা অনেক পেছনে। খুব জোরে না দৌড়লেও চলবে। তবু যত তাড়াতাড়ি পারে সে পথ চলছে।

এদিকে গাঁয়ের সবাই তখন শতগুণ যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ করছে। পোড়া ছাই চোখে ঢুকে ব্যাথা আরও বাড়িয়ে তুলেছে। তারা ভালো হয়ে উঠবে ভেবে অনেকটা ছাই চোখে দিয়েছিল। উঃ, কি সর্বনাশ। চোখ ফুলে লাল হয়ে একাকার। এখনকার কষ্ট অনেক বেশি। আগের যন্ত্রণা কিছুই নয়। এ কি হল তাদের? নিজেদের মধ্যে বলাবলি করল, 'টাকাও গেল, চোখের ব্যামোও বেড়ে গেল। কি ঠকবাজ ছেলে? কীভাবে ঠকিয়ে গেল? আসুক না আর একবার। হাত-পা বেঁধে এমন মার দেব জীবনে ভুলবে না।' বলছে আর চোখ কচলাচ্ছে। ভীষণ যন্ত্রণা।

ফিরে এল বাড়িতে। মাকে পাঠালো মামাদের বেতের কুন্‌কে আনতে। মা কুন্‌কে নিয়ে এল। দিদির পেছনে পেছনে এল ছোট ভাই। ভাগ্নে কেন কুন্‌কে চাইছে? দেখতে হবে সে কি করে। এসে দেখে—ভাগ্নে মেঝেতে ছড়িয়ে রেখেছে অনেক অনেক টাকা। আর কুন্‌কে দিয়ে সেইসব টাকা গুনছে। অবাক হল ছোট মামা। ছুটে এল দাদাদের কাছে। সব বলল। ভাগ্নে ফিরে এসেছে। আরও অনেক টাকা। অনেক অনেক টাকা। সেবারের চেয়েও বেশি।

ছয় ভাই অবাক হল। গেল ভাগ্নের কাছে। জিজ্ঞোস করল, 'ভাগ্নে, কোথা থেকে এত টাকা পেলি? বল না ভাগ্নে?'

ছেলেটি শান্ত চোখে মামাদের দিকে তাকিয়ে বলল, 'বাড়ি-পোড়া ছাইয়ের বদলে এই টাকা পেলাম। যে বাড়ি তোমরা পুড়িয়ে দিয়েছিলে তার ছাই বিক্রি করে এই টাকা পেলাম। যে গাঁয়ে ছাই বিক্রি করে এলাম, সেখানকার মানুষজন বলছে,—আরও ছাই চাই, এত কম ছাই দিয়ে কি হবে? আরও ছাই নিয়ে এসো। আমার ঘরখানা তো ছিল ছোট্ট, তা থেকে আর কত ছাই হবে। তা আমি আর কোথায় বেশি ছাই পাব। তোমদের অনেকগুলো ঘর। ঘরগুলো অনেক বড় বড়। ভেবে দেখ, কত ছাই হবে। উঃ, ভাবতেই পারছি না। অত ছাই বিক্রি করলে তো টাকা বয়েই আনতে পারবে না। আর ভাবতে পারছি না।'

ছয় ভাই চলে এল। পরামর্শ করল, 'আমাদের ঘরগুলো পুড়িয়ে দি। কত টাকাই পাব। তখন আবার ঘর ছেয়ে নেব।' বলামাত্রই কাজ শুরু হয়ে গেল। দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে উঠল। বাঁশঝাড়ের মাথা ছাড়িয়ে শিখা ওপরে উঠল। বাঁশ আর কাঠের বাড়ি জ্বলছে। মাটির সঙ্গে মিশে গেল ঘরগুলো। অনেক ছাই। এত ছাই বয়ে নিয়ে যাওয়া অসম্ভব! তাও ছয়জন মিলে যতটা পারে চেপে ঝুড়িতে রাখল। ঝুড়িও অনেক বড়। মাথায় চাপিয়ে রওনা দিল।

ভাগ্নে তখন তাদের কাছে গিয়ে উৎসাহ দিয়ে বলল, 'শোনো মামা, ওই গাঁয়ে যাবে। ওই গাঁয়ে সবার চোখের ব্যামো হয়েছে। গাঁয়ে ঢুকেই চিৎকার করে হাঁক দেবে,—ছাই নেবে গো? চোখের ব্যামো একদম সেরে যাবে। মনে রেখো।'

মাথায় ভীষণ ভারি বোঝা। তবু তাড়াতাড়ি চলেছে ছয় ভাই। আঃ! কত টাকাই না মিলবে। চোখ বুজে মাঝেমধ্যে ভাবছে সেই কথা। পথ চলছে আনন্দে। এসে গেল সেই গাঁ, এই গাঁয়েই সবার চোখের ব্যামো হয়েছে, এখানেই ভাগ্নে ছাই বিক্রি করে অনেক টাকা ঘরে নিয়ে ফিরেছে। গাঁয়ে ঢুকেই তারা হাঁক দিল, 'ছাই নেবে গো? চোখের ব্যামো একদম সেরে যাবে।'

পিলপিল করে গাঁয়ের লোক ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এল। তখনও তাদের চোখের জ্বালা একটুও কমেনি। ধাক্কা মেরে ফেলে দিল ছয় ভাইকে। মাথার ঝুড়ি কোথায় ছিটকে পড়ল, দামি ছাই কোথায় হাওয়ায় গেল উড়ে। মোটা মোটা দড়ি এনে তারা বেঁধে ফেলল ছয় ভাইকে। আষ্টেপিষ্ঠে বাঁধল। তারা যে ছাই এনেছিল তা এনে খুব করে তাদের চোখে ঘষে দিল, আর কয়েকজন মিলে শুরু করল বেদম প্রহার। সবারই রাগ, সবারই চোখ জ্বলছে। সবাই মারতে শুরু করল। পালা করে মারছে আর চোখে ছাই ঢুকিয়ে দিচ্ছে। অনেকক্ষণ ধরে চলল এই অত্যাচার। গাঁয়ের লোকের রাগ শেষকালে কমল। তারা ক্লান্ত হয়ে পড়ল। ছেড়ে দিল ছয় ভাইকে। খোঁড়াতে খোঁড়াতে চোখ কচ্‌লাতে কচ্‌লাতে ছয় ভাই বাড়ি ফিরল। হায় কপাল!

বাড়িতে ঢুকেই চেপে ধরল ভাগ্নেকে। এবার আর রক্ষা নেই। ওকে মেরেই ফেলবে তারা। এতবড় শয়তান। ওর জন্য ওদের সুন্দর ঘর পুড়ল, দেহের এই হাল হল। ভাগ্নেকে ধরেই ওরা একটা লোহার খাঁচায় পুড়ল। শক্ত করে দরজা এঁটে দিল। ভেতর থেকে খোলার কোন উপায় নেই। ছয়জন মিলে মাথায় করে বয়ে নিয়ে চলল সেই খাঁচা। খাঁচার মধ্যে ভাগ্নে। অসহায়ভাবে এদিক-ওদিক চাইছে। নাঃ, এবার আর বাঁচার উপায় নেই। ঘন জঙ্গালের পাশ দিয়ে বয়ে চলেছে পাহাড়ি নদী। সেই নির্জন জায়গায় গিয়ে তারা থামল। ধপাস্ করে ফেলে দিল খাঁচা। তারপরে বলল, 'নদীর জলে ডুবিয়ে তোকে মারব। খাঁচাসমেত তোকে জলে ফেলে দেব। দেখি কে বাঁচায় তোকে। অনেক হয়েছে, আর নয়। এবার তুই মরবি। একটু পরেই মরবি।'

খাঁচা তো ভালোভাবে বাঁধাই রয়েছে। খুব খিদে পেয়েছে। কিছু খাওয়া দরকার। খেয়ে এসে ওকে জলে ডোবালেই চলবে। তারা গেল গাছের ফল খুঁজতে। একটু দূরে। খাঁচার মধ্যে বসে বোকাবোকা চোখে চেয়ে আছে ছেলেটি। দু-একবার হাত দিয়ে দরজা নাড়ল। না, বেরিয়ে যাবার কোনই উপায় নেই। এবার বুঝি মরতেই হবে।

এমন সময় ছেলেটি একজন লোককে দেখতে পেল। খুব সাবধানে পা ফেলে এদিক ওদিক চেয়ে সে জঙ্গলের ভেতর দিয়ে আসছে। সে একজন বিরাট সর্দারের ছেলে, সর্দারকে সবাই রাজা বলে। রাজার ছেলে শিকার করতে বেরিয়েছে। অনেক দূরের পাহাড়ি গাঁয়ে তার বাড়ি। শিকার খুঁজতে খুঁজতে সে অনেক দূরে চলে এসেছে।

হঠাৎ শিকারি রাজপুত্রের চোখে পড়ল এক অদ্ভুত দৃশ্য। এমন জিনিস সে আগে কখনও দেখেনি। খাঁচার মধ্যে বসে রয়েছে পাখি নয়, জন্তু নয়,—একটা মানুষ। কাছে এল সে। জিজ্ঞেস করল, 'কি ব্যাপার? তুমি লোহার খাঁচার মধ্যে কেন? কে তোমায় খাঁচায় বন্দি করে রেখেছে?'

ছেলেটি দুঃখের নিশ্বাস ছেড়ে বলল, 'আর বলেন কেন। আমার মামাদের একটা মেয়ে আছে। তার মতো সুন্দরী এই এলাকায় আর কেউ নেই। অন্য কোথাও নেই। কি রূপ তার! মামারা তার সঙ্গে আমার বিয়ে দিতে চায়। কিছুতেই ছাড়বে না। আর আমার তো এই চেহারা। ওকে যদি বিয়ে করি, আমার তো ভীষণ হিংসে হবে। কি রূপ তার। লোকে আড়ালে আমাকে হাসি-ঠাট্টাও করতে পারে। কি বউয়ের কি বর! আমি তাই ওকে কিছুতেই বিয়ে করতে চাই না। মামারাও ছাড়বে না। তাই আমার এই হাল হয়েছে। মত দিলে তবেই নাকি খাঁচার দরজা খুলবে। কি যে করি! ওঃ! মেয়ের রূপ যদি আপনি দেখতেন।'

রাজপুত্র অবাক হয়ে বলল, 'আমি তো তাহলে মেয়েটাকে বিয়ে করতে পারি। কি বল তুমি?'

ছেলেটি একটু চুপ করে রইল। তারপর বলল, 'তা পারেন। আপনার উপযুক্ত মেয়েই বটে। খুব মানাবে। মামারাও অরাজি হবে না।'

রাজপুত্র বলল, 'কেমন করে বিয়ে হবে? তুমি ঠিকঠাক বলে দাও।'

ছেলেটি এবার আরও উৎসাহ করে বলল, 'আপনি এই খাঁচার মধ্যে বসে থাকবেন। চুপটি করে বসে থাকবেন। অল্পক্ষণ পরেই মামারা এসে পড়বে। তারা এসেই আপনাকে জিজ্ঞেস করবে,— তোমার কি আর কিছু বলার আছে? তারা যখন আপনাকে এই প্রশ্ন করবে, আপনি জবাব দেবেন—মামা, আমার বলার কথা একটাই আছে, আমি রাজি, আমি আপনাদের মেয়েকে বিয়ে করব। আমার মত হয়েছে। ব্যাস, তাহলেই সুন্দরী মেয়ের সঙ্গে আপনার বিয়ে হয়ে যাবে।'

শিকারি রাজপুত্র আনন্দে ডগমগ্ হয়ে বলল, 'তাহলে তো খুবই ভালো হয়। খুব ভালো।'

এবারে ছেলেটি তাড়াতাড়ি বলল, 'দেখুন, আর একটা কথা আছে। আপনি যদি শিকারের ওই পোশাকে খাঁচার মধ্যে বসে থাকেন, তবে মামারা ঠিক আপনাকে চিনে ফেলবে। বুঝবে, এ তো তাদের ভাগ্নে নয়। তাহলে বিয়েও পণ্ড হয়ে যাবে। আমি খাঁচা থেকে বেরিয়ে আপনার পোশাক পরি, আর আপনি আমার পোশাক পরে খাচায় ঢুকে পড়ুন। ব্যাস, তাহলেই হবে। একটু তাড়াতাড়ি করাই ভালো। মামাদের আসার সময় হয়ে এল। এই এল বলে।'

রাজপুত্রের মন উতলা হয়ে উঠল। সে তাড়াতাড়ি খাঁচার দরজা খুলে দিল। বেরিয়ে এল ছেলেটি। পোশাক খুলে ফেলল তাড়াতাড়ি। রাজপুত্রকে দিল তার পোশাক।

রাজপুত্র দিল নিজের নতুন ঝক্‌মকে পোশাক, গলার হার, হাতের বালা। ছেলেটি পরে নিল সেসব। রাজপুত্র পরে নিল ছেলেটির অতি সাধারণ পোশাক। ঢুকে পড়ল খাঁচার মধ্যে। ছেলেটি বাইরে থেকে লোহার খাঁচার দরজাটি খুব ভালোভাবে সাবধানে এঁটে দিল।

সুন্দর নতুন ঝকমকে পোশাকে গলায় হার হাতে বালা পরে ছেলেটি রাজপুত্রের বেশে বাড়ির পথে হাঁটা দিল। কি সুন্দর লাগছে তাকে দেখতে।

এখন হয়েছে কি, গাছের ফল খেয়ে নদীর জল খেয়ে মামারা ফিরে এল নদীর তীরে সেই জঙ্গালের কাছে। ওখানেই রয়েছে খাঁচায় বন্দি তাদের ভাগ্নে। এসে দেখে, না খাঁচা ঠিক আছে। ভেতরে বসে রয়েছে তাদের ভাগ্নে। মুখটা নিচু করে বসে রয়েছে। মামারা এসেই ঠাট্টা করে বলল, 'ভাগ্নে, তোর কিছু বলার আছে?'

রাজপুত্র হাসিহাসি মুখে বলল, 'মামা ঠিক আছে, আমি রাজি। আমি ওকেই বিয়ে করব।'

তার কথা মামারা শুনল কি শুনল না, ধাক্কা মেরে উল্‌টে দিল খাঁচা, একবার গড়িয়ে গেল, আবার ধাক্কা, আবার গড়িয়ে গেল। শেষকালে ঝপ্‌ করে গিয়ে পড়ল নীচের নদীতে। ভাগ্নে কি যেন বলতে চাইল, মামারা শুনতে পেল না, শুনতে চায়ও না। জলের ওপরে অনেক বুদবুদ দেখা গেল, আবার জলেই সেগুলো মিলিয়ে গেল। নদীর জল যেমন বইছিল তেমন বয়ে চলল।

মামারা ফিরে আসছে জঙ্গালের পথে বাড়ির দিকে। মনে খুব আনন্দ। নিজেরা নিজেদের মধ্যে বলছে, 'কি ভোগান্তিই না ভুগিয়েছে ভাগ্নে। ওঃ, কি পাজি শয়তান। এখন মরে গিয়ে শান্তি হল। আর জ্বালাতে আসবে না।' তারা বাড়ি ফিরল।

বাড়ির উঠোনে পা দিয়েই তারা চমকে উঠল। এ কি কাণ্ড! ভাগ্নে তো মরেনি! দাওয়ায় বসে পা নাচাচ্ছে। সুন্দর ঝল্‌মলে পোশাক, গলায় হার, হাতে বালা। যেন রাজপুত্র বসে রয়েছে। ও তো মরেনি। আশ্চর্য! আরও সুন্দর হয়েছে।

তারা আস্তে আস্তে ভাগ্নের কাছে এল। জিজ্ঞোস করল, 'ভাগ্নে, তোকে জলে ডুবিয়ে দিয়ে এলাম। খাঁচার দরজা বন্ধ। তা এত তাড়াতাড়ি এলি কেমন করে?'

ছেলেটি তৃপ্তিভরে হাসল। শেষকালে বলল, 'আমি কি আর একা এখানে ফিরে আসতে পারতাম? খাঁচা তো বন্ধ, জল তো অনেক। আমার দাদু-দিদিমারা আমাকে আবার এখানে পাঠিয়ে দিল। পালকি করে পাঠিয়ে দিল। পাল্‌কি চড়ে তাই এত তাড়াতাড়ি চলে এলাম। খুব মজা।'

মামারা তাকিয়ে রয়েছে অবাক চোখে। ভাগ্নে বলে চলেছে, 'জলের তলায় ঢুকে যেতেই দাদু-দিদিমারা কাছে চলে এল, খাঁচা খুলে দিল। সঙ্গো সঙ্গো এই নতুন পোশাক, গলার হার আর হাতের বালা। পরে নিলাম। ফিরে এলাম। খুব মজা। ও, বলতে ভুলে গেছি, দাদু-দিদিমারা একটা কথা বলে দিয়েছে। ওঃ, এক্কেবারে ভুলে গেছি। অনেকদিন তোমাদের দেখেনি, তাই একবার তোমাদের ছয়জনকে দেখতে চেয়েছে। এই কথা বলে দিয়েছে। আর তোমাদের জন্য এই সোনার ভোজালি পাঠিয়ে দিয়েছে, সোনার ভোজালি। হাতে নিয়ে দেখ।'

মামাদের হাতে সে সোনার ভোজালিটা তুলে দিল। এমন সোনার বড় ভোজালি ভাগ্নে পাবে কোথা থেকে? জলের তলায় দাদু-দিদিমা না দিলে? সত্যিই, সোনার ভোজালি। মামারা অবাক হল, হিংসেতে ফেটে পড়ল।

একটু পরে জিজ্ঞেস করল, 'তাহলে, ওখানে যাওয়া যায় কেমন করে? ভাগ্নে, বল তো, কেমন করে দেখা করব বাবা-মায়ের সঙ্গে?'

ছেলেটি চোখের কোণে হাসির ঝিলিক টেনে বলল, 'খুব সোজা। মামা, সেখানে যাওয়া খুব সোজা। তোমরা এক একজনে একটা করে লোহার খাঁচা বানাও। নদীর তীরে জঙ্গালের পাশে সেগুলোকে নিয়ে যাও। ঢুকে পড় তার মধ্যে। ব্যাস, হয়ে গেল। পৌঁছে যাবে দাদু দিদিমাদের দেশে।'

কথামতো কাজে লেগে গেল ছয় মামা। লোহার খাঁচা তৈরি করল। মাথায় করে বয়ে নিয়ে গেল নদীর তীরে জঙ্গালের পাশে। ঢুকে পড়ল যে যার খাঁচার মধ্যে। পেছনে পেছনে চলছিল ভাগ্নে। সে ভালোভাবে সাবধানে ছয়জনের খাঁচার দরজা বন্ধ করে দিল। পাশাপাশি রয়েছে ছটা খাঁচা। ভেতরে ছয় মামা হাসছে। মনে আনন্দ। এখুনি পৌঁছে যাবে বাবা-মায়েদের দেশে। নতুন ঝল্‌মলে পোশাক পাবে, গলায় হার পরবে আর হাতে বালা। তার ওপরে পাবে সোনার ভোজালি। খুব মজা হবে।

বড় মামার খাঁচা গড়িয়ে দিল ভাগ্নে। কয়েকবার গড়িয়ে সেটা গিয়ে পড়ল গভীর জলে। অনেক বুদ্‌বুদ্‌ উঠল জলের ওপরে। আবার মিলিয়ে গেল। ভাগ্নে চিৎকার করে উঠল, 'মামারা, তাকিয়ে দেখ। বড় মামা দাদু-দিদিমাদের কাছে যেতেই তারা তাকে অনেকটা ধেনো মদ খেতে দিয়েছিল। তাড়াতাড়ি পচাই খেয়ে দেখ বড় মামা কেমন ভক্‌ভক্‌ করে বমি করছে, জলে কত বুদবুদ। ইস, কি বমিই না হল।'

তারপরে মেজ মামার খাঁচা ঠেলতে লাগল। খাঁচা গড়াতে লাগল। মেজ মামার মুখে হাসি, মনে আনন্দ। ঝপ্‌ করে খাঁচা গিয়ে পড়ল নদীর গভীর জলে। আবার অনেক বুদ্‌বুদ্‌। এমনি করে ছয় মামার ছটি খাঁচাই হারিয়ে গেল নদীর জলে। জল এখন শান্ত, নদী আগের মতোই বয়ে চলেছে। জঙ্গালে আর কোন খাঁচা নেই। ভাগ্নে ফিরে চলল বাড়ির পথে।

বাড়ির উঠোনে পা দিতেই ছয় মামি ভাগ্নেকে একসঙ্গে জিজ্ঞেস করল, 'তোর মামারা ফিরবে কখন?'

ভাগ্নে আড়চোখে মামিদের দিকে তাকিয়ে বলল, 'মামি, খুব তাড়াতাড়ি তো ফিরতে পারবে না। একটু তো দেরি হবেই। সবে মামারা তাদের বাবা-মায়ের কাছে পৌঁছেছে। কত দিন পরে দেখা-সাক্ষাৎ হল। সহজে কি তারা ছেলেদের ছাড়বে? একটু দেরি তো হবেই।' মামিরা নিশ্চন্ত হল।

তিন দিন তিন রাত্তির কেটে গেল। স্বামীরা তবু ফিরল না। চার রাত্তির কেটে গেল,—তবু তো কেউ এল না। আর কত দেরি হবে? এখনও কি বাবা-মায়েরা ছেলেদের ছাড়ছে না? এবার মামিরা উতলা হল। জিজ্ঞেস করল, 'ভাগ্নে, অনেক দিন তো হল। এখনও কেন তোর মামারা ফিরছে না? খুব চিন্তা হচ্ছে।'

ভাগ্নে বলল, 'এই তো ফিরল বলে। মামারা তাড়াতাড়িই ফিরে আসবে। কোন ভাবনা নেই।'

আরও তিন দিন তিন রাত্তির কেটে গেল। তবু স্বামীরা ফিরে এল না। একজনও এল না। মামিরা কান্নাভরা চোখে জিজ্ঞেস করল, 'ভাগ্নে, কই বাছা, মামারা তো তোর এখনও ফিরে এল না।'

ভাগ্নে এবার বলল, 'মামি, মামাদের ভাত আলাদা আলাদা করে ভরে নোক্‌সেক্‌-এ রেখে দাও।'

মামিরা বুকফাটা কান্নায় ভেঙে পড়ল। একথার অর্থ,—ছয় মামাই মরে গিয়েছে। হায়! ছয় স্বামীই মারা গিয়েছে। তারা আর কখনও ফিরে আসবে না। চিরকালের জন্য তারা চলে গিয়েছে। চোখের জলে বুক ভাসিয়ে মামিরা কাঁদতে লাগল। সে কি কান্না!

মামাদের ভাগ্নে অনাথ ছেলেটি খুব ধনী হয়ে গেল। অনেক টাকাকড়ি তার, রুপোর গয়না, সোনার ভোজালি, কুনকে কুনকে ভর্তি রুপোর চাক্‌তি। কত বড়লোক সে। আর কেউ বেঁচে নেই যে তাকে হিংসে করবে, তাকে কষ্ট দেবে, সর্বনাশ ডেকে আনবে। অনেক বড়লোক হয়ে ভাগ্নে সুখে-শান্তিতে বাস করতে লাগল।

যে গল্পের শেষ নেই

ছোট ছোট উঁচু-নিচু পাহাড়। মাঝখান দিয়ে বয়ে চলেছে এক নদী। নদীর দুপারে দুটি গ্রাম। চওড়া নদী, টল্‌টলে জল। দু গাঁয়ে থাকে ইঁদুর। অনেক অনেক ইঁদুর। পাহাড়ের কোলে, গাছের কোটরে তাদের সুন্দর বাড়ি। কোন দুঃখ নেই।

সব দিন সমান যায় না। একবার গাঁয়ে হল প্রচণ্ড খরা। সব ফসল জ্বলে গেল, সব ফল ছোটতেই ঝরে পড়ল, সরস বিট-গাজর মাটিতেই শুকিয়ে গেল। খাবার মতো কিছুই রইল না। নদীর জল খেয়ে তো আর বেঁচে থাকা যায় না?

পাতা-ঝরা এক গাছের নীচে সভা বসল। বুড়োরা বলল, আমরা অনেক দেখেছি। ফসল হতে আরও এক বছর লাগবে। না খেয়ে বেঁচে থাকা যাবে না। ছোটরা তো আগে মরবে। চলো, অন্য গাঁয়ে যাই। নদীর ওপারে অন্য গাঁয়ে। সুদিন এলে আবার ফিরে আসব।

বিশাল এক ডিঙিতে তারা উঠল। সবাই উঠল। ডিঙি ভেসে চলেছে। তাদের চোখে জল, তবু নতুন আশায় বুক নাচছে। খিদে আর কত সহ্য করা যায়!

মাঝ নদীতে ডিঙি। ওপার থেকে একটা ডিঙি এসেছে মাঝ নদীতে। কোথায় চলেছ? ওপারে। এপারে ভীষণ খরা। সব কিছু পুড়ে গিয়েছে। কিছু নেই খাবার। তা, তোমরা? তোমরা চলেছ কোথায়? ওপারে। এপারে সব শেষ। সব ফসল নষ্ট। কিছু নেই খাবার।

কথা নেই কারও মুখে। নদীর দুপারে দু গাঁয়ে একই অবস্থা। ওপারে গিয়ে লাভ নেই, এপারে এসে লাভ নেই। তাহলে? বাঁচার কোন পথ নেই। শুকিয়ে মরে কোন লাভ নেই। সবাই মিলে ঠিক করল, সুন্দর ঠান্ডা টল্‌টলে জলে ডুবে মরবে। সেই ভালো।

একটা ইঁদুর চু চু করে কাঁদল। লাফ দিল জলে। হাবুডুবু খেল। তলিয়ে গেল জলে। আর একটা ইঁদুর চু চু করে কাঁদল, লাফ দিল জলে। হাবুডুবু খেল। তলিয়ে গেল জলে। আর একটা ইঁদুর চু চু....আর একটা ইঁদুর........আর একটা.......আর....

আমরা এলাম কোথা থেকে

আজ আমরা সবাই এই পৃথিবীতে বাস করছি। আমরা দ্বীপে দ্বীপে থাকি। কিন্তু এমনটা চিরকাল ছিল না। আমরা তখন আকাশের ওপাশে থাকতাম। সব মানুষ ওখানেই থাকত।

একবার আমাদের সর্দারের মেয়ের খুব অসুখ করল। সে অসুখ আর সারেই না। কত বদ্যি, কত ওঝা। কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় না। শেষকালে এক নুয়ে-পড়া বুড়ো ওঝা বলল, 'মেয়ের অসুখ সারবে। তবে ওভাবে নয়। বুনো ডুমুর গাছের শেকড়ের মধ্যে মেয়ের রোগ সারাবার উপায় রয়েছে। ডুমুর গাছের গোড়ায় মাটি সরিয়ে ফেলো, নীচের শেকড়ে হাত ছোঁয়ালেই মেয়ের অসুখ সেরে যাবে।'

কয়েকজন যুবক লেগে গেল বুনো ডুমুর গাছের গোড়ার মাটি সরাতে। অনেক নীচে শেকড়। মাটি উঠছে, মাটি উঠছে, ওরা নিচু হচ্ছে, আরও নিচু। নীচের শেকড় বেরিয়ে পড়ল।

বাবা মেয়েকে ধরে ধরে গাছের গোড়ায় নিয়ে এল। মেয়ে নিচু হয়ে শেকড় স্পর্শ করতে গেল। হাত পেল না। আরও নিচু হতে হবে। মেয়ে মাথা নুইয়ে পিঠ বেঁকিয়ে আরও নিচু হল। হাত ছোঁয়াল শেকড়ে। কিন্তু টাল সামলাতে না পেরে গর্তে ঢুকে গেল। ঝুরোঝুরো আলগা মাটি, মেয়ে পিছলে গেল। গর্তে পড়ে গেল।

আকাশের ফুটো দিয়ে মেয়ে নীচে পড়ে যাচ্ছে। সবাই হাহাকার করে উঠল। কিন্তু কিছুই করার নেই। পড়ছে শুকনো পাতার মতো উল্‌টে-পালটে। নীচে পড়ছে। মেয়ে আর বাঁচবে না। কেননা, আকাশের নীচে শুধুই জল। দাঁড়াবার কোন ঠাঁই নেই। আর ওপর থেকে অত জোরে নীচে পড়লে, জলে আঘাত পেয়েই মেয়ে মরে যাবে। হায়! হায়! হায়!

এমন সময় দুটো বুনো হাঁস উড়ে যাচ্ছিল। তারা মেয়েকে দেখতে পেল। চম্‌কে উঠল। প্রাণ কেঁদে উঠল। গলা লম্বা করে পা দুটো পেছনে সোজা করে তারা উড়ে এল মেয়ের কাছে। গলা নীচে নামিয়েই দুটো হাঁস মেয়ের দেহের নীচে নেমে এল। মেয়ে এখন হাঁস দুটির পিঠে শুয়ে রয়েছে। তারা নামছে, নামছে,— নীচের জলের দিকে নামছে।

নীচে জলের ওপরে ভেসে রয়েছে বিশাল কচ্ছপ। মুখ তুলে সে আকাশের দিকে চেয়ে আছে। মেয়ে নামছে বুনো হাঁসের নরম পিঠে। কচ্ছপ তাড়াতাড়ি সব সাঁতারু জন্তুকে ডাকল ; সঙ্গে সঙ্গে সভা বসে গেল। সবাই তাকাল আকাশের দিকে। বলল, 'যেমন করে হোক মেয়েকে বাঁচাতেই হবে। তাকে আশ্রয় দিতেই হবে। আহা, আকাশের ওপাশের মেয়ে।' তাদের প্রাণ কেঁদে উঠল।

দলপতি কচ্ছপ সোনা ব্যাঙকে আদেশ করল, 'সোনা ব্যাঙ, জলের নীচে ডুব দাও। নীচে অনেক নীচে চলে যাও। জলের তলায় অনেক গাছ আছে। সেই গাছের গোড়া থেকে কাদা তুলে আনো। দেরি করবে না।'

সোনা ব্যাঙ একবার ওপরে মেয়ের দিকে তাকাল, তারপর জলে ডুব দিল। জলে কয়েকটা বুদ্‌বুদ্‌ দেখা গেল, আবার শান্ত হল জল। সবাই তাকিয়ে রয়েছে জলের সেই খানটায়, যেখানে সোনা ব্যাঙ ডুব দিয়েছিল। তাদের প্রাণ কাঁদছে। ভস্‌ করে সোনা ব্যাঙ জলে মাথা তুলল। না, সে পারেনি। জলের নীচে গাছের গোড়া থেকে কাদা তুলে আনতে পারেনি।

দলপতি কচ্ছপ শুশুককে আদেশ দিল, 'জলের নীচে গাছের গোড়া থেকে কাদা নিয়ে এসো। দেরি করবে না।' আদেশ পেয়ে পাছা উলটিয়ে শুশুক জলের নীচে ডুব দিল। তাদের প্রাণ কাঁদছে। ওপরের মেয়ে আস্তে আস্তে নেমে আসছে।

কিছুটা জল ছল্‌কে পড়ল। জলের গর্তে মুখ তুলল শুশুক। হাঁ করে নিঃশ্বাস নিচ্ছে সে। না, সে পারেনি। জলের নীচে গাছের গোড়া থেকে কাদা তুলে আনতে পারেনি।

শেষকালে কোলা ব্যাঙ নিজে থেকেই বলল, 'আমি চেষ্টা করে দেখি। কাদা তুলে আনতে পারি কিনা।'

একথা শুনেই সাঁতারু জন্তুরা আনন্দে লাফিয়ে উঠল ; তারা কোলা ব্যাঙকে উৎসাহ দিল। কিন্তু বিশাল কচ্ছপ চুপ করে রইল। গম্ভীর হয়ে বলল, 'কোলা ব্যাঙ, বেশ, তুমি চেষ্টা করে দেখো। মনে হয় তুমি পারবে। যে ভাগ্যবান সে-ই পারবে।' তাদের প্রাণ কাঁদছে।

কোলা ব্যাঙ বুক ফুলিয়ে গলা ফুলিয়ে জোরে নিঃশ্বাস টেনে নিল, তারপর মুখ-চোখ বন্ধ করে জলের নীচে ডুব দিল। নীচে, আরও নীচে। পেছনের পা দুটো লম্বা করে মাথা নিচু করে কোলা ব্যাঙ নীচে নেমে যাচ্ছে। দম আটকে আসছে, বুক ফেটে যাচ্ছে, চোখ বেরিয়ে আসতে চাইছে। তবু কোলা ব্যাঙ হাল ছাড়েনি। সবাই চেয়ে আছে সেইখানটায়, যেখানকার জলে ডুব দিয়েছে কোলা ব্যাঙ। জলের ওপরে কয়েকটা বদ্‌বুদ্‌ ফেটে গেল। কোলা ব্যাঙের মাথা জেগে উঠল জলের ওপরে। আহ্‌, কি আনন্দ। কোলা ব্যাঙের মুখে কিছুটা চকচকে বালি। কোলা ব্যাঙ পেরেছে।

বালি নিয়ে কোলা ব্যাঙ বিশাল কচ্ছপের ঢালু পিঠে ছড়িয়ে দিল। সঙ্গে সঙ্গে বিশাল কচ্ছপের পিঠে গজিয়ে উঠল একটা দ্বীপ। এই দ্বীপটিই হল বোহোল্‌ দ্বীপ। জলের বুকে প্রথম ডাঙা। বুনো হাঁসের নরম পিঠ থেকে মেয়ে নামাল এই দ্বীপে। মেয়ে বেঁচে থাকবে। তাদের প্রাণ শান্ত হল।

নাতি-নাতনিরা, খুব ভালো করে যদি কচ্ছপের পিঠ দেখ, তবে দেখবে আমাদের এই বোহোল্‌ দ্বীপের মতোই কচ্ছপের পিঠ। আসলে, কচ্ছপের পিঠই তো এই বোহোল্‌ দ্বীপ। কি মিল। এই মেয়েই আমাদের আদি মাতা। আমরা সবাই তার ছেলেমেয়ে। তখন থেকেই আমরা পৃথিবীতে থাকি, দ্বীপে দ্বীপে থাকি।

কিন্তু তখন আর এক বিপদ। মেয়ে শীতে ঠক্‌ঠক্‌ করে কাঁপছে। দাঁতে দাঁত লেগে যাচ্ছে। হাঁটুর মধ্যে মুখ রেখে মেয়ে বসে রয়েছে, মেয়ে কাঁপছে। তাদের প্রাণ আবার

কেঁদে উঠল। তার আরও আলো চাই। পৃথিবীতে তখন এত আলো ছিল না। চাই আরো আলো। তবেই মেয়ের দেহ গরম হবে।

সব সাঁতারু জন্তু মিলে আবার সভায় বলল, অনেক সলা পরামর্শ হল। ছোট্ট কচ্ছপ গলা নেড়ে বলল, আমি যদি আকাশে উঠতে পারতাম, তবে সব বিদ্যুৎ এক জায়গায় জড়ো করে অনেক আলো তৈরি করতাম। মেয়ের কষ্ট ঘুচত। শীতে এমন করে বসে থকেত হত না। সকলের প্রাণ কাঁদছে।

বিশাল কচ্ছপ গম্ভীর হয়ে বলল, 'তুমি চেষ্টা করে দেখতে পার। হয়তো তুমি পারবে। যে ভাগ্যবান সেই-ই পারবে।'

এক পাশে সরে গিয়ে ছোট্ট কচ্ছপ চুপ করে বসে রইল। সে যেতে চায় দূর আকাশে। কিন্তু কেমন করে? কেমন করে দূর আকাশে যেতে হয় তা সে জানে না। কিন্তু যেতে চায়। মেয়ের বড় কষ্ট। আহা, ও কেমন অন্ধকারে জড়সড় হয়ে বসে রয়েছে। চারিদিকে কি অন্ধকার। মেয়ে তো আলোর দেশের মেয়ে। ধব্‌ধবে আকাশ। চম্‌কানো বিদ্যুৎ। সে পারবে কেন এই অন্ধকারে থাকতে?

ভাবছে, ভাবছে,—ছোট্ট কচ্ছপ ভাবছে, বারবার আকাশের দিকে তাকাচ্ছে, আর কষ্টে মাথা নিচু করে নিচ্ছে। শেষকালে খোলের মধ্যে মুখ ঢুকিয়ে নিল। কোন আশা নেই, আকাশে উঠবার কোন পথ নেই!

হঠাৎ আকাশে মেঘগুলো কেমন ভেঙে ভেঙে যেতে লাগল। কেমন এধার ওধার সরে সরে যাচ্ছে। নীচে নেমে আসছে। হাওয়া বইছে এলোমেলো। দ্বীপের চারপাশের জলে ঢেউ। ভীষণ ঝড়। শোঁ শোঁ শব্দ। জল আছড়ে পড়ছে। দমকা হাওয়া। হঠাৎ এক দমকা ঝোড়ো হাওয়ায় ছোট্ট কচ্ছপের দেহ মাটি থেকে ওপরে উঠল। হাওয়ার বেগে আকাশের দিকে চলেছে ছোট্ট কচ্ছপ। কোন চেষ্টাই তাকে করতে হচ্ছে না। সে পৌঁছে গেল আকাশের রাজ্যে। আহ্‌, কি শান্তি। আর কষ্ট পাবে না আকাশের মেয়ে। অনেক আলো, দিনে আলো, রাতে আলো।

ছোট্ট কচ্ছপ অনেক বিদ্যুৎকে জড়ো করল,—অনেক অনেক অনেক। বেশি বিদ্যুৎ দিয়ে গড়ল একটা গোলাকার সুন্দর জিনিস, অল্প বিদ্যুৎ দিয়ে তৈরি করল আর একটা গোলাকার সুন্দর জিনিস। একটার মধ্যে বেশি সাদা উজ্জ্বল আলো। অন্যটার আলো কম, নরম মিষ্টি আলো। একটা আলো দেবে একসময়। অন্যটা অনসময়। মেয়ে বাঁচবে, মেয়ে বেঁচে রইল।

এ দুটো হল সূর্য আর চন্দ্র। একটা দিনের আলো, আরেকটা রাতের আলো। সমসময় আলো। আকাশের আলো আমাদের দ্বীপগুলোতে ছড়িয়ে পড়ে। সেদিন থেকে ছড়িয়ে পড়েছে।

ভুল খবর

অনেক অনেক কাল আগের কথা। অনেক পুরনো দিনের কথা। সেই পুরনো দিনে আমরা সবাই ছিলাম দাস, ক্রীতদাসও বলতে পার। দিন-রাতের সবটুকুই অন্যের জন্য বাঁধা ছিল। নিজের ইচ্ছে বলতে কিছুই ছিল না।

সেই পুরনো দিনে শুধু গোষ্ঠীপতি ছিল অন্যরকম। সে ক্রীতদাস ছিল না। থাকবে কেমন করে? আমরা যে তারই কাজকর্ম করতাম। সর্দারের সবকিছু করতাম। না করে উপায় ছিল না। কিন্তু এ জীবন আর ভালো লাগে না। বড় কষ্টের। কতদিন ধরে চলবে এই ক্রীতদাসের জীবন।

একদিন সন্ধ্যাবেলার অন্ধকারে তারা সকলে পাশের বনে গেল। অনেক কথা হল। শেষকালে তারা ঠিক করল, একজন দূতকে পাঠাবে দেবতার কাছে। তিনিই শুধু বুঝবেন তাদের কষ্ট। দেবতা থাকেন ওই দূর পাহাড়ের ওপারে, বন পেরিয়ে সেখানে যেতে হবে।

দূত হবে কুকুর। সেই সবসময়ের বন্ধু, কুকুর কখনও কথার খেলাপ করে না, সে বড় বিশ্বস্ত। তাছাড়া কুকুরের মতো গতি আর কার আছে? সে তাড়াতাড়ি পৌঁছে যাবে দূরের দেবতার কাছে। সেই তাহলে দূতের কাজ করুক।

বন্ধু কুকুরও রাজি। মানুষের উপকার করবে, এতে তার খুব আনন্দ। সে দৌড় দিল বন-বাদাড় পেরিয়ে। তাকে আর দেখা গেল না। গাঁয়ের মানুষ নিশ্চিন্ত হল। দেবতা এবার তাদের কষ্ট দূর করবেন।

এক গাঁয়ের পাশ দিয়ে কুকুর দৌড়ে যাচ্ছে। সে হাঁপিয়ে পড়েছে, জিভ বেরিয়ে পড়েছে, ঘামে দেহের লোম ভিজে উঠেছে, অনেক আস্তে চলেছে সে। হঠাৎ খোলা দরজার মধ্যে দিয়ে কুকুর দেখতে পেল, ঘরের মধ্যে বসে এক বুড়ি উনুনে কি যেন ফোটাচ্ছে। উনুনের মুখে শুকনো পাতা দিচ্ছে বুড়ি, হাঁড়ির চারপাশ দিয়ে আগুন বেরুচ্ছে। রান্না করছে বুড়ি।

কুকুর থেমে পড়ল। বড্ড খিদে পেয়েছে। নাহয় একটু পরেই যাওয়া যাবে। এত তাড়া কিসের? একটু কিছু খেয়ে যাই। আর যদি সময় কিছু নষ্টই হয়, খেয়েদেয়ে আরও জোরে ছুটব নাহয়। দেহে জোর পাব, দম পাব। কুকুর দোরের সামনে বসে পড়ল। জিভ চাট্‌ছে আর লেজ নাড়ছে। মাঝে মাঝে অশান্তিতে উঠে পড়ছে, আবার বসছে।

এমন সময় বুড়ি পেছন ফিরে তাকাল। দেখতে পেল কুকুরকে। তবে রে! উনুনে দেবার চেরা কাঠ নিয়ে তেড়ে গেল বুড়ি। কুঁই কুঁই করে কুকুর একটু দূরে সরে গেল। তার খিদে গেল আরও বেড়ে। বুড়ি ফিরে গেল ঘরে। আপদ যত সব।

আবার বুড়ি পেছন ফিরে তাকাল। দেখতে পেল কুকুরকে। আবার গেল তেড়ে। কুকুর আর একটু দূরে সরে গেল। বুড়ি ফিরে যেতেই সে আবার দোরের মুখে বসল। এমনি করে অনেকক্ষণ কেটে গেল। বুড়ি আর হাঁড়ি নামায় না উনুন থেকে। কুকুরও নড়ে না সেখান থেকে।

কুকুর তো ফিরছে না। কেন এত দেরি হচ্ছে? গাঁয়ের মানুষজন ব্যস্ত হয়ে পড়ল। এতক্ষণ তো কুকুরের ফেরা উচিত। একটা ছোট ছাগল-ছানা একথা শুনতে পেল। আহা! মানুষদের বড় কষ্ট। বন্ধু কুকুর শেষকালে এমন কাজ করল? নাঃ, কাউকে বিশ্বাস নেই, সেই যাবে দেবতার কাছে। সেই পৌঁছে দেবে কষ্টের কথা, সে নিজেই যাবে দেবতার কাছে। একটু বেশি সময় হয়তো লাগবে। কিন্তু উপায় কী? ছাগল ছানা রওনা দিল।

চলেছে, চলেছে, ছাগল ছানা চলেছে। যত তাড়াতাড়ি পারে সে ছুটে চলেছে। বনের মধ্যে দিয়ে তাও চলা যায়, কিন্তু পাহাড়ি পথে বড়ই কষ্ট। পায়ে লাগে, হোঁচট খেতে হয়। তবু চলেছে ছাগল-ছানা। মানুষ কত আদর করে তাকে, তার উপকার সে করবে না?

এদিকে বসেই রয়েছে কুকুর। প্রচণ্ড খিদে, তার ওপরে লোভ। সে ভুলে গেল তার কাজের কথা। এমন সময় হাঁড়ির জল টগবগ করে ফুটে উটল। কুকুরের চোখ গোলগোল হয়ে উঠল। বুড়ি গেল পাশের বড় ঘরে। কোলে তুলে আনল একটা বাচ্চা ছেলেকে। দাওয়ার ওপরে বসাল বাচ্চাটাকে। উনুনের ওপর থেকে হাঁড়িটা তুলে আনল। হাঁড়িটা রেখে আর একটা বড় হাঁড়ি নিয়ে এল। তাতে ঢেলে দিল কিছুটা ঠান্ডা জল। তারপরে....। ককুর অবাক হল। মুখ দিয়ে গোঙানি বেরিয়ে এল। বুড়ি উনুন থেকে আনা হাঁড়িটা উপুড় করে দিল। গরম ধোঁয়া-ওঠা জল পড়ল নীচের বড় হাঁড়িতে। শুধুই ফুটন্ত জল। বুড়ি চান করাতে লাগল, বাচ্চাটা জল পেয়ে খল্‌বল্‌ করে উঠল। বুড়ি চান করাচ্ছে বাচ্চাটাকে।

কুকুর লাফিয়ে উঠল। হায়! কত সময় বয়ে গেল। কিছুই তো হল না। মনে পড়ল তার কাজের কথা। ভুলে গেল খিদের কথা। লজ্জা পেল সে। দৌড় দিল, ভীষণ দৌড়।

হঠাৎ পথে দেখা ছাগল-ছানার সঙ্গে। ছাগল-ছানা পাহাড়ি পথে নেমে আসছে, আস্তে আস্তে। বড় ক্লান্ত সে।

কুকুর বলল, 'ছাগল-ছানা, এই কষ্টের পথে তুমি কোথায় গিয়েছিলে? একা একা।'

ছাগল-ছানা কিছু বলতে চাইল। সে হাঁপাচ্ছে। দম নিয়ে বলল, 'বন্ধু, তুমি এতক্ষণ কোথায় ছিলে?'

কুকুর মাথা নিচু করে নরম গলায় বলল, 'বন্ধু, অনেক দেরি হয়ে গেল। আমি যাচ্ছি দূর পাহাড়ের ওপারে। মানুষ পাঠিয়েছে আমাকে। দেবতার কাছে যাচ্ছি। একটা কথা বলতে হবে।'

ছাগল-ছানা বলল, 'তার আর দরকার নেই, আমিই গিয়েছিলাম দূর পাহাড়ে। মানুষের কথা আমি দেবতাকে বলে এসেছি। তুমি ফিরে যাও।'

কুকুর অবাক হল। কেমন আঁকুপাঁকু করতে লাগল। শেষে বলল। 'ছাগল-ছানা, দেবতার কাছে তুমি কি বললে?'

'কেন? ঠিক কথাই বলেছি। মানুষের বড় কষ্ট। মানুষ আর গোলামি করতে পারছে না। ক্রীতদাসের এই জীবন থেকে সে মুক্তি চায়। দেবতা তুমি মুক্তি দাও। মানুষ এই জীবন থেকে মুক্তি চায়, সে মৃত্যু চায়। মৃত্যুই ভালো। এ জীবনের বদলে মৃত্যু ভালো। দেবতা তাই দিলেন।'

একথা শুনে কুকুর কেমন যেন হয়ে গেল। তার পা কাঁপছে, বুকে যেন কি চেপে বসছে, চোখ ভিজে উঠছে, ঝাপসা হয়ে আসছে চারপাশ। সে বসে পড়ল।

এ কি সর্বনাশ করে এল ছাগল-ছানা। এ কি ভীষণ ভুল করে এল সে। ভুল প্রার্থনা, ভুল খবর, মানুষ তো এ মুক্তি চায়নি। অন্য মুক্তি চেয়েছিল। দেবতার কাছে গিয়ে ভুল শোধরাতে হবে।

শিকারির হাত থেকে যেমনভাবে বর্শা ছুটে যায়, ধনুক থেকে যেমন তির ছুটে যায়, আকাশ থেকে যেমন বিদ্যুৎ ছুটে আসে,—কুকুর তেমনি গতিতে পাহাড়ে উঠতে লাগল। ওপারে পৌঁছে গেল কুকুর। দেবতার বাড়িতে। দেবতা বসে রয়েছেন কাঠের আসনে।

কুকুর কিছু বলতে গেল। দেবতা ধমকে উঠলেন। একটু আগেই মানুষের আর্জি শুনেছেন। মানুষ যা চেয়েছে, তিনি তাই দিয়েছেন। আবার কেন নতুন করে আর্জি? এত ঘন ঘন মানুষের কথা শোনা সম্ভব নয়। আর নতুন করে কিছু করাও অসম্ভব। দেবতা একবার যা বলেছেন, তাই সত্য হবে। তাকে পালটানো যায় না। দেবতা নতুন করে কিছু শুনবেন না।

কুকুর অস্পষ্টভাবে কিছু যেন বলতে চাইল। দেবতা অন্য দিকে চেয়ে আছেন। তার সামনে কুকুর যে নত হয়ে বসে রয়েছে, দেবতা তা খেয়ালই করছেন না। কুকুর কয়েকবার বলতে চেষ্টা করল। ভয় পেল। পারল না। কুকুর ফিরে চলল।

বারবার হোঁচট খাচ্ছে কুকুর। চোখে কিছুই দেখতে পাচ্ছে না। এ কি হল? বন্ধু মানুষের ভাগ্যে এ কি ঘটে গেল। তারই জন্য, তারই দোষে, তারই লোভে। সে কেমন করে ফিরে যাবে গাঁয়ে। সে যদি এখনই মারা যেত অনেক ভালো হত। হায় দেবতা, এ তুমি কি করলে? দেবতারই বা দোষ কি?

সেদিন থেকে মানুষের মধ্যে মৃত্যু এল। আগে মানুষ মারা যেত না। ভুল খবরে মৃত্যু এল। আর আজও মানুষ ক্রীতদাস হয়েই রয়েছে। এ জীবন থেকে মুক্তি ঘটেনি। মৃত্যু হলে তবেই মুক্তি।

অতৃপ্ত হৃদয়

এ তো শুধু গল্প নয়! এ এক শোকগাথা। সেই কবে কোন্ অতীতে দুটি হৃদয় মিলতে চেয়েছিল, মিলন হয় নি। এ গান আজও আমরা গাই, বেদনার গান। আমাদের সমাজের সবাইকেই এই শোকগাথা জানতে হয়। বাছারা, তোমরাও শোন সেই বেদনার গান। তোমারাও বলবে।

ওই পাহাড়ের নীচে একসময় ছিল এক মস্ত গ্রাম। আজ নেই। আজ ওখানে শুধুই মাঠ। ভেড়া চরে, মোষ চরে। সেই গ্রামে ছিল এক নামজাদা গোষ্ঠীপতি। মস্ত ধনী সে। তার প্রাসাদে ছিল অফুরন্ত সোনা-হীরে-রত্ন। কিন্তু সবচেয়ে দামি রত্ন ছিল একটি। সে গোষ্ঠীপতির মেয়ে। সব ধনরত্ন এক করলেও মেয়ের সমান হবে না। দুর্লভ সে বস্তু। বাবার তাই গর্বের শেষ ছিল না।

স্বর্গের সব সুন্দরী পরীদের মাঝখানে আমাদের মাটি-পাথরের পৃথিবীর মেয়েকে রেখে দিলেও তাকেই শুধু চোখে পড়বে। মেয়ের দেহের চামড়া ছিল গলে-পড়া মোমের মতো, আলুলায়িত কেশগুচ্ছের রঙ ছিল দাঁড়কাকের গলার পালকের মতো, ঠোঁটদুটি ছিল রক্তপদ্মের মতো। এই ছিল আমাদের মেয়ে।

গ্রীষ্মকাল আমাদের বড় প্রিয়। মেয়ে সতেরোটি গ্রীষ্ম পেরিয়ে এসেছে। টলটলে পবিত্র জলের মতো স্নিগ্ধ যৌবন। এমনটি বুঝি আর হয় না। একদিন। ফুলের বাগানে ফুলের সঙ্গে খেলা করছে মেয়ে। ফুল নড়ছে, গাছ নড়ছে, সেও এদিক-ওদিক দুলছে। কে বেশি সুন্দর! ফুল না মেয়ে? বোধহয় মেয়েই।

বাগানের ওপার থেকে ভেসে এল অপরূপ সংগীত! একটি কিশোর গান গাইছে। পুরনো দিনের, হারিয়ে যাওয়া দিনের শোকগাথা। এ কি কণ্ঠ! এ কি সংগীত! হৃদয়ের সমস্ত বেদনা উজাড় করা সংগীত! কেন এই বেদনা?

মেয়ে মনে মনে বলল, 'এই সুন্দর সংগীত কে গাইছে? এমন কণ্ঠ কার? সে কোনজন?' মেয়ে এল বাগানের ওই দিকে, যেখান থেকে গান ভেসে আসছে। উঁকি দিয়ে বাগানের বাইরে দেখতে চাইল। পারল না। এমন ঘন লতা-পাতায় ছাওয়া বাগানের বেড়া, যে গাইছে তাকে দেখতে পাচ্ছে না।

বাগানের ফুল-লতা-পাতাবাহার মেয়ের বড় প্রিয়। ছেলেবেলা থেকেই সে বাগানে যায়। বাগান তার আর এক সখী। কিন্তু এদিন থেকে সময় পেলেই সে বাগানে আসে। বাগান তাকে টানে। না, ঠিক বাগান নয়, বাগানের ওপার থেকে যে গান ভেসে আসে সেই গান যেন মেয়েকে পাগল করে তুলেছে। এক অদেখা রহস্যময় শিল্পী তার মিষ্টি গানে সর্দারের মেয়ের মন চুরি করে নিয়েছে। এ ছাড়া তার আর কিছুই ভালো লাগে না। হায়, মেয়ে বোধহয় জানে না, এক অদেখা কিশোরের কাছে সে তার মনপ্রাণ দিয়ে বসে আছে। মেয়ে হারিয়ে ফেলেছে নিজেকে।

কাউকে বলতে পারে না। তার মনের জ্বালা-বেদনা-আকুতি সে কাউকেই জানাতে পারে না। গুমরে মরে নিজের মধ্যে। সে-ও তো কিশোরী! আর কত সহ্য করবে! একদিন মেয়ে অসুস্থ হয়ে পড়ল। বিছানা নিল। রোগ বেড়ে চলে। একবারটি দেখতে চায় তার হৃদয়ের আপন প্রেমিককে। এই অজানা কিশোরকে একবার দেখলেই হয়তো সে সুস্থ হয়ে উঠবে।

বাবাও পাগলের মতো হয়ে উঠল। আদরের মেয়ের এ কি হল? অনেক বদ্যি এল, ওঝা এল। অনেক মন্ত্রপড়া, অনেক শিকড়-বাকড় খাওয়া। কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না। মেয়ে দিনেদিনে আরও রোগা হয়ে যেতে লাগল। শেষকালে ওঝা-বদ্যি সাদা চুলের মাথা নেড়ে বলল, 'না, আমরা পারলাম না। এ রোগ আমরা সারাতে পারব না। আমাদের সব কৌশল, সব বিদ্যে, সব ওষুধ ব্যর্থ হল। এ রোগ অন্যরকম।' তারা মাথা নিচু করে চলে গেল। বাবা 'হায় হায়' করে উঠল।

দুঃখী বাবা বসে থাকে মেয়ের পাশে। মেয়ে কোন কথা বলে না। একদিন বাবা মেয়ের হাত নিজের কাঁপাকাঁপা হাতের মধ্যে নিয়ে আদর করছে। হঠাৎ বাবা বলল, 'সোনা, আমার ছোট্ট সোনা, কি হয়েছে বল্‌তো? লজ্জা করিস না। বাবাকে লজ্জা করতে নেই। বল্‌....'

মেয়ে ডাগর চোখে চেয়ে রইল বাবার দিকে। রক্তপদ্মের মতো সুন্দর পবিত্র মুখ লজ্জায় আরও রাঙা হল। চোখের ভাষায়ও কেমন লজ্জা-লজ্জা ভাব। মেয়ে মিষ্টি সুরে খুব আস্তে আস্তে সেই কথাটি বলল। সেই সংগীতের কথা, সেই অজানা কিশোরের কথা। বলেই মেয়ে চোখ নামিয়ে বাবার কোলে মুখ লুকিয়ে ফেলল।

বাবা ভাবল, সবই তো করা হল। তাহলে আর একটি কাজ করতে হবে। মেয়ের জন্য সর্দার সবই করতে পারে। এখন সেই রহস্যময় গায়ককে নিয়ে আসতে হবে মেয়ের পাশে। যেমন করেই হোক।

খুব বেশি চেষ্টা করতে হল না। কিশোরকে পাওয়া গেল। সে এই গাঁয়েরই ছেলে। মাঠে-মাঠে ভেড়া চরায়। তাকে সহজেই খুঁজে পাওয়া গেল। বাবা বলল, 'ওগো ছেলে, গাঁয়ের সর্দার হয়েও তোমার কাছে মিনতি করছি, একবার তুমি আমার বাড়িতে চল। আমার বাড়িতে রয়েছে একজন রোগী। সে তোমার গানে মুগ্ধ। সে তোমায় দেখতে চায়।' মেয়ের এমন অবস্থায় গাঁয়ের সর্দারও কেমন সাধারণ মানুষ হয়ে গিয়েছে। সে মিনতি জানাচ্ছে। সর্দার হলেও সে পিতা।

কিশোর কিছুই জানে না। কার রোগ, কেন রোগ। সে পবিত্র মনে সর্দারের সঙ্গে চলল। ঘরে ঢুকেই অবাক হয়ে গেল। স্বর্গের একটি পরি তার দিকে চেয়ে রয়েছে। পরি চেয়ে রয়েছে ওই কিশোরের মুখপানে, যার কণ্ঠ তাকে পাগল করে তুলেছিল। এ মেয়েকে কিশোর কোনদিন দেখেনি। এ কিশোরকে এ মেয়ে কোনদিন দেখেনি। দুজনে চেয়ে রয়েছে, অপলক চোখে। এ কি মুখ। এ কি পবিত্র চাহনি! দুজনেরই। মাটির তলা থেকে যেন জেগে উঠল মৃত আত্মা। কিশোরকে দেখামাত্র মেয়ে সুস্থ হয়ে উঠল। হাজারো ফুল পাপড়ি মেলল মেয়ের মুখে, বৃষ্টি-ধোয়া আকাশের নির্মলতা দেখা দিল মেয়ের দেহে।

কিন্তু এই সুন্দর পবিত্র মুখ এ কি সর্বনাশ ডেকে আনল? মেয়ে সুস্থ-সতেজ। আর সেদিন থেকে কিশোর বিছানা নিল। সে অসুস্থ হয়ে পড়ল। দিনে দিকে কিশোর বিছানার সঙ্গে মিশে যেতে লাগল। সে ওই পবিত্র মুখকে ভুলতে পারছে না। আর একটিবারমাত্র সে ওই পরিকে দেখতে চায়।

কিশোর আরও অসুস্থ হয়ে পড়ল। আর বোধহয় তাকে বাঁচানো যাবে না। তার বাবা ছেলের মুখ থেকে সব শুনল। চোখের জল মুছতে মুছতে গেল সর্দারের বাড়িতে। হাঁটু ভেঙে বসে হাত জোড় করে মিনতি জানাল, 'আমার ছেলের বোধহয় এবার ডাক এসেছে। ওগো সর্দার, আমাদের সর্দার, তোমার মেয়েকে একবার আমার ছেলের পাশে যেতে দাও। আমার নিভে আসা ছেলের পাশে। দয়া কর।'

সর্দার গর্জে উঠল, 'সর্দারের মেয়ে যাবে রাখালের বিছানার পাশে? আমার মেয়ে যাবে রাখলের বাড়ি? সব মর্যাদা কি ভুলে গেলে? কাকে কি বলছ?'

কিশোর রাখলের বাবা কেঁদে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল, বলল, 'একদিন তোমার মেয়ের পাশে আমার ছেলে এসেছিল। তেমনি, তেমনি একবার তোমার মেয়েকে যেতে দাও। ওই সময় বংশের কথা ভাবতে নেই। ওগো সর্দার, আমিও যে পিতা।'

সর্দার কোন কথা শুনল না। বাড়ির উঠোন থেকে রাখালের বাবাকে বের করে দিল। বাবা কাঁদতে কাঁদতে বাড়ি ফিরে এল।

ছেলে জানল আর কোনদিন ওই পবিত্র মুখ সে দেখতে পাবে না। তাকে দেখতে দেওয়া হবে না। আর একবার দেখলেই সে ধন্য হত। হয়তো বাঁচত। না, তা হবার উপায় নেই। কোথায় রাখাল আর কোথায় সর্দারের মেয়ে। পরের দিন ভোরবেলায় কিশোর মারা গেল।

কিশোরের পূর্ব-পুরুষেরা যেখানে মাটির নীচে শান্তিতে ঘুমিয়ে রয়েছে, কিশোরকেও নিয়ে যাওয়া হল সেখানে। সে-ও ঘুমিয়ে রইল মাটির নীচে। চিরকালের জন্য।

রাতের আঁধার নামে, মানুষজন বাড়ি ফেরে, চারিদিক নিঝুম। তখন মাটির তলা থেকে গান ভেসে আসে, বিষাদের গান, শোকগাথা। কখনও ভেসে আসে গভীর দীর্ঘশ্বাস, কখনও যন্ত্রণার আর্তনাদ। কখনও ভেসে আসে বুকফাটা কান্না, হাহাকার। কখনও ফিস্‌ফিস্‌ কথা,—ওগো, তোমরা একবার আমাকে দেখতে দাও। একবার। আমার প্রেমিকাকে। ওই সুন্দর পবিত্র পরিকে। আমার প্রেমিকাকে।

চারিদিকে আতঙ্ক। সূর্য ডোবার পরে কেউ আর ওপথে যায় না। যদি চেপে ধরে ওই অতৃপ্ত আত্মা! আশা-না-মেটা আত্মারা বড় ভয়ানক।

একদিন এক পুরোহিত চলেছে ওই পথে। মুখে তার দেবতার নাম। উদার আকাশের দিকে চেয়ে শান্ত পথে চলেছে পুরোহিত। হঠাৎ তার কানে এল হাহাকার ধ্বনি। শান্ত চিত্তে শব্দ লক্ষ্য করে সে এগিয়ে গেল। ভালোভাবে শুনল সেই হাহাকার। মনে মনে বলল, 'হায়, অতৃপ্ত আত্মা, তুমি চিরশান্তিতে ঘুমোতে পারছ না? সে কোন্‌জন? যাকে জীবনে না পেয়ে তুমি এভাবে কান্নায় ডুবে রয়েছ? এ আকুলতা কোন্‌ নিষ্ঠুর প্রাণের জন্য?'

গভীর রাতের অন্ধকারে নিঃসঙ্গ পুরোহিত মাটির তলা থেকে তুলে নিল সেই গায়ক হৃদয়টি। বুকে জড়িয়ে ধরল। পরম যত্নে, অশেষ প্রীতিতে। কাছেই পুরোহিতের

ছোট্ট মন্দির। সেখানে এসে একটি সুন্দর পাত্রের মধ্যে রেখে দিল সেই হৃদয়কে। তারপরে মাথা নুইয়ে চোখ বন্ধ করে বলল, 'অতৃপ্ত হৃদয়, আজ থেকে আমার সমস্ত প্রার্থনা তোমাকেই করব, তোমার উদ্দেশেই আমি সব মন্ত্র উচ্চারণ করব। হয়তো তোমায় শান্তি দিতে পারব। একটি অতৃপ্ত হৃদয়কে ঘিরে আজ থেকে আমার সকল সাধনা।' আকাশে মেঘ জমে বৃষ্টি হয়, করুণা আর দয়ার এক বিরাট মেঘখণ্ড হল এই পুরোহিতের হৃদয়।

দিন যায়, রাত যায়, মাস বয়ে চলে। আকাশের চাঁদ নিজের পথ পাল্‌টায়। পুরোহিত সব মন্ত্র উচ্চারণ করে অতৃপ্ত হৃদয়কে ঘিরে। চিরশান্তি লাভ করুক এই হৃদয়,—পুরোহিতের সব সাধনা একে ঘিরেই। কিন্তু সব ব্যর্থ হল। হৃদয় শান্তি পেল না। পাত্রের মধ্যে প্রতিদিন হৃদয় কেঁদে ওঠে, হাহাকার করে, দীর্ঘশ্বাস ফেলে, গান গেয়ে ওঠে। বেদনার গান। কখনও ফিস্‌ফিস্‌ করে বলে,—একবার দেখতে দাও আমার প্রেমিকাকে। তার পবিত্র মুখ কিছুতেই ভুলতে পারছি না।

শেষকালে একদিন সর্দারের মেয়ে এল সেই নির্জন মন্দিরে। তাদের বাড়িতে তাকে দেখাশোনা করে এক বুড়ি। তার সঙ্গে মেয়ে এল। আজ পুণ্য দিন। দেবতার পায়ে ধূপ জ্বালিয়ে প্রণাম করতে এসেছে মেয়ে।

নত হয়ে ধূপ জ্বালাচ্ছে মেয়ে। হঠাৎ চম্‌কে উঠল মেয়ে। ধূপকাঠি পড়ে গেল হাত থেকে। অতি-চেনা কার কণ্ঠস্বর ভেসে আসছে? খুব কাছ থেকে। কোথায় শুনেছি এ কণ্ঠ? কোথায়? কোথায়?

অপরূপ ভঙ্গিতে উঠে পড়ল মেয়ে। নিঃশব্দ পায়ে মন্দিরের মধ্যে হেঁটে চলল মেয়ে। এদিক থেকে ওদিকে। এগিয়ে গেল ওই দিকে, যেদিক থেকে হৃদয়-নিংড়ানো কণ্ঠ ভেসে আসছে। কিন্তু কেউ তো নেই? হঠাৎ সে পুরোহিতের ছোট্ট কুঠুরিতে ঢুকে পড়ল। মনে হয়, শব্দ আসছে ওখান থেকেই। দেখতে পেল, একটি পাটাতনের ওপরে বসানো রয়েছে একটি সুন্দর পাত্র। শুধু একটি পাত্র। অপরূপ কারুকাজ করা পাত্র। ওই পাত্রের ভেতর থেকেই কি কণ্ঠস্বর শোনা যাচ্ছে? বেদনার হাহাকার?

হঠাৎ মন্দিরের চারপাশের গাছ থেকে অসংখ্য চড়ুই পাখি একসঙ্গে বলে উঠল, 'ওগো সুন্দরী মেয়ে, ওগো স্বর্গের পরি একবার ওই পাত্রের ভেতরে তাকাও, মুখ নিয়ে যাও পাত্রের ওপরে।'

এ কি? পাখিরা তাকে এই পাত্রের মধ্যে তাকাতে বলছে কেন? কোন অমঙ্গল? কোন অশুভ ইঙ্গিত? কিংবা অন্যকিছু? এক মুহূর্তের জন্য মেয়ে দ্বিধা করল। কুণ্ঠায় বিব্রত হল। কিন্তু পর মুহূর্তেই মেয়ে এগিয়ে গেল পাত্রের কাছে, কম্পিত হৃদয়ে, বিস্মিত চোখে।

কাঁপাকাঁপা হাতে পাত্রের ঢাকনা তুলে ফেলল মেয়ে। আস্তে পাশে রেখে দিল। বুক কাঁপছে। প্রস্ফুটিত রক্তপদ্ম নত হল পাত্রের ওপরে। পবিত্রতা ঝরে পড়ছে। আর সেই মুহূর্তে........

নিস্তব্ধ হল পাত্র। হাহাকার থেমে গেল। কান্না মিলিয়ে গেল। অতৃপ্ত হৃদয় যা চেয়েছিল তা পেল। একটিবারের দেখা। শেষবারের মতো দেখা। শান্তি, শান্তি, শান্তি চারিদিকে। রক্তপদ্ম তবু চেয়ে রয়েছে পাত্রের ভেতরে, রক্তপদ্মের পাপড়িতে কয়েক ফোঁটা শিশিরবিন্দু।

আমাদের ছোট বোন

সবুজ বনে-ঢাকা এক পাহাড়ি ঢালুতে ছিল এক গ্রাম। সেই গ্রামে থাকত একজন লোক আর তার বউ। তাদের ছিল সাত মেয়ে। সবাইকেই কাজ করতে হত। খুব খাটতে হত। এতগুলো মুখ, এতগুলো পেট,—অনেক খাবার লাগত।

পাশেই ছিল একখণ্ড জমি। সেই জমিতে তারা চাষ করত। এইরকম একবারের কথা। বাবা-মা চাষ করেছে সেই জমিতে। মাটি বেশ নরম হয়েছে। এখন বীজ বুনতে হবে। ধানের বীজ ছড়াতে হবে। বাবা-মা আর পারছে না। তাই মেয়েদের বলল, 'ভালোভাবে ধানের বীজ ছড়াও। সাবধানে পা ফেলবে।'

মেয়েরা এর আগে অনেক রকম কাজ করেছে। কিন্তু বীজ ছড়ানোর কাজ তেমন ভালোভাবে জানত না। আলতোভাবে বীজ ছড়াতে হবে। নইলে ধান ভেঙে যাবে, তার খোসা উঠে যাবে। হলও তাই। ধানের খোসা গেল উঠে, ভেতরের চাল গেল ভেঙে। এ বীজ মাটিতে ছড়িয়ে লাভ কি? মা ভীষণ রেগে গেল। খুব বকাবকি করতে লাগল। কত ক্ষতি হয়ে গেল। এমনিতেই কত অভাব। কাজে একটুও মনোযোগ নেই। আরও কত কি বলল মা।

মা তো এমন করে আগে কখনও বকেনি। এমন কি অপরাধ করেছে তারা? ভীষণ অভিমান হল বড় মেয়ের। সে কেঁদে ফেলল। আচম্‌কা গড়িয়ে পড়ল মাটিতে। আর পাহাড়ি ঢালুতে গড়িয়ে গেল। ঘুরতে ঘুরতে পড়ছে সে। জমির ওপর দিয়ে গড়িয়ে গেল সে। পাক খেয়ে নেমে যাচ্ছে সে। পাহাড়ি শক্ত মাটিতে, কাঁটাঝোপে, ঘাসের ছুঁচলো আঘাতে তার দেহ কেটে ছড়ে একাকার হয়ে গেল। রক্ত ঝরছে সারা দেহে। গলগল করে রক্ত পড়ছে। মেয়ে নিথর হয়ে গেল।

পরের দিন মেজ মেয়ে এমনি করেই ইচ্ছে করে গড়িয়ে পড়ল। দিদির পথে। তারও একই দশা হল। শেষকালে সে-ও নিথর হয়ে গেল।

পর পর ছয় দিন ছয় মেয়ে এমনি করে পাহাড়ি ঢালুতে গড়িয়ে পড়ল। একজন হঠাৎ, অন্য পাঁচজন ইচ্ছে করে। সবাই শেষকালে নিথর হয়ে গেল।

ছোট মেয়েও ঠিক করল, দিদিরা যে পথে গিয়ে নিথর হয়ে গিয়েছে, সে-ও তাই করবে। দিদি যেখানে দাঁড়িয়েছিল ছোট বোন সেখানে গিয়ে দাঁড়াল। কেউ নেই। কি সুন্দর দিন। নিথর হতে ইচ্ছে করছে না। কিন্তু দিদিরা কেউ তো সঙ্গী নেই! কি হবে বেঁচে থেকে? গড়িয়ে পড়ল ছোট বোন। কিন্তু পড়েই সে কেঁদে উঠল। হাত দিয়ে কিছু ধরতে চেষ্টা করল। কিন্তু পারল না। গড়িয়ে যাচ্ছে। কাঁদছে। দুহাতে কিছু আঁকড়ে ধরতে চাইছে, পারছে না। ক্ষতবিক্ষত দেহে গড়িয়ে যাচ্ছে।

পাহাড়ি ঢালুর এক জায়গায় ছিল একটা মস্ত গাছ। ছোট বোনের দেহ গিয়ে লাগল সেই গাছের গুঁড়িতে। আশ্চর্য, মেয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল। কোথায় চলে গেল ছোট

বোনের দেহ? আর কোনদিন কেউ তার দেহ খুঁজে পায়নি। তার নিথর দেহ কেউ দেখেনি।

অল্পক্ষণ পরেই চারপাশেই সুন্দর সব গাছ গজিয়ে উঠল। গাছে গাছে সুন্দর সব পাকা ফল ঝুলছে। ঠিক যে জায়গায় মেয়ে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল, তারই চারপাশে এ সব ফলের গাছ। আগে ছিল না।

তার নরম দেহের নরম মাংস থেকে জন্মাল সাদা ধব্‌ধবে ধানের ছোট্ট ছোট্ট চারা,— এই ধান থেকেই আমাদের এখানে সবচেয়ে ভালো চাল হয়। তার কচি কচি হাড় থেকে জন্মাল সাধারণ চাল। আর তার অপরূপ সুন্দর লাল রক্ত থেকে জন্মাল লাল রঙের চাল। ছোট মেয়ে যখন হাসত সবাই অবাক হয়ে চেয়ে থাকত। এমন মিষ্টি হাসি, মুক্তোর মতো দাঁত। ঝিনুকের মধ্যে যেমন মুক্তো হাসে, তার হাসিভরা মুখেও মুক্তো ঝরত। তার মুক্তোর মতো দাঁত থেকে জন্মাল ভুট্টা। অনেক হয়, আমাদের গোলা ভরে যায়। মেয়ে ছিল মুক্তকেশী। মন ভরে যেত। মাথা-ভর্তি কালো চুলের রাশি। সেই মাথা থেকে জন্মাল নারকেল। অনেক অনেক হয়। আমাদের দ্বীপের চারপাশে।

আমাদের আদরের মেয়ে, ছোট বোন চলে গেল। আর কোনদিন ফেরেনি। কিন্তু সে আমাদের অনেক দিয়ে গেল। প্রতিটি ফসলের পরবে তাই আমরা তার গান গাই। বেদনার গান, খুশির গান।

স্মৃতি-ঘেরা পাথর

সেকালের কথা সবাই ভুলে গিয়েছে। সেই ভুলে-যাওয়া কালে এক গাঁয়ে থাকত একটা লোক। সে ছিল খুব ধনী। তার ছিল এক মেয়ে। অমন ফুটফুটে সুন্দরী মেয়ে ওই গাঁয়ে আর একটাও ছিল না। বাবা-মায়ের বড় আদরের মেয়ে সে।

মেয়ে বড় হল। মেয়ের বিয়ে ঠিক হল। দূরের গাঁয়ের এক অপরূপ সুন্দর ছেলের সঙ্গে বিয়ে। বিয়ের দিন ছেলের বাড়ি থেকে সুন্দর একটা পাল্‌কি এল। সেই পাল্‌কি চড়ে মেয়ে যাবে তার নতুন বাড়িতে।

মেয়ে রওনা হল পালকিতে চড়ে। দরজা খোলা। ভেতরে বসে রয়েছে বউ, নতুন সাজে। আরও সুন্দর লাগছে তাকে। পাল্‌কির পাশে মা কাঁদতে কাঁদতে চলেছে, মায়ের বুক ভেঙে যাচ্ছে। কতদূরে যাচ্ছে। আদরের ছোট মেয়ে। পাল্‌কির আশেপাশে পেছনে গাঁয়ের সব লোক। শেষ বিদায় জানাতে এসেছে গাঁয়ের মেয়েকে। তাদের চোখেও জল। পাল্‌কির মধ্যে মেয়ের বুকের কাছটাও ভিজে উঠছে, অঝোরে জল পড়ছে।

গাঁয়ের সীমানায় তারা এল। এর পরেই মেয়েকে ছেড়ে যেতে হবে। দুপাশে উঁচু পাহাড়। পাহাড়ের মাঝখান দিয়ে সরু পথ। হঠাৎ আকাশে দেখা দিল এক টুকরো কালো মেঘ। ঠিক পাল্‌কির ওপরে। মায়ের বুক কেঁপে উঠল, এ কি অলক্ষণ। মা কেঁদেই চলেছে। এখন কি হবে? আমরা কি করব?

মেঘ নেমে আসছে। আস্তে। মেঘ নেমে আসছে। জোরে। আরও জোরে। আরও জোরে। মেঘ নেমে এল পাল্‌কির একেবারে কাছে। একটানে ছিনিয়ে নিল নতুন বউকে। বউ দিশেহারা। কিছু ভাববার আগেই মেঘ মেয়েকে নিয়ে পাহাড় ছাড়িয়ে উঠে গেল। আর কিছু দেখা গেল না। না মেঘকে না মেয়েকে।

মা আছড়ে পড়ল মাটিতে। হাউ হাউ করে কাঁদতে লাগল। মা যেন একটা পাগলি। চিৎকার করে বলল, 'আমি মেয়েকে ফিরিয়ে আনবই। যা থাকে কপালে। ভয় করি না কিছুকে।'

পরের দিন ভোরবেলা মা গাঁ থেকে বেরিয়ে পড়ল। গাঁয়ের মানুষজন মাকে বিদায় জানাল। এই পথেই মেয়ে গতকাল চলেছিল তার নতুন বাড়িতে। মা সে পথেই চলল।

পাহাড় ডিঙিয়ে, মাঠ পেরিয়ে মা চলেছে। একটুও বিশ্রাম নেয় নি। মেয়েকে খুঁজে বের করতেই হবে। আহা, তার আদারের রত্ন। সূর্য ডুবে গেল ওই পাহাড়ের ওপারে। আঁধার নেমে এল। এবার তো পথ দেখা যাবে না। রাতে অপেক্ষা করে আবার সকালে পথে বেরোতে হবে। কিন্তু রাতে থাকবে কোথায়?

হঠাৎ অল্প দূরে মা একটা মন্দির দেখতে পেল। চেঁচিয়ে বলল, 'সারাদিনের পথ চলায় আমি বড় ক্লান্ত। আমাকে হয়তো পাগলির মতো দেখতে লাগছে। কি করব, আমি যে

আমার মেয়েকে খুঁজতে বেরিয়েছি। আমাকে কি এই মন্দিরে আজ রাতের মতো থাকতে দেবে? কাল সকালেই আমি চলে যাব। শুধু আজ রাতটুকু থাকতে চাই।'

মন্দির থেকে বেরিয়ে এল এক পুজারিণী। দেবীর মতো সে দেখতে। শান্ত স্বরে মাকে ডেকে বলল, 'তোমায় থাকতে দিতে পারি। কিন্তু শোবার মতো কিছু নেই, খেতে দেবার মতো কিছু আমার নেই। তুমি থাকতে পার।'

মা মন্দিরে ঢুকল। পা আর চলে না, চোখ আর খুলে রাখা যায় না। মা মেঝেতে শুয়ে পড়ল। একটু পরেই ঘুমিয়ে পড়ল। গভীর ঘুম। পুজারিণী নিজের পোশাক খুলে মায়ের দেহের ওপর পেতে দিল। আহা, বড় ক্লান্ত সে।

পুজারিণী মায়ের পাশে একটু দাঁড়াল। তারপর বলল, 'আমি জানি তুমি কোথায় চলেছ। তুমি চলেছ তোমার মেয়েকে খুঁজতে। মেয়ে রয়েছে হিংসুটে রাক্ষসের প্রাসাদে। এই সামনের নদী পেরোলেই তার প্রাসাদ। নদীর পাশেই রয়েছে সরু সাঁকো। সাঁকো পেরোলেই রাক্ষসের প্রাসাদের দরজা। দরজা খোলা। কিন্তু সাঁকোর ওপরে পাহারা দিচ্ছে দুটো কুকুর। একটা বড়, একটা ছোট। যে সাঁকোতে পা দেবে তাকেই ছিঁড়ে ফেলবে। পারবে না যেতে। তবে হ্যাঁ, একটা উপায় আছে। ঠিক দুপুর বেলা অল্পক্ষণের জন্য কুকুর দুটো ঘুমোয়। খুব অল্পক্ষণ। তখন সাঁকোয় উঠতে পারবে। তবু খুব সাবধান। আর এক বিপদ। সাঁকোর ওপরে ছড়ানো রয়েছে গোল গোল পুঁতি। অনেক পুঁতি। সাবধানে পা ফেলতে হবে। একবার পা ফসকালেই সর্বনাশ। আছাড় খেয়ে নীচে পড়বে, পড়বার শব্দে কুকুর উঠবে জেগে। মৃত্যুফাঁদ। মারাত্মক ওই পথ।'

সকালবেলা এক রকমের খস্‌খস্‌ আওয়াজে মায়ের ঘুম ভেঙে গেল। মা অবাক হয়ে চেয়ে রইল। মা শুয়ে রয়েছে সবুজ ঘাসের ওপরে, চারিদিকে নলখাগড়ার বন। কোথায় গেল মন্দির, কোথায় গেল পুজারিণী। সকালের হাওয়া লেগে নলখাগড়ার বন কাঁপছে আর তাই থেকে কেমন আর্তনাদ বেরিয়ে আসছে। হাহাকার....শুধুই হাহাকার। মায়ের মাথার তলায় শুধু রয়েছে পাথরের একটা বালিশ। পাথরটি সুন্দর।

মা উঠে বসল। আপন মনে বলল, 'পুজারিণী, তুমি কে তা জানিনা। তুমি আমায় বাঁচিয়েছ। আমি পথ জেনেছি তোমার কাছে। তোমাকে প্রণাম।'

মা এগিয়ে গেল নদীর দিকে। অল্প দূরেই নদী। সাঁতরে পেরিয়ে গেল নদী। ওপারে যেতেই মা সামনেই সাঁকো দেখতে পেল। সাঁকোর ওপরে একেবারে সামনে দুটো কুকুর। একটা বড়, একটা ছোট। সব চিনতে পারল মা। গাছের আড়ালে বসে রইল। ভেজা পোশাক গায়েই শুকিয়ে গেল।

মা হঠাৎ তাকিয়ে দেখে, কুকুর দুটো ঘুমোচ্ছে। এই তো সুযোগ। কিন্তু মনে পড়ল ছড়ানো পুঁতির কথা। কুকুরদের ডিঙিয়ে মা চলে গেল। পুঁতির ওপর দিয়ে চলা বড় কষ্ট। যদি কিছু হয়। মেয়েকে কি দেখতে পাব না? যদি পড়ে যাই! মা পেরিয়ে গেল সাঁকো। সাঁকো পেরিয়েই বাগান। সুন্দর বাগান। বাগানে ঢুকেই মা মেয়ের গান শুনতে পেল, তাঁত বুনছে আর গান গাইছে। এ গান মেয়ে গাঁয়ে থাকতে গাইত। তাঁত বোনার সময়। এখনও গাইছে। মায়ের গলা ধরে আসছে। মা ডাকল, 'আমার সোনা মেয়ে।'

সঙ্গে সঙ্গে জানলা দিয়ে মেয়ের মুখ দেখা গেল। হাসিতে ভরা মুখ। বাগান দিয়ে দৌড়ে আসছে মেয়ে। দুজন দুজনকে জড়িয়ে ধরল। মেয়ে মাকে নিয়ে ঘরের ভেতর চলে

গেল। মায়ের চেহারা দেখে মেয়ে এবার কেঁদে ফেলল। মাকে কিছু খেতে দিল। তারপর বলল, 'মা, অল্পক্ষণ পরেই রাক্ষস অসবে। তোমাকে দেখতে পেলেই ভীষণ বিপদ। সর্বনাশ। তোমাকে লুকিয়ে রাখতে হবে।'

মা বলল, 'রাক্ষস দেখতে কেমন রে?'

মেয়ে বলল, 'মানুষের চেহারার মতোই। তবে একটু বড়। মাথায় শিং আছে, সামনের দাঁতদুটো বড়। দেহে ভীষণ শক্তি, খুব হিংসুটে। দেহের রঙ নীলচে। আর সময় নেই মা, তুমি এই পাথরের সিন্দুকে ঢুকে পড়ো।'

এমন সময় রাক্ষস ঘরে ঢুকল। ঘরে ঢুকেই সে রাগে ফেটে পড়ল, 'মনে হচ্ছে ঘরের মধ্যে মানুষ আছে। আমি গন্ধ পাচ্ছি। কোথায় মানুষ?'

মেয়ে বলল, 'কই, আমি তো কিছুই জানি না। মানুষ কোথায়? আমি জানব কেমন করে?'

রাক্ষস বলল, 'ঠিক আছে, বাগানের ফুলগাছ দেখে আমি ঠিক বুঝতে পারব। আমাকে ফাঁকি দেওয়া?'

এখন হয়েছে কি, বাগানে রাক্ষসের একটা জাদু ফুলগাছ ছিল। সেই ঘরে যে কজন থাকবে ফুলগাছেও সেকটা ফুল ফুটে থাকবে। সেই ফুল দেখেই রাক্ষস সব বুঝতে পারবে। বাগানে গিয়ে রাক্ষস দেখতে পেল গাছে তিনটে ফুল রয়েছে। রাগে কাঁপতে কাঁপতে রাক্ষস ফিরে এল ঘরে। 'কোথায় তুমি আর একজনকে লুকিয়ে রেখেছ? আমি তুমি। আর একজন কোথায়?' চারিদিকে দেখতে লাগল রাক্ষস। সে ভীষণ ক্ষেপে গিয়েছে। এই বুঝি মেয়েকে মেরে বসে। রাক্ষস গায়ে হাত তুললে আর রক্ষা নেই। যা বলবান।

মেয়ে কিছু বলতে পারছে না। মাথায় কিছু আসছে না। সব তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে। আজ বুঝি নিস্তার নেই। হঠাৎ মেয়ের মাথায় বুদ্ধি খেলে গেল। ঠোঁটের কোণে হেসে মেয়ে লজ্জা লজ্জা ভাব করে বলল, 'আমার পেটে ছেলে রয়েছে। তাই হয়তো তিনটে ফুল ফুটে রয়েছে। তোমার ছেলে।'

'আমার ছেলে?' আর কিছু বলল না রাক্ষস। সে পালটে গেল। কোথায় গেল তার রাগ, কোথায় গেল হম্বিতম্বি। সে আনন্দে লাফিয়ে উঠল। মাথা মেঝেতে রেখে পা দুটো ওপরে তুলে দিল। মেঝেতে গড়াগড়ি খেল, সাত পাক ডিগবাজি খেল। কি আনন্দ, কি ফুর্তি!

ঘরের বাইরে সাঙ্গাপাঙ্গাদের চিৎকার করে ডাকতে লাগল। 'অনুচর, আমার অনুচর, তোমরা তাড়াতাড়ি এসো। ধেনো মদ নিয়ে এসো। বাজনা বাজাও। আমার ছেলে। ফুর্তি করো। কুকুর দুটোকে মেরে মাংস বানাও। নাচের আয়োজন করো। তাড়াতাড়ি। আমার ছেলে।'

আনন্দে নাচছে রাক্ষস। অনুচরেরাও খুশি, তারাও নাচছে। তারাও চিৎকার করছে, 'ধেনো আনো, বাজনা বাজাও, কুকুর দুটোকে মেরে ফেলো, বড়টাকে, ছোটটাকে। প্রভুর ছেলে।'

আনন্দে দিশেহারা হয়ে রাক্ষস প্রচুর ধেনো মদ খেল। আর ঠিক থাকা যাচ্ছে না। দেহ অবশ হয়ে আসছে, চোখের পাতা ভারি হয়ে উঠেছে। রাক্ষস ঘুমিয়ে পড়ছে।

বউকে জিজ্ঞেস করল, 'বউ, আমার খুব ঘুম পেয়েছে। আমার শোবার কাঠের সিন্দুক কোথায় ? আর পারছি না।'

বউ একথা শুনে মনে মনে শান্তি পেল। কিন্তু সে ভাব সে প্রকাশ করল না। খুব আদর করে রাক্ষসকে ধরল, আস্তে আস্তে সিন্দুকের কাছে নিয়ে গেল, যত্ন করে তাকে শুইয়ে দিল। তারপর পর পর সাতটা ডালা বন্ধ করল, সাতটা ডালাতেই একে একে তালা লাগাল। রাক্ষস এখন অনেক ভেতরে, গভীর ঘুমে ঢলে পড়েছে।

মেয়ে তাড়াতাড়ি মায়ের পাথরের সিন্দুক খুলে ফেলল। মা জেগেই ছিল। দুজনে পালাল রাক্ষসের বাগান পেরিয়ে। বড় কুকুর, ছোট কুকুর টুকরো টুকরো হয়ে রাক্ষসের পেটে রয়েছে, তাই ভয়ের কিছু নেই। তারা অনেকটা নিশ্চিন্ত। তারা তাড়াতাড়ি রাক্ষসের সেই বিরাট ঘরে ঢুকে পড়ল। সেখানে রয়েছে প্রকাণ্ড রথ, মাঝারি রথ, ছোট রথ, ছোট জাহাজ, বড় জাহাজ। 'কোনটা নিলে আমরা খুব তাড়াতাড়ি পালাতে পারব ?' মা-মেয়ে ঠিক করতে পারছে না। এদিকে সময় নষ্ট করা চলবে না। এমন সময় ঘরে দেখা দিল সেই পুজারিণী। সে বলল, 'রথে তেমন জোরে যাওয়া যাবে না। তোমরা ছোট জাহাজ নাও। নদীর জলে তিরবেগে ছুটবে ছোট জাহাজ। দেরি করে লাভ নেই।'

মা-মেয়ে জাহাজে চড়ল। জাহাজ বয়ে চলেছে তিরের গতিতে। নদীতে অনেক জল। হাওয়ায় ভেসে চলেছে জাহাজ। মা-মেয়ের মুখে হাসি।

রাক্ষস হঠাৎ জেগে উঠল। তার গলা শুকিয়ে গিয়েছে, বুক হাঁইফাঁই করছে। ভীষণ তেষ্টা পেয়েছে। চিৎকার করে বলল, 'বউ, তেষ্টা পেয়েছে, বুকের ছাতি ফেটে যাচ্ছে, এক্ষুনি জল দাও। জল দাও।'

অনেক বার ডাকল রাক্ষস। কে শোনে কার কথা। বউ তো সাড়া দিচ্ছে না। তবে কি.. ? প্রচণ্ড শব্দে কাঠের সিন্দুকের সাতটা ডালা ভেঙে গেল। রাক্ষস বেরিয়ে এল। ঘরে নেই কেউ। তবে কি... ? এ ঘরে ও ঘরে খুঁজল। কোথাও নেই কেউ। 'তাহলে ? মানুষের মেয়ে পালিয়েছে ? শয়তান কুকুর।' হুংকার দিল রাক্ষস। দুঃখে-রাগে তার বুক ফেটে যাচ্ছে। অনুচরেরা নেশার ঘোরে এখানে ওখানে পড়ে ছিল। লাথি মেরে রাক্ষস তাদের জাগিয়ে দিল। প্রভুর হুংকারে তাদের নেশা ছুটে গেল। রাক্ষস ছুটে গেল বিরাট ঘরে। দেখল, একটা ছোট জাহাজ নেই। ছুটে গেল নদীর পারে। বহুদূরে দেখতে পেল, জাহাজ চলেছে। প্রায় অদৃশ্য হয়ে এসেছে জাহাজ। তাহলে ?

অনুচরেরা রাক্ষসের পেছনে। রাক্ষস বলল, 'হাঁটু জলে নেমে পড়। নদীর সব জল গিলে ফেলো। দেরি নয়।'

অনুচরেরা কাজে লেগে গেল। সোঁ সোঁ শব্দ হচ্ছে, চোঁ চোঁ জল গিলছে তারা। মা-মেয়ে দেখল, জাহাজ হঠাৎ থেমে গেল। জাহাজ আর সামনে যাচ্ছে না, পেছনে চলেছে। আস্তে, জোরে, আরও জোরে, তিরের গতিতে জাহাজ চলেছে রাক্ষসের প্রাসাদের দিকে। এ কি হল ? এ কি হল ? তাদের মুখ শুকিয়ে গেল, বুক কাঁপছে। মা আছড়ে পড়ল কাঠের পাটাতনের ওপর।

অল্পক্ষণ পরেই রাক্ষস তাদের ধরে ফেলবে। আর তারপর ? মা-মেয়ে সব আশা ছেড়ে দিল। উদাস চোখে চেয়ে রইল। দুপারের পাহাড় গাছ পেছনে সরে সরে যাচ্ছে।

এমন সময় জাহাজে দেখা দিল সেই পূজারিণী। সুন্দর পবিত্র বেশে সে দাঁড়িয়ে রয়েছে। 'তোমরা দুজনে শুধু দাঁড়িয়ে রয়েছ? এখুনি রাক্ষসের হাতে গিয়ে পড়বে।'

কি করবে তারা? কিছুই বুঝতে পারছে না।

পূজারিণী বলল, 'তোমরা কি জান না রাক্ষসরা সবচেয়ে পবিত্র জিনিস দেখলে হাসতে থাকে? পবিত্র জিনিস দেখাও। পৃথিবীর সবচেয়ে পবিত্র জিনিস মেয়েদেরই আছে। তা হল তাদের দুটি বুক। শিশু মানুষ হয় বুকের দুধ খেয়েই। খুলে ফেল তোমাদের বুকের আবরণ।'

মা ও মেয়ে তাদের বুকের কাপড় খুলে ফেলল। পূজারিণী খুলে দিল নিজের বুকের কাপড়। পৃথিবীর সবচেয়ে পবিত্র ছ'টি বুক।

তাদের দিকে চোখ পড়তেই রাক্ষসেরা হাসতে লাগল। খুব স্পষ্ট সবকিছু দেখা যাচ্ছে। কেননা, জাহাজ খুব কাছে। তারা দেখছে আর হেসে হেসে গড়িয়ে পড়ছে। গড়িয়ে পড়ছে আর মুখ দিয়ে জল বেরিয়ে আসছে। যেমন করে পাহাড় থেকে ঝরনা নামে। জাহাজ থেমে গেল। জাহাজ চলতে শুরু করল। এবার অন্যদিকে। রাক্ষসের প্রাসাদ থেকে দূরের পথে। বুক খোলাই রয়েছে। রাক্ষসেরা হাসছেই। ওরা কি পাগল হয়ে গিয়েছে? একবার সোজা হচ্ছে, আবার হাসির দমকে দেহ বেঁকে যাচ্ছে। নদীর জল বেড়ে যাচ্ছে, তাতে স্রোত এল, জাহাজ চলল দূরে, বহু দূরে। রাক্ষসের প্রাসাদ আর দেখা যাচ্ছে না। আঃ কি শান্তি।

মা-মেয়ে বারবার নত হয়ে পূজারিণীকে প্রণাম জানাল। 'পূজারিণী, তুমি না থাকলে আমরা এই বিপদ থেকে বাঁচতাম না। তুমি প্রথম থেকে কত উপকারই না করলে। তোমাকে প্রণাম।'

পূজারিণী মধুর হেসে বলল, 'আমি পূজারিণী নই। আসলে আমি হলাম পাথরের স্মৃতিস্তম্ভ। যে স্মৃতিস্তম্ভে মাথা রেখে তুমি মন্দিরে ঘুমিয়েছিলে। স্মৃতিই তো সব। তার প্রতীক আমি পাথরের রূপে থাকতে ভালোবাসি। আমি খুব খুশি হব, প্রতি বছর যদি তুমি একটা করে পাথরের স্মৃতিস্তম্ভ তৈরি কর। সেই পাথরটার পাশে রাখবে। প্রতি বছর একটা করে। এতেই আমার সবচেয়ে বেশি আনন্দ। স্মৃতিই সব।' সাদা মেঘের মধ্যে মিলিয়ে গেল পবিত্র পূজারিণী।

মা-মেয়ে বাড়িতে ফিরে এল। পথে আর কোন বিপদ ঘটেনি। গাঁয়ের সবাই খুব খুশি।

মা-মেয়ে পূজারিণীর কথা ভোলেনি, সারা জীবন ধরে তারা প্রতিশ্রুতি রেখেছে। প্রতি বছর পূজারিণীর নামে একটি করে পাথরের স্মৃতি তৈরি করেছে। কখনও ভোলেনি। তাই তো আমাদের এই সুন্দর দেশ জুড়ে কত পাথরের স্মৃতিস্তম্ভ। স্মৃতি-ঘেরা পাথরই ছিল পূজারিণীর সবচেয়ে প্রিয়।

অগ্নিকুমার

সেই পুরনো কালে এক গাঁয়ে ছিল এক সর্দার। সবাই তাকে মানত। অনেক দিন পরে তার এক ছেলে হল। বড় আদরের ছেলে। বাবা-মায়ের আদরের ছেলে। ছোট্ট ছেলের হাসিতে দুষ্টুমিতে বাড়ি ভরে থাকত।

সুখ বেশিদিন থাকল না। ছেলের বয়েস যখন তিন বছর তখন মা মারা গেল। বাবা আবার বিয়ে করল। ছেলে সৎমায়ের কাছে বড় হতে লাগল।

এমনি করে দিন কাটে। ছেলের বয়েস এখন নয় বছর। সেই সময় পাহাড়ের ওপরে অনেক দূরের এক গাঁ থেকে বাবার নেমন্তন্ন এল। বাবা যাবে ওই গাঁয়ের সর্দারের বাড়ি। কি এক উৎসব আছে। থাকতে হবে দুমাস। পাহাড়ের কোল বেয়ে নদী এঁকেবেঁকে ওই গাঁয়ে গিয়েছে। বাবা যাবে লম্বা ডিঙিতে।

যাবার সময় বাবা বউকে বলল, 'আমি ফিরে আসব ঠিক দুমাস পরে। তোমাকে অন্য কোন কাজ করতে হবে না। শুধু ছেলের যত্ন নেবে। ওর চুল প্রতিদিন ভালোভাবে আঁচড়ে দেবে। এটা কিন্তু ভুলো না।' মায়ের ওপরে ছেলের ভার দিয়ে বাবা ডিঙিতে উঠল। নদীর ধারে দাঁড়িয়ে দুজন সর্দারকে হাত নেড়ে বিদায় জানাল।

সেই দিন থেকে মা খুব খারাপ ব্যবহার শুরু করল। দুচোখে তাকে দেখতে পারে না। দিনরাত খাটায়। ছেলে কিছু বলে না, মায়ের কথা মেনে চলে।

মা হয়তো বলে, 'আজকে তোমায় পাহাড়ে যেতে হবে। ওখান থেকে কাঠ কুড়িয়ে আনো। আগুন ধরাতে হবে।' কাঠ বয়ে আনল ছেলে। সঙ্গে সঙ্গে মা বলল, 'যাও, বাগানের আগাছা পরিষ্কার কবো। শুধু বসে বসে খাওয়া।' ছেলে মাথার কাঠ নামিয়ে বাগানে চলে গেল। আগাছা তুলতে শুরু করল। নরম হাত, বড্ড ব্যথা লাগে। কিন্তু সে 'না' বলে না।

এমনি করে সারা দিন তার খাটুনিতে কাটে। সৎমা তার দিকে ফিরেও তাকায় না। যত্ন করা দূরে থাকুক, শুধুই বকাঝকা। ছেলের চুলে মা হাতও দেয় না। ছেলের মাথা হয়েছে পাখির বাসা। এলোমেলো চুল, নোংরা মাথা। এমনি করে দিন কাটে।

এমনি করে দুমাস কেটে গেল। কালকে সর্দার ফিরবে। মা ছেলেকে বলল, 'কালকে সকালে তোমার বাবা ফিরবে। তাই আজ তোমাকে খুব খাটতে হবে। পাহাড়ি বন থেকে অনেক কাঠ বয়ে আনো, খুব মন দিয়ে বাগান পরিষ্কার করো। সারাদিন খাটবে।'

পরের দিন খুব ভোরে ছেলের ঘুম ভেঙে গেল। আজ বাবা আসবে। খুব আনন্দ। ছেলে মাকে বলল, 'মা, আজ তো বাবা আসবে। আমরা তাড়াতাড়ি গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকি। তাহলে বাবা নেমেই আমাদের দেখতে পাবে।'

মা বলল, 'হ্যাঁ, যেতে তো হবেই। তুমি একটু আগে যাও। আমি পেছনে আসছি। আমি চুল আঁচড়িয়ে পোশাক বদলে যাচ্ছি। তুমি রওনা হও।' ছেলে লাফাতে লাফাতে নদীর দিকে রওনা হল।

ছেলে চলে যেতেই মা একটা খুর বের করল। মুখের কয়েকটা জায়গা কেটে ফেলল। রক্ত পড়ছে, খুব ব্যথা করছে,—তবু সৎ মা তাই করল। তারপর চুলগুলো এলোমেলো করে চাদর ঢাকা দিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়ল।

ওই দূরে বাবার ডিঙি আসছে। বাবাকে বাইরে দেখা যাচ্ছে। ছেলে আনন্দে লাফাতে লাগল, হাত নাড়তে লাগল। বাবার ডিঙি তীরে ভিড়ল। এগিয়ে এসে ছেলেকে জড়িয়ে ধরতে গিয়ে বাবা অবাক হল। ছেলের এ কি অবস্থা! চুল এলোমেলো, দেহ নোংরা। বাবার খুব কষ্ট হল। বলল, 'তোমার এরকম দশা কেন?'

ছেলে সরল মনে বলল, 'মা তো আমায় শুধু খাটায়। পাহাড়ে পাঠায়। বাগানে আগাছা তোলায়। মা যে আমাকে সাজিয়ে দেয় না। আমি কি করব?'

'তোমার মা আসেনি কেন?'

'মা বলল চুল ঠিক করে পোশাক বদ্‌লে আমার পেছনেই আসবে। এখুনি আসবে।'

অনেকক্ষণ বাবা-ছেলে নদীর তীরে গাছের ছায়ায় দাঁড়িয়ে রইল। এই বুঝি সে আসে। অনেক সময় কেটে গেল। আর কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবে? তারা হাঁপিয়ে উঠল। শেষকালে বাড়ির পথে রওনা দিল।

বাবা নিজের ঘরে ঢুকে দেখে, বউ চাদর ঢাকা দিয়ে ঘুমিয়ে রয়েছে। বাবা ডাকতেই মা চাদরের ঢাকা সরিয়েই কেঁদে ফেলল। বউয়ের মুখ দেখে বাবা চম্‌কে উঠল। রক্তমাখা মুখ। মা কাঁদতে কাঁদতে বলল, 'আমি তোমায় আনতে যাব কেমন করে? দেখ তোমার ছেলের কাণ্ড। খুর দিয়ে মেরেছে। এ মুখ বাইরে কাউকে দেখানো যায়? তাই আমি যাই নি। তোমার যাওয়ার পরদিন থেকে প্রতিদিন ছেলে খুর নিয়ে আমায় এমনি করে মারত আর চেঁচিয়ে বলত,—বুড়ি সৎমা কোথাকার! দূর হ! উঃ, ভাগ্যি তুমি এসেছ, নইলে আমি মরেই যেতাম।' মা কাঁদতে লাগল।

বউয়ের কথা শুনেই বাবা রাগে ফেটে পড়ল। ছেলের কোন কথাই আর সে শুনল না। চিৎকার করে বলল, 'এত শয়তান তুমি? মায়ের গায়ে হাত তোল? যে মা তোমাকে বড় করে তুলেছে? অকৃতজ্ঞ শয়তান কোথাকার। দেখাচ্ছি মজা। দূর করে দেব বাড়ি থেকে।'

বাবার ছিল তিনটে ঘোড়া। তার মধ্যে সবচেয়ে ভালো ঘোড়াটাকে সে নিয়ে এল। খুব ভালো পোশাক দিল, দূর গাঁ থেকে ছেলের জন্য যেসব উপহার এনেছিল তাও দিল। ঘোড়ায় চাপিয়ে বাবা ছেলেকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিল। ছেলের বুক কান্নায় যেন ফেটে যাচ্ছে।

কি আর করবে সে? মা এমন মিথ্যে কথা বলল। বাবা দিল তাড়িয়ে। বেশ তাই হোক। নতুন ঝকমকে পোশাক পরে ঘোড়ায় চেপে ছেলে ছুটে চলল দক্ষিণ দিকে। পেছনে পড়ে রইল তার অতি-চেনা গ্রাম, খেলার সঙ্গীসাথীরা। চলছে, চলছে, এগিয়ে চলেছে ছেলে। এমন সময় সামনে পড়ল এক পাহাড়ি নদী। প্রবল স্রোত। ঘোড়া নামলে ভেসে যাবে। ঠিক আছে, কেমন করে নদী ডিঙোতে হয় আমি জানি। ছেলে

চাবুক দিয়ে ঘোড়ার পেছনে আঘাত করল। আরে! এক লাফে ঘোড়া নদী পেরিয়ে ওপারে গিয়ে নামল।

আবার চলতে শুরু করল। পাহাড়ি পথ। শেষকালে সামনে পড়ল এক উঁচু পাহাড়। পাহাড়ের মাথায় কালো মেঘ জমে রয়েছে। সে সামনে যেতে পারছে না, বামদিকে নয় ডানদিকেও নয়। ঠিক আছে। এমন কিছু শক্ত কাজ নয়। কেমন করে পাহাড় ডিঙোতে হয় আমি জানি। আমার ঘোড়াও জানে। ছেলে চাবুক দিয়ে ঘোড়ার পেছনে আঘাত করল। ঘোড়া মাথা নোয়াল। ছেলে আবার আঘাত করল। আরে! এক লাফে ঘোড়া পাহাড় ডিঙিয়ে ওপারে গিয়ে থামল। আবার চলতে শুরু করল।

চলছে, চলছে—এগিয়ে চলেছে ছেলে। হঠাৎ দেখতে পেল, জোয়ারের খেতে একজন বুড়ো-মতন লোক কাস্তে হাতে ফসল কাটছে। তার লম্বা লম্বা এলোমেলো চুল। ছেলে তার কাছে গেল। মধুর গলায় বলল, 'কর্তাবাবা ও কর্তাবাবা, আমি কাজ চাই। কারও কাজের লোক দরকার? এখানে কেউ কি কাজের লোক খুঁজছে? তুমি কিছু জান?'

'হ্যাঁ, তা জানি বৈকি। সব খবরই রাখি। ওই পাহাড়ের উত্তরে একজনের মস্ত বাড়ি আছে, মস্ত খামার আছে। তা সেথায় পঁয়ত্রিশ জন কাজ করে। সাতদিন আগে একজন কিষান মারা গেল। এখনও কাউকে পায়নি। তা বাছা, তুমি দেখতে পার। কিন্তু ও পোশাকে কি তোমাকে কিষাণ রাখবে?'

'তাহলে এক কাজ কর কর্তাবাবা। আমার পোশাক তুমি নাও, তোমার কিষানের পোশাক আমাকে দাও। তাহলেই নেবে।'

বুড়ো একটু ভয় পেয়ে বলল, 'তা কি হয়? ওই পোশাক আমি পরলে সবাই সন্দেহ করবে। চোর ভেবে ধরবে আমাকে। কাজ নেই। বরং তুমি আমার পোশাক নাও। তোমার যখন খুবই দরকার।'

'বেশ তাই দাও। কিন্তু আমাকে একটা ঝুড়ি দিতে হবে। আমার পোশাকগুলো ওর মধ্যে রেখে তোমার কাছে জমা রাখছি। আপত্তি নেই তো?'

বুড়ো রাজি হল। ছেলেটা বড় মিষ্টি, বড় ঘরের ছেলে বলে মনে হয়। ছেলেটা ঝুড়িতে পোশাক খুলে রাখল। ঘোড়ার লাগামও রেখে দিল। তারপর ঘোড়াকে পাহাড়ি ঢালুতে ছেড়ে দিল। সেখানে বেশ ঘন বন। তারপর কিষানের পোশাক পরে বুড়োর সঙ্গে খামারের মালিকের বাড়িতে গেল। তার লোকের দরকার। ছেলেকে কাজ দিল সে। দিন-মজুরের কাজ। ছেলে তাতেই খুশি।

তখন থেকেই কাজে লাগল ছেলেটি। খামারের মালিক তাকে মাঠে পাঠাল। সেখান থেকে লম্বা লম্বা ঘাস কেটে আনতে হবে। গোরু-মোষ খাবে। একটু পরেই ছেলেটি বুঝল, কাজটা বেশ শক্ত। ঘাসের ডগায় হাত ছড়ে যাচ্ছে, কাস্তের আঘাতে হাত কাটছে। এসব কাজ কি সে কোনদিন করেছে?

সে ফিরে এল মালিকের কাছে। বলল, 'আমার হাত কেটে যাচ্ছে, আমি ঘাস কাটতে পারব না। তার চেয়ে আমাকে বাগানের আগাছা পরিষ্কার করতে দাও। এটা আমি জানি।'

'বেশ, তাই কর। বাগানেই কাজ কর।'

অল্প কিছুক্ষণ কাজ করেই ছেলে বুঝল, এ বাগান তাদের বাড়ির বাগান নয়। সে ফিরে এল। মালিককে বলল, 'বাগানে আমি কাজ করতে পারব না। হাতে আমার

ফোস্কা পড়ে গিয়েছে। জ্বালা করছে। আমি বরং রান্না করতে পারব। সাতজন মিলে যা রান্না করে আমি একাই তা পারব।'

'ঠিক আছে, তাই হবে। তুমি রান্নাই করবে। তুমি বড্ড ছোট। তোমার যা খুশি তুমি তাই করো। যা তোমার মন চায়।'

ছেলেটি বলল, 'শুধু আজকের দিনের জন্য আমার সাতজন লাগবে। সাতজন থাকলেই হবে।'

'বেশ, তাই হবে।'

সাতজনকে নিয়ে ছেলে রান্নাঘরে গেল। বিরাট রান্নাঘর। সে একজনকে পাঠাল। নরম কাদা আনতে। আর একজনকে পাঠাল পাথর বয়ে আনতে। দুজনকে পাঠাল জল আনতে, একজনকে পাঠাল খড় আনতে। আর এগুলো আনা হয়ে গেলে অন্য দুজনকে কাদা ছেনতে দিল। কাদার মধ্যে চুন, বালি আর খড়ের টুকরো দিল। কাদা খুব মজবুত হল। তারপর পাথর সাজিয়ে সাতটা উনুন তৈরি করল। একসঙ্গে সাতটা উনুন জ্বালিয়ে দিল।

অল্পক্ষণের মধ্যে অতগুলো লোকের তিন বেলার ভাত রান্না হয়ে গেল। আগে কি হত ? দুপুর গড়িয়ে যেত সকালবেলার ভাত রাঁধতে, সন্ধেবেলায় তৈরি হত দুপুরের ভাত আর মাঝরাতে তৈরি হত রাতের ভাত। এখন থেকে সকালবেলায় কিষানদের ডেকে বলত, 'সকালের ভাত খাও।' ঠিক দুপুর বেলায় বলত, 'দুপুরের ভাত খাও।' সূর্য পাহাড়ের কোলে ঢলে পড়লেই সে বলত, 'রাতের ভাত খাও।'

খামারের মালিক মহা খুশি। কিষানরাও খুশি। এমন সুন্দর ব্যবস্থা। কাজও ভালো হতে লাগল। মালিক বলল, 'খুব ভালো ছেলে তুমি। তুমি রান্নাঘরের কাজ খুব ভালো পার। আগুন তোমার হাতের মুঠোয়। তুমি তো অগ্নিকুমার । চিরকাল তুমি আমার কাছে কাজ করো। তুমি এখানেই থাক। আর শোন, কালকে তো আমাদের পরব। নাচ-গান হবে। কাল কিন্তু দুপুরের ভাত অনেক আগেই তৈরি করতে হবে। পারবে তো ?'

পরের দিন সকালে অগ্নিকুমার যখন রান্না করছে তখন খামার-মালিক এসে বলল, 'অগ্নিকুমার, তুমিও কিন্তু আজকের নাচের পরবে যাবে।'

সে বলল, 'কিন্তু আমি তো যেতে পারব না। ছয় বছর আগে এই দিনে আমার মা মারা গিয়েছিল। আনন্দের পরবে এই দিনে যোগ দিতে নেই।'

'ঠিকই, তুমি যোগ দেবে কেমন করে ? বেশ, সবাই তো চলে যাবে। তুমি একা সব দেখাশোনা করবে। এখানে তুমি একাই থাকবে। আমি নিশ্চিন্ত।'

খামার-মালিক চলে গেল। অন্য কিষানরাও চলে গেল। পাহাড়ের এই পশ্চিম এলাকায় সে একা। সবাই চলে যেতেই অগ্নিকুমার ভালো করে চান করে নিল। তারপরে গেল বুড়ো কিষানের বাড়িতে। তার সুন্দর পোশাক পরে নিল। তারপর উঠল এক উঁচু গাছে। সেখান থেকে চিৎকার করে তার ঘোড়াকে ডাকল। বনের গভীর থেকে ঘোড়া বেরিয়ে এল। তাকে লাগাম পরাল সে। ঘোড়া ছুটিয়ে সে নাচের আসরের উত্তর দরজায় গিয়ে দাঁড়াল। 'এবার অগ্নিকুমারের ঘোড়া নাচবে'— এ কথা বলেই সে ঘোড়ার পেছনে চাবুক মারল। এক লাফে ঘোড়া আসরের মাঝখানে পৌঁছে গেল। নাচতে লাগল ঘোড়া, সুন্দর ভঙ্গিতে। পিঠের ওপরে ছেলেটি।

সেখানকার গোষ্ঠীপতি ও অন্যান্য লোকজন চিৎকার করে উঠল, 'আজ আমাদের মধ্যে আকাশের রাজ্য থেকে এক দেবদূত এসেছে। সবাই উঠে দাঁড়াও, দেবদূতকে পূজো করো।' সবাই মাথা নিচু করে প্রণাম করল।

খামার-মালিকও মাথা নিচু করে প্রণাম জানাচ্ছে। তার পাশে ছিল তার মেয়ে। সে বলে উঠল, 'এ তো আমাদের অগ্নিকুমার! তার বাঁদিকের কানের কাছে একটা কালো চিহ্ন আছে। এই দেবদূতেরও আছে। এ অগ্নিকুমার।'

বাবা ধমক দিয়ে বলল, 'তুমি অনেক বড় হয়েছ। তোমাব বিয়ের বয়েস হয়েছে। ছেলেমানুষি করবে না। অপবিত্র কথা বলবে না। দেবদূতকে অভক্তি করতে নেই। প্রাণাম করো। আকাশ রাজ্যের দেবদূত সে।'

মেয়ে একটু হেসে মাথা নিচু করে দেবদূতকে প্রণাম করল, কিন্তু চোখ খুলে। আড়চোখে চেয়ে রইল।

নাচের আসর ভেঙে গেল। সবার আগে ফিরে এল ছেলে। ঘোড়াকে পাহাড়ের কোলে বনে ছেড়ে দিল। পোশাক আর লাগাম ঝুড়িতে করে বুড়োর বাড়ি রেখে এল,—আবার কিষাণ হয়ে পাহাড়ের পশ্চিমে চলে গেল। ঘুমিয়ে পড়ল।

কিছুক্ষণ পরে খামার-মালিক এসে তাকে ডেকে তুলে বলল, 'অগ্নিকুমার! আঃ, আজকে যদি তুমি যেতে। খুব ভালো হত। আকাশ-রাজ্য থেকে ঘোড়ায় চেপে এক দেবদূত এসেছিল। আমাদের পরবে নাচের আসরে। অমবা সবাই তার পুজো করেছি।'

'তাই নাকি? দেবদূত এসেছিল? আঃ, আমার দেখা হল না। যেতে পারলে কি ভালোই হত।'

খামার-মালিক বলল, 'কালকের পরের দিন আবার নাচের পরব হবে। তাড়াতাড়ি উঠে রান্নাবান্না শেষ করে রেখো।'

কালকের পরের দিন এল। খুব সকালে উঠেই অগ্নিকুমার সব কিযানের জন্য সকালের ভাত তৈরি করে ফেলল। কাজ শেষ হয়েছে এমন সময় খামার-মালিক এসে বলল, 'আজকে তুমি চলো আমাদের সঙ্গে। নাচের পরবে।'

অগ্নিকুমার মাথা নিচু করে বলল, 'যাওয়ার খুব ইচ্ছে ছিল। কিন্তু আজকের দিনে আমার ঠাকুমা মারা গিয়েছিল। আমার বোধহয় আজকের দিনে যাওয়া ঠিক হবে না। দুঃখের দিনে আনন্দ করতে নেই।'

সবাই চলে গেল। কেউ নেই পাহাড়ের পশ্চিম এলাকায়। একা অগ্নিকুমাব। সে ভালোভাবে চান করে নিল। বুড়ো কিষানের বাড়িতে গিয়ে ভালো পোশাক পরে নিল। গাছে উঠে ঘোড়াকে ডাকতে যাবে এমন সময় খামার-মালিকের মেয়ে ফিরে এসেছে। সবার সঙ্গে যেতে যেতে সে ফিরে এসেছে। বলেছে, বাড়িতে কি যেন ভুলে রেখে এসেছে। কি আর করে অগ্নিকুমার। মেয়ে জেনে ফেলেছে। মেয়েকে ঘোড়ায় চাপিয়ে অগ্নিকুমার রওনা দিল। দুজনে এল নাচের আসরের পুব দিকের দরজায়।

'সবাই দেখ, অগ্নিকুমারের ঘোড়া কেমন নাচে,'—এ কথা বলেই চাবুক দিয়ে ঘোড়ার পেছনে আঘাত করল। ঘোড়া লাফ দিল আর আসরের মাঝখানে এসে নামল। ঘোড়া নাচতে লাগল। সুন্দর ভঙ্গিতে।

গোষ্ঠীপতি আর খামার-মালিক বলে উঠল, 'আজকে দেবদূত এসেছে তার বউকে

নিয়ে। কি সুন্দর। সবাই উঠে দাঁড়াও, পুজো করো।'

সকলের ফেরার আগেই অগ্নিকুমার ও মেয়ে পাহাড়ের পশ্চিমে চলে এল। ঘোড়াকে ছেড়ে দিল পাহাড়ি ঢালু বনে, পোশাক বদলে নিল, তারপর ঘুমিয়ে পড়ল।

একটু পরেই খামার-মালিক এল। ঘুম থেকে জাগিয়ে সে বলল, 'অগ্নিকুমার, আজকে গেলে তোমার আরও ভালো লাগত। আজকে দেবদূত এসেছিল বউকে সঙ্গে নিয়ে। কি সুন্দর।'

'তাইতো, গেলে খুব ভালো লাগত। দেখতে পেতাম। কিন্তু কি করব আমি।'

খামার-মালিক বাড়িতে ঢুকে দেখে মেয়ে শুয়ে রয়েছে। 'তুমি আজ কেন নাচের আসরে গেলে না?' বাবা জিজ্ঞেস করল। মেয়ে বলল, তার পেটে ভীষণ ব্যথা করছে। যাবে কেমন করে?

বাবা ব্যস্ত হল। একজন বদ্যি ডাকা দরকার। বাবা একথা বলতেই মেয়ে বলল, 'বদ্যির দরকার নেই। বরং দেবতার থানের পুজারিণীকে ডেকে আনো।'

পুজারিণী এল, আঁক কষে ভবিষ্যৎ-বাণী করল, 'দেহের কোন রোগ নয়। রোগ মনের। কিংবা বহু পুরনো মানসিক দুর্বলতার। অন্য চিকিৎসা দরকার।'

মেয়ে এ কথায় আপত্তি জানাল। লজ্জা পেল। মাথা নেড়ে বলল, 'নতুন যে পুজারিণী থানের ভার পেয়েছে তাকে ডেকে আনো।'

নতুন পুজারিণী এল। আঁক কষে ভবিষ্যৎ-বাণী করল, 'এ রোগ সত্যি অন্যরকম। তবে বহু পুরনো নয়। অল্পদিনের রোগ। এই খামারে যেসব লোকজন কাজ করে তাদের মধ্যে একজনকে মেয়ের খুব ভালো লেগে গিয়েছে। তারা নিজেদের পছন্দমতন ভালো ভালো পোশাক পরে সারি বেঁধে দাঁড়িয়ে পড়ুক। মেয়ে যার হাতে এক পেয়ালা মিষ্টি দুধ তুলে দেবে, জানবে তাকেই মেয়ের পছন্দ। আসলে রোগটা অন্যরকম।'

খামার-মালিক তার সব কিষানকে একথা বলল। সবাই এল। কিন্তু মেয়ে কারও হাতে মিষ্টি দুধের পেয়ালা তুলে দিল না। আর কেউ বাকি রয়েছে? হ্যাঁ, একজন আসেনি। সে হল নোংরা পোশাকের হতভাগ্য অগ্নিকুমার।

খামার-মালিক অগ্নিকুমারকে নতুন পোশাক ধার দিল। বলল, 'সে-ও অন্য কিষানদের মতোই। সে আসুক নতুন পোশাক পরে। দেখা যাক কি হয়।'

অগ্নিকুমার ভালোভাবে চান করে নিল। খামার-মালিকের পোশাক শুয়োরের ডেরায় ছুড়ে ফেলে দিল। তাকে আরও ভালো পোশাক ধার দেওয়া হল, সে গোয়ালের পাশে ফেলে দিল। আরও সুন্দর পোশাক তাকে দেওয়া হল, সে ফেলে দিল রান্নাঘরের পেছনে। শেষকালে অগ্নিকুমার চলে গেল বুড়ো কিষানের বাড়ি। নিজের রেখে-দেওয়া পোশাক পরে, বন থেকে ঘোড়ায় চেপে ফিরে এল খামার-মালিকের বাড়িতে। অগ্নিকুমারকে হাত ধরে আস্তে আস্তে নিয়ে এল খামার-মালিক, ঢুকল মেয়ের ঘরে। মেয়ের রোগ তক্ষুনি সেরে গেল। চোখ-মুখে হাসিহাসি ভাব। মেয়ে মিষ্টি দুধের পেয়ালা তুলে দিল অগ্নিকুমারের হাতে।

বাবা বলল, 'এসব তো কিছুই আমি বুঝতে পারি নি। চিনতে পারি নি। মেয়েকেও চিনতে পারি নি। তা, অগ্নিকুমার, তুমি কি আমার জামাই হবে? আমার একমাত্র আদরের জামাই?'

অগ্নিকুমারের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে হয়ে গেল। খাওয়া-দাওয়া, আনন্দ, নাচ-গান। সবাই খুশি। তিনদিনের বিয়ের পরব শেষ হল। তারপরের দিন অগ্নিকুমার বলল, 'বাবা, আমাকে তিন দিনের ছুটি দিতে হবে। আমি দূর গাঁয়ে আমার বাবা-মাকে একবার দেখতে যাব।'

খামার-মালিক বলল, 'তা কি করে হবে? তিন দিনের জন্য তোমায় যেতে দিতে পারি না। শুধু আজকের দিনের জন্য তুমি যেতে পার। শুধু একদিনের জন্য।'

'ঠিক আছে, একদিনের জন্যই যাব।' অগ্নিকুমার যাওয়ার জন্য তৈরি হল।

বউ বলল, 'তুমি সমুদ্রের ওপর দিয়ে যাবে, না পাহাড়ি পথে যাবে? তোমার কি ইচ্ছে?'

একটু ভেবে অগ্নিকুমার বলল, 'যদি সমুদ্র-পথে যাই তাহলে তিনদিন সময় লাগবে। আর পাহাড়ি পথে গেলে লাগবে মাত্র একদিন। তাই পাহাড়ি পথেই যাব।'

চোখ-দুটো ভিজে গেল বউয়ের। কান্না-ভরা গলায় বলল, 'যখন তুমি পাহাড়ি পথে ঘোড়া ছুটিয়ে যাবে তখন ওপর থেকে তুঁতফল তোমার ঘোড়ার জিনের ওপর পড়বে। মাঝে মধ্যেই পড়বে। তোমার যদি খুব তেষ্টাও পায় তবু তুমি ওই ফল খাবে না। যদি তুমি ওই তুঁতফল একটাও খাও, তাহলে আমাদের দুজনের মধ্যে আর কোনদিন দেখা হবে না। তোমায় আর কোনদিন আমি দেখতে পাব না।' বউ কান্নায় ভেঙে পড়ল।

ঘোড়া ছুটিয়ে পাহাড়ি পথে এগিয়ে চলেছে অগ্নিকুমার। হাওয়ার বেগে চলেছে। হঠাৎ ওপর থেকে কয়েকটা তুঁতফল তার ঘোড়ার জিনের ওপরে পড়ল। মনে পড়ল তার বউয়ের কথা। একটু হেসে সে ফলগুলো ফেলে দিল। এগিয়ে চলেছে অগ্নিকুমার। তৃষ্ণায় তার গলা শুকিয়ে উঠেছে, বুক ফেটে যাচ্ছে। আশে পাশে কোথাও পুকুর-ঝরনা কিছুই দেখতে পেল না। জিভ শুকিয়ে তালুতে আটকে যাচ্ছে। মাঝে মাঝেই তুঁতফল ওপর থেকে জিনের ওপরে পড়ছে। ফেলে দিচ্ছে অগ্নিকুমার। কিন্তু আর তো পারে না। হাওয়ার বিপরীতে যাচ্ছে, আরও কষ্ট হচ্ছে। বুক যেন চৌচির হয়ে যাবে। ভুলে গেল বউয়ের কথা। তুলে নিল তুঁতফল। মুখে দিতেই অগ্নিকুমার ঢলে পড়ল জিনের ওপর। অগ্নিকুমার মরে গেল।

ঘোড়া সব বুঝতে পারল। এবার উঠতে হবে পাহাড়ে। পেছনের পা ভাঁজ করে সে উঠতে লাগল, যেন অগ্নিকুমার পড়ে না যায়। পাহাড় থেকে নামবার সময় সামনের পা ভাঁজ করে নামতে লাগল, যেন অগ্নিকুমার পড়ে না যায়। শেষকালে ঘোড়া এল অগ্নিকুমারের বাবার গাঁয়ে। ঘোড়া তাদের বাড়ির সামনে দাঁড়াল। এখানেই জন্মেছে অগ্নিকুমার। তিনবার ডাকল ঘোড়া। চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

বাবা ঘোড়ার ডাক চিনতে পেরেছে, এ তো তার ছেলের ঘোড়া। বাবা চিৎকার করে বলল, 'আমার ছেলে ফিরে এসেছে। কিন্তু অবাক কাণ্ড, সে কেন বাবা বলে ডাকছে না! শুধু কেন ঘোড়ার ডাকের শব্দ হল? বউ শিগগির যাও, দরজা খোল, খারাপ কিছু নয়তো? আমার ছেলে।'

সৎমা তাড়াতাড়ি দরজার কাছে গেল। হতচ্ছাড়াটা ফিরে এল নাকি। দরজা খুলে গেল সঙ্গে সঙ্গে, একটা তেজি পা এগিয়ে এল,— ঘোড়ার শক্ত পা। আঘাত করল সৎমাকে। ছিটকে পড়ল মেঝেতে। তক্ষুনি সৎমা মরে গেল।

বাবা অবাক হল। কি হয়েছে? দরজার কাছে ছুটে গেল। এসেই দেখে, ঘোড়ার ওপরে নিঃসাড় হয়ে শুয়ে আছে আদরের ছেলে। তাকে কোলে তুলে নিয়ে এল, শুইয়ে দিল একটা পিপের ওপরে। বলল, 'যে ছেলে আমার ফিরে আসবে টগবগ করে, সে এল নিঃসাড় হয়ে। কেন এমন হল?' শেষকালে ছেলেকে একটা বড় পিপের মধ্যে শুইয়ে তার ডালা বন্ধ করে দিল।

পাহাড়ের পশ্চিম এলাকায় বউ ছট্‌ফট করছে। মনে মনে বারবার বলছে, 'একদিনেই ফিরে আসার কথা। তিন দিন হয়ে গেল। সে কেন ফিরছে না? পাহাড়ি পথে তুঁতফল খায়নি তো?' বুকটা কেঁপে উঠল, চোখদুটো ঝাপসা হয়ে এল।

বউ জানে না অগ্নিকুমারের গ্রাম কোথায়। সে কোন দিকে। তবু ভেঙে পড়লে চলবে না। সে তিন পেয়ালা সঞ্জীবনী জল সঙ্গে নিল। হেঁটে চলল পাহাড়ি পথে। যে পথ পার হতে ঘোড়ার সারাদিন লেগেছিল, বউ সে পথ পেরিয়ে গেল অর্ধেক সময়ে। পৌঁছে গেল অগ্নিকুমারের বাড়িতে।

'এটা কি অগ্নিকুমারের বাড়ি? সৎমায়ের মিথ্যে কথায় বাবা যাকে তাড়িয়ে দিয়েছিল, এটা কি তার বাড়ি?'

'তার দেহ কোথায় রেখেছ? আমাকে দেখাও।'

'যাকে আমি চিনি না, যে মানুষ একেবারে অচেনা, তাকে আমার ছেলের দেহ দেখতে দেব কেমন করে?

'আমি অতিথি নই, আমি অচেনা নই। অগ্নিকুমার আমার স্বামী। তোমার ছেলে আমার স্বামী, আমার প্রাণ। আমাদের বিয়ে হওয়ার পর চতুর্থ দিনে সে বাবা-মাকে দেখতে এসেছিল। আর ফেরেনি। আর দেরি নয়, দেহটি কোথায়?'

'মেয়ে, আমি ভুল বুঝেছিলাম। শিগ্‌গির তুমি ভেতরে এসো।'

বাবা পিপের মধ্যে থেকে দেহটি বের করে মেয়ের সামনে রাখল। বাবা এমনভাবে ছেলেকে শুইয়ে দিল যেন ছেলে মরে নি, শুধু ঘুমিয়ে রয়েছে। বাবা কাঁদছে।

মেয়ে সঞ্জীবনী জল নিয়ে তার দেহে ছিটিয়ে দিল, আল্‌তো করে লেপে দিল সেই জল। বউ পাশে বসে অগ্নিকুমারের দেহে ভেজা হাত বুলিয়ে দিতে লাগল। বাবা পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে, চোখ দিয়ে জল পড়ছে।

চোখ খুলল অগ্নিকুমার। আস্তে আস্তে বলল, 'আমি সকালে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, আমি সন্ধেবেলা ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।'

মেয়ে স্বামীর মুখের কাছে মুখ এনে বলল, 'তুমি সকালেও ঘুমোও নি, তুমি সন্ধেবেলাও ঘুমোওনি। আমি তোমাকে নিষেধ করেছিলাম, ওগো, তুঁতফল খেয়ো না। তৃষ্ণার কষ্টে তুমি ভুলে গেলে সব। তুঁতফল খেলে, আর ঢলে পড়লে চির অন্ধকারে। আমার কাছে ছিল মৃত-সঞ্জীবনী জল। তাই তোমায় ফিরে পেয়েছি। চলো, ফিরে যাই আমাদের শান্তি-পাহাড়ে।'

'ও যে আমার একমাত্র ছেলে! ও গেলে আমি বাঁচব কেমন করে?' বাবা আর্তনাদ করে উঠল। কান্নায় ভেঙে পড়ল।

বউ বলল, 'ওকে ছাড়া আমি তো বাঁচব না। তাহলে আমি এখানেই থাকব। ও থাকবে আর আমি চলে যাব, না তা আমি পারব না।'

অগ্নিকুমার বলল 'আমি দুজন বাবার দায়িত্ব নেব কেমন করে? বাবা, তুমি সর্দার, তোমার অনেক আছে। তুমি আর একটা ছেলেকে নিজের ছেলের মতো কাছে রাখো। গাঁয়ে অনেক ছেলে। আমি ফিরে যাব পাহাড়ের পশ্চিম এলাকায়, ওরা আমাকে বাঁচিয়েছে, ওরাই আমাকে বাঁচিয়েছে। ওরা আমাকে অগ্নিকুমার করে তুলেছে। সবাই সুখে থাকো।'

অগ্নিকুমার আর বউ মিলিয়ে যাচ্ছে পাহাড়ি বনের পথে। বাবা তাকিয়ে রয়েছে। ওরা মিলিয়ে গেল। বাবা আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখল—সাদা সুন্দর আকাশ, কোথাও মেঘ নেই। ওরা সুখে থাকুক, ভালো থাকুক।

পুরনো বাড়ির ফুটো ছাদ

অনেকদিন আগে এক পাহাড়ি উপত্যকায় থাকত এক বুড়ো আর এক বুড়ি। নির্জন পাহাড়ে সুখে-শান্তিতে তাদের দিন কেটে যেত। তাদের ছিল এক অদ্ভুত শখ। ঘোড়াকে তারা খুব ভালোবাসত। অন্য পশুদের তেমন নয়। ঘোড়া দেখলেই তারা আদর করত, গায়ে হাত বুলিয়ে দিত, ভালো ভালো খেতে দিত। কত বুনো ঘোড়াকেই না তারা আদর করেছিল।

তাদের নিজেদেরও একটা পোষা ঘোড়া ছিল। যেমন সে দেখতে, তেমনি আদুরে। এমন তেজি ঘোড়া ওই এলাকায় আর ছিলনা। বুড়ো-বুড়ির খুব গর্ব। হবেই বা না কেন।

এক চোর ভাবল, ঘোড়াটাকে চুরি করতে হবে। অনেক দিন থেকেই সে সুযোগ খুঁজছিল। একদিন অন্ধকার রাতে সে বুড়ো-বুড়ির বাড়ির কাছে একটা উঁচু পাথরের আড়লে লুকিয়ে রইল। চারিদিক নিস্তব্ধ হয়ে এলে চোর আস্তাবলের ছাদে উঠে চুপটি করে বসে রইল। সুযোগ পেলেই ঘোড়া নিয়ে পালাবে। ছাদের ফাঁক দিয়ে নীচে তাকিয়ে দেখল, ঘোড়া তখনও খামার থেকে ফেরেনি। এত দেরি হচ্ছে কেন? বুড়ো তো ফিরে এসেছে। তবে? চোর অপেক্ষা করতে লাগল। অনেকক্ষণ—। আরও অনেকক্ষণ—। তার কেমন ঘুম পেয়ে গেল। সে ঘুমিয়ে পড়ল। গভীর ঘুম।

এখন হয়েছে কি, সেই পাহাড়ের এক গুহায় থাকত একটা নেকড়ে বাঘ। অনেকদিন থেকেই তার ইচ্ছে সে বুড়ো-বুড়িকে খাবে। তেমন সুযোগ পায়নি। সেদিন সে ঠিক করল, আজকে খাবই। বেশ অন্ধকার রাত। সেও গেল বুড়ো-বুড়ির বাড়ির দিকে। নেকড়ে বাঘ সব সময় ভাবত, এই দুনিয়ায় আমার চেয়ে শক্তিমান আর কেউ নেই।

ঘুম আসছে না বুড়ো-বুড়ির। তারা কথাবার্তা বলছে। পুরনো দিনের কথা, পুরনো দিনের শিকারের কথা, সুখ-দুঃখের কথা। ঘাপটি মেরে জিভ বের করে দোরের কাছে বসে রয়েছে নেকড়ে বাঘ। সব কথা সে শুনছে। সুযোগের অপেক্ষায় সে রয়েছে।

কি থেকে যে কি কথা এসে যায়! বুড়ো বুড়িকে জিজ্ঞোস করল, 'আচ্ছা বুড়ি, তোমর কি মনে হয় বলতো? এই পৃথিবীতে সবচেয়ে ভয়ের, সবচেয়ে সাংঘাতিক কোন জিনিস আছে? তোমার মত কি?'

বুড়ি বলল, 'আমার কথা যদি বলো, তাহলে আমার মনে হয় পৃথিবীতে সবচেয়ে সাংঘাতিক হল নেকড়ে বাঘ। ওর কথা মনে হলেই বুক কাঁপে, হাত-পা ঠান্ডা হয়ে আসে।'

নেকড়ে বাঘ কথাটা শুনে খুব খুশি হল। সে একটু নড়েচড়ে বসল। মুখে তৃপ্তির হাসি। সে যা ভাবে তাহলে কথাটা মিথ্যে নয়। বেশ, এরা যখন তাকে এমন ভয় পাচ্ছে, তাহলে আজ রাতেই এদের মাংস খাওয়া যাবে। বেশি বেগ পেতে হবে না।

হঠাৎ বুড়ি কাঁপা গলায় জিজ্ঞেস করল, 'আচ্ছা বুড়ো, তোমার কি মনে হয়? এই পৃথিবীতে সবচেয়ে ভয়ের, সবচেয়ে সাংঘাতিক কোন জিনিস আছে? তোমার মত কি?'

'আমার মত হল, এই পৃথিবীতে সবচেয়ে ভয়ের সাংঘাতিক জিনিস হল পুরনো বাড়ির ফুটো ছাদ। বৃষ্টির জল যদি একবার ঢুকতে শুরু করে—'।

নেকড়ে বাঘ তড়াক্ করে লাফিয়ে উঠল। সে শুনেছে পুরনো বাড়ির ফুটো ছাদ? আর কিছু শোনার মতো অবস্থা তার নেই। সে ভাবল, এতকাল জানতাম আমিই সবচেয়ে সাংঘাতিক, সবচেয়ে শক্তিমান। কিন্তু বুড়ো একি কথা শোনাল! আমার চেয়েও সাংঘাতিক জিনিস আছে? পুরনো বাড়ির ফুটো ছাদ? সে ভয়ে ঠক্‌ঠক্ করে কাঁপতে লাগল। এই বুঝি পুরনো বাড়ির ফুটো ছাদ এসে পড়ে। কিন্তু সে দৌড়তে পারল না, সেখানে দাঁড়িয়েই কাঁপতে লাগল, দাঁতে দাঁতে শব্দ হচ্ছে।

এমন সময় ছাদের ওপরে চোর জেগে উঠেছে। তলায় তাকিয়ে দেখে, বুড়োর ঘোড়া দাঁড়িয়ে আছে। অন্ধকারে তেমন ঠাহর হয় না,—না আর দেরি নয়। লাফিয়ে পড়ল ঘোড়ার পিঠে। ঠিক মতন লাফ দিতে পেরেছে।

নেকড়ে বাঘ আরও চমকে উঠল। এ নিশ্চয়ই তার চেয়েও সাংঘাতিক পুরনো বাড়ির ফুটো ছাদ। মৃত্যু ঠেকায় কে! তবু চেষ্টা করা যাক। এর কথাই বুড়ো বলেছিল। হায়! তার একি হল?

প্রাণের ভয়ে নেকড়ে বাঘ দৌড় দিল। চার পায়ে প্রচণ্ড গতি। এমন দৌড় সে আগে জানত না। সে চলেছে বন্ধুর কাছে। বন্ধু থাকে গুহায়। সে যদি বাঁচায় তাকে।

আর চোর বুঝেছে, সে ঘোড়াকে পেয়েছে। তাকে পালাতে দেবে না। শক্ত করে জড়িয়ে ধরল ঘোড়ার গলা। ছুটছে নেকড়ে বাঘ, পিঠে লেপ্‌টে আছে চোর। ছুটছে নেকড়ে বাঘ, পিঠে চড়ে রয়েছে সাংঘাতিক জিনিস, পুরনো বাড়ির ফুটো ছাদ।

গুহার মুখে গিয়ে চোর ছিট্‌কে পড়ল। ঘোড়া গুহায় ঢুকে গিয়েছে। কিন্তু চোর গুহার মুখে বসে রইল। ঘোড়া কতক্ষণ থাকবে গুহার ভেতরে? বেরোতে তাকে হবেই। তখন? সে চুপটি করে গুহার মুখ পাহারা দিয়ে রইল।

গুহার মধ্যে অনেক জন্তু-জানোয়ার। রাতের শিকারে বেরোবে বলে তৈরি হচ্ছিল। নেকড়ে বাঘ হাঁপাতে হাঁপাতে গুহায় ঢুকেই শুয়ে পড়ল। সে ক্লান্ত। তবু হাঁপাতে হাঁপাতে দলপতিকে বলল তার শোনা কথা। সব বলল। পুরনো বাড়ির ফুটো ছাদের কথা। কি সাংঘাতিক।

জানোয়ার দলপতি গম্ভীর হয়ে বলল, 'তাহলে? তাহলে তোমাদের মধ্যে কে পুরনো বাড়ির ফুটো ছাদকে ধরতে যাবে? কে রাজি আছ?'

নেকড়ে বাঘেরই এমন অবস্থা। কেউ রাজি হল না। সবাই বলল, আমি পারব না, আমি যেতে চাই না, আমার দ্বারা ওসব হবে না, ওর মধ্যে আমি নেই।

এক ছিল বানর। সে খুব চালাক। ভাবল, দেখাই যাক না কি হয়। সে রাজি হয়ে গেল। দলপতি বাহবা দিল। সবাই নিশ্চিন্ত হল। কিন্তু চুপ করে রইল।

বানর গুহার দিকে মুখ করে পেছনে সরতে লাগল। লেজটা লম্বা হয়ে আগে আগে যাচ্ছে। গুহার বাইরে লেজ এল। লেজের গোড়ায় ঠান্ডা হাওয়া লাগল। বানর একটু

থামল। নাঃ, কিছুই তো বোঝা যাচ্ছে না। লেজ আর একটু বাইরে এল। লেজ নড়ছে। চোরের চোখ-মুখ খুশিতে ভরে গেল। তবে? বেরোতে তোমাকে হবেই।

লেজ আর একটু বেরিয়েছে। লোমশ লেজ। খপ্ করে মুঠোতে চেপে ধরল, বানর লাফিয়ে উঠেই কাঁপতে লাগল। দুহাতে লেজ চেপ ধরে প্রাণপণে চোর টানছে, সে একটা পাথরে দুপা বাধিয়ে নিয়েছে। ঘোড়াকে পালাতে দেবে না সে।

বানরের মুখ ভর্তি লোম। তার মধ্যেও তার গোল গোল চোখ দেখা যাচ্ছে, লাল হয়ে উঠেছে। নেকড়ে বাঘ এক লাফে গুহার কোণে ঝাঁপিয়ে পড়ল। সব জন্তু কোণে যেতে চায়। হুটোপুটি। একজন আর একজনের গায়ের ওপরে পড়ে যাচ্ছে। দলপতিও তাদের মধ্যে। সে এক কাণ্ড।

বানর খুব বুদ্ধিমান। সে-ও গুহার পাথরের একটা ফাটল দুহাতে ধরে ফেলেছে। শক্ত করে। একবার এগোচ্ছে দেহ, আবার পেছোচ্ছে। এগোবার সময় পাথরে মুখ ঘষে যাচ্ছে। দাঁতে দাঁতে শব্দ হচ্ছে, চোখ যেন বেরিয়ে যাবে। দেহের সব রক্ত মুখে জমা হয়েছে, লেজের গোড়া টন্‌টন্ করছে। এই বুঝি ছিঁড়ে যাবে। যাক্। সেও ভালো। সত্যি সাংঘাতিক, সত্যি অসীম বলবান এই পুরনো বাড়ির ফুটো ছাদ। গায়ে কি জোর। কি সাহস। প্রাণটা বুঝি গেলই। কি দরকার ছিল কায়দা করার। বানর এগোচ্ছে, পিছিয়ে যাচ্ছে। মুখ ঘষে যাচ্ছে পাথরে।

নেকড়ে বাঘ একটু গলা উঁচিয়ে বানরকে দেখতে চেষ্টা করল। বানরের অবস্থা দেখেই মুখ লুকিয়ে ফেলল। অন্য জন্তুরাও ভয়ে কাঠ।

বানরের বিরাট লেজ। এখন টান টান হয়ে আছে। হঠাৎ পটাং করে আওয়াজ হল। বানরের মুখ থেঁতলে গেল পাথরে, সে হুমড়ি খেয়ে পড়ল। চোর দুই পা তুলে উলটে গেল। হাতে তার বানরের লেজ, অনেকটা।

সেদিন থেকে বানরের লেজ আজকের মতো ছোট হয়ে গেল। আগের মতো আর বড় রইল না। বানরের মুখ চোরের টানাটানির জন্য বারবার পাথরে ঘষে গিয়েছিল। সেই ঘষায় মুখের সব লোম উঠে গেল। দেহের সব জায়গায় লোম, কিন্তু তখন থেকে বানরের মুখে কোন লোম নেই। রক্ত জমে গিয়েছিল মুখে। বাপ্‌রে যা টানাটানি। সেদিন থেকে বানরের মুখ রক্তের মতো লাল হয়েই রইল।

জোনাকি

ভুলে-যাওয়া সেই কালে এক যে ছিল গরিব চাষি। খুব সুখের সংসার। কষ্ট আছে কিন্তু তারা সুখি। সেই চাষির ছিল এক ছেলে। বড় আদরের।

কিন্তু বউ একদিন মারা গেল। ছেলেটা তখনও খুব ছোট। তার বয়েস দশ বছর। বাবা আবার বিয়ে করল। ঘরে এল নতুন বউ, নতুন মা। সৎমা।

একদিনও তর্ সইল না। প্রথম দিন থেকেই সৎমা খুব খারাপ ব্যবহার করতে লাগল। দুদিন সবুরও করল না। ছেলে অবাক হল। কিন্তু ভয়ে চুপ করে রইল। চুপ করে থাকলে অবিচার বেড়েই যায়।

বাড়ির সবচেয়ে নোংরা আর শক্ত কাজগুলো করানো হত ছেলেকে দিয়ে। ছেলেকে পাঠানো হত মাঠে, খেতের কাজে। বড় কষ্ট। এ ছোট বয়সে কি এসব করা যায়? তাছাড়া মা বেঁচে থাকতে, এসব কাজ কোনদিন করেনি। শুধু কি তাই? সৎমা তাকে যা খেতে দিত, তাতে পেটে খিদেই থেকে যেত। কিছুক্ষণ পরে কেমন পেটে চিন্‌চিন্ ব্যথা হত। মাথা ঘুরত। তবু ভয়ে সে কিছুই বলত না। বাবাও নতুন মায়ের পক্ষে।

একদিন সকালে মা ছেলেকে ডেকে বলল, 'এই আমার পয়সাগুলো নাও, চলে যাও পাহাড়ের ওপাশের গাঁয়ে। সেখানকার এক দোকানে ভালো বাদাম তেল পাওয়া যায়। কিনে আনো। যদি দেরি হয়, এমন মার দেব যে জীবনে ভুলতে পারবে না। উনুনের পাশেই অনেক চেলা কাঠ আছে। যদি তাড়াতাড়ি না আস।'

ছোট্ট ছেলে কেঁপে উঠল। এর আগেও সে কয়েকবার চেলা কাঠের শাস্তি পেয়েছে। উঃ কি অসহ্য কষ্ট। রাতে দেহ গরম হয়ে ওঠে। বোধহয় জ্বর হয়। আজকে আরও বেশি ভয় পেল। মায়ের মুখ-চোখের চেহারা কেমন যেন অন্যরকম। যদি দেরি হয়? অত দূরের দোকানে কেন? কাছেও তো দোকান ছিল। কিন্তু এসব কথা বলার উপায় নেই। ছোট্ট ছেলে তামার পয়সাগুলো নিয়ে উঠোন পার হয়ে বেরিয়ে পড়ল। কাঁপতে কাঁপতে।

পথে যেতে যেতে ভাবছে, তাড়াতাড়ি ফিরতে না পারলে, উঃ কি ভয়ানক শাস্তিই না মা দেবে। শাস্তির কথা ভেবেই সে যেন কেমন আনমনা হয়ে পড়ছে। আবার মন ঠিক করে পথ চলছে। মা বড় নিষ্ঠুর। ছেলে বড় অসহায়।

বাতাস বইছে সোঁ সোঁ করে। যত পাহাড়ের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে হাওয়ার দাপট তত বাড়ছে, ঠান্ডায় যেন পায়ের পাতা জমে যাচ্ছে, দেহ অবশ হয়ে আসছে। হাওয়ার উলটো দিকে তাড়াতাড়ি হাঁটা যাচ্ছে না। তবু ছোট ছেলে ছোট পায়ে এগিয়ে চলেছে। কয়েক ঘন্টা হাঁটার পরে পাহাড়ের ওপারের গাঁয়ে সে পৌঁছল। যাক্, শেষকালে দোকান খুঁজে পেল। কিন্তু এ কি? তামার পয়সাগুলো কোথায় গেল? জামার পকেটে ছিল পয়সা। গেল কোথায়? ছেলের মুখ সাদা হয়ে গেল। হায়! পকেট ছেঁড়া। পুরনো জামা। তাতে একটা ফুটো রয়েছে। কোথায় পড়ল কে জানে। ছেলের বুক কাঁপতে লাগল। চোখ থেকে জল গড়িয়ে পড়ল। চেলা কাঠের কথা আর মায়ের চোখ-মুখের চেহারা মনে পড়ল। পয়সা নেই।

ছেলে বাড়ির পথে ফিরছে। হাউ হাউ করে কাঁদছে, 'মা, আমাকে আর মেরো না। মা, মা, ! আর এমন হবে না। মা।' যেন মা তার সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে। চোখে সবকিছু ঝাপসা দেখছে। হোঁচট খাচ্ছে। দেহ টলছে। মাথা ঝিমঝিম করছে। খালি হাতে ফিরে গেলে মা মেরেই ফেলবে। সে বাঁচবে না। ফিরে গেলে মা তাকে আস্ত রাখবে না। সে মরে যাবে। আরও কাঁদছে ছেলে।

বারবার মাথা নেড়ে ছেলে বলছে, 'পয়সাগুলো খুঁজে পেতেই হবে। যেখানেই হারিয়ে যাক, খুঁজতেই হবে। নইলে—'। পাগলের মতো বারবার বলছে। পথের পাশের ঝোপে, পাথরের ফাঁকে ছেলে পয়সা খুঁজে চলেছে।

ছোট ছেলে। মনে ভয়। পয়সা খোঁজায় ব্যস্ত। ফেরার সময় সে পথ হারিয়ে ফেলল। যে পথ দিয়ে পাহাড়ের ওপাশের গাঁয়ে গিয়েছিল, সে পথে ফেরা হল না। দিন গড়িয়ে যাচ্ছে, ছেলেও পয়সা খুঁজে পেলনা। এ কি হল ? অনেক বিপদ এসেছে তার ছোট্ট জীবনে। কিন্তু এমন বিপদে সে আগে পড়েনি।

সন্ধ্যা নেমে এল। চারিদিকের পথঘাট নির্জন হয়ে গেল। গাছে গাছে শুধু পাখিদের বিকট চেঁচামেচি। একা একা ভয় করছে। তবু সে বাড়ি ফিরতে সাহস পাচ্ছে না। মা রয়েছে বাড়িতে। ছেলে জানেও না এ পথে সে বাড়ি পৌঁছতে পারবে না। সে পথ হারিয়েছে। বৃথাই তার বাড়ি ফেরার চেষ্টা করা। পথ-হারানো ছোট্ট ছেলে।

তার পা দুটো অবশ হয়ে এল। আহা, ছোট্ট দুটো পা। সে আর চলতে পারছে না। এমন সময় ঝড় এল, প্রচণ্ড ঝড়। পথের ধুলো-পাতা পাক খেয়ে খেয়ে ওপরে উঠছে। গাছগুলো নুয়ে পড়ছে, এবার বুঝি ভেঙেই পড়বে। অন্ধকারে ঝড়ে সে দিশেহারা হয়ে বসে পড়ল। পাদুটো যেন তার নয়, পাথরের পা। দেহ যেন কেমন অচল হয়ে পড়ল।

কিন্তু বসে থাকলে তো চলবে না ! পয়সা খুঁজতেই হবে। কিন্তু খুঁজবে কেমন করে ? চোখে যে কিছুই দেখা যায় না। তবু সে এগোল। কেন তা জানেনা। সব যেন কেমন হয়ে গিয়েছে। হঠাৎ পায়ে খুব ঠান্ডা লাগল, ভিজে মাটি। চোখে কিছুই ঠাহর হচ্ছে না। একটা দমকা হাওয়া এল। সে টাল সামলাতে পারল না। সামনেই পাহাড়ি নদী। জলে গিয়ে পড়ল। হাত-পা-দেহ অবশ। বাঁচবার চেষ্টাও করতে পারল না। ডুবে গেল। ছোট্ট ছেলে মরে গেল।

মৃত্যুতেও ছেলে সৎমায়ের নিষ্ঠুরতার কথা ভুলতে পারল না। মায়ের শাস্তির ভয় তার মন থেকে গেল না। মনে হল, 'মা আমাকে ছাড়বে না। ঠিক শাস্তি দেবে। পয়সা হারিয়েছে, ঠিক চেলা কাঠ দিয়ে মারবে। মা মা।' এক অদ্ভুত আতঙ্ক !

তার আত্মা বারবার বলছে, 'পয়সা আমাকে খুঁজে পেতেই হবে। পয়সা আমাকে খুঁজে পেতেই হবে।'

এই আতঙ্কের মধ্যে ছেলে জন্ম নিল জোনাকি হয়ে। সে জোনাকি হল,—হাতে অস্পষ্ট আলো, ছোট্ট আলো, জ্বলছে নিভছে। মৃত্যুর পরেও সে খুঁজে চলেছে মায়ের দেওয়া পয়সা। ছোট্ট ছেলে ছোট্ট জোনাকি হয়ে অল্প আলোয় পয়সা খঁজছে পথে, বনের ধারে, পাথরের ফাঁকে। সে আজও পয়সা খুঁজে পায়নি। জোনাকি আলো জ্বেলে এখনও হারানো পয়সা খুঁজছে।

ছায়াপথ

মানুষের পাপের ফলে আজ আর আমরা স্বর্গ দেখতে পাই না। মৃত্যুর আগে দেখতে পাই না। কিন্তু একদিন পেতাম। সেই দূরের স্বর্গের গোচারণভূমিতে গোরু চরাত এক রাখাল। সকালবেলা হলেই রাখাল গোরু নিয়ে বেরিয়ে পড়ত। গোরুরা চরছে, সে গাছের নীচে বসে বাঁশি বাজাচ্ছে। চারিদিকে সেই সংগীতের মিষ্টি সুর ছড়িয়ে পড়ত। মাঝে-মধ্যে গোরুরাও ভুলে যেত খাবার খেতে। রুপোলি বাঁশির সেই সুর আশেপাশের মেঘে আঘাত পেয়ে নানা সুরে ভেঙে পড়ত। সারাদিন বাঁশি বাজাত রাখাল। সে নিজেই যেন মিষ্টি গানে তৈরি।

স্বর্গদেবতার নয় মেয়ে। সবচেয়ে সুন্দরী মেয়ে রেশমি রঙের মেঘে মেঘ বোনে। মেঘ বুনে চলাই তার কাজ। আকাশে মেঘের কতরকম চেহারাই না আমরা দেখি। সবচেয়ে উজ্জ্বল রেশমি রঙের বুননের কাজ করে ওই মেয়ে।

একদিন এই কাজ করতে করতে মেয়ে আন্‌মনা হয়ে গেল। আজ কেন যেন বড় একঘেয়ে লাগছে। আর ভালো লাগছে না। এদিকে-ওদিকে চেয়ে দেখছে, হাতের কাজ বন্ধ। চেয়ে রয়েছে আকাশি নদীর দিকে। টল্‌টলে শীতল জল বয়ে চলেছে। মেয়ে ভাবল, 'আঃ, কি সুন্দর জল। স্নান করে আসি, তাহলে বোধহয় মন ভালো লাগবে।'

যেন ডানা মেলে হাওয়ায় ভেসে ছুটে গেল মেয়ে। কেউ নেই। খুলে ফেলল তার দেহের পোশাক। সোনালি দেহ এলিয়ে দিল জলে। কি আনন্দ। মিষ্টি স্বর্গীয় গান ভেসে আসছে মেঘের ফাঁকে ফাঁকে।

ঝোপের আড়ালে বসে ছিল রাখাল। জলের শব্দ হতেই পেছন ফিরে চাইল। এ কি রূপ ? এ কি দেহের বরণ ? এ কে ? সোনালি গোরু ফিস্‌ফিস্ করে বলল, 'দেরি করো না, মেয়ের পোশাক লুকিয়ে ফেলো।' গোরু পাশে শুয়ে গান শুনছিল। আর দেরি নয়। রাখাল ছুটে গিয়ে পোশাক তুলে নিল হাতে, বুকের কাছে নিয়ে ঝোপে লুকিয়ে পড়ল।

আনেকক্ষণ স্নান করল মেয়ে। এবার জল ছেড়ে উঠে আসছে মেয়ে। সোনার বরণ মেয়ে। মেয়ে তীরে উঠে দেখে পোশাক নেই ! এধার-ওধার চাইল। সে বাড়ি ফিরবে কেমন করে ? পোশাক কোথায় গেল। মেয়ে কাঁদতে শুরু করল।

ঝোপের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল রাখাল। মেয়ের সামনে এসে দাঁড়াল, হাতে তার রেশমি পোশাক। বলল, 'ওগো মেয়ে, তুমি যদি আমায় বিয়ে করো, তবেই আমি পোশাক দেব, নইলে নয়। বল, বিয়ে করবে।'

কান্না-ভরা লাল চোখ তুলে মেয়ে দেখল, এক পবিত্র কিশোর মিষ্টি মুখে দুষ্টুমি-ভরা চোখে তার সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে। তার সুন্দর গোলাপি ঠোঁটদুটো হাসির রেখায় ভরা।

'মেয়ে, বিয়ে করবে না ?' কি সহজ সুরে কথা বলছে ছেলে। মেয়ে অবাক হল। বড্ড ছেলেমানুষ। বড়ো ভালো লাগছে। মেয়ের মনও সহজ। সোনার মেয়ে রাজি হল। অনেক স্বর্গীয় গোরুর মাঝখানে তাদের বিয়ে হয়ে গেল।

দুটি রঙিন প্রজাপতি ঘর বেঁধেছে। কি সুন্দর তাদের মিলন, কি পবিত্র তাদের চারিদিক। এমনি করে দিন বয়ে যায়।

একদিন মেয়ে বলল, 'ওগো কিশোর, এবার যে আমায় যেতে হবে। অনেকদিন রেশমি মেঘ দিয়ে মেঘ বোনার কাজ করিনি। বাবা হয়তো ভীষণ রেগে রয়েছে। এখন গিয়ে অনেক বোনার কাজ করে বাবার রাগ ভাঙাতে হবে। কতদিন করি নি কে জানে। এবার আমায় যেতে দাও', মেয়ের চোখে টল্‌টলে শিশিরবিন্দু।

ছেলে দুঃখে ভেঙে পড়ল, 'সোনার মেয়ে, আমি তোমায় আবার কবে দেখতে পাব ? আবার কবে দেখা হবে ?'

মেয়ে বলল, 'বছরে মাত্র একবার। সেদিন আমাদের দুজনের দেখা হবে।' মেয়ে আর কিছু বলতে পারল না। চোখ নামিয়ে বাড়ির পথে চলল।

না, মেয়েকে যেতে দেবে না রাখাল ছেলে। বুকভরা অভিমান। কেন যাবে আমায় ছেড়ে ? পেছনে পেছনে চলল রাখাল। পেছন ফিরে তাকাল মেয়ে। তার সোনালি আঙুল তুলে নিষেধ করল। আসতে নেই, এসো না গো।

এগিয়ে চলেছে মেয়ে। পেছনে চলেছে ছেলে। দুজনের চোখেই টল্‌টলে শিশিরবিন্দু। রাঙা ফুলের মতো চোখ মেলে মেয়ে বলল, 'ওগো, এসো না, আসতে নেই, বাবা দেখলে রাগ করবে, বকবে। এসো না, সোনা ছেলে।'

ছেলে এগিয়ে চলেছে। নিষেধ মানে না সে। বড় অবুঝ। মেয়ে পেছন দিকে তাকিয়ে জল-ভরা চোখে বলল, 'আমাদের দেখা হবে। বছরে একবার। মাত্র একবার। যেদিন আকাশ-পথে রুপোলি ছায়াপথ দেখা দেবে, সেদিন আমাদের দেখা হবে। প্রতীক্ষার পরে মিলন হবে অনেক আনন্দের। তুমি বড় ছোট। বুঝবে কি এসব কথা ? এসো না, আসতে নেই গো সোনা ছেলে।'

একথা বলেই মেয়ে তার মাথার মেঘবরণ কেশগুচ্ছ থেকে খুলে নিল একটা চুল বাঁধবার সুন্দর কাঁটা। তাই দিয়ে ফুলের পাপড়ির মতো সুন্দর আঙুলে মেঘের ওপরে দাগ কেটে দিল। সঙ্গে সঙ্গে বয়ে গেল একটা রুপোলি নদী, আকাশপথে ছায়াপথ। রুপোলি নদীর ওপারে স্বর্গীয় রাখাল আর এপারে মেঘকন্যা। দুজনের বিচ্ছেদ হল। ছেলে তাকিয়ে রইল মেয়ের দিকে, মেয়ে ছেলের দিকে। হাওয়ায় যেমন করে গাছের পাতা ঝুরুঝুরু কাঁপে, তেমনি কাঁপা হাতে বিদায় জানাল মেয়ে। ছেলে দাঁড়িয়ে রইল। কোন কথা বলল না, বিদায় জানাল না। মেয়ে এগিয়ে গেল।

প্রতিবছর আকাশে একবার ছায়াপথ দেখা দেয়। সেদিন পৃথিবীর যত দোয়েল পাখি আছে তারা ডানা মেলে উড়ে আসে। রুপোলি নদীর ওপরে। ডানা মেলে ভেসে থাকে রুপোলি নদীর সবখানে। এপার থেকে ওপারে। তারা যে এই প্রেমিক-প্রেমিকাকে ভালোবাসে। ছেলে অপেক্ষা করে থাকে এই দিনটির জন্য, মেয়ে অপেক্ষা করে থাকে এই দিনটির জন্য। পাখির সেতুর ওপর দিয়ে হেঁটে যায় ছেলে, দৌড়ে যায় সোনা ছেলে। ওপারে গিয়ে বুকে জড়িয়ে ধরে সোনার বরণ মেঘকন্যাকে। এই একদিনের জন্য।

বাছারা, তোমরা দেখবে আকাশে যেদিন ছায়াপথ দেখা দেয়, প্রায় বছরেই সেদিন বৃষ্টি পড়ে। এ কিন্তু অন্যদিনের মতো বৃষ্টি নয়। দুজনে মিলিত হয়ে কান্নায় ভেঙে পড়ে। তাদেরই চোখের জল মেঘের পথ বেয়ে নেমে আসে। মিলনের মুহূর্তে আবার বিচ্ছেদের ভাবনায় তারা কাঁদে। দুটি স্বর্গীয় প্রেমিক-প্রেমিকা কোন ভুলে-যাওয়া কাল থেকে মিলিত হচ্ছে আর কাঁদছে।

এসব আমাদের মা দিয়েছে

এক যে ছিল বাবা-মা। তাদের দুই ছেলে। সবাই মিলে কাজ করে। সুন্দর দ্বীপ। চারিদিকে নীল জল। এ জায়গাটা তাদের খুব পছন্দ।

কিন্তু এমন দিন থাকল না। পরপর দু বছর খরা হল। প্রচণ্ড খরা। দুর্ভিক্ষ। সবচেয়ে কষ্ট জলের। দ্বীপের ছোট ছোট পুকুর শুকিয়ে গেল। ঝরনার জল আর পড়ে না। জলের বড় কষ্ট। চারিদিকে এত জল, কিন্তু তাতে তেষ্টা মেটে না। জিভ পুড়ে যায়। শরীর ঠান্ডা হয়, কিন্তু তেষ্টা মেটে না।

শেষকালে মা একটা গর্ত দেখতে পেল। মাটিতে গর্ত। সেই গর্ত বেয়ে অনেক নীচে নেমে গেলে তবেই জল মেলে। খুব কষ্ট। তবু তেষ্টা মেটাবার জল তো পাওয়া গেল।

বাড়ি থেকে অনেক দূরে সেই গর্ত। একদিন হয়েছে কি, মা গর্তে ঢুকতে যাবে, তার পেট আটকে গেল গর্তের এক জায়গায়। আসলে, মা আবার মা হতে চলেছে। ছেলে ভেতরে বড হচ্ছে। তাই মায়ের পেট গেল আটকে। বাবা অনেক চেষ্টা করল, কিন্তু মাকে ছাড়াতে পারল না। সে তেমনি আটকে রইল। চেষ্টা করতে গেলেই যন্ত্রণায় মা চিৎকার করছে। কিছুতেই কিছু করা যাচ্ছে না।

অনেক সময় বয়ে গেল। মা-বাবা কেন ফিরছে না? এত দেরি তো কোনদিন হয় না? তবে আজকে কি হল? বাড়িতে বসে বসে দুই ভাই ভাবছে। বারবার বাইরে এসে দূরে তাকিয়ে দেখছে। মা-বাবা আর আসে না।

শেষকালে কাঁদতে কাঁদতে দুই ভাই হাঁটা দিল। খুব তাড়াতাড়ি। গর্তের মুখে যেতেই তারা দেখল, মা নেই, বাবা চুপ করে আকাশের দিকে তাকিয়ে বসে রয়েছে। বাবার খেয়ালই নেই, পাশে এসে দুই ছেলে দাঁড়িয়ে আছে। 'বাবা' বলে ডাকতেই সে চমকে উঠল। সব বলল তাদের।

নিচু হয়ে ছেলে দুটি গর্তের মুখে ঢুকল। কিছুটা এগিয়ে গিয়েই মাকে দেখতে পেল। মা ক্লান্ত হয়ে সেখানে আটকে রয়েছে। ছেলেরা কাঁদতে কাঁদতে মায়ের কাছে গিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরল। মা কাঁদল না।

ছেলেদের জড়িয়ে ধরে মা বলল, 'আমি আর ফিরতে পারব না। তাতে কি? তোমাদের যা দেব তাতে দুঃখ থাকবে না। মায়ের জন্য কাঁদতে নেই।'

মা প্রথমে তাদের দিল একটা পাখি। ঠিক তিতির পাখির মতো দেখতে। আর দিল একমুঠো বীজ। ঠিক লাউয়ের বীজের মতো দেখতে। আরও দু-একটা জিনিস।

ছেলেদের হাতে এসব তুলে দিয়ে মা বলল, 'বাছারা, এই পাখি যখন আনন্দে তার দুটো সুন্দর ডানা ঝাপটাবে, তখন তোমাদের শস্যের গোলা জোয়ার শস্যে ভরে উঠবে।

জলের পাত্রগুলো উপ্‌চে পড়বে টল্‌টলে জলে। যখন লাউয়ের বীজ থেকে অঙ্কুর গজাবে, সেই ছোট্ট গাছ পুঁতে দিয়ো মাটিতে। সেই গাছে ফল ধরবে। ফলগুলো কাটলেই তার মধ্যে নানান ধরনের ফসল পাবে। অফুরন্ত। কোন অভাব থাকবে না। আমি ফিরব না, কিন্তু তাতে দুঃখ নেই। তোমরা সুখি হবে।'

বাড়িতে ফিরে এল তারা। পরের দিন। সুন্দর সকাল। মিষ্টি হাওয়া বয়ে আসছে। তিতির আনন্দে ডানা ঝাপ্‌টাল। শস্যের গোলা ভরে উঠল, পাত্রে পাত্রে জল উপ্‌চে পড়ছে। কি আনন্দ।

বীজ থেকে অঙ্কুর হল। অঙ্কুর থেকে গাছ। গাছে ফলল অনেক ফল। ফলগুলো কেটে ফেলতেই নানান ধরনের ফসল মাটিতে পড়ল। কিন্তু শধু ফসল নয়। কয়েকটা ফল থেকে অনেক পাখি, অনেক জন্তু বেরিয়ে এল। তারা বেরিয়েই ফসল খেতে শুরু করল। সর্বনাশ! এত প্রাখি, এত জন্তু! এরাই তো সব খেয়ে শেষ করে দেবে! তাড়াও, তাড়াও, এদের তাড়াও। অনেক পাখি আর জন্তুকে তারা তাড়িয়ে নিয়ে চলল। পাহাড়ের দিকে। তারাও ভয় পেয়ে পাহাড়ি বনে ঢুকে পড়ল। আর কোনদিন ফেরেনি। তারা সেখানেই রয়ে গেল। আজকে আমরা পাহাড়ি বনে যেসব পশুপাখিকে দেখতে পাই তারা ওদেরই ছেলেমেয়ে। বুনো শুয়োর, হরিণ,—আরও কত কি।

কয়েকটি পশু বেশ শান্ত। তারা তেমন করে ফসল খায়নি। তারা যেতে চাইল না পাহাড়ি বনে। থাকতে চাইল মানুষের মধ্যে। ছেলে দুটি কি আর করে! তাদের থাকতে দিল। বড় শান্ত তারা। আহা থাক। তারাই হল আমাদের পোষা শুয়োর। বড় উপকারী।

শিকারি ও কুকুর

কুকুর একসময় বনেই থাকত। সে ছিল বুনো কুকুর। অন্য বুনো পশুদের সে খুব ভয় করত। ভাবত, তাদের সঙ্গে বোধহয় পেরে উঠবে না। ওরা হিংস্র! তাই লুকিয়ে - চুরিয়ে কুকুর একা একাই বনে থাকত। তার কোন বন্ধু ছিল না। একা, একেবারে একা। কিন্তু এ জীবন তো আর ভালো লাগে না। সবাই একসঙ্গে থাকে, সবারই বন্ধু-বান্ধব আছে। সেই শুধু একা। এবার সে বন্ধু পাতাবেই কারও-না-কারও সঙ্গে।

এই ভেবে সে তার নির্জন গুহা থেকে বেরিয়ে পড়ল। যা থাকে কপালে। পথে এক ঝোপের পাশে দেখা হল এক খরগোশের সঙ্গে। তাকে দেখেই কুকুর বলল, 'বন্ধু, আমি তোমার বন্ধু হতে চাই। এসো, আমরা একসঙ্গে থাকি। এক বাড়িতে।'

খরগোশ কান খাড়া করল। কুকুরকে বুঝতে চেষ্টা করল। সব বুঝে বলল, 'বেশ তো ভালোই। একসঙ্গে থাকি।'

ঠিক হল তারা কুকুরের আস্তানাতেই থাকবে। দুজনে পাশাপাশি হেঁটে আস্তানায় পৌঁছল। অনেক হাসি, অনেক আনন্দ। অনেক জমানো কথা। শেষকালে দিনের আলো কমে এল, সূর্য পাহাড়ের ওপারে ঢলে পড়ল। দুজনে দুপাশে শুয়ে পড়ল।

মাঝ রাত্তির। চারিদিকে কোন সাড়া-শব্দ নেই। মাঝে মধ্যে দু-একটা পাখি শুধু চেঁচিয়ে উঠছে। বোধহয় ভয় পেয়েছে। হঠাৎ কুকুর ঘেউ ঘেউ করে চিৎকার করতে লাগল। খরগোশের ঘুম গেল ভেঙে। লাফিয়ে উঠে সে বসল, কানদুটো সোজা হয়ে আছে। বেচারা বড় ভয় পেয়েছে।

'বন্ধু, তুমি চেঁচাচ্ছ কেন? থাম, থাম। এক্ষুনি নেকড়ে শুনতে পাবে। আর শুনলে রক্ষা নেই। এসে দুজনকেই শেষ করবে।' খরগোশ ফিস্‌ফিস্ করে বলল।

কুকুর ভাবল, 'হায় কপাল। আমি তো ঠিক বন্ধু জোটাতে পারি নি? আমি ভয়ে মরি, ভাবলাম সাহসী বন্ধুর আশেপাশে থাকব, তা না এ আমার চেয়েও ভিতু। এ বন্ধু চলবে না। আমার মনে হচ্ছে, নেকড়ে নিশ্চয়ই কাউকে ভয় পায় না।' এই ভেবে কুকুর গুহা থেকে বেরিয়ে গেল। চলল নেকড়ের সন্ধানে।

কুকুর লেজ নেড়ে চলেছে পথে। হঠাৎ দেখা নেকড়ের সঙ্গে। কুকুর একটু ভয় পেল, তবু সাহস করে বলল, 'বন্ধু, আমি তোমার বন্ধু হতে চাই। এসো, আমরা একসঙ্গে থাকি। এক বাড়িতে।'

নেকড়ে বলল, 'মন্দ কি! বেশ তাই হবে।'

ঠিক হল তারা নেকড়ের গুহাতেই থাকবে। তারা দুজনে গুহায় ঢুকল। অনেক হাসি, অনেক আনন্দ। অনেক জমানো কথা। শেষকালে দিনের আলো কমে এল, চারিদিকে অন্ধকার। দুজনে পাশাপাশি শুয়ে পড়ল।

মাঝ রাত্তির। হঠাৎ কুকুর চিৎকার করে উঠল। ঘেউ ঘেউ শব্দে নেকড়ের ঘুম ভেঙে গেল। সে ভীষণ ভয় পেয়ে কুকুরকে বলল, 'বন্ধু চেচাচ্ছ কেন? এই রাত্তিরে? এক্ষুনি শব্দ শুনতে পাবে পাহাড়ি ভালুক। তাহলে আর রক্ষে নেই। এক্ষুনি দুজনকেই পেটে পুরে দেবে। চেঁচিয়ো না।'

কুকুর মনে মনে ভাবল, 'ও বাবা, এও দেখছি আমার মতো ভিতু। আমি তাকে যা ভেবেছিলাম নেকড়ে তো তা নয়। সে আবার পাহাড়ি ভালুককে ভয় পায়। ঠিক বন্ধুত্ব হয় নি। তাহলে বুঝতে পারছি পাহাড়ি ভালুকই সবচেয়ে সাহসী।'

কুকুর বেরিয়ে এল গুহা থেকে। পাহাড়ি ভালুকের সন্ধানে। যাচ্ছে যাচ্ছে, কুকুর কান খাড়া করে চলেছে। হঠাৎ দেখা এক পাহাড়ি ভালুকের সঙ্গে। কুকুর বেশ ভয় পেল, তবু বলল, 'বন্ধু, আমি তোমার বন্ধু হতে চাই। এসো, আমরা একসঙ্গে থাকি। এক বাড়িতে।'

ভালুক সঙ্গে সঙ্গে বলল, 'এতে আর আপত্তি করার কি আছে। বেশ তাই হবে।'

ঠিক হল, তারা থাকবে ভালুকের গুহায়। দুজনে গেল পাহাড়ি গুহায়। অনেক হাসি, অনেক আনন্দ। অনেক জমানো কথা। শেষকালে চারিদিক অন্ধকার হয়ে গেল। তারা পাশাপাশি শুয়ে পড়ল।

মাঝ রাত্তির। চারিদিক নিঝুম। হঠাৎ কুকুর ডেকে উঠল। ঘেউ ঘেউ শব্দে পাহাড়ি ভালুকের ঘুম ভেঙে গেল। সে ভয়ে কাঁপছে। কাঁপতে কাঁপতে বলল, 'ও কুকুর, তুমি চেচাচ্ছ কেন? এই ডাক শুনতে পেলে এখুনি শিকারি মানুষ ছুটে আসবে। আমাদের দুজনকেই শেষ করে দেবে। ওদের হাতে তির-ধনুক আর বর্শা আছে। চেঁচিয়ো না।'

কুকুর আকাশ থেকে পড়ল। এ কি হল? যাকে সে ভেবেছিল সবচেয়ে শক্তিমান, যার ওপরে তার ছিল এত আশা,—সে-ও ভয়ে কাঁপছে? পাহাড়ি ভালুক কাউকে ভয় পায় না, সে তো তাই ভেবেছিল। ভাবনাটা ঠিক নয়। ঠিক বন্ধুত্ব হয়নি। এ রকম বন্ধু তার দরকার নেই। মনে হয়, মানুষই সেই বন্ধু যে কাউকে ভয় করে না। চলল মানুষের সন্ধানে।

যেতে যেতে শেষকালে সে একজন মানুষের দেখা পেল। অনেক দূরে। সে শিকারি মানুষ। তাকে দেখেই কুকুর লেজ নেড়ে বলল, 'বন্ধু, আমি তোমার বন্ধু হতে চাই। এসো, আমরা এক সঙ্গে থাকি। এক বাড়িতে।'

মানুষ বলল, 'বাঃ, ভালোই তো। বন্ধু সবসময়েই ভালো। যত বন্ধুত্ব হয় ততই ভাল।'

ঠিক হল, তারা দুজনে শিকারির তাঁবুতে থাকবে। ছোট তাঁবু, কিন্তু সবকিছু গোছানো। মাঝ রাত্তির। শিকারি এবার ঘুমোতে গেল। সারাদিন সে অনেক পরিশ্রম করেছে। কুকুরও ঘুমিয়ে পড়ল।

হঠাৎ কি যেন কেন কুকুর চিৎকার করে উঠল। কুকুরের ঘেউ ঘেউ ডাকে শিকারি জেগে উঠল। বিছানা থেকে লাফিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। তারপর কুকুরকে বলল, 'বন্ধু, তোমার কি খিদে পেয়েছে? তাঁবুতে খাবার কিছু নেই। তুমি অন্ধকারে বেরিয়ে পড়ো। শিকার ধরে আনো। বিপদে পড়লে আমাকে ডাকবে। তির-ধনুক-বর্শা আমার পাশেই আছে। ভয় নেই। আমিও কাউকে ভয় পাই না। কিন্তু শুধু শুধু ঘেউ ঘেউ করে আমার ঘুম ভাঙিয়ো না। ভয়ের কি আছে?'

কুকুর আনন্দে লেজ নাড়তে লাগল। হ্যাঁ, এতদিনে সে সত্যিকারের বন্ধু পেয়েছে। যে ভয় করে না, যে বিপদ দেখে পালায় না, যে ফিস্‌ফিস্‌ করে কথা বলে না। যাক্‌ শেষকালে ঠিক বন্ধু সে পেয়েছে।

কুকুর মনে মনে ঠিক করল, সে মানুষের কাছেই থেকে যাবে। আর কোথাও যাবে না। আজও সে মানুষের পাশেপাশেই রয়েছে। কোনদিন ছাড়াছাড়ি হয়নি।

জাদুথলে ও রুপোর শিং

অনেককাল আগে এক পাহাড়ি গাঁয়ে থাকত এক বুড়ো আর তার বুড়ি। তারা ছিল খুব গরিব। কেননা, তারা এত বুড়িয়ে গিয়েছিল যে, কোন কাজ করতে পারত না। গাঁয়ের লোক দয়া করে যা দিত কোনরকমে তাতেই চলে যেত। কিন্তু গাঁয়ের লোকই বা কত দেবে! তাদেরও তো সংসার চালাতে হয়। ভিক্ষার এই জীবন আর ভালো লাগে না। আগের দিনের কথা ভাবলে চোখে জল আসে।

বসন্তকাল। গাঁয়ের লোকজন মাঠে চলল। ফসল বুনতে হবে। বুড়ি অনেক কষ্টে চোখের জল চেপে বুড়োকে বলল, 'আর তো পারি না। তুমি কিছুটা জোয়ার চাষ করতে পারবে না আস্তে আস্তে? আমার কাছে জোয়ারের কিছুটা বীজ আছে। জোয়ারের গুঁড়ো দিয়ে নরম পিঠে বানিয়ে খাব। ভিক্ষে-করা এই শক্ত দানা তো চিবোতে পারি না? দেখ না চেষ্টা করে।'

বুড়ো ঝাপ্‌সা চোখে তাকিয়ে রইল। যৌবনের দিনগুলোর কথা মনে পড়ল। তারপর বলল, 'ঠিক আছে। পারব। কেন পারব না? বীজ দাও। জোয়ার ফলাবই।' বুড়ির কষ্ট হল তবু খুশি হল।

গাঁয়ের শেষে বুড়োর এক খণ্ড জমি ছিল। অনেকদিন তাতে চাষ করা হয়নি। আস্তে আস্তে কাঁপা কাঁপা হাতে বুড়ো মাটি ঠিক করল, আগাছা তুলে ফেলল, মাটি নরম করল। তারপর বীজ ছড়িয়ে দিল। অঙ্কুর হল, গাছ বড় হচ্ছে, বৃষ্টি সরস করল মাটিকে, রোদ সজীব করল গাছকে। গাছে ফসল ধরতে আর দেরি নেই। এখন মাঠে কোন কাজ নেই। তবু প্রতিদিন যায় বুড়ো। খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে তার ঝাপ্‌সা চোখ।

সেদিনও গিয়েছে বুড়ো। এ কি? একটা সারস লম্বা লম্বা পায়ে জমির ওপর দিয়ে চরে বেড়াচ্ছে। পায়ের চাপে সবু ফসলের চারা নুয়ে পড়ছে। 'হায়! চরে বেড়াবার আর জায়গা পেল না? হুশ হুশ্।' বুড়ো কেঁদে ফেলল। এ-বয়সেও কেঁদে ফেলল। সারস পাখি উড়ে গেল। কাছে গিয়ে বুড়ো দেখে, প্রায় সব ফসলের চারা নুয়ে পড়েছে। ওগুলো গোড়া থেকে বেঁকে গিয়েছে। ওতে আর ফসল ফলবে না। চোখে জল। দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে বুড়ো বাড়ি ফিরে এল।

বুড়িকে বলল, 'অনেক কষ্টে চাষ করেছিলাম। চারা খুব ভালোই ফলেছিল। কিন্তু...। একটা সারস সবকিছু তছনছ করে দিয়েছে। কপাল খারাপ। কিছুই পাব না।'

বুড়ি একথা শুনে কেঁদে ফেলল। একটু চুপ করে থেকে বলল, 'এককালে তুমি কত বড় শিকারি ছিলে। বুনো শুয়োর, শেয়াল আর পাজি পাখিদের মারতে ওরা তোমাকেই ডাকত। পার না ওই সব পাখিদের মারতে? তোমার বর্শা আর তির-ধনুক এখনও ওই দেয়ালে ঝোলানো আছে। ওই শয়তান সারসকে মারতে পার না। জোয়ার আর পাব না, কিন্তু কিছুটা মাংস তো পাওয়া যাবে। দেখ না চেষ্টা করে।'

শিকারের কথায় বুড়োর চোখ চক্‌চক্ করে উঠল। আবার নিভেও গেল। হাত কাঁপে, চোখ ঝাপ্‌সা—সে কি পারবে? দেখাই যাক না চেষ্টা করে। বুড়ো পিঠে নিল ধনুক, হাতে

নিল তির আর বর্শা। সোজা চলে গেল গাঁয়ের শেষে তার জমিতে। একটা ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে রইল সে। রাগে বুড়ো কাঁপছে।

সারস আবার উড়ে এল। তেমনিভাবে চরে বেড়াতে লাগল। বুড়ো তির ঠিক করে ধনুকের ছিলায় লাগল। তির বেরিয়ে আছে ঝোপের বাইরে। তাক্ ঠিক করছে বুড়ো। এক চোখ বোজা। এইবার তির ছাড়তে হবে। আর...।

সারস পাখি মানুষের গলায় কথা বলে উঠল, 'ওগো বুড়ো! আমায় মেরো না। এ তুমি কি করছ?'

'মারব না? আমার ফসল নষ্ট করেছে কে? মারবই।'

সারস কাতরভাবে বলে উঠল, 'ওগো বুড়ো। আমি জানতাম না, এই ফসলের জমি তোমার, তা আমি জানতাম না। আমি ভেবেছিলাম এ-জমি নিষ্ঠুর সর্দারের। গোষ্ঠীপতির। আমায় ক্ষমা করো।'

'ক্ষমা করে দাও বলা খুব সহজ। বললেই হয়ে গেল। এ-দুনিয়ায় আমার আর কিছুই রইল না। যাও-বা কিছু ফলিয়েছিলাম, তাও তুমি নষ্ট করে দিলে। আমার একমাত্র আশা ছিল ওই জোয়ার। এখন বুড়ো-বুড়িকে উপোস করতে হবে। আর এর জন্য তুমিই দোষী। ক্ষমা করব?' বুড়ো ভীষণ রেগে গিয়েছে।

চুপ করে মন দিয়ে সারস বুড়োর কথা শুনল। বলল, 'তুমি এত গরিব? ঠিক আছে। তোমায় এমন জিনিস দেব যাতে তোমায় জোয়ারের জন্য কাঁদতে হবে না। একটু দাঁড়াও।' সারস ডানা মেলে উড়ে গেল। দূরে ঝোপের আড়ালে মিলিয়ে গেল।

বুড়ো হঠাৎ ভাবল, সারস তাকে বোকা বানিয়ে উড়ে গেল না তো? ইস্ তাই ঠিক। ওকে তির মারাই উচিত ছিল। বুড়িকে গিয়ে এখন কি বলবে?

হঠাৎ বুড়ো ডানার শব্দ শুনতে পেল। ঝোপের ওধার থেকে সারস হাওয়ায় ভেসে আসছে। তার ঠোঁটে ঝুলছে ছোট্ট একটা থলে।

বুড়োর ঝোপের কাছে এসে সারস নামল। থলেটা বুড়োর হাতে দিয়ে বলল, 'তোমার ফসল আমি নষ্ট করেছি, তার বদলে এই থলে দিলাম।'

'কি হবে তোমার থলে দিয়ে। আমি তো ভিক্ষে করে খাই, ওরকম থলে আমার অনেক আছে। ভিখারির থলে ছাড়া আর কিছু থাকে না। এসব তুমি জান না'? বুড়ো আরও রেগে গেল।

সারস শান্ত গলায় বলল, 'বুড়ো, এটা তুমি নাও। তোমার হয়তো অনেক থলে আছে, কিন্তু এরকম থলে নেই। এটা হল জাদুথলে। থলেটা নিজের সামনে ধরে বলবে—ছোট্ট থলে, তুমি বড় হয়ে যাও, তুমি সুন্দর হও, তুমি আমায় খাবার দাও, পানীয় দাও। থলে তোমায় সব দেবে। কাজ হয়ে গেলে আবার বলবে— ছোট্ট থলে, তুমি গুটিয়ে যাও, খাবার শেষ হোক, পানীয় শেষ হোক। থলে আবার পুরনো আকারে ফিরে আসবে।'

'তাই যদি হয় তবে তোমাকে অনেক ধন্যবাদ। তোমাকে চিরকাল মনে রাখব। আমরা বড় গরিব।' ছোট্ট থলে নিয়ে বুড়ো বাড়ির পথে চলল। বেশ তাড়াতাড়ি।

কিন্তু বাড়ি যাওয়া আর হল না। সে দেরি করতে পারছে না। দেখাই যাক না, সারস সত্যি কথা বলেছে কিনা। পথের পাশে সে বসে পড়ল। এদিক-ওদিক দেখল। তারপর থলেটা নিজের সামনে এনে বলল, 'ছোট্ট থলে, তুমি বড় হয়ে যাও, তুমি সুন্দর হও, তুমি আমায় খাবার দাও, পানীয় দাও।' অবাক কাণ্ড! তার সামনে এমন সব খাবার আর পানীয় এল, যে সে এসব কোনদিন চোখেও দেখেনি। সে কেন, গাঁয়ের সর্দারও দেখেনি।

'সত্যি, সারস বড় ভালো। সে আমাকে ঠকায়নি।' মনের সুখে প্রাণ ভরে বুড়ো ওই সব খেল। আবার থলেকে ছোট করে দৌড় দিল বাড়ির পথে।

বাড়ির উঠোনে পা দিয়েই বুড়ো আনন্দে চিৎকার করে উঠল, 'ও বুড়ি। আরে গেলে কোথায় ? বেঁচে আছ তো ?

'হ্যাঁ গো, বেঁচেই আছি। তা অত চেঁচাচ্ছ কেন ? হয়েছে কি ? এতক্ষণ বাইরে থাকে ? আমি তো ভয়েই অস্থির ! নেকড়ে খেল নাকি ! অথবা ভালুকের খপ্পরে পড়েছ। তারা তোমায় মজা করে ঝোপে টেনে নিয়ে গিয়ে...... !'

'আরে, না না। ওসব কিছু নয়। নেকড়েও খায়নি, ভালুকও ধরেনি। ধরলেই হল ? অনেক খাবার, অনেক পানীয়। শেষ জীবনে আর কোন কষ্ট রইল না। আরে, এসেই দেখ না !'

বুড়ি এসব আবোল-তাবোল কথা কিছুই বুঝল না। সে কাছে এল। বুড়ো ছোট থলে সামনে ধরে খাবার দিতে বলল, পানীয় চাইল। অবাক কাণ্ড ! বুড়ির চোখ বোধহয় ঠিকরে বেরিয়ে আসবে। কাঠের চৌকি ভরে গেল খাবারে পানীয়ে। 'এসব তুমি পেলে কেমন করে ?' বুড়ির গলা কাঁপছে।

'সেই সারস পাখি আমাদের এসব দিয়েছে। এই জাদুথলে দিয়েছে।'

'বুড়ো, তুমি তো আচ্ছা বোকা ! এমন পাখিকে মারতে তির-ধনুক-বর্শা নিয়ে গিয়েছিলে ? এত বোকা তুমি ?' বুড়ি ভুলেই গেল, সে-ই বুড়োকে পাঠিয়েছিল মাংস আনতে। এরকমই হয়।

পেট পুরে, প্রাণ ভরে তারা খেল। এসব তো জীবনে চোখেই দেখেনি। আর খেতে পারছেনা।

হঠাৎ বুড়ি বলল, 'এটা তো ঠিক হচ্ছেনা। তুমি ওদের ডাক, ওরাও আসুক।'

'ওরা কারা ?'

'বাঃ, আমাদের গাঁয়ের যারা খুব গরিব, যারা খেতে পায়না, যাদের বড় কষ্ট, তাদের ডেকে আনো। ওরা আমাদের অনেক দিয়েছে। নিজেরা অল্প খেয়েও দিয়েছে। ওদের ভুলতে নেই।'

বুড়ির কথা বুড়ো বুঝতে পারল। সে সব গরিব মানুষকে ডেকে আনল। যারা গরিব, যারা খিদেয় কষ্ট পায়,—তাদের সবাইকে ডাকল। তারা এল, প্রাণ ভরে খেল। জাদুথলের গুণ দেখল। খুব খুশি হল।

বুড়োর বাড়ি গম্‌গম্‌ করে। প্রতিদিন দুবেলা সবাই আসে। অফুরন্ত খাবার-পানীয়। সবাই খায়। বুড়োকে ভালোবাসে, বুড়িকে ভালোবাসে। সবাই খুশি। আর কারও অভাব নেই।

এদিকে হয়েছে কি, সর্দারের এক ক্রীতদাস জাদুথলের কথা জেনে গেল। সে সব কথা সর্দারকে বলল। সর্দার মনে মনে ভাবল, 'আমি হলাম এলাকার সর্দার, আমি যা খেতে পাইনা, ওই ভিখারি বুড়ো তাই খাচ্ছে ? রোজ ! সবাইকে খাওয়াচ্ছে ? এতে তো আমারই মান গেল।'

রাগে কাঁপছে সর্দার। হিংসেয় জ্বলে-পুড়ে যাচ্ছে সর্দার। এর একটা বিহিত করতেই হয়। গাড়িতে ঘোড়া জুড়ে সর্দার ছুটে চলল বুড়োর বাড়ির দিকে। ঘোড়ারা ছুটছে যেন ঝড় বইছে। পৌঁছে গেল বুড়োর ভাঙা-চোরা বাড়িতে।

গাড়ি থেকে নেমে সর্দার বুড়োর উঠোনে এল। মাথা উঁচু করে কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে সর্দার বলল, 'শুনতে পেলাম একটা জাদুথলে নাকি সব গরিব লোককে খাওয়াচ্ছে! সত্যি নাকি?'

বুড়ো মানুষটি জীবনে মিথ্যে কথা বলেনি। সে আস্তে আসতে বলল, 'হ্যাঁ, সত্যি কথা।'

'দেখি থলেটা? কেমন করে খাবার দেয়?'

বুড়ো ঘরের মধ্যে গেল। থলেটা নিয়ে এল। কেমন করে খাবার আসে কেমন করে পানীয় আসে তার কৌশল দেখিয়ে দিল। সর্দার তার চোখকে যেন বিশ্বাস করতে পারছে না। সে এমন মদ চোখে দেখেনি। এসব জিনিস দিলেও তার রান্নাঘরের লোকজন এমন ভালো খাবার তৈরি করতে পারবে না।

সর্দার চড়া সুরে বলল, 'ও থলেটা আমাকে দিতে হবে। তুই ভিখিরি, তুই এসব খাবার দিয়ে কি করবি? এসব সর্দারের বাড়ির জন্য। কত সর্দার, কত বড় মানুষ আমার বাড়িতে আসে। তাদের জন্যই থলেটা আমার দরকার। তুই এসব কোনকালে চোখে দেখেছিস? থলেটা দে।'

'না, থলে আমি দেব না। এটা আমার। এটা তোমরা আমাকে দাওনি। থলে দিয়ে দিলে বুড়ো-বুড়ি বাঁচব কেমন করে? গাঁয়ের মানুষ বাঁচবে কেমন করে? আহা ওদের বড় কষ্ট! জাদুথলে আমি দেব না।' বুড়ো স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিল।

সর্দার বলল, 'ভাবনা নেই, তোর চলার মতো আমি গাড়ি ভর্তি করে আলু, রুটি, মাংস এসব পাঠিয়ে দেব। তোদের দুজনের চলে যাবে।'

'না, তা হয় না। অনেককেই দেখতে হয়। ওরা যে বড্ড গরিব! থলে আমি দেব না।' বুড়ো কাঁপা গলায় বলল।

'তাই নাকি? চাবুকে পিঠের চামড়া তুলে নেব। সর্দারের মুখেমুখে কথা? যদি এমনিতে না দিস, তবে জোর করে নিয়ে যাব। থলে আমার চাই-ই, আমি কে জানিসনা? আমাকে চিনিসনা? তোর থলেও যাবে, তুইও যাবি মাটির নীচে। কেউ টুঁ শব্দ করবেনা।'

সর্দারের সঙ্গে বুড়ো পারবে কেন? এতক্ষণ বাধা দিয়েছিল এই কত না? লোকে শুনলে অবাক হয়ে যাবে। বুড়োর তেজ আছে। গরিব মানুষের তেজ কি বেশিক্ষণ থাকে? বুড়ো জাদুথলে সর্দারের হাতে তুলে দিল।

সর্দার ফিরে যাচ্ছে। সেদিকে তাকিয়ে রয়েছে বুড়ো, পেছনে বুড়ি। দুজনের চোখেই জল। আর সেদিন থেকে সর্দারের বাড়ি আরও গমগম্ করে উঠল। নানা এলাকার সর্দারেরা এই সর্দারের বিরাট বাড়িতে আসছে। খাবার খাচ্ছে, পানীয় খাচ্ছে। এরকম খাবার-পানীয় তারাও আগে দেখেনি। কোন গরিব মানুষ সর্দারের বাড়ি ঢুকতে পারে না। আগের মতো হয়ে গেল সব, বুড়ো আর অন্য গরিব মানুষ কাঁদে, আর সর্দারের বাড়ির দিকে তাকিয়ে থাকে। এদিকে সর্দার বলেছিল, গাড়ি-ভর্তি খাবার আসবে। দিন যায়, রাত যায়, আবার দিন হয়। খাবার আসে না। বড় মানুষ কি ওসব কথা মনে রাখে? সর্দার তার নিজের দেওয়া কথা ভুলে গেল।

বুড়ি একদিন বলল, 'আমার মনে হয় সর্দার ওকথা ভুলে গিয়েছে। তুমি গিয়ে মনে করিয়ে দাও। সর্দারের তখন মনে পড়বে আর খাবার দেবে। মানুষের কতরকম ভুল হয়।'

বুড়োও তাই ভাবল। বুড়ো গেল সর্দারের বাড়ি। কিন্তু সর্দার গরিব বুড়োর কোন কথাই শুনল না। বলল, 'তোমায় দেব এমন কিছুই আমার নেই। যা, বরং ভিক্ষে কর।'

'তাহলে আমার ছোট্ট থলে দিয়ে দাও।' বুড়ো সাহস করে বসল।

'থলে ? তুই জাদুথলে ফিরে চাস ? একটু দাঁড়া, কেমন থলে ফিরে পাস দেখাচ্ছি।' এই বলে রাগে সর্দার চিৎকার করে উঠল। তার চাকরদের ডাকল, পঁচিশ ঘা চাবুক মারতে বলল। হুংকার ছেড়ে বলল, 'এমনভাবে মারবি যাতে বুড়ো আর কোনদিন এমুখো না হয়।'

চাকররা বুড়োকে চেপে ধরল। মারতে মারতে বাড়ির সীমানার বাইরে ধাক্কা মেরে ফেলে দিল। পড়ে রয়েছে বুড়ো। চোখে অন্ধকার, মাথা ঘুরছে, দেহ কাঁপছে। চোখে এক ফোঁটাও জল নেই। অনেকক্ষণ পড়ে থাকার পরে বুড়ো কোনরকমে সোজা হয়ে বসল। ভীষণ ব্যথা দেহে। আস্তে আস্তে বাড়ির পথে চলল।

বাড়িতে ঢুকেই বুড়ো এবার কেঁদে ফেলল। সর্দারের কাছে থলে চাইতে গিয়ে কি হয়েছে সব বলল বুড়িকে। বুড়ি কান্নায় ভেঙে পড়ল। বুড়ো মানুষ দেখেও সর্দারের দয়া হলনা ! তাড়িয়ে দিত কিন্তু মারল কেন ? সর্দাররা এরকমই হয়। ওদের দয়ামায়া থাকতে নেই।

বুড়ি শাপ-শাপান্ত করল সর্দারের। অনেকক্ষণ কাঁদল। তারপর বলল, 'তুমি আবার আমাদের জমিতে যাও। হয়তো সারসের সঙ্গে দেখা হবে। চাইলে সে ওরকম আর একটা থলে দিতেও পারে। জাদুথলে। যাবে নাকি ?'

আশা জাগল বুড়োর মনে। সে অল্পক্ষণ পরে তার জমির দিকে রওনা হল। সে এল গাঁয়ের শেষ সীমানায়। জোয়ারের চাষের জমিতে বসে রইল। অপেক্ষা করতে লাগল। হঠাৎ ডানার শব্দ শুনতে পেল। দূরের ঝোপের দিকে তাকিয়ে দেখে, ডানা মেলে হাওয়ায় ভেসে ওই সারস পাখি আসছে। বুড়োর পাশে এসে নেমে পড়ল সারস।

'বন্ধু, তোমার দেওয়া সেই জাদুথলে আমাদের গাঁয়ের সর্দার কেড়ে নিয়েছে। আমি চাইতে গেলাম, আমাকে চাবুক মেরে তাড়িয়ে দিল। এখন বুড়ো-বুড়ি বাঁচব কেমন করে ? গরিব মানুষ বাঁচবে কেমন করে ? তুমি কি আর একটা জাদুথলে আমায় দেবে ?' বুড়ো সারসের মুখের দিকে চেয়ে রইল।

অনেকক্ষণ ভাবল সারস। তারপর বলল, 'না, ওরকম আর একটা থলে আমি তোমায় দেব না। তার চেয়ে ভালো জিনিস। এবার তোমাকে একটা রুপোর শিং দেব।' একথা বলেই সারস উড়ে গেল দূরের ঝোপের দিকে। বুড়ো বসে রয়েছে। হঠাৎ দেখতে পেল ডানা মেলে সারস উড়ে আসছে এদিকে, তার ঠোঁটে একটা রুপোর শিং।

সারস শিংটা দিয়ে বুড়োকে বলল 'এই নাও। জাদুথলের বদলে এই শিং নাও।'

বুড়ো অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, 'এই রুপোর শিং নিয়ে আমি কি করব ? শিখিয়ে দাও।'

সারস বলল, 'এই শিং নিয়ে তুমি সর্দারের বাড়িতে চলে যাও। সেখানে গিয়ে শিং হাতে নিয়ে বলবে এই রুপোর শিঙে অনেক কিছু আছে। যখন সর্দার বলবে, অনেক হয়েছে আর চাই না তখন তুমি বলবে, এসো সবাই শিঙের মধ্যে ঢুকে যাও।' একথা বলেই সারস দূরে মেঘের কোলে মিলিয়ে গেল।

বুড়ো ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে শিংটা দেখল, রুপোর সুন্দর শিং। বুড়ো ভাবল, 'সারস নিশ্চয়ই অবাক-করা জিনিস দিয়েছে। আর হয়তো সর্দারের কাছে চাবুক খেতে হবে না। সারস তো আমার বন্ধু।'

বুড়ো বাড়ির পথে হাঁটছে আর ভাবছে,—সর্দারের বাড়ি যাওয়া কি ঠিক হবে ? মরে যাইনি ভাগ্যি ! কিভাবেই না মারল ! আপন মনে এসব ভাবতে ভাবতে বুড়ো পথ চলছে।

হঠাৎ পথে দেখা সর্দারের এক শিকারির সঙ্গে। সে সর্দারের বাড়িতেই থাকে। সর্দারের পাশে থাকে সবসময়। বুড়োকে দেখতে পেয়েই শিকারি বলল, 'কি হে, কোথায় গিয়েছিলে ? খবর কি বুড়ো ?'

বুড়ো আনমনে বলল, 'আমি আমার পুরনো বন্ধু সারস পাখির সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম। অনেকদিন দেখা হয়নি। আজ দেখা পেলাম।'

'তা, সারস তোমায় কিছু দিল নাকি ?'

'হ্যাঁ, দিয়েছে। একটা রুপোর শিং।' বুড়ো ঢোলা জামার ভেতর থেকে রুপোর শিং বের করে শিকারিকে দেখাল।

শিকারির চোখ চক্‌চক্ করে উঠল। কোনরকমে উত্তেজনা চেপে বলল, 'তা এতে কি হয় ? কাজটা কি ?'

'এমনি। একটা রুপোর শিং। কি আর হবে ?' বুড়ো বলল।

শিকারি একটু রেগে গেল। রাগ সামলে বলল, 'কিছুই হয় না ? তুমি বুড়ো কিছু চেপে যাচ্ছ। আমার মনে হয়, শিঙের কাছে চাইলে হয়তো সোনা-হীরে পাওয়া যাবে। কি বল ?'

'তা হতে পারে। হয়তো পাওয়া যাবে। কে জানে ?'

'তাহলে শিংকে বল না ? সোনা-হীরে বেরোক।'

'শিকারি, তুমি নিজেই করোনা। নিজেই বলো, এই রুপোর শিঙে অনেক কিছু আছে। এই বললেই হবে।'

শিকারি তাড়াতাড়ি বুড়োর হাত থেকে রুপোর শিংটা ছিনিয়ে নিল। হাতে নিয়ে বলল, 'এই রুপোর শিঙে অনেক কিছু আছে।' অবাক কাণ্ড। শিঙের মুখ থেকে একে একে ঝড়ের বেগে বারোজন শক্তিমান যুবক বেরিয়ে এল। তাদের প্রত্যেকের হাতে একটা করে শক্ত চাবুক। তারা বেরিয়েই লোভী শিকারিকে চাবুক মারতে শুরু করল। যন্ত্রণায় ছট্‌ছট্ করছে শিকারি। মাটিতে আছড়ে পড়ছে। তারা কিন্তু থামছে না।

শিকারি চিৎকার করে কেঁদে কেঁদে বলছে, 'ওগো বুড়ো, তোমার পায়ে পড়ি, এদের ফিরিয়ে নাও। আর পারি না। এবার প্রাণ বেরিয়ে যাবে।'

বুড়ো হেসে হেসে গড়িয়ে পড়ছে। এমন আনন্দ সে জীবনে পায়নি। হাসছে আর বলছে, 'ওগো শিকারি, বেশি কৌতূহল ভালো নয়, বেশি লোভ ভালো নয়। অন্যের ব্যাপারে নাক গলিয়ো না, তাহলে বিপদেও পড়বে না। হয়েছে তো ?'

এর মধ্যে বারোজন যুবক শিকারিকে মারতে মারতে প্রায় তাল পাকিয়ে ফেলেছে, মনে হচ্ছে শিকারি যেন এক তাল জোয়ারের ময়দা, এখনি রুটি তৈরি হবে। বুড়ো দেখছে আর হাসছে।

তারপর বুড়ো বলল, 'এসো, সবাই শিঙের মধ্যে ঢুকে যাও।' চোখের পলকে তারা ছোট হয়ে শিঙের মধ্যে ঢুকে পড়ল। শিংটা পড়ে রয়েছে, কেউ কোথাও নেই। শিকারি গোঙাচ্ছে। বুড়ো ভাবল, 'এবার বুঝেছি, বন্ধু সারস কেন আমায় এটা দিয়েছে।' মুচকি হেসে শিং হাতে নিয়ে বুড়ো চলল সর্দারের বাড়ির দিকে।

সর্দারের বাড়ির কাছে পৌঁছতেই বুড়ো শুনতে পেল, ভেতরে চলেছে হৈ-হল্লা। সেখানে তখন খাওয়া-দাওয়ার ধুম। আনন্দ-ফূর্তি। বুড়ো মস্ত উঠোনে ঢুকল। বড় জানলা দিয়ে

দেখতে পেল অনেক অতিথির ভিড়, খাচ্ছে আর নাচানাচি করছে। কি আনন্দেই তারা আছে! অথচ যার দয়ায় সর্দার ওই সব করছে সেই জাদুথলে কিন্তু তারই ছিল। বুড়ো আরও দেখল, জাদুথলে একটা কাঠের পাটাতনের ওপরে শুয়ে আছে। সে খুব আনমনা হয়ে গেল।

জানলা দিয়ে সর্দার বুড়োকে দেখতে পেয়েছে। গলা বাড়িয়ে চিৎকার করে বলল, 'এই বুড়ো, তোর এখানে কি চাই?'

'সর্দার, প্রভু, আমি আমার জাদুথলে নিতে এসেছি।'

'হাঃ হাঃ! তোর শিক্ষা হয়নি। এরকম জাদুথলে তোর কোনদিন ছিল নাকি? বোকা বুড়ো কোথাকার! খুব লোভ!' হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়ল সর্দার। হঠাৎ থেমে গেল। হুংকার ছেড়ে চাকরদের ডাকল, 'বুড়োকে ঘরের মধ্যে ধরে আন। আমার অতিথিদের সামনে পঁচিশ ঘা চাবুক মার। আর ফিরতে দিবিনা। ধরে আন।'

চাকররা বুড়োর ঘাড় ধরে হিড়্‌হিড় করে টেনে ঘরের মধ্যে নিযে এল। ধাক্কা মেরে মেঝেতে ফেলে দিল সর্দারের পায়ের কাছে। কিন্তু এরই মধ্যে বুড়ো ঢোলা পোশাকের মধ্যে থেকে কোনরকমে রুপোর শিংটা বের করেই বলে উঠল 'এই রুপোর শিঙে অনেক কিছু আছে।' বুড়োর চোখে আগুন ছুটছে।

অবাক কাণ্ড। বারোজন শক্তিমান যুবক একে একে ঝড়ের বেগে বেরিয়ে এল রুপোর শিং থেকে। তাদের প্রত্যেকের হাতে একটি করে চাবুক। তারা বেরিয়েই সপাং সপাং করে চাবুক মারতে লাগল। সে আঘাতকে কেউ বাধা দিতে পারল না। চাকরবাকর, সর্দার আর অতিথিরা যন্ত্রণায় চিৎকার করছে। মাটিতে গড়াগড়ি দিচ্ছে। 'বাচাও বাচাও' বলে কাঁদছে।

সবচেয়ে বেশি মার খাচ্ছে সর্দার। কেননা, বুড়ো দাঁড়িয়ে আদেশ দিচ্ছে, 'চাকরদের জন্য এক ঘা চাবুক, অতিথিদের জন্য দু ঘা আর সর্দারের জন্য তিন ঘা।' বুড়োর কথামতো যুবকেরা কাজ করে চলেছে। বিশ্রাম নেই, অবিরাম।

সর্দার সবচেয়ে বেশি মার খেয়ে পাগলের মতো চিৎকার করছে, গোঙাচ্ছে, আছাড়ি-পাছাড়ি খাচ্ছে। সে আর যন্ত্রণা সহ্য করতে পারছে না। মিনতি করে বলল, 'বুড়ো, তোমার পায়ে পড়ি, তুমি ফিরিয়ে নাও তোমার জাদুথলে, থামতে বলো তোমার ছেলেদের। এবার মরেই যাব।'

বুড়ো মুচকি হেসে বলল, 'আহা, একথাটা যদি তুমি আগে বুঝতে সর্দার। থলেটা যদি আগেই দিয়ে দিতে। তুমি ফিরিয়ে দিতে চাইছ ওই ছোট্ট থলে? ফিরিয়ে দেবে কি? ওটা তো তোমার নয়। কিছুই দিতে চাইছ না তুমি, আমি ছেলেদের থামতে বলি কেমন করে?'

'বুড়ো, তুমি আর কি চাও বল? আমি তোমায় একটা গোরু দেব, একটা ঘোড়াও দেব। ওদের থামতে বলো।'

'না সর্দার, ওগুলো এমন কিছু বেশি নয়।'

'বুড়ো, মরে গেলাম। মরে গেলাম! উঃ, প্রচণ্ড চাবুকের মার! তুমি যদি ওদের ফিরিয়ে না নাও, সত্যি বলছি মরে যাব। বলো, তোমার আর কি কি চাই?' সর্দার চিৎকার করে কাঁদছে।

'বেশ, তুমি যদি বাঁচতে চাও, তাহলে তোমার বাড়ি-জমি-পশুপাখি সব গাঁয়ের গরিবদের দিয়ে দিতে হবে। আর তোমাকেও এই গাঁ ছেড়ে চিরকালের জন্য চলে যেতে হবে।

অনেক খারাপ কাজ করেছ তুমি। তোমার ক্ষমা নেই। বহুদূরে তোমায় চলে যেতে হবে। রাজি আছ?'

'ওগো বুড়ো, এই বাড়ি এত জমি ছেড়ে আমি বাঁচব কেমন করে? আমি তো কাজকম্ম জানিনা, কি কারে বাঁচব? আমার হয়ে কে কাজ করে দেবে?'

হাসতে হাসতে বুড়ো বলল, 'সেসব তুমিই জান। আমার জানার কথা নয়। ছেড়ে যেতে না চাইলে এমনিভাবে মার খেতেই হবে। উপায় কি বলো? এই ছেলেরা, এখন শুধু চালাও সর্দারের দেহে।'

যুবকেরা চাকর ও অতিথিদের ছেড়ে শুধু সর্দারকেই মারতে লাগল। বারোজন একজনকে মারছে। গরম পাত্রে যেমন করে বান মাছ যন্ত্রণায় লাফায় সর্দার তেমনি লাফাচ্ছে। শেষকালে সর্দার বলল, 'সব নাও বুড়ো, সব নাও। গরিবদের দাও। শুধু ওদের থামাও।'

বুড়ো বলল, 'যাক, ব্যাপারটা বুঝেছ। ঠিক ওষুধ ধরেছে। শোন, মনে রেখ আমাকে আর আমার ছেলেদের। এই ছেলেরা, এসো, সবাই শিঙের মধ্যে ঢুকে যাও।'

চোখের পলকে ছেলেরা সবাই শিঙের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল। সব শান্ত। চাকররা অতিথিরা আর সর্দার সবাই মেঝের ওপরে গড়াগড়ি খাচ্ছে, কাঁদছে, গোঙাচ্ছে, বিড়বিড় করে কিসব যেন বলছে। আনন্দের আর ফুর্তির ঘর কেমন পালটে গিয়েছে।

বুড়ো তার সুন্দর রুপোর শিংটা ঢোলা পোশাকের মধ্যে ঢুকিয়ে নিল। পাটাতনের ওপর থেকে জাদুথলে তুলে নিয়ে নিজের কাছে রেখে দিল। বুড়োকে কেমন খুশিখুশি জয়ীজয়ী লাগছে, চোখে দীপ্তি, চলাফেরার উচ্ছলতা। সবদিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিল।

শেষকালে সর্দারের কাছে গিয়ে বলল, 'সর্দার, তোমার অনেক রয়েছে। কোন অভাব তোমার নেই। বন্ধু সারস পাখি আমায় জাদুথলে দিয়েছিল। এই গরিব মানুষ আমরা খেয়েপরে ভালোই ছিলাম। সহ্য হল না তোমার। সর্দার হয়ে কোথায় তুমি আমাদের বাঁচাবে, না আমাদের শুধু কষ্টই দিয়েছ। যাক গে ওসব কথা'। হঠাৎ বুড়ো রাগে ক্ষেপে গিয়ে আবার বলল, 'শোন সর্দার, কাল সকালে আমি আবার আসব। হাতে থাকবে আমার রুপোর শিং। তোমায় যদি এখানে দেখতে পাই, ছেলেদের আবার ডাকব। আর কিছু নয়।'

বুড়ো তার রুপোর শিং আর জাদুথলে পেয়ে খুব খুশি। গাঁয়ের সবাই খুশি। সবাই প্রাণ ভরে খেতে পারবে। ওদের বড় কষ্ট।

বুড়ো যদি আবার ফিরে আসে? হাতে যদি থাকে সেই রুপোর শিং? আর যদি...। সেদিন থেকে সর্দারকে কেউ দেখেনি। একা সে চলে গিয়েছে কোথায় কেউ জানে না। সেদিন থেকে অন্য গাঁয়ের সর্দাররাও খুব ভয়ে ভয়ে থাকে! গাঁয়ের লোকের ওপর জুলুম করে না। যদি বুড়োকে ওরা ডেকে আনে?

সূর্য ওঠে সূর্য অস্ত যায়, গাঁয়ের লোক সকাল-সন্ধে বুড়োর বাড়ি আসে। দিনগুলো বড় সুন্দর! রাতগুলোয় ভয় নেই।

কেশবতী কন্যা

ওই যে আমদের গাঁয়ের পাশে যে পাহাড় দেখতে পাচ্ছ, ওই যে পাহাড় থেকে গড়িয়ে পড়া জলরাশির ধারা দেখতে পাচ্ছ, কি মনে হয় তোমাদের? পাহাড় থেকে যে জলধারা নামছে তার দিকে ভালো করে চেয়ে দেখো। মনে হবে, এক কেশবতী কন্যা পেছন দিয়ে বসে রয়েছে খাড়া উঁচু পাহাড়ের ধারে, আর তার লম্বা সাদা কেশরাশি পাহাড় বেয়ে নামছে। আমরা একে বলি, কেশবতীর ধারা, কেশবতী জলপ্রপাত। কেন বলি তাই শোনো।

অনেক অনেক কাল আগে আমাদের গাঁয়ে কিংবা ওই পাহাড়ে কোন জল ছিল না। জলের কোন উৎস নেই, কোন ধারা নেই। আকাশের জল ছিল একমাত্র ভরসা। বৃষ্টির সময়ে গাঁয়ের লোকেরা জল ধরে রাখত। সেই জল খেত, সেই জলেই হত চাষবাস। আর যে বছরে হত খরা, বৃষ্টির নামগন্ধ নেই, সে বছরে অনেক দূর থেকে, পাহাড়ের ওপাশ থেকে জল বয়ে আনতে হত। ওখানে আছে একটা ছোট নদী। কিন্তু সে জলে তেষ্টা মিটত। চাষবাস করা যেত না। অতদূর থেকে অত জল আনবে কে? ফসল হত না, বড়ই কষ্ট ছিল।

এই পাহাড়ি গাঁয়ে থাকত এক মেয়ে। খুব গরিব ঘরের মেয়ে। তার মেঘবরণ চুল, দাঁড়কাকের বুকের পালকের মতো রং সে চুলের। এই কেশবতী কন্যার চুল পিঠ ছাড়িয়ে কোমর ছাড়িয়ে পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত ঢেউ খেলত। কি যে তার নাম ছিল গাঁয়ের লোক ভুলে গিয়েছিল। তাগে ডাকত কেশবতী কন্যা বলে। সবাই তাকে ভালোবাসত। কেননা, এমন হৃদয় আর কারও ছিল না। বড় ভালো সেই মেয়ে।

মেয়ের কেউ নেই, আছে এক বুড়ি মা। সে বিছানায় শুয়ে থাকে। সে অসুস্থ। তার সেবা করে মেয়ে। এতেই তার আনন্দ। মেয়ের ছিল একপাল শুয়োর। তাই থেকেই মা-মেয়ের কষ্টের সংসার চলে যেত। কোনরকমে। খরার সময় মেয়ে ভোর রাতে উঠে চলে যেত ওই দূরের ছোট নদীতে। জল আনতে। তারপরে যেত পাহাড়ে। সেখানে বুনো ফল, কচু, রসাল গাছের গোড়া নিয়ে আসত। শুয়োরদের জন্য। মেয়ে সকাল থেকে রাত পর্যন্ত শুধু খেটেই চলত। খুব কষ্ট মেয়ের। সংসারে কাজের লোক সে একা।

এমনি একদিনের কথা। ঝুড়ি হাতে চলেছে পাহাড়ে ফলমুল খুঁজতে। হঠাৎ পাহাড়ের এক জায়গায় দেখল, একটা সুন্দর ওলকপি ফলে রয়েছে। ভালোই হল, রান্না করে মাকে দেব, নিজেও খাব। এই ভেবে সে ওলকপির কাছে গেল। পাতাগুলো আশ্চর্য সবুজ, পাতাগুলো খুব পুষ্ট।

ঝুড়ি নামিয়ে রেখে দুহাতে জোরে টান দিল। গোড়া বেশ শক্ত। উঠে এল ওলকপি। ওলকপির নীচের অংশ বেশ বড়, লাল রঙের আর সুন্দর গোল। একটা ছোট গর্ত হল

পাহাড়ি কাঁকুরে মাটিতে। অবাক কাণ্ড! সেই গর্ত থেকে ঝরনার জলের মতো জল বেরোচ্ছে। উপচে পড়ছে গর্ত। ভিজে যাচ্ছে আশপাশের মাটি। 'হুশ' করে শব্দ হল। ওলকপি তার হাত থেকে লাফিয়ে পড়ল। আবার গর্তে বসে পড়ল। জল বন্ধ হয়ে গেল। মেয়ে তাকিয়ে রয়েছে সেদিকে। আনন্দে, ভয়ে, বিস্ময়ে।

খুব তেষ্টা পেয়েছে কেশবতী কন্যার। সে আবার তুলে আনল ওলকপি। আবার গর্ত ছাপিয়ে জল পড়তে লাগল। নিচু হয়ে মুখ কছে আনল। প্রাণভরে জল খেল। ঠান্ডা বরফের মতো জল, ফলের রসের মতো মিষ্টি জল। গর্ত থেকে মুখ সরিয়ে আনবার সঙ্গো সঙ্গো মেয়ের হাত থেকে ওলকপি লাফিয়ে পড়ল। ঠিক গর্তে। জলের ধারা বন্ধ হল।

বুনো লতাপাতার মধ্যে দাঁড়িয়ে রয়েছে মেয়ে। অবাক চোখে পাহাড়ের চারপাশ দেখছে। পাহাড়কে আজ অনেক বেশি ভালো লাগছে। হঠাৎ একটা দমকা হাওয়া এল। মেয়েকে যেন উড়িয়ে নিয়ে গেল। মেয়ে এসে পড়ল একটা গুহার সামনে। আর দমকা হাওয়া নেই।

এদিক ওদিক চাইতেই মেয়ে দেখল, সামনে একটা পাহাড়ের ওপরে বসে রয়েছে একজন লোক। তার সারা দেহ কটা রঙের লোমে ভর্তি। লোমশ মানুষ। মেয়ের দিকে চেয়ে বলল, 'ও তুমি, তাহলে তুমিই আমার গোপন ঝরনার কথা জেনে ফেলেছ। শোনো, একথা তুমি কাউকে বলবে না। একজনকেও নয়। তুমি যদি বলো কিংবা কেউ যদি আমার ঝরনার জল নিতে আসে, আমি তোমাকে জ্যান্ত মেরে ফেলব। মনে রেখো আমার কথাগুলো। আমি এই পাহাড়ের দেবতা। ভুললে বিপদ।'

আর একটা দমকা হাওয়া এল। মেয়ে ছিটকে এসে পড়ল পাহাড়ের নীচে। পাহাড়ের নীচে দাঁড়িয়ে রয়েছে মেয়ে। আর দমকা হাওয়া নেই। সে আস্তে আস্তে বাড়ি ফিরে এল।

মেয়ে মাকে কিছুই বলল না। সেই কোন ভোররাতে চলে যায় দূরের নদীতে, জল আনতে। সারাদিন খাটে। কিন্তু, এরকম তো আগেও ছিল। তবু ঝরনার গোপন খবর জানার পর থেকে মেয়ে যেন আরও চুপচাপ হয়ে গিয়েছে।

এবারে প্রচণ্ড খরা। এক ফোঁটা বৃষ্টি নেই। আকাশে মাঝেমধ্যে মেঘ দেখা দেয়। সবাই চেয়ে থাকে ওপর পানে। না, বৃষ্টি হল না। মেঘ কোথায় উড়ে গেল। চাষের মাঠ ফুটিফাটা হয়ে গিয়েছে। মাটি আর পাথরে কোনো তফাৎ নেই। লাঙল দেওয়া যায় না মাটিতে। গ্রামবাসীর সে কি কষ্ট। জলের ধারা কোথায় আছে মেয়ে জানে। অথচ বলতে পারছে না। বললেই মৃত্যু। সব মানুষ, কচি-বুড়ো সবাই হাঁপাচ্ছে, জলের জন্য হাহাকার করছে। অত দূর থেকে কি নিত্যি নিত্যি এতদিন ধরে জল বয়ে আনা যায়? হায়! মেয়ে যদি জলের কথা বলতে পারত! কোন পরিশ্রম নেই। পাহাড়ের ওপরে ওই ওলকপি সরিয়ে ফেলো, গর্তটা গাঁইতি দিয়ে আরও বড় করো, উপচে পড়বে জল। মিষ্টি শীতল জল। ভাবে আর শিউরে ওঠে। মনে পড়ে সেই ভয়ানক মানুষটির কথা, লোমশ লোকটির কথা। সে নিজের মনেই চেপে থাকে। গুমরে মরে নিজের মনেই।

মনে মনে খুব দুঃখ পেতে লাগল কেশবতী কন্যা। এক চিন্তা সব সময়। তার খিদে চলে গেল, রাতে চোখের পাতা এক হয় না। শুধুই দুশ্চিন্তা। আস্তে আস্তে মেয়ে

হয়ে উঠল এক নির্বাক প্রাণী। কোন কথা বলে না। শুধু কাজ করে। কি যেন ভাবে। চোখে ছিল তার স্নিগ্ধ দীপ্তি, কোথায় গেল সেই উজ্জ্বলতা। প্রাণহীন চোখ দুটোয় কোন ভাষা নেই। গালদুটিতে ছিল গোলাপি ফুলের আভা। কোথায় গেল সেই আভা। আর আশ্চর্য! মেঘবরণ লম্বা চুল আস্তে আস্তে কেমন জট পাকিয়ে গেল, উসকো খুসকো চুলে আর চেনাই যায় না কেশবতী কন্যাকে।

মা শুয়ে থাকলেও এসব বুঝতে পারে। একদিন মেয়ের রোগা রোগা হাতখানি ধরে মা করুণ গলায় বলল, 'বাছা, তোর কিসের কষ্ট? কি হয়েছে তোর? এত কাহিল হয়ে পড়ছিস কেন মা?'

মেয়ে ঠোঁট কামড়ে ধরল, চোখে আতঙ্ক, বুকের মধ্যে কেমন যেন করছে। কিছু বলতে পারলে সে হাল্‌কা হত। কিন্তু না, সে পারল না। কিছুই বলল না মাকে।

দিন চলে যায়, মাস বয়ে যায়। কারও জন্য তারা বসে থাকে না। কেশবতী কন্যার ঘন চুলের রাশির রঙ একেবারে পাল্‌টে গেল। বরফের মতো সাদা হয়ে গেল। চুলে পড়ে না চিরুনি, হাত পড়ে না মাথায়। পিঠ ছাপিয়ে সাদা রঙের কেশরাশি আলুলায়িত থাকে। কি ছিরি হয়েছে সে সুন্দর চুলের! লম্বা সাদা ঝোপ।

গাঁয়ের লোক মেয়েকে দেখে আড়ালে বলে, 'অবাক কাণ্ড! এক রত্তি মেয়ে, এই তো কচি বয়েস, কিন্তু মেয়ের চুল এমনধারা সাদা হয়ে গেল কেমন করে? এমন কাণ্ড দেখিনি কখনও।' মেয়েকে তারা খুব ভালোবাসে বলে আরও বেশি দুঃখ করে। মেয়ের কোন খেয়াল নেই।

মেয়ে নিজের বাড়ির বেড়ার ধারে দাঁড়িয়ে থাকে। উদাস চোখে পাহাড়ের দিকে কিংবা মেঘের চলার পথে তাকিয়ে থাকে। কখনও পথিকের হেঁটে যাওয়া দেখে। গাঁয়ের কোন চেনা মানুষকে দেখে মেয়ে বিড়বিড় করে বলে,—দূরের ওই উঁচু পাহাড়ে... কিন্তু কথাটা শেষ করে না। জোরে ঠোঁট কামড়ে ধরে, এত জোরে চেপে ধরে ঠোঁট যেন মনে হয় দাঁতের চাপে রক্ত ছুটে বেরুবে। রক্ত টলটল করে সুন্দর ঠোঁটে। গাঁয়ের মানুষ আধখানা কথা বহুবার শুনেছে। থেমে গিয়েছে পুরো কথা শোনার জন্য। আজও শুনতে পায়নি।

এমনি একদিনের কথা। মেয়ে উদাস চোখে দাঁড়িয়ে রয়েছে বেড়ার ধারে। কতশত ভাবছে মেয়ে। এমন সময় সামনের পায়ে-চলা পথ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে একজন বুড়োমতন লোক। তার সব দাড়ি পাকা। হাওয়ায় দুলছে। তার হাতে জলের একটা পাত্র। ওই দূরের ঝরনা থেকে সে জল বয়ে আনছে। আহা! বুড়ো মানুষ। তার পা কাঁপছে। অত দূরের পথে হাঁটা কি সহজ। হঠাৎ বুড়ো একটা পাথরে হোঁচট খেল। টাল সামলাতে পারল না। হুমড়ি খেয়ে পথে পড়ে গেল। ছিট্‌কে গেল জলের পাত্র। জল গেল গড়িয়ে। পায়ের বুড়ো আঙুলের নখ উঠে গিয়েছে, পাথরে লেগে কপাল ফেটেছে। রক্ত বেরুচ্ছে গলগল করে। মাথা নিচু করে বুড়ো উঠবার চেষ্টা করছে।

আঁৎকে উঠল কেশবতী কন্যা। ছুটে গেল বুড়োর কাছে। তার পোশাকের ধার থেকে ছিঁড়ে ফেলল এক টুকরো কাপড়। নিচু হয়ে বসে পড়ল মেয়ে। আদরে-যত্নে বুড়োকে বসিয়ে বেঁধে দিল তার আঘাতের জায়গা দুটো। রক্ত বন্ধ হল। বুড়ো গোঙাচ্ছে, চোখ ভিজে উঠেছে, যন্ত্রণায় মুখের চেহারা অন্য রকম হয়ে গিয়েছে। মেয়ে

করুণ চোখে বুড়োর মুখের দিকে চেয়ে রইল। বুড়োর গোটা মুখ বয়সের ভারে কুঁচকে গিয়েছে। যন্ত্রণায় কুঁচকে-যাওয়া চামড়া কাঁপছে। বুড়ো চোখ বন্ধ করে রয়েছে।

মনে মনে কেশবতী কন্যা বলল, 'আমি এত ভিতু ? এত স্বার্থপর ? নিজের কথাই শুধু চিন্তা করছি। আমার এত মৃত্যুভয় ? ছিঃ, ছিঃ ! মাঠ শুকিয়ে গিয়েছে, ফসল জ্বলে গিয়েছে। খাওয়ার জল পর্যন্ত নেই। জলের হাহাকার। মানুষের এত কষ্ট। অথচ আমি জানি...। গাঁয়ের লোকের তো এত কষ্ট হবার কথা নয়। আমি তো উপায় জানি। আমার জন্যই এই বুড়ো মানুষের পা ভেঙেছে, কপাল ফেটেছে। ভিতু, ভিতু কোথাকার !'

এবার বোধহয় পাগল হয়ে যাবে মেয়ে। আর সহ্য করতে পারছে না, কথা চেপে রাখতে পারছে না। বুক বুঝি ফেটে যাবে। গলা শুকিয়ে উঠেছে। নাঃ, অনেক হয়েছে, আর না।

মেয়ে বুড়োর রক্ত-মাখা কপালে আলতো করে হাত বুলিয়ে দিয়ে বলল, 'বাবা, দূরের ওই উঁচু পাহাড়ে একটা ঝরনা রয়েছে। ঝরনার মুখে বসানো রয়েছে একটা ওলকপি। ঝরনার মুখ থেকে ওলকপিটা তুলে নেবে। টুক্‌রো টুক্‌রো করে কেটে ফেলবে। দূরে ফেলে দেবে। গাঁইতি চালিয়ে ঝরনার মুখের গর্তটা অনেক বড় করে দেবে। পাহাড়ের কোল ছাপিয়ে, পাহাড়ের গা বেয়ে ঝরনার ধারা নামবে। অফুরন্ত জল। ঠান্ডা মিষ্টি জল। এ গল্পকথা নয়, সত্যি। আমি নিজে চোখে ঝরনার ধারা দেখেছি। আঃ, কি শান্তি।'

বুড়ো যেন কিছু বলবে। কিন্তু তাকিয়ে দেখে মেয়ে আর বসে নেই। পথ দিয়ে সামনে হেঁটে চালেছে। পেছনে দুলছে লম্বা চুলের রাশি, বরফের মতো সাদা।

হঠাৎ মেয়ে দৌড়তে লাগল। ছুটে গেল গাঁয়ের ভেতরে। চিৎকার করে বলল, 'সবাই বেরিয়ে এসো। সবাই। ওই দূরের পাহাড়ে একটা ঝরনা আছে। আমি জেনে এসেছি। সবাই এসো।'

গাঁয়ের মানুষ ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এল। মেয়ের চারপাশে এসে দাঁড়াল। অনেক দিন পরে তারা কেশবতী কন্যার কথা শুনল। অবাক হয়ে চেয়ে রয়েছে মেয়ের দিকে। কারও মুখে কথা নেই। এ মেয়েকে তারা অবিশ্বাস করতে পারে না। এ কি কথা শোনাচ্ছে মেয়ে ?

মেয়ে সব খুলে বলল। ডাগর চোখে সে চেয়ে রয়েছে গাঁয়ের মানুষের দিকে। মেয়ে বলল ঝরনার কথা, কেমন করে খুঁজে পেয়েছে সেই ঝরনা, কি করতে হবে তাদের। সব বলল। শুধু পাহাড়ের দেবতার সেই ভয়ানক কথার কিছুই জানাল না। দেবতার কথাও বলল না। মেয়েকে তারা সবাই খুব ভালোবাসে। অবিশ্বাস করবে কেন তার কথা ? তারা মেয়ের পিছু পিছু চলল।

মেয়ে চলেছে এগিয়ে। পেছনে হাওয়ায় দুলছে কেশরাশি। অনেকের হাতে গাঁইতি, কারও হাতে ধারালো ছুরি। সামনে বেঁকে তারা পাহাড়ে উঠছে, মেয়ে পথ দেখিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। পৌঁছে গেল গুপ্ত ঝরনার কাছে। নিচু হয়ে ঝরনার মুখ থেকে তুলে নিল সেই ওলকপিটা। দূরে ফেলে দিল। বলল, 'টুকরো টুক্‌রো করে কেটে ফেল ওটাকে।'

একসঙ্গে কয়েকটা ছুরির আঘাত পড়ল ছোট ওলকপির ওপরে। শত টুক্‌রো হয়ে গেল ওলকপি। ছোট গর্ত থেকে জল উপচে পড়ছে। ঝিরিঝিরি জল। ভিজে উঠেছে পাশের পাহাড়ি মাটি।

কেশবতী কন্যা শান্ত মিষ্টি গলায় বলল, 'দেরি নয়, গর্তের মুখ বড় করতে হবে। গাঁইতি নাও। খুব তাড়াতাড়ি। যত বড় পারবে তত বড় করবে। তাড়াতাড়ি। নইলে...।' ঠোঁট কামড়ে ধরল মেয়ে।

অতশত দেখার সময় নেই। মনও নেই। অনেক গাঁইতি পড়ল গর্তের মুখে। মাটি উঠছে, জলের ধারা নামছে। ভীষণ শব্দ করে জল বেরুচ্ছে। পায়ের পাতা ডুবল, জল উঠেছে, হাঁটু ডুবছে। জলের ধারা পাহাড়ের কোল ছাপিয়ে, গা বেয়ে নেমে যাচ্ছে নীচে, গাঁয়ের দিকে, গাঁয়ের পাশ দিয়ে। ছোট নদী বয়ে চলেছে গাঁয়ের পাশ দিয়ে। অফুরন্ত জলের উৎস, অফুরন্ত জলের ধারা। আনন্দে নাচছে গাঁয়ের মানুষজন, তারা জল ছিটিয়ে সবাইকে ভিজিয়ে দিচ্ছে। আঃ, কি শান্তি!

হঠাৎ পাহাড়ের ওপর দিয়ে বয়ে গেল একটা দমকা হাওয়া। এত লোকের চোখের সামনে থেকে নিমেষে মিলিয়ে গেল কেশবতী কন্যা। শুধু একজন নেই সবাই আছে। কিন্তু এসব দেখার সময় নেই তাদের। তারা জানতেই পারল না, কেশবতী কন্যা এখন আর তাদের মাঝে দাঁড়িয়ে নেই।

হঠাৎ একজন বলে উঠল, 'আরে! কেশবতী কন্যা কোথায়? সে কোথায় গেল?'

অন্য একজন বলল, 'সে বোধহয় বাড়িতে গিয়েছে। সবার আগেই চলে গিয়েছে। বুড়িমা একা রয়েছে।' সবাই মেনে নিল তার যুক্তি। পাহাড় থেকে নেমে এল তারা। সবাই যেন অন্য মানুষ। নতুন শক্তি তাদের দেহে, মনে।

কিন্তু কেশবতী কন্যা তো আর তার বাড়িতে যায় নি! দমকা হাওয়া তাকে উড়িয়ে নিয়ে গেছে সেই ভয়াবহ গুহার সামনে। পাহাড়ের দেবতা বসে রয়েছে। পাথরের ওপরে। চোখ জ্বলছে।

হুংকার ছাড়ল পাহাড়ের দেবতা, 'আমি নিষেধ করেছিলাম তোমাকে। ঝরনার কথা কাউকে বলবে না। সবাইকে বলে দিলে। তাদের নিয়ে এলে পাহাড়ি ঝরনার কাছে। তারা টুকরো টুকরো করে ফেলল আমার জাদু ওলকপি। তারা গাঁইতি চালিয়ে আমার গুপ্ত ঝরনার মুখ বড় করে ফেলল। আমি নিষেধ করেছিলাম। এবার আমি তোমায় জ্যান্ত মেরে ফেলব।' দেবতা দাঁতে দাঁত ঘষল।

কেশবতী কন্যার আলুলায়িত কেশরাশি পিঠের ওপরে হাওয়ায় দুলছে। মিষ্টি সুরে শান্ত গলায় মেয়ে বলল, 'গাঁয়ের মানুষজনের দুঃখ ঘুচেছে। আমি হাসিমুখে মরতে পারব। আনন্দে মরব। কোন ভয় নেই আমার। আমি তৈরি।'

পাহাড়ের ভয়ানক দেবতা আকাশ ফাটিয়ে হেসে উঠল। পাহাড়ে পাহাড়ে প্রতিধ্বনিত হয়ে সে হাসি হাজার হাসি হয়ে ফেটে পড়ল। 'তোমাকে মরতে হবে। কিন্তু অত সহজে তোমাকে মারব না। যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ করে কান্নায় ভেঙে পড়ে তিলে তিলে তোমায় মরতে হবে।'

মেয়ে শান্ত চোখে চেয়ে রইল। মেঘের লুকোচুরি খেলা চলেছে। মেয়েকে ছুঁয়ে মেঘেরা পাহাড়ের পাশ দিয়ে ভেসে চলেছে। মেয়ের ঠোঁটের কোণে পবিত্র হাসি।

হঠাৎ দেবতা হুংকার দিয়ে উঠল, 'ওই নীচে মসৃণ পাথরের উপরে তোমাকে শুইয়ে দেব। ওই পাথরে, যায় ওপরে আছড়ে পড়ছে পাহাড়ি ঝরনার জল। তোমার শয়তানিতে ছোট্ট ঝরনা জলপ্রপাত হয়েছে। তার নীচে তোমায় শুইয়ে দেব। জলের আঘাতে দেহ ওলটপালট হয়ে যাবে, হৃদয় ফাটবে, দম বন্ধ হয়ে আসবে। যন্ত্রণা, ভীষণ যন্ত্রণা। তিলে তিলে মৃত্যু। নিষেধ না মানার প্রতিফল।' দাঁতে দাঁত ঘষছে দেবতা।

সাদা মেঘের মধ্যে দাঁড়িয়ে মেয়ে হাসতে হাসতে বলল, 'গাঁয়ের মানুষদের ভালোর জন্য আমি ওই পাথরের ওপরে শুয়ে পড়তে একটুও ভয় পাই না। আমার দেহে জলের ধারা আঘাত করুক। কিন্তু হে পাহাড়ের দেবতা, তোমায় প্রণাম জানিয়ে আমি একটা ছোট্ট ভিক্ষা চাই। ভিক্ষা দেবে?' মেয়ের হাসিমুখে মুক্তো ঝরছে।

'কি তোমার ভিক্ষা? আগে শুনি।'

মেয়ে চোখ নামিয়ে আস্তে আস্তে বলল, 'আমার কেউ নেই। রয়েছে এক বুড়িমা। কোন কাজ মা করতে পারে না। অনেক বয়েস। আর রয়েছে শুয়োরের কয়েকটা ছোট্ট ছানা। তারাও নিজেরা খেতে পারে না। হায়! দেবতা, মরবার আগে একবার আমায় বাড়ি যেতে দাও। ওদের ভার একজনের ওপরে দিয়েই আমি ফিরে আসব। আমি কখনও মিছে কথা বলি না। দোহাই তোমার, একবার বাড়ি যেতে দাও।' মেয়ে কাঁদছে।

'বেশ, তুমি যেতে পারো। কিন্তু একটা শর্তে। যদি তুমি ফিরে না এসে কোথাও পালিয়ে যাও, তাহলে আমি ঝরনার মুখ চিরকালের মতো বন্ধ করে দেব। আর, আর গাঁয়ের সব মানুষকে পাথরে পিষে মেরে ফেলব। মনে থাকবে?' অল্প থেমে দেবতা কথাগুলো বলল। দুচোখে তার আগুন ঝরছে।

মেয়ে আস্তে আস্তে পাহাড়ি পথে হেঁটে চলল। পেছনে দেবতা বসে রইল। হঠাৎ দেবতা বলল, 'দাঁড়াও। ফিরে যখন আসবে তখন আমার কাছে আসবার দরকার নেই। সোজা মসৃণ পাথরের ওপরে চলে যাবে, শুয়ে পড়বে। জলের ভীষণ ধারার নীচে শুয়ে পড়বে। আমি সব জানতে পারব।'

মাথা নেড়ে সায় দিয়ে মেয়ে হেঁটে চলল। পাহাড়ি পথে মেয়ে নেমে আসছে। হঠাৎ একটা দমকা হাওয়া এল। মেয়েকে উড়িয়ে নিয়ে পাহাড়ের নীচে পায়েচলা পথে নামিয়ে দিল। দমকা হাওয়া মিলিয়ে গেল। আঃ, কি শান্তি। সাদা জলের ধারা ফেনা তুলে নীচে আছড়ে পড়ছে। অফুরন্ত জলের ধারা। জলের ধারা শুকনো জমির ওপর দিয়ে বয়ে চলেছে। কত ফসল ফলবে এবার। মেয়ে খুশির হাওয়া বইয়ে পালকের মতো ভেসে চলল। গাঁয়ের পথে, বাড়ির পথে।

বাড়িতে পৌঁছে গেল কেশবতী কন্যা। কিন্তু ঘরে ঢুকেই সে কেমন দমে গেল। মাকে সত্যি কথা বলবে কেমন করে? একথা শুনেই মা যদি...। মেয়ের বুক কেঁপে উঠল।

মায়ের গলা জড়িয়ে ধরে মেয়ে বলল, 'মা, আমাদের গাঁয়ের পাশ দিয়ে নদী বয়ে চলেছে, খেতে খেতে ফসল ফলানো অফুরন্ত জল। সব জল আসছে পাহাড়ি ঝরনা থেকে। আর কোন ভাবনা নেই। জলের ভাবনা নেই।'

মা চেয়ে আছে মেয়ের দিকে। শুকনো মুখেও হাসি। মেয়ে আবার বলল, 'মা, আমি তো পাহাড়ে যেতাম ফল কুড়োতে, সেখানে পাশের গাঁয়ের কয়েকজন মেয়ে আমার সই হয়েছে। নতুন সই। ওরা আমায় নেমন্তন্ন করেছে। ওদের সঙ্গো কয়েকদিন থাকব, আনন্দ করব। এই ক'দিন পাশের বাড়ির খুড়িমা তোমাকেও দেখবে, শুয়োরের ছানাদেরও দেখবে। ভাবনা নেই। আমি যাব?'

মায়ের মুখে কি সুন্দর হাসি। মেয়ে আবার আগের মতো আব্দার করছে, মুখে খই ফুটছে, এই তো আমার সেই মেয়ে। মা তক্ষুনি রাজি হল। মেয়ে পাশের বাড়ির খুড়িমার সঙ্গো দেখা করে এল। মায়ের আর ছানাদের কোন অযত্ন হবে না। খুড়িমা রাজি।

মেয়ে ফিরে এল মায়ের কাছে। বলল, 'মা, আমায় বোধহয় ওরা সহজে ছাড়বে না। দিন পনেরো থাকতে হবে। কেমন? তুমি যেতে দেবে?'

'সে কি কথা? তুই যাবি বেড়াতে, আর আমি মত দেব না? খুব আনন্দ কর ওখানে গিয়ে। অনেক কষ্ট তোর। বাছা, কিছু ভাবিস না। পাশের বাড়ির বউ খুব ভালো।'

কেশবতী কন্যা মায়ের হাত দুটো চেপে ধরল, কপালে চুমো দিল। মেয়ের চোখ বেয়ে জলের ধারা নেমেছে। মুখ ফিরিয়ে নিল মেয়ে। শুয়োরের ছানাদের কাছে গেল। তাদের কোলে তুলে গায়ে হাত বুলিয়ে আদর করল। ছানাদের দেহ ভিজে গেল। দোরের কাছে এসে মেয়ে বলল, 'মা আমি যাচ্ছি।' আর কিছু বলতে পারল না। ছুটে চলল পাহাড়ি জলপ্রপাতের দিকে। পেছনে দুলছে মেয়ের সাদা আলুলায়িত চুলের রাশি।

পথের মধ্যে রয়েছে এক বিশাল বটগাছ। চারিদিকে ঝুরি নেমেছে। বটগাছের ঘন ছায়ার তলা দিয়ে যাবার সময় মেয়ে গাছের গুঁড়ি ছুঁয়ে বলল, 'বটগাছ, আজ থেকে আমি আর তোমার কাছে আসব না। আসতে পারব না। তোমার ঘন ছায়ায় আর কোনদিন জিরোতে আসব না। দেহ শান্ত করতে আর আসব না। শেষ বিদায়।'

হঠাৎ মোটা বটগাছের ওপাশ থেকে একজন বুড়ো মেয়ের সামনে এসে দাঁড়াল। তার মাথাভর্তি চুল সবুজ, বুকের ওপরে দোলানো দাড়ি সবুজ, তার দেহের পোশাক সবুজ। যেন একজন সবুজ মানুষ মেয়ের সামনে এসে দাঁড়াল।

মিষ্টি হাসি হেসে সবুজ বুড়ো বলল, 'কেশবতী কন্যা, তুমি কোথায় চলেছ?'

দীর্ঘনিঃশ্বাস বেরিয়ে এল, মেয়ে কোন কথা না বলে আস্তে করে মাথা নোয়াল।

সবুজ বুড়ো হাসল। মাথা নেড়ে বলল, 'তোমার সব কথা আমি জানি। মেয়ে, তোমার যে কি বিপদ তাও আমি জানি। আমার কাছে কোন কথাই লুকনো থাকে না। তোমার এমন মন, সবার জন্য তুমি চিন্তা কর। বড় ভালো মেয়ে তুমি। তোমায় আমি বাঁচাব। বাঁচাবই। নইলে বেঁচে থেকে লাভ কি? আমি পাথর কুঁদে একটি মেয়ের মূর্তি গড়েছি, তোমার মতো দেখতে। যেন তোমারই মূর্তি। পাথরের বুকে সে চোখ মেলে রয়েছে। গাছের এপাশে এসে দেখ।'

গাছের ওপাশে গেল মেয়ে। পাথরের মূর্তি দেখে চমকে উঠল। সবুজ বুড়ো কি আগে তাকে দেখেছে। সে তো কখনও তাকে দেখেনি? নিখুঁত মূর্তি, তারই মূর্তি। কত বড় শিল্পী এই সবুজ বুড়ো! শুধু মূর্তির মাথায় তার মতো চুল নেই। আর সব একরকম। মেয়ে তাকিয়ে রয়েছে, পলক পড়ছে না চোখে।

বুড়ো মিষ্টি গলায় বলল, 'পাহাড়ের দেবতা তোমাকে ওই জলধারার নীচে শুয়ে পড়তে আদেশ দিয়েছে। তাকে অমান্য করতে পারবে না। কিন্তু ওই আছাড়ে-পড়া জলের নীচে শুয়ে পড়লে তোমার কি হবে তা তুমি জানো? হ্যাঁ, তুমি ঠিকই জানো। পাথর ছাড়া ও আঘাত কেউ সইতে পারে না। পাথরও কেঁপে ওঠে, ক্ষয়ে যায়। আর তুমি তো একরত্তি মেয়ে। আমি পাথরের মূর্তিটাকে বয়ে নিয়ে যাব জলধারার নীচে। তোমার হয়ে পাথর-মেয়ে সেখানে শুয়ে থাকবে। আঘাত লাগবে তার দেহে, তোমার দেহে আঘাত লাগতে দেব না। কিন্তু পাথর-মেয়ের তোমার মতো চুল নেই। একটু কষ্ট করতে হবে। ব্যথা পাবে, কিন্তু উপায় নেই। তোমার চুলগুলো ছিঁড়ে আমি পাথর-মেয়ের মাথায় লাগিয়ে দেব। সে হবে কেশবতী কন্যা, ঠিক তোমার মতো। পাহাড়-দেবতা দেখতে পেলেও কোন সন্দেহ করবে না। ভাববে, তুমিই শুয়ে রয়েছ। নইলে.... ?'

বুড়ো চুপ করে গেল। মেয়ে নিঃশব্দে মাথা এগিয়ে দিল বুড়োর কাছে। বুড়ো পাথরে বসে মেয়ের মাথা কোলে নিয়ে কেশরাশি ছিঁড়ে ফেলতে লাগল। উঃ, কি অসহ্য যন্ত্রণা। চোখ ভরে এল জলে। একটুও শব্দ করল না মেয়ে। আশ্চর্য সহ্যের ক্ষমতা।

মেয়ের চুলগুলো পাথরের মূর্তির মাথায় স্পর্শ করামাত্র সেগুলো পাথর-মেয়ের মাথায় বসে গেল। পাথর-মেয়ের সত্যিকারের চুল। এলোমেলো হাওয়ায় উড়ছে। সাদা চুলের গোছায় মূর্তির রূপ আরও বেড়ে গেল। সত্যিকারের কেশবতী কন্যা যেন। আর কেশবতী কন্যা দাঁড়িয়ে রয়েছে মূর্তির সামনে,—তার মাথায় কোন চুল নেই। মেয়ের কান্না পেল।

বুড়োর মুখে হাসি নেই। আকাশের কালো মেঘ সবুজ বুড়োর মুখে। কাঁপা গলায় বলল, 'মেয়ে, এবার তুমি ঘরে যাও। আর কোন ভয় নেই। গাঁয়ে এখন অনেক জল, ফসলের জমি নরম হয়েছে, চাষ করো, পরিশ্রম করো। সবাই মিলে ফসল ফলাও। তুমি, তোমরা সুখে জীবন কাটাও। ফলে ফুলে শস্যে তোমাদের জীবন ভরে উঠুক।'

সবুজ বুড়ো চোখ নামিয়ে নিল। মেয়ের দিকে আর চেয়ে দেখল না। ভারী পাথরের মূর্তিটা অনেক কষ্টে কাঁধে তুলে নিল। পাহাড়ি পথে এগিয়ে চলল। পাথর পেরিয়ে যাচ্ছে, বুড়ো কাঁপছে, মূর্তি হেলে পড়ছে। বুড়ো এগিয়ে চলল। পৌঁছল আছড়ে-পড়া জলধারার নীচে। শুইয়ে দিল পাথর-মেয়েকে। আছড়ে পড়ল জল, সাদা ফেনায় ভরা জলরাশি। মেয়ের মাথার সাদা চুল ওলটপালট খাচ্ছে, এধার ওধার করছে, ভেসে উঠছে, লেপটে যাচ্ছে মেয়ের দেহে। জল পাথরের দেহ ছুঁয়ে বয়ে চলেছে আরও নীচে, ফসলের জমির দিকে।

মেয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে বটগাছের নীচে। সে বাড়ির পথে যায় নি। সব দেখছে। বুক ভেসে যাচ্ছে। না, তার কেশরাশি গিয়েছে বলে নয়। তাকে বাঁচাবার জন্য সবুজ বুড়ো যে কষ্ট করেছে, তাই দেখে মেয়ে কাঁদছে। আহা, কত ছেলেবেলায় বাবাকে হারিয়েছে সে!

কেশবতী কন্যার মাথা চুলকোচ্ছে। চিড়বিড় করছে। মাথায় হাত দিল সে। খোঁচা খোঁচা চুল। জমি থেকে ধান কেটে নিলে যেমন থাকে। এ কি! চুল বেড়ে যাচ্ছে। মাথায় আর খোঁচা খোঁচা লাগছে না। নরম হয়ে আসছে চুলের রাশি। ছেলেদের মাথার মতো চুল। আরও বড়ো হচ্ছে আরও বড়। কাঁধ ছাড়াল, বুক ছাড়াল, কোমর পেরিয়ে গেল, চুলের রাশি মাটি ছুঁয়ে গেল। থেমে গেল বড় হওয়া। কেশবতী কন্যা দাঁড়িয়ে আছে। পাহাড়ি হাওয়ায় কেশরাশি উড়ছে। হাতের মুঠোয় চুলের রাশি সামনে তুলে ধরল। চোখের সামনে। দাঁড়কাকের গলার পালকের মতো কালো কেশ। লাফিয়ে উঠল আনন্দে। নাচের ছন্দে ঘুরে গেল মেয়ে। দুহাত দুপাশে ছড়িয়ে আনন্দে নাচছে কেশবতী কন্যা। সহজ আনন্দে বনের প্রাণী মুক্ত হাওয়ায় নাচছে।

থেমে গেল মেয়ে। তাকিয়ে রইল পাহাড়ি পথে। অনেকক্ষণ। পথের দিকে চেয়ে রয়েছে। কিন্তু সবুজ বুড়ো কই ফিরছে না তো? অনেক সময় বয়ে গেল।

হঠাৎ বটগাছের ডালপালা কেঁপে উঠল, পাতাগুলো কেঁপে উঠল। সেই কাঁপা-কাঁপা পাতার মাঝখান থেকে ভেসে এল কার কন্ঠস্বর? সে বলছে, 'ওগো, কেশবতী কন্যা, তুমি বাড়ি ফিরে যাও। পাহাড়ের দেবতাকে আমরা সত্যি সত্যি বোকা বানিয়েছি। ভয় নেই, বাড়ি ফিরে যাও। সুখে থাকো, ভালো থাকো।'

উঁচু পাহাড় থেকে জলধারা আছড়ে পড়ছে নীচে, পাথরের ওপরে। মেয়ে সেদিকে চেয়ে রইল। নীচে পাহাড়ের কোল জুড়ে সবুজ ফসলের খেত, মাঠের পারে হাসিহাসি মুখে দাঁড়িয়ে রয়েছে গাঁয়ের কিষানেরা, তাদের পাশে উচ্ছল ছেলেমেয়ে আর ডাগর চোখ-মেলা বধূরা। সবুজ পাতায় ভরা বিরাট বটগাছ, নীচে দাঁড়িয়ে রয়েছে মেয়ে। বনের হরিণের মতো চমকে উঠে পাহাড়ি হাওয়ায় চুল ভাসিয়ে গানের ছন্দে মেয়ে নেমে আসছে পাহাড়ি পথে। মেয়ে হাওয়ায় ভেসে আসছে, মেয়ে চলেছে গাঁযের পথে। সবুজ ফসলের ওপর দিয়ে জলের ধারার মতো আসছে কেশবতী কন্যা।

মানুষ ওষুধ পেল কেমন করে

সেই আদ্দিকালে মানুষ আর পশু একসঙ্গো বাস করত। যে কালের কথা বলছি সেটা ছিল সৃষ্টির আদিকাল। মানুষ আর পশু ভাই-ভাই হয়ে পাশাপাশি থাকত। ঝগড়া নেই, ঝাঁটি নেই, হিংসে নেই। বড়ই ভাব। কিন্তু ছাড়াছাড়ি হল কেমন করে? পশু কেন মানুষের শত্রু হল? মানুষ কেন পশুর শত্রু হল? সেই কথাই বলছি।

বনে-জঙ্গালে, পাহাড়ের গুহায়, গাছের কোটরে মানুষও থাকত, পশুও থাকত। গলাগলি ভাব। কিন্তু বনের এই জীবন মানুষের আর ভালো লাগল না। বড়ই কষ্ট। তাই ভেবে চিন্তে মাথা খাটিয়ে সে কুঁড়েঘর তৈরি করতে শিখল। ছাউনি যখন হল, তখন আর গুহায় কিংবা কোটরে থেকে লাভ কি? শুধুই কষ্ট পাওয়া। ফাঁকা মাঠের মধ্যে গাছের ডালপালা আর পাতা দিয়ে সে ঘর তৈরি করল। বন ছেড়ে আলোয় এল। রোদ্দুরে কষ্ট নেই, বৃষ্টিতে ভিজতে হবে না, শীতেও অনেক আরাম। কি বুদ্ধি মানুষের!

কিন্তু পশুরা রয়ে গেল বনে, পাহাড়ি গুহায়, গাছের কোটরে। ওরা ঘরবাড়ি তৈরি করতে জানত না। বেচারা পশুরা! কি আর করে? বনেই রয়ে গেল। ভাইয়ে ভাইয়ে ছাড়াছাড়ি হল। কিন্তু তখনও হিংসে তেমন ছিল না, কেউ কারও তেমন শত্রু হয়নি।

একবার আমাদের এই এলাকায় ভীষণ ঠান্ডা পড়ল। সে কি কাঁপুনি। ঘরের মধ্যে থাকলেও কাঁপতে হচ্ছে। তখন তো কোন মানুষ পোশাক পরত না। তাই শীতও লাগে বেশি। এমনি এক ভোরে এক কাণ্ড ঘটে গেল।

এক বুড়ি ঠক্‌ঠক্ করে কাঁপছে। আকাশে মেঘ, রোদের তেজ নেই। ঘর থেকে বাইরে এসে দেহ গরম করার উপায় নেই। তার ওপরে বাইরে হাওয়া বইছে। বুড়ো সারা রাত ভয়ে ভয়ে থেকেছে,—এই বুঝি বুড়ি মরে যাবে। রাত পোহাল কিন্তু বুড়ির কাঁপুনি কমছে না। বুড়ো কি যেন ভাবল। চোখ কুঁচ্‌কে বাইরে তাকাল। হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল। হাতে তুলে নিল একটা এবড়ো খেবড়ো পাথর আর বুনো লতার একটা গুলতি। হাঁটা দিল বনের পথে।

অল্পক্ষণ পরেই বুড়ো ফিরে এল। তার হাতে একটা চামড়া, তখনও গরম রয়েছে, চামড়ার একপাশে লাল টক্‌টকে রঙ। গোটা পশুর গোটা চামড়া। ব্যাস, আর দেখে কে! মানুষে-পশুতে সরাসরি লড়াই শুরু হয়ে গেল। চরম শত্রুতা। একে অন্যকে পেলেই ছিঁড়েখুঁড়ে মেরে ফেলত। আর সেই ভাই-ভাই ভাব কোথায় মিলিয়ে গেল। এখন আমরা যেমন দেখতে পাই। শুরু হয়েছিল বুড়োর চামড়া আনার দিন থেকে।

কিন্তু এভাবে চলতে পারে না। তাই পশুরা গভীর জঙ্গালের মধ্যে একটা সভা ডাকল। সব পশু এল। সলা-পরামর্শ করা দরকার। মানুসের হাত থেকে তারা বাঁচবে কেমন করে? মানুষ শয়তান, জঘন্য। দুষ্টুবুদ্ধিতে তাদের হারিয়ে দিচ্ছে। ওদের শায়েস্তা করার পথ বাত্‌লাতে হবে। সবাই বলুক, মন খুলে বুদ্ধি দিক। এই মানুষ কি

সাংঘাতিক! বড় বড় দাঁত নেই, ধারালো নখ নেই, থাবাও নেই,—আর গায়ের জোরও কিছুই নেই। তবু সবচেয়ে বড় আর শক্তিমান পশুকেও মেরে ফেলছে। তার ছাল ছাড়িয়ে বাড়ি নিয়ে যাচ্ছে। দেহ গরম করছে। নিজের কিছুই নেই। অথচ তির-ধনুক-বর্শা, গাছের মোটা ডাল, বুনো লতার গুল্‌তি, এবড়ো খেবড়ো পাথর,—যা পায় তাই কাজে লাগায়। দূর থেকে আমাদের কাবু করে দেয়। আসুক না সামনাসামনি। কিন্তু ওসব কথা বলবে কে? কাপুরুষ কোথাকার! ভিতু কোথাকার! তবু জিতে যাচ্ছে, আমাদের মেরে ফেলছে। নিজের দেহে লোম নেই। আমাদের লোমশ ছালে দেহ গরম করছে। ছিঃ, লজ্জা করে না? লজ্জা নেই। আমরা শুধু মরছি। ওদের মতো তির-ধনুক-গুলতি যে আমরা বানাতে পারি না। নিজের দেহের বাইরের কিছুই কাজে লাগাতে পারি না। হায়! আমাদের বাঁচার উপায় কি?

কিন্তু পশুদের একটা জিনিস ছিল। সে জিনিস মানুষের ছিল না। পশুরা জাদু জানত। অনেক জাদু। আর জাদু দিয়ে রোগ বানাতে জানত। জাদু দিয়ে তারা অনেক রকমের রোগ আবিষ্কার করেছিল।

সেই আদিকালে কোন রোগ-বালাই ছিল না। কোন মানুষ কখনও অসুস্থ হয়ে পড়ত না। অসুখের নামগন্ধ ছিল না। অন্য অনেক কষ্ট ছিল, কিন্তু অসুখের কষ্ট ছিল না। বড়ই সুখের দিন ছিল।

কিন্তু প্রতিশোধ নেবার জন্য পশুরা নানা ধরনের রোগকে পাঠাতে লাগল মানুষের গাঁয়ের দিকে। এক একটা নতুন নতুন রোগ আবিষ্কার করে আর পাঠিয়ে দেয় মানুষদের কাছে। হায়! হায়! গাঁয়ে দেখা দিল হামজ্বর, সকাল-সন্ধে কাঁপুনি জ্বর, সর্দি-কাশি, হাঁটুর ব্যথা, পিঠের ব্যথা, বমি। আরও কত কি। সবচেয়ে সাংঘাতিক রোগ হল বাতের ব্যথা। কাজ না করলে খাবার আসবে কেমন করে? অথচ বাতের ব্যথায় কিছুই করা যায় না। মানুষজন ভীষণ ভয় পেয়ে গেল। গাল-গলা ফুলে যাওয়া রোগ কে পাঠিয়েছিল আমি বলতে পারব না। কিন্তু শোনা যায় বাতের ব্যথার রোগ পাঠিয়েছিল হরিণ। কেননা, সেই সবচেয়ে বেশি ভুক্তভোগী ছিল। সেই সবচেয়ে বেশি মারা পড়ত।

রোগ আসছে, রোগ আসছে,— রোগ বাড়ছে। ভীষণ প্রতিশোধ। লোক মরছে, লোক খোঁড়া হচ্ছে, অকেজো হচ্ছে। ভীষণ প্রতিশোধ। শেষকালে এমন হল, মানুষ বুঝি শেষ হয়ে যাবে। আর কেউ বেঁচে রইবে না।

মানুষ জানতেও পারেনি এমন সব রোগ এল কেমন করে। আগে তো ছিল না। অনেক ভাবল সে, কোন কূল-কিনারা করতে পারল না। কোন উপায় বের করতে পারল না। মরতে লাগল।

পশুদের মহা ফুর্তি। অনেক নিশ্চিন্ত তারা। আর কিছুদিন বাদেই একেবারে নিশ্চিন্ত হবে। ছাল ছাড়ানো বের করছি। সন্ধেবেলা গুহার মুখে বসে প্রায়ই তারা এসব আলোচনা করে।

সেই গুহার ওপরে ছিল আইভি লতার গাছ। একটা লতা বাড়তে বাড়তে গুহার মুখে ঝুলে পড়েছিল। পশুরাও খেয়াল করে না, গায়ে লাগলেও সেদিকে তাকায় না। বনের পশু,— ওরকম কত লতাপাতা রোজ গায়ে লাগে।

সেই সবুজ লকলকে আইভি লতা একদিন পশুদের কথা শুনে ফেলল। সে আঁতকে উঠল। তাহলে? তাহলে পশুরাই রোগ পাঠিয়ে মানুষের এমন সর্বনাশ করছে? সে ভয়ও পেল। মন তার কেঁদে উঠল। সে শক্ত তালগাছকে বলে দিল। তাল গাছ কেঁপে উঠল। চুপিচুপি নিচু গলায় হাওয়াকে বলে দিল। হাওয়া দুলে উঠল। সে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে মাঠের ঘাসকে বলে দিল। ঘাস পাশের নলখাগড়াকে বলে দিল। এই সাংঘাতিক খবর বনের আগুনের মতো ছড়িয়ে পড়ল। চুপিচুপি, কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি। যেমন বনের আগুন ছড়িয়ে পড়ে। বনের লতা-গাছ-ঘাস তখন এক সভা ডাকল। সবাই বেশ চিন্তিত। বনের মধ্যে ফাঁকা মাঠে বিরাট সভা বসল।

তালগাছ বলল, 'আমার মনে হয়, মানুষকে এভাবে মরতে দেওয়া ঠিক হবে না। মানুষ মরছে পোকার মতো। এটা ঠিক নয়। কেননা, কেন যেন আমার মনে হচ্ছে মানুষ একদিন দারুণ কিছু করবে। অসাধারণ সব জিনিস-পত্তর বানাবে। ঠিক কি করবে আমি বলতে পারব না, কিন্তু বিরাট কিছু করবে। বেচারারা এখনও খুবই গরিব। সবাই পোশাক-আশাকও পরে না ঠিকই। কিন্তু একদিন তারা বাঘ আর দেবদারু গাছের মতোই বিরাট হবে, শক্তিমান হবে।'

খেজুর গাছ বলল, 'মানুষের ছেলেমেয়েরা ফুলের কুঁড়ির মতো সুন্দর। আমের মুকুলের মতো সজীব। পশুর হাত থেকে ওদের বাঁচাতেই হবে।'

আইভি লতা বলল, 'আহা, ফুলের মতো উজ্জ্বল ওরা, ফুলের মতো হাসিখুশি ওরা। ওরা মরছে,—খুব কষ্ট হচ্ছে আমার।'

সব গাছ পাতার শব্দ করে সায় দিল। ঠিক কথা, ঠিক কথা। মানুষকে বাঁচাতেই হবে। কিন্তু কয়েকটি লতা গাছ আর বিষাক্ত ছোট ঝাঁকড়া গাছ মাথা নেড়ে প্রতিবাদ করল। না, তাদের সায় নেই। মানুষ যখন-তখন আমাদের কেটে শেষ করে দিচ্ছে। বিছুটি ভীষণ রেগে গেল। তাকেই বেশি মার খেতে হয়। সে রোঁয়া ফুলিয়ে বলল, 'ওসব মানি না। সুযোগ পেলেই আমি ওদের গায়ে বিষ ঢালব। লাল চাকাচাকা দাগ করে দেব। ফোস্কার মতো জ্বালা ধরিয়ে দেব। মানি না ওসব ভালো কথা।'

দু-একজনের কথায় কেউ কান দিল না। শুধু রসাল আগাছা বলল, 'আমি তক্ষুনি রস লাগিয়ে চাকাচাকা দাগ সারিয়ে তুলব।' ওদের কথায় আর কোন কথা-কাটাকাটি হল না।

গাছ-গাছালি লতা-পাতা ঘাস-শ্যাওলা সবাই নিজের দেহের অংশ থেকে রোগের ওষুধ তৈরি করল। পাতা-ডাল-বাকল-শেকড় সব থেকেই ওষুধ তৈরি হল। শিখিয়ে দিল মানুষকে। পশুরা যে যে রোগ আবিষ্কার করছে, গাছপালা তারই ওষুধ তৈরি করে ফেলছে। মানুষ সেরে উঠছে। মানুষ বেঁচে যাচ্ছে।

ছেলেমেয়েরা, তোমরা যদি চোখ মেলে চেয়ে দেখ, দেখতে পাবে সব গাছ-গাছালি থেকেই ওষুধ তৈরি হয়। আমরা অনেক গাছের গুণ ভুলে গেছি। কিন্তু বাপ ঠাকুরদারা জানত। বিষাক্ত গাছ থেকেও ওষুধ তৈরি হয়। সব গাছেই ওষুধ তৈরি হয়। তাই সব গাছ আমাদের দেবতা। ওদের গায়ে আঘাত দিতে নেই। ওদের জন্যই আমাদের রোগ সারে।

শেয়াল ও সিংহ

অনেক কাল আগে একবার গরম কালে পাহাড়ি এলাকায় সব ঝরনা শুকিয়ে গেল। কাঠফাটা রোদ, গরম হাওয়া। তার ওপরে তেষ্টা মেটাবার জল নেই। সে এক ভীষণ কষ্টের দিন। পশুরা জিভ বের করে হাঁপাচ্ছে, তেষ্টায় বুকের ছাতি ফেটে যাচ্ছে। এবার বোধহয় তেষ্টার জ্বালায় সবাই মারা পড়বে।

দুঃখের দিনে সবাই শত্রুতা ভুয়ে যায়। পশুদেরও তাই হল। তারা হিংসা ভুলে গেল। সবাই পাহাড়ের ছায়ায় বসে পরমর্শ করল। কি করা যায়। বাঁচতে তো হবে। একটা উপায় দেখতে হয়। সবাই মিলে জলের খোঁজে চলল। হাল ছাড়লে চলবে কেন ?

খুঁজতে খঁজতে শেষকালে একটা ঝারনা পাওয়া গেল। শেওলা আর ছোট ছোট পাথরে তার মুখ ছোট হয়ে এসেছে। সেই ছোট্ট মুখ থেকে ঝির্‌ঝির্‌ করে জল গড়িয়ে পড়ছে পাহাড়ের গা বেয়ে। তবু সবাই আনন্দে লাফিয়ে উঠল। বাঁচার আশা জাগল।

পশুর রাজা সিংহ বলল, ‘সবাই লেগে পড়ো। গর্তের মুখ বড় করতে হবে। পাহাড়ের পাথর যত শক্তই হোক ঝরনার মুখ অনেক বড় করতে হবে। দেহের ব্যথা-বেদনা ভুলে সবাই কাজে লেগে পড়ো।’ একথা বলেই সিংহ নিজেই থাবা বসাল। কয়েকটা নুড়ি খসে পড়ল। সিংহের থাবার নখে ব্যথা করছে, তবু সে থামল না।

সবাই কাজে লেগে গেল। ঝর্‌ঝর্‌ করে মাটি পড়ছে, পাথর পড়ছে। ঝরনার জল বাড়ছে। কাজ থেমে নেই।

সেই দলে ছিল এক শেয়াল। সে কুঁড়ের বাদশা। কোন কাজ করতে চায় না। ঝরনা খোঁড়ার কোন কাজই সে করল না। ছায়ায় শুয়ে রইল। ভাবল, জল তো বেরোক, তারপরে দেখি কে আমায় জল খাওয়া ঠেকায়।

সূর্য পাহাড়ের কোলে ঢলে পড়ল। আঁধার হয়ে এল। সবাই গুহায় ফিরে গেল। ঠিক হল, পরদিন খুব ভোরে সবাই এখানে চলে আসবে।

পরের দিন খুব ভোরে সবাই চলে এল। সিংহ এল সবার আগে। আর শেয়াল এল সবার পরে। রোদ উঠবার অনেক পরে। সবাই এসেই কাজে লেগে গেল। শেয়াল তেমনি শুয়েই রইল।

এর মধ্যে হয়েছে কি, একটা কাঠবেড়াল সিংহকে বলে দিয়েছে,—শেয়াল শুধু শুয়েই আছে। এতক্ষণে সিংহের নজর পড়ল। ভীষণ গর্জন করে সিংহ তেড়ে আসছে। বিপদ বুঝেই পেছনের দুই পায়ের মধ্যে লেজ গুটিয়ে শেয়াল কোথায় যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গেল।

হঠাৎ পশুরা চিৎকার করে নাচতে লাগল, 'পশুরাজ, তর্‌তর্‌ করে জল পড়ছে। মিষ্টি জল। সাদা ফেনায় উপ্‌চে-পড়া জল।' পশুরাজও নাচতে লাগল। তারা জলের মধ্যে হুটোপাটি খাচ্ছে। অনেক দিন পরে দেহ ঠান্ডা হল।

হঠাৎ সিংহ গম্ভীর হয়ে বলল, 'শোনো, সবাই অনেক কষ্ট করেছে, তাই ঝরনার এমন জল দিচ্ছে। কিন্তু একজন কিছুই করে নি। তাকে সবাই চিনেছে। তাকে এই ঝরনার এক ফোঁটা জলও খেতে দেব না। তোমারাও দেবে না।'

'কিন্তু পশুরাজ, ওটা ভীষণ শয়তান। অনেক কায়দা জানে। খুব বুদ্ধি। আমরা কি পারব ওকে ঠেকাতে?'

'বেশ, তাহলে আমিই ঝরনা পাহারা দেব। আজ থেকে আমি ঝরনার পাশে ওই গুহাতেই থাকব। দেখি, কেমন করে ও জল খেতে পায়। তেষ্টায় বুকের ছাতি ফেটে ও মরবে।' ভেজা গায়ে সিংহ জোরে জোরে কথাগুলো বলল, পাহাড়ে ধাক্কা খেয়ে তার কথা অনেক দূর ছড়িয়ে পড়ল।

সবাই গুহায় ফিরে যাচ্ছে। পেছন থেকে তারা সিংহের কথা শুনতে পল,—'অনেক দিন শেয়ালের মাংস খাইনি। যদি ও জল খেতে আসে, তবে এবার বোধহয় শেয়ালের মাংস খেতে হবে। ছাড়াছাড়ি নেই।'

পশুরা একথা শুনে খুব খুশি হল। খুব আনন্দ হল তাদের। যাক, নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। বড্ড বেড়েছে শেয়াল। কুঁড়ের বাদশা কোথাকার। এবার মজাটা বুঝবে। সিংহের প্রতিজ্ঞা।

বেশ কয়েকদিন কেটে গেল। শেয়াল ঝরনার পথ মাড়ায়নি। আশেপাশে কোথাও তাকে দেখা যায়নি। সবাই ভাবল, শেয়াল ভয়ে এই এলাকা ছেড়ে দূরে কোথাও পালিয়েছে। কেউ কেউ ভাবল, তেষ্টায় বুঝি শেয়াল মরেই গিয়েছে।

কিন্তু এসব কিছুই হয়নি। একদিন দেখা গেল শেয়াল ঝরনার একটু দূরে বসে রয়েছে। সিংহ গুহার মুখে বসে সব দেখছে। ভাবছে, শেয়াল ঝরনায় জলে মুখ দিলেই ঝাঁপিয়ে পড়ব। কিন্তু না, শেয়াল ঝরনার দিকে চেয়েও দেখছে না। জল খাওয়ার কোন ইচ্ছেই তার নেই।

সিংহ দেখল, শেয়াল কালোমতো কি একটা জিনিস থেকে কি যেন খাচ্ছে আর আপনমনে হাসছে। অবাক কাণ্ড! কি খাচ্ছে শেয়াল? সিংহ আস্তে আস্তে গুহা থেকে বেরিয়ে এল। শেয়ালের পাশে বসল। শেয়াল ফিরেও দেখল না। আপন মনে খেয়ে চলেছে।

হঠাৎ সিংহের দিকে চেয়ে শেয়াল বলল, 'পশুরাজ, ওসব বাজে জলটল খাওয়ার কোন ইচ্ছে আমার নেই। আমি এখন থেকে মধু খেয়ে থাকব। এই মধু খাচ্ছি। অপূর্ব, আঃ কি স্বাদ! কোথায় লাগে ঝরনার ওই বিচ্ছিরি জল? থাকগে এসব কথা।'

সিংহের জিভে জল এল। কিন্তু লজ্জায় কিছু বলতে পারল না। শেয়াল আরামে আধবোজা চোখে খাচ্ছে আর হাসছে। সিংহ আর পারল না। শেষকালে বলেই ফেলল, 'তা শেয়াল, একটু মধু দেবে নাকি?'

মৌচাক থেকে এক ফোঁটা মধু নিয়ে শেয়াল সিংহকে দিল। আঃ, কি সুন্দর খেতে। কোনদিন খাইনি এমন মধু। কি মিষ্টি! সিংহ বলেই ফেলল, 'বন্ধু, এত অল্প দিলে। দাও না একটু বেশি করে।'

শেয়াল লেজ নেড়ে গলা পরিষ্কার করে বলল, 'হ্যাঁ এটা ঠিক, অনেকটা না খেলে পুরো স্বাদ পাওয়া যায় না। এ মধুর যে কি স্বাদ তা জানতে হলে মুখ ভর্তি করে খেতে হবে। ঠিক কথাই বলেছেন।'

'তাহলে, শেয়াল তুমি কি.......।' জিভ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ল সিংহের।

'হ্যাঁ পশুরাজ, আমি মোটেই কৃপণ নই। দেব বৈকি! আপনি চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ুন, আমি মৌচাক থেকে মধু আপনার মুখে ঢেলে দি।'

সিংহ চারটে থাবা তুলে চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ল। হাঁ-করা মুখ, দাঁতগুলো বেরিয়ে আছে। আনন্দে থাবা চারটে কাঁপছে, নখগুলো এধার-ওধার নড়ছে। কাছে গিয়ে শেয়ালের মুখ শুকিয়ে গেল। কাঁচুমাচু হয়ে বলল, 'পশুরাজ, আমার ভয় করছে, বুকে উঠে মধু ঢালতে গিয়ে যদি নখের খোঁচা লাগে? তাহলেই হয়েছে! তার চেয়ে এক কাজ করি। আপনার থাবাগুলো ভালোভাবে বেঁধে দি। তাহলে আর ভয় থাকবে না, কেমন?'

'যা করবে তাড়াতাড়ি করো। বেশিক্ষণ দেরি করতে পারছি না।'

শেয়াল দৌড়ে গেল পাহাড়ের কোলে। বুনো লতা ছিঁড়ে আনল। বেশ শক্ত করে সিংহের থাবা চারটে বেঁধে ফেলল। সিংহ আর থাবা নাড়াতে পারছে না।

ফিক্ করে হেসে শেয়াল ঝরনার দিকে হাঁটা দিল। প্রাণভরে মিষ্টি ঠান্ডা জল খেল। উঠে এল ঝরনা থেকে। সিংহের পাশ দিয়ে শেয়াল বাড়ির পথে হাঁটা দিল। ফিরেও দেখল না সিংহকে।

হঠাৎ সিংহ চিৎকার করে কেঁদে উঠল, 'ও শেয়াল, যাচ্ছ কোথায়? আমায় ফেলে যেয়ো না, দোহাই তোমার। এমন অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখলে সব পশুপাখি আমায় ঠাট্টা করবে। পশুরাজকে এমন অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখলে সব পশুপাখি আমায় ঠাট্টা কারবে। পশুদের ওপরে আমার প্রভুত্বই চলে যাবে, আমি রাজা হয়ে মুখ দেখাব কেমন করে? আমার বাঁধন খুলে দাও। তুমি যত খুশি যখন খুশি ঝরনার জল খেয়ো। কেউ নিষেধ করবে না। আমি কথা দিচ্ছি। তোমার পায়ে পড়ি, তুমি যেয়ো না।'

আস্তে আস্তে হাঁটতে হাঁটতে শেয়াল ভাবল,—আমি যদি সিংহের বাঁধন খুলে না দি, তবে কেউ না কেউ খুলে দেবেই। এখুনি পশুরা হয়তো চলে আসবে। আর তখন পশুরাজ কি আমায় ছেড়ে দেবে? প্রতিশোধ সে নেবেই, গোটা জঙ্গল পাহাড় খুঁজে ফিরবে। আর তখন আমাকে.....। উঃ, কি সাংঘাতিক ব্যাপার! তার চেয়ে ওকে বিশ্বাস করাই ভালো। এতে বাঁচলেও বাঁচতে পারি। কিন্তু বাঁধন খুলে না দিলে কেউ বাঁচাতে পারবে না।

এইসব সাতপাঁচ ভেবে শেয়াল ফিরে এল। সিংহের থাবা থেকে লতাগুলো খুলে ফেলল। বাঁধন খুলে ফেলল। বাঁধন খুলে ফেলেই মৌচাক এগিয়ে দিল সিংহের সামনে। না, সিংহ শেয়ালকে কিছু বলল না। মধু খেল। তারপরে সব পশুকে বলে দিল, এখন থেকে শেয়াল সবার মতো নিশ্চিন্তে ঝরনার জল খাবে। কেউ যেন কিছু না বলে। পশুরা মেনে নিল আদেশ। সেদিন থেকে শেয়াল হল সিংহের বন্ধু।

শেয়াল আর সিংহ তো বন্ধু হল। সিংহ বাধ্য হয়ে শেয়ালকে বন্ধু করল। নইলে, শেয়াল যদি তার বোকামির কথা অন্য পশুদের বলে দেয়! কি লজ্জা!

এদিকে শেয়াল বুঝল, সিংহের সঙ্গে এই বন্ধুত্ব বেশিদিন টিকবে না। হাজার হলেও পশুরাজ তো! কখন কিরকম মেজাজ থাকবে কে বলতে পারে। আগে থেকেই সাবধান হওয়া ভালো।

এইসব চিন্তা করে শেয়াল পাহাড়ের উঁচু চূড়ায় এক গুহায় থাকতে লাগল। ছেলেদের আর বউকে নিয়ে গেল উঁচু গুহায়। এখন, ওই গুহায় উঠতে হলে পাহাড়ি গাছের লতা বেয়ে উঠতে হত। শেয়াল সেই লতা কেটে দিল। আর গুহায় রেখে দিল সেই লতা। ছেলেমেয়ে কিংবা বউ কেউ পাহাড়ের চূড়া থেকে নামত না। শুধু নামত শেয়াল। শেয়াল-বউ লতা ঝুলিয়ে দিত, তাই বেয়ে শেয়াল নামত। আবার লতা তুলে নিত। শেয়াল শিকার নিয়ে ফিরে এলে বউ আবার লতা নামিয়ে দিত। খুব নিরাপদ আস্তানা।

এমনি করে দিন যায়। হাজার হলেও সিংহ হল পশুরাজ। মেজাজই অন্যরকম। দিনে দিনে সিংহ সেই আগের বোকামির ঘটনা ভুলে গেল। এবার শেয়াল পড়ল বিপদে।

দুজনে একসঙ্গে শিকার করত। কিন্তু শিকারের ভালো ভালো মাংস সিংহ নিয়ে নিত, শেয়ালের জন্য পড়ে থাকত হাড়গোড়। তাছাড়া বেশি অংশই নিয়ে নিত সিংহ। সিংহের দাঁত আর থাবার দিকে তাকিয়ে শেয়াল কিছু বলত না।

শেয়াল ভাবত মজা তো মন্দ নয়। আমি প্রাণের মায়া ছেড়ে কত কষ্টে শিকারের হদিস্ এনে দি, পথ দেখিয়ে নিয়ে যাই ওকে। আর উনি কি করেন? একটু পেছনে সরে এসে বিদ্যুতের মতো লাফ দেন, শিকার ছটফট্ করে, মরে যায়। ব্যাস, আর কোন কাজ নেই। অথচ শিকারের প্রায় সবটাই ও নিয়ে নেয়। আর সহ্য করা যায় না। কিন্তু করিই বা কি। যা দাঁত আর নখ! একবার আদর করলেই......।

শেয়াল ভাবে আর ভাবে। কূল-কিনারা পায় না। এখন আবার আর এক ফ্যাসাদ। সিংহকে শিকারের খোঁজও দিতে হয় না। ঘুরে-ফিরে বেড়াতে হয় না। তাই সে দিনে দিনে ভীষণ কুঁড়ে হয়ে উঠল। শিকারের মাংস সিংহ বয়ে নিয়ে গুহায় যেত না। সেটাও পৌঁছে দিতে হত শেয়ালকে। শেয়াল বুঝল, এতদিনে সত্যিই সে সিংহের 'ক্রীতদাস' হয়ে গিয়েছে। 'ক্রীতদাস'—এই কাথাটা মনে অসেতেই শেয়াল ঠিক করে ফেলল এবার তাকে কি করতে হবে। অনেক হয়েছে, আর নয়।

একদিন তারা একটা বুনো বাচ্চা ঘোড়া শিকার করেছে। সিংহ ঘোড়ার রক্ত চেটে শেয়ালকে বলল, 'খুব কচি মাংস। সবটাই আমার গুহায় পৌঁছে দাও। পরে গুহায় এসো। আমাদের খাওয়ার পরে যদি কিছু বাঁচে নিয়ে যেয়ো।' একথা বলেই সিংহ দুল্‌কি চালে গুহার পথে হাঁটা দিল।

আর নয়, এবার অন্য পথ ধরতে হবে। বড্ড বেশি বাড়াবাড়ি শুরু হয়েছে। এই না ভেবে শেয়াল সমস্ত মাংস কেটে কেটে উঁচুতে তুলল। খুব ধকল গেল। কিন্তু মনে খুব আনন্দ। সিংহের কথায় আর চলছিনা, ওকে মানবো না। দেখি না কি হয়।

রাত ভোর হয়ে এল। শেয়াল সিংহের গুহায় ফিরল না। খিদেতে, অপমানে, রাগে সিংহ চিৎকার করতে করতে গুহা থেকে বেরিয়ে এল। শেয়ালের পায়ের গন্ধ শুঁকে

শুঁকে পাহাড়ের অনেক উঁচুতে উঠল। ওপরেই শেয়ালের গুহা। কিন্তু মসৃণ পাথর, ওখানে ওঠা যাবে না।

সিংহ কিছুক্ষণ ভাবল। তারপর বলল, 'শেয়াল, বন্ধু, তোমার সঙ্গে কিছু কথা আছে। আমি তো তোমার অনেককালের বন্ধু। তাই, লতাটা ফেলে দাও। ওপরে উঠব। ভয় নেই বন্ধু।'

শেয়ালের বউয়ের দাঁতকপাটি লেগে গেল। ছেলেমেয়ে গুহার কোণে গিয়ে ঠক্‌ঠক্ করে কাঁপছে। লেজ ঢুকে গিয়েছে পেছনের দু'পায়ের মধ্যে। সে এক কাণ্ড।

শেয়াল কিন্তু ঠোঁটের কোণে হাসছে। গলা বাড়িয়ে বলল, 'পশুরাজ, কি সৌভাগ্য। আপনি এসেছেন আমার গুহায়! কি আনন্দ! এখানে আজকের খাবার খেতে হবে কিন্তু! আপনি হলেন আমাদের রাজা। আমি লতা নামিয়ে দিচ্ছি। আস্তে আস্তে উঠুন। কি সৌভাগ্য আমার।'

শেয়াল লতা নামিয়ে দিচ্ছে। বউ নিষেধ করতে গেল, কিন্তু দাঁতে দাঁতে এমন ঠক্‌ঠক্ হচ্ছে যে সে কথাই বলতে পারল না। ছেলেমেয়েরা আরও সিঁটিয়ে গেল।

সিংহ লতা বেয়ে উঠছে। ওপরে, আরও ওপরে। মাঝখানে সিংহ ঝুলছে, দেহ ভারী, তাড়াতাড়ি ওঠা যায় না। হঠাৎ..... পটাং করে আওয়াজ হল। লতা গেল ছিঁড়ে। পাহাড়ের একেবারে নীচে ধপাস করে একটা আওয়াজ হল। একটু গোঙানি। তারপর সব চুপচাপ।

শেয়াল বউয়ের দিকে তাকিয়ে বলল, 'লতটা খুব পল্‌কা। তাই না? ওটা আগেই এনে গুহায় রেখে দিয়েছিলাম।'

শেয়ালের চোখে-মুখে হাসি ঝরে পড়ছে।

আদাপা আর দখিনা বাতাস

এক যে ছিল কিশোর। তার নাম আদাপা। একদিন ভোরবেলায় সে গিয়েছে মাছ ধরতে। কি শান্ত সমুদ্র। তির্‌তির্‌ করে তার ছোট নৌকো ভেসে চলেছে। এমন শান্ত সমুদ্র সে অনেক কাল দেখেনি। আজ মাছ ধরা অনেক সহজ। আজ অনেক মাছ ধরা পড়বে। কিশোর আদাপা খুব খুশি।

বলা নেই কওয়া নেই হঠাৎ ঝড়ের বেগে দখিনা বাতাস বয়ে গেল। কিছু বোঝার আগেই পাল হেলে পড়ল জলে, নৌকো কাত হয়ে উল্‌টে পড়ল। আর কিশোর ছিট্‌কে পড়ল নোনা জলে। একটু হাবুডুবু খেয়েই সে সাঁতার কাটতে লাগল। বেশ কষ্ট করে তীরে পৌঁছল। বালিতে বসে হাঁপাতে লাগল।

ভেজা দেহে ভেজা চোখে চেয়ে রইল জলের দিকে। উল্‌টে-যাওয়া নৌকো অল্প অল্প দুলছে। আরও দূরে সরে যাচ্ছে। আদাপার কান্না পেল। আর তখন দখিনা বাতাস তার কানের চারপাশ দিয়ে ঘুরে ঘুরে বইছে আর হাহা করে হাসছে। চারপাশে হাসি আর মনের মধ্যে কান্না। চাপা কান্না।

হঠাৎ আদাপা লাফ দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। রাগে লাল হয়ে চিৎকার করে বলল, 'শয়তান কোথাকার! তোমায় যদি দেখতে পেতাম তবে ডানাদুটো দুম্‌ড়ে ভেঙে দিতাম। পাজি শয়তান!'

হাঃ হাঃ হাসির শব্দ হল। দখিনা বাতাস দেখা দিল। তার দেহ দাঁড়িয়ে রয়েছে আদাপার সামনে। দখিনা বাতাস এখন আর না-দেখা বাতাস নয়। বিরাট দানবী। অর্ধেক নারী, অর্ধেক পাখি। আদাপা তার কাছে ছোট্ট শিশু। কিন্তু সে ভয় পেল না। রাগে কাঁপতে কাঁপতে ঝাঁপিয়ে পড়ল দানবীব ওপর। জড়িয়ে ধরল তাকে, কিছু বুঝবার আগেই তার ডানা দুটো দুমড়ে ভেঙে দিল।

হঠাৎ দানবী দখিনা বাতাস উবে গেল, হাওয়ায় মিলেয়ে গেল। এখন আর তাকে দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু হাওয়ার আর্তনাদ ভেসে আসছে। বালুতীরে কিছু গড়াগড়ির শব্দ হচ্ছে,—মনে হচ্ছে ভাঙা ডানা ঝাপটাচ্ছে কেউ। গুমরে গুমরে কাঁদছে সে, সে কান্না হাওয়ায় ছড়িয়ে পড়ছে। আদাপা দাঁড়িয়ে রয়েছে বীরের মতো। এখন মজা বুঝুক, নৌকো উল্‌টে দেবার মজা বুঝুক। শয়তান কোথাকার!

দিন বয়ে যায়। রাত বয়ে যায়। এদিকে হয়েছে কি, দখিনা বাতাস ফিরছে না। দেবতাদের রাজা আনু বসে রয়েছেন স্বর্ণ সিংহাসনে। প্রাসাদের মস্ত ঘরে তিনি বসে রয়েছেন। সব জানালা রয়েছে খোলা তবু দখিনা বাতাস তার প্রভুর কাছে ফিরে এল না। অনেক সময় বয়ে গেল। সাগরজলে জাহাজ চলেছে শান্তভাবে, খেতের ফসল পাকা সোনার রং ছড়িয়ে নুয়ে পড়েছে মাটিতে, শুকনো মাটি রোদের আগুনে ঝলসে গেল,—তবু দখিনা বাতাস বইল না। বর্ষার কালো মেঘ উড়ে এল না,—দখিনা বাতাস

বইছে না যে। দেবরাজ আনু অস্থির হয়ে উঠলেন। এ কি হল? এমন তো কখনও হয় নি?

শেষকালে দেবরাজ তার এক দূতকে পৃথিবীতে পাঠালেন। সে খুঁজছে দখিনা বাতাসকে। পাওয়া গেল তাকে। কিন্তু হায়, এ কি দশা তার! কি করুণ অবস্থা! স্বর্গের দখিনা বাতাস বালুতীরে কাঁদছে আর গড়াগড়ি দিচ্ছে। দূত তাকে তুলে নিয়ে দেবরাজের কাছে উড়ে গেল।

দেবরাজ তার ভৃত্যের এই দশা দেখে রাগে জ্বলে উঠলেন। পড়ন্ত বিকেলের রক্তরাঙা সূর্যের মতো রেগে লাল হয়ে উঠলেন। দেহ কাঁপছে, চোখ জ্বলছে।

বাজ পড়ার শব্দ হল। আনু আদেশ দিলেন, 'যে মানুষ আমার ভৃত্যের এই দশা করেছে, তাকে নিয়ে এসো। এখুনি।'

রাতের অন্ধকার। ঘুমিয়ে রয়েছে আদাপা। চোখ ধাঁধানো উজ্জ্বল আলোয় আদাপার ঘুম ভেঙে গেল। আলোয় চোখ সয়ে এলে আদাপা দেখল, তার সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে এক আলোকিত দেহ, তার ডানাদুটো অল্প অল্প কাঁপছে।

আলোকিত দূত বলল, 'দেবরাজ আনু তোমাকে ডেকেছেন। তোমায় যেতে হবে তার বিচারসভায়। তুমিই সেই মানুষ যে দখিনা বাতাসের ডানাদুটো দুমড়ে ভেঙে দিয়েছ।'

বাছারা, আজকে আমি তোমাদের বলতে পারব না, কেমন করে আদাপা দেবরাজের বিচারসভায় গিয়েছিল। দূত তাকে পথ বলে দিয়েছিল কিনা তাও আমি জানি না। আমার মনে হয়, সমুদ্রের যে পথ দিয়ে সূর্য আকাশে ওঠে, সে পথ দিয়েও আদাপা যেতে পারে। কিংবা ওই দূর পাহাড়ের কোলে হয়তো কোন রথ ছিল, সে রথেও সে যেতে পারে। আমি ঠিক জানি না।

আলোকিত দূত অদৃশ্য হল। আদাপা বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ল। বাবাকে জাগিয়ে তুলে আদাপা বলল, 'বাবা, সব শেষ হয়ে গেল। আর আমাদের আনন্দের দিন ফিরে আসবে না। জাল নিয়ে সমুদ্রে মাছ ধরা হবে না, তোমার সঙ্গে আর নৌকোয় যেতে পারব না। ঘন বনের ছায়ায় ছায়ায় তোমার হাত ধরে ঘুরে বেড়াতে পারব না। সব শেষ। দেবরাজ আনু ভীষণ রেগে গিয়েছেন। আমি নাকি মস্ত অপরাধ করেছি। তিনি আমাকে তার বিচারসভায় ডেকেছেন। আমার বিচার হবে।'

বাবার বুক কেঁপে উঠল। তার যে আর কেউ নেই! আদাপাই তার সব। চোখের কোল ভিজে উঠল। তবু শক্ত মনে বাবা ছেলেকে জড়িয়ে ধরে বলল, 'বাছা, দেবরাজ যখন ডেকেছেন, তখন যেতেই হবে। শোকের পোশাক পরে তুমি যাবে। বিনয়ী হয়ে কথা কইবে। উদ্ধত হবে না। আবার অকারণে মাথাও নত করবে না। মধুর কথায় তার কাছে ক্ষমা চাইবে। কেন তুমি ডানা ভেঙেছ তাও জানাবে। দেবরাজ যদি তোমায় ক্ষমা করেন, তাড়াতাড়ি ফিরে আসবে আমাদের এই পৃথিবীতে। হ্যাঁ, আর একটা কথা। স্বর্গের কোন খাবার খাবে না, কোন পানীয় স্পর্শ করবে না। পৃথিবীকে যদি ভুলতে না চাও, তবে এই নিষেধের কথা মনে রেখো। পৃথিবী বড় সুন্দর।'

অল্পক্ষণ তাকিয়ে রইল বাবার মুখের দিকে, তারপরে আদাপা রওনা দিল। এক আশ্চর্য উপায়ে আদাপা স্বর্গের পথ পেয়ে গেল। পৌঁছে গেল মেঘের রাজ্যে। মেঘরাজ্যে

দেবরাজের বিচারসভা। বিচারসভার ঘরে দাঁড়িয়ে রয়েছে দুজন দৈত্য। তাদের দেহের দুপাশে বিশাল ডানা। মাথা নামিয়ে আদাপা তাদের অভিবাদন জানাল। বড় বিনয়ী মানুষ। তারা পথ ছেড়ে দিল।

বিচারসভার ঐশ্চর্য দেখে আদাপার চোখ ধাঁধিয়ে গেল। কিন্তু সে ঐশ্চর্যও ম্লান হয়ে পড়েছে দেবতাদের কাছে। অমর দেবতারা বসে রয়েছেন, তাদের পোশাক আকাশের তারায় খচিত। অপরূপ সুন্দর দেবতারা। মাঝখানে রয়েছেন দেবরাজ। সূর্যের চেয়েও উজ্জ্বল তিনি, চারিদিকে আভা। আদাপা হাঁটু ভেঙে বসে দেবরাজ ও দেবতাদের প্রণাম জানাল। আলোর ছটায় চোখ খুলে রাখা যায় না।

বাজ পড়ার শব্দ হল। দেবরাজ বললেন, 'মানুষ হয়ে এত সাহস কোথায় পেলে? আমার ভৃত্যের ডানা ভেঙেছ? কোথায় পেলে এই সাহস?'

আদাপা ভয় পেল না। কথা জড়িয়ে গেল না। বিনয়ী হয়ে মিষ্টি সুরে বলল, 'হে দেবরাজ, আমি আপনার কাছে ক্ষমা চাইতে এসেছি। দখিনা বাতাস আমার নৌকো উল্‌টে দিয়েছিল। আমি মাছ ধরছিলাম। মাছ না ধরলে আমরা অনাহারে থাকব। হঠাৎ রেগে গেলাম, তার ডানাদুটো দুম্‌ড়ে ভেঙে দিলাম। হ্যাঁ, আমিই ভেঙেছি। কিন্তু সত্যি বলছি, দখিনা বাতাস যে আপনার ভৃত্য রাগের মাথায় আমি সে কথা ভুলে গিয়েছিলাম। রাগ মানুষকে সব ভুলিয়ে দেয়। সেই ভুলে আমি স্বর্গরাজ্যের বাসিন্দার গায়ে হাত তুলেছিলাম। আমি অনুতপ্ত, আমায় ক্ষমা করুন।'

তাকিয়ে রয়েছে আদাপা। চোখের সামনে ভেসে উঠল বাবার সুন্দর মুখখানি। না, সে ভয় পায় নি। না, সে উদ্ধত হয়নি। না, মাথা নত করেনি।

দেবতারা বলে উঠলেন, 'ছোট্ট মানুষটি সত্যিই অনুতপ্ত। সে অপরাধ করেছে, অপরাধ বুঝে স্বীকার করেছে। সে অনুতপ্ত।'

দেবরাজ কথা বললেন। বাজ পড়ার শব্দ হল না। মধুর সংগীত ভেসে এল, 'ছোট্ট মানুষ, তোমায় ভালো লেগেছে। তুমি অনুতপ্ত। তুমি ক্ষমা চেয়েছ। তোমায় ক্ষমা করলাম। কিন্তু তুমি আর পৃথিবীতে ফিরে যেতে পারবে না। স্বর্গরাজ্যে যা দেখে গেলে, পৃথিবীর মানুষকে তা জানাতে দেব না। এটাই নিয়ম। আজ থেকে তুমি স্বর্গরাজ্যের বাসিন্দা হবে। আমাদের সঙ্গে থাকবে। চিরকালের জন্য অমর হয়ে রইবে তুমি। পৃথিবীর মানুষের মতো মৃত্যু তোমায় স্পর্শ কারতে পারবে না। স্বর্গীয় সুরা পান করে অমরত্ব লাভ করো। দূত, ওকে সুরার পাত্র এগিয়ে দাও।'

মেঘের আড়াল থেকে দূত এগিয়ে আসছে। আলোকিত দূতের হাতে সুরার পাত্র। স্বর্গীয় সুরা। বাবার মুখ ভেসে উঠল। দূত আরও এগিয়ে আসছে। আরও কাছে। সুরার পাত্রে বাবার মুখ ভেসে উঠছে। আদাপা দেবরাজের পায়ের নীচে ঝাঁপিয়ে পড়ল। কাতরভাবে বলে উঠল, 'ওগো দেবরাজ, তুমি রেগে যেয়ো না, তুমি আমায় ক্ষমা করো। তোমার তুচ্ছ সৃষ্টিকে দয়া করো। আমি তোমার স্বর্গীয় সুরা পান করতে পারব না। কিছুতেই পারব না।'

বাজ পড়ার শব্দ হল। প্রতিধ্বনি তুলে সে শব্দ শতগুণ হয়ে আছড়ে পড়ল। আগুনের মতো রাঙা হয়ে দেবরাজ বললেন, 'আমার দেওয়া প্রসাদ তুমি ফিরিয়ে দিলে? স্বর্গীয়. সুরা পান করতে অস্বীকার করলে? বুঝেছি তুমি ভেবেছ আমি তোমায়

বিষ পান করতে দিয়েছি। এ সুরা পান করলে তুমি বুঝি মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়বে। তাই না? হতচ্ছাড়া খুদে মানুষ কোথাকার! মনে শুধুই বদ বুদ্ধি। আমি তোমায় দেবতার আসনে বসাতে চেয়েছিলাম। অমরত্বের স্বাদ পেতে আহ্বান জানিয়েছিলাম। সহ্য হল না।' বাজের শব্দ থেমে গেল।

মাথা নত করে আদাপা বলে গেল, 'ওগো দেবরাজ, তা নয়। আমি ভুল বুঝিনি। তুমি সত্যের পিতা, সত্যকে জানো। আমি তো ভাবিনি। আমি করুণার দানকে বুঝতে পেরেছি। কিন্তু দেবরাজ, আমি যে তার উপযুক্ত পাত্র নই। আমি সামান্য মানুষ। তোমার বিচারসভায় আসবার অগে আমি বাবার কাছে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, যদি তুমি আমায় ক্ষমা করো, তবে আমি তাড়াতাড়ি বাবার কাছে ফিরে যাব। তুমি ক্ষমা করেছ, তাই আমি ফিরতে চাই। বাবা বলেছে, পৃথিবী বড় সুন্দর। তুমি ফিরে যেতে আদেশ দাও।' আদাপা করুণ চোখে চেয়ে রইল দেবরাজের মুখের দিকে।

দেবরাজের রাগ মিলিয়ে গেল। অদ্ভুত হাসি ফুটল মুখে। 'পৃথিবী বড় সুন্দর! ফিরে যেতে চাও সেখানে? বাবার কাছে প্রতিজ্ঞা করেছ? অমরত্ব চাও না? বেশ তাই হবে। ফিরে যাও পৃথিবীতে। সেখানে তোমার জন্য অপেক্ষা করছে হাড়ভাঙা পরিশ্রম, দুঃখ-কষ্ট, রোগজ্বালা, বার্ধক্যে নুয়ে পড়া, কান্না আর ভয়াবহ মৃত্যু। এই তো মানুষের ভাগ্য। এ যদি তোমার ভালো লাগে, ফিরে যাও তোমার সুন্দর পৃথিবীতে।'

আদাপার মুখে হাসি। সবাইকে প্রণাম জানিয়ে আদাপা পৃথিবীর পথে রওনা দিল।

হ্যাঁ, আদাপা পৃথিবীতে ফিরে এল। সে অমরত্ব চায় নি। সে দেবরাজের ভিক্ষা মাথা পেতে নেয়নি, তার প্রসাদ ফিরিয়ে দিয়ে বাবার আদেশ মাথা পেতে নিয়েছে। দেবরাজের চেয়েও আদাপার কাছে তার বাবা অনেক বড়। অমর হয়ে দেবলোকে শান্তিতে সে থাকতে চায় নি। সে মেনে নিয়েছে মানুষের সহজ আনন্দকে, মানুষের দুঃখ-কষ্টকে—সব মানুষ যেভাবে বাঁচবে মরবে, সে-ও সেভাবেই থাকবে। অনেক কষ্ট জীবনে, তবু পৃথিবী বড় সুন্দর। আদাপার পৃথিবী, মানুষের পৃথিবী।

কাঠবাদামের গাছ

পাহাড়ের কোলে বিরাট বন। নানা জাতের গাছ-গাছালি। সেই বনে ছিল একটা কাঠবাদামের গাছ। মস্ত উঁচু। সব গাছের মাথা ছাড়িয়ে সে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ডালপালায় ভরা গাছ। অনেক বয়েস হয়েছে। বুড়ো গাছ। অনেক কিছু দেখেছে সে।

শরৎকাল এসে গেল। ডালে ডালে কাঠবাদাম। কাঠবাদামে ছেয়ে গিয়েছে গাছ। বাদামি রং ধরেছে ফলে। ফলগুলো সব পেকে উঠেছে। গাছ আরও সুন্দর হয়েছে।

পাশেই থাকত এক কাঠবেড়াল। ঝড়ে ভেঙে-পড়া একটা মরা গাছের কোটরে সে থাকত। ঢোকার মুখটা ছোট্ট, কিন্তু ভেতরে বিরাট ঘর। কাঠবেড়াল তর্‌তর্‌ করে কাঠবাদামের গাছে উঠে পড়ল। ফল পড়তে লাগল নীচে। যা ধারালো দাঁত! দাঁত বসাচ্ছে আর ফল পড়ছে নীচে। সব বাদাম শেষ। গাছে আর একটাও ফল নেই। নীচে নেমে এল সে। খুব তাড়াতাড়ি এক জায়গায় জড়ো করল ফলগুলো।

কান্না-কান্না গলায় গাছ বলল, 'বন্ধু কাঠবেড়াল, সব ফল নিয়ে যেয়ো না। একটা ফল গাছের নীচে রেখে দাও। একটিমাত্র ফল। বুড়ো হয়েছি। বনে তো এ গাছ আর নেই। আমি মরে গেলে কেউ রইবে না। বাচ্চা একটা চারা গজিয়ে উঠুক। আমার সন্তান। দোহাই তোমার, সব নিয়ে যেও না। একটা ফল রেখে দাও।'

'ওসব হবে না। কারও কথা ভাববার সময় নেই। এই তো শীত আসছে। বরফ পড়বে, বরফের ঝড় বইবে। তখন খাব কি? বাইরে যাব কেমন করে? ওসব শুনছি না। না খেতে পেয়ে মরলে তুমি দেখবে? কেউ দেখে না।' কাঠবেড়াল লেজ তুলে মুখঝামটা দিল।

একটা কাঠবাদামের খোলা ভাঙে আর মুখে করে গাছের কোটরে রেখে আসে। কাঠবেড়াল ভীষণ ব্যস্ত। খোলাগুলো জমে উঠেছে। অনেক খোলা, খোলা বেড়েই চলেছে। কোনদিকে তাকাচ্ছে না সে, শুধু এক কাজ।

ঝাপসা চোখে গাছ,
ঘন পাতার গাছ,
দেখছে নীচে ফল,
ফেলছে চোখের জল।

হঠাৎ 'ঘন ঝোপের আড়াল থেকে তিরের বেগে ছুটে এল একটা খেঁকশেয়াল। কাঠবেড়াল তার দাঁতে আটকে গেল। খেঁকশেয়াল মেরে ফেলল কাঠবেড়ালকে, যে কাঠবেড়াল কাঠবাদাম খাচ্ছিল।

ঝাপসা চোখে গাছ,
ঘন পাতার গাছ,
দেখছে নীচে ফল,
ফেলছে চোখের জল।

হঠাৎ গাছের ফাঁক থেকে লাফিয়ে পড়ল একটা বুনো নেকড়ে। ছট্‌ফট্‌ করল খেঁকশেয়াল। বুনো নেকড়ে মেরে ফেলল খেঁকশেয়ালকে, যে খেঁকশেয়াল মেরেছিল কাঠবেড়ালকে, যে কাঠবেড়াল কাঠবাদাম খাচ্ছিল।

ঝাপসা চোখে গাছ,
ঘন পাতার গাছ,
দেখছে নীচে ফল,
ফেলছে চোখের জল।

আধবোজা চোখে নেকড়ে হাড় চিবোচ্ছে। আর খিদে নেই। পেট ভর্তি। তবু হাড় চিবোচ্ছে। আঃ ! একটু জিরিয়ে নিয়ে গুহায় ফেরা যাবে।

হঠাৎ একটা হলুদ তির ছুটে এল। চিতা লাফিয়ে পড়েছে নেকড়ের দেহের ওপর। কামড়ে ধরেছে নেকড়ের গলা। ঝটাপটি, মারামারি। নেকড়ে নিথর হয়ে গেল। চিতা মেরে ফেলল নেকড়েকে, যে নেকড়ে খেঁকশোয়ালকে মেরেছিল, যে খেঁকশেয়াল কাঠবেড়ালকে মেরেছিল, যে কাঠবেড়াল কাঠবাদাম খাচ্ছিল।

ঝাপসা চোখে গাছ,
ঘন পাতার গাছ,
দেখছে নীচে ফল,
ফেলছে চোখের জল।

খাচ্ছে, খাচ্ছে, চিতা মাংস খাচ্ছে। তুলতুলে মাংস, রক্তমাখা নরম মাংস। পেট ভরে গেল। যাওয়ার তাড়া নেই। চোখ বুজে লম্বা হয়ে শুয়ে রইল গাছের নীচে। গাছের পাতা কাঁপছে। ঘন পাতার ছায়া। আবামে চোখ বন্ধ হয়ে এল চিতার। সে ঘুমিয়ে পড়ল।

হঠাৎ একটা দম্‌কা হাওয়া বয়ে গেল। অনেক বয়েস হয়েছে গাছের, আর তেমন শক্তি নেই। হাওয়ার তেজ সহ্য করতে পারল না। হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ল গাছ। ঠিক চিতার পেটের ওপর। চিতা তক্ষুনি মরে গেল, যে চিতা নেকড়েকে মেরেছিল, যে নেকড়ে খেঁকশেয়ালকে মেরেছিল, যে খেঁকশেয়াল কাঠবেড়ালকে মেরেছিল, যে কাঠবেড়াল কাঠবাদাম খাচ্ছিল।

কোথা থেকে আকাশে মেঘ জমল। মেঘের গর্জন আর বিদ্যুতের আলো। হঠাৎ বাজ পড়ল নীচে, কাঠবাদাম গাছের ওপর। দাউ দাউ জ্বলে উঠল কাঠবাদাম গাছ, আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেল গাছ, যে গাছ চিতার ওপর পড়েছিল, যে চিতা নেকড়েকে মেরেছিল, যে নেকড়ে খেঁকশেয়ালকে মেরেছিল, যে খেঁকশেয়াল কাঠবেড়ালকে মেরেছিল, যে কাঠবেড়াল কাঠবাদাম খাচ্ছিল।

বাজের আওয়াজ আর বিদ্যুতের চমকানো থেমে গেল। ঝমঝম করে বৃষ্টি নামল। চারিদিকে আঁধার-করা বৃষ্টি। ছাই পচে গেল। শেষকালে একদিন গাছ মাটির সঙ্গে মিশে গেল, যে গাছে বাজ পড়েছিল, যে গাছ চিতার ওপরে পড়েছিল, যে চিতা নেকড়েকে মেরেছিল, যে নেকড়ে খেঁকশেয়ালকে মেরেছিল, যে খেঁকশেয়াল কাঠবেড়ালকে মেরেছিল, যে কাঠবেড়াল কাঠবাদাম খাচ্ছিল।

মাটি ভিজে রয়েছে। বর্ষাকাল। বর্ষার জলে, পচে-যাওয়া গাছের ছাইয়ে সেখানকার জমি আরো ভালো হল। উর্বর হল। এল বসন্ত। সেই জমিতে অনেক কাঠবাদামের গাছ। কচি ডাল, সবুজ পাতা। অনেক ফল ছড়িয়ে ছিল সেই গাছের নীচে। আজ গাছের অনেক ছোট্ট চারা। সেখানে কাঠবাদামের বন হয়ে গেল। ঘন বন। অনেক বাদামের গাছ। কাঠবাদাম গাছের সন্তান।

সেই থেকে বনে বনে কাঠবাদামের গাছের বন হল। একটা কাঠমাদামের গাছ তাই তোমরা কখনও দেখতে পাবে না। ওরা ডালে ডালে লেগে থাকে, এক গাছের ডাল অন্য গাছে। আর তো একা নয়, তাই ভয়ও নেই।

ধ্রুবতারা ও শুকতারা

অনেক অনেককাল আগে বনের মধ্যে এক গাঁয়ে থাকত এক সর্দার। সে ছিল গাঁয়ের সব মানুষের মাথা, সে গোষ্ঠীপতি। তার ছিল এক ছেলে। এমন দুষ্টু ছেলে কমই দেখা যায়। একটা দুষ্টুমি করেই সে আর একটা কি দুষ্টুমি করবে তা ভাবতে থাকে। বেশিক্ষণ ভাবেও না। দুষ্টুমির খেলা খেলতে তাকে কোনদিন বেশি কিছু ভাবতে হয় না।

একদিন গুলতি নিয়ে খেলছে। বাড়ির পাশের গাছে অনেক পাখি বসে রয়েছে। এর মধ্যেই গোটা তিনেক পাখিকে সে মেরেও ফেলেছে। এমন সময় দেখে পথ দিয়ে যাচ্ছে এক বুড়ি। মাথায় তার জলভর্তি কলসি। একটু হাসল সর্দারের ছেলে। টং করে আওয়াজ হল। কলসি গেল ভেঙে। বুড়ি ভিজে গেল।

অনেক দূরের পাহাড়ি ঝরনা থেকে খাওয়ার জল আনতে হয়। বুড়ি রেগে গিয়ে বলল, 'কোথাও শান্তি পাবি না। পাজি ছেলে কোথাকার! গোটা দুনিয়া চষে বেড়ালেও শান্তি পাবি না। ওই দূরের অমর রাজ্যে গেলেও তুই শান্তি পাবি না, এক মুহূর্ত বিশ্রাম পাবি না। এই বলে দিলাম।'

কথাটা শুনে দুষ্টু ছেলে কেমন পাল্‌টে গেল। গুলতি ফেলে দিল দূরে। মুখ নিচু করে ঘরে ঢুকল। শুধু চিন্তা করছে বুড়ির কথা। মন খারাপ থাকে সবসময়। দুষ্টুমি করতে যায় না। শুধু ভাবে আর ভাবে। সে বেরিয়ে পড়তে চায় বিরাট দুনিয়ায়,— কোথায় রয়েছে অমর রাজ্য, সে সেখানেই যাবে। কয়েকদিন ভাবনার পর সে সব ঠিক করে ফেলল। সর্দার-বাবার কাছে গিয়ে সে নতুন পোশাক চাইল, চাইল তরবারি আর একটা মোটা লাঠি। কথা শুনল না, বাবা-মায়ের কথাও না। এইসব নিয়ে সে অজানা পথে রওনা দিল। নিজের বাড়ি পেছনে পড়ে রইল।

সে পথ হাঁটছে। কত পথ পেছনে পড়ে রইল। কত গ্রাম পেরিয়ে গেল সে। বন পেরিয়ে এল, নদী পেরিয়ে এল। সে হাঁটছে, সে হাঁটছে।

শেষকালে বনের মধ্যে সে একজন সন্ন্যাসীর কুঁড়েঘর দেখতে পেল। পল্‌কা দরজায় টোকা মারল। সন্ন্যাসী দরজা ঠেলে বেরিয়ে এল। চোখ কুঁচকে বলল, 'বাছা, তুমি কি চাও? এমন জায়গায় তুমি?'

ছেলে বলল, 'বলতে পার, কোথায় রয়েছে অমর রাজ্য? আমি সেখানে যাব।'

সন্ন্যাসী অবাক হয়ে চেয়ে রইল। একটু পরে বলল, 'অমর রাজ্য তো আমি কখনও দেখিনি। অমর রাজ্যের নামও কখনও শুনিনি। কি জানি, কোথায় সে রাজ্য।'

ছেলে দুঃখ পেল। সন্ন্যাসীও সে রাজ্যের কথা জানে না? বিড়্‌বিড়্ করে বলল, 'তাহলে এখন আমি কি করি? বাড়িতে তো ফিরতে পারব না। কখনই না।'

এই কথা শুনে সন্ন্যাসী আস্তে আস্তে বলল, 'সামনেই পড়বে ঘন বন। আলো ঢোকে না ওই বনে। নীচের দিকে অন্ধকার। ওই বনের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে যাও। বনে রয়েছে

অসংখ্য হিংস্র প্রাণী। যার সঙ্গে দেখা হবে তাকেই নত হয়ে অভিবাদন জানাবে, প্রত্যেককে। শেষকালে তুমি পৌঁছে যাবে একটা বিশাল রাজপ্রাসাদের সামনে। দেখবে, সামনে শুয়ে রয়েছে একটা মস্ত বড় সাপ। তাকেও নত হয়ে অভিবাদন জানাবে। মাথা সরিয়ে সে তোমায় পথ করে দেবে। সেখানে গেলে জানতে পারবে কোন্‌দিকে কতদূরে যেতে হবে। এর বেশি আমি কিছু জানি না।'

এগিয়ে চলল ছেলে। বনের ঘন অন্ধকারে সব পশু-পাখি-কীটপতঙ্গকে সে নত হয়ে অভিবাদন করল। কেউ কিছু বলল না। শেষকালে বন পেরিয়ে এল রাজপ্রাসাদের সামনে, বিশাল এক সাপ এধার-ওধার পথ জুড়ে শুয়ে আছে। ছেলে বলল, 'বাঃ! কি সুন্দর তোমার সোনালি দেহের রং-বাহার। তোমায় অভিবাদন জানাই।'

সাপ খুব খুশি হল। মাথা একধারে সরিয়ে নিল। বলল, 'খুব ভাগ্যবান তুমি। যদি আমায় অভিবাদন না জানাতে, এখুনি মেরে ফেলতাম তোমায়। খুব ভাগ্য ভালো তোমার।'

অল্প দূরে গিয়ে ছেলে থামল। পেছন ফিরে বলল, 'আমাকে মারতে এলে তোমাকেও তালগোল পাকিয়ে দিতাম। কিংবা তুমি পড়ে থাকতে টুকরো টুকরো হয়ে। তুমিও ভাগ্যবান।'

সর্দারের ছেলে রাজপ্রাসদের মধ্যে ঢুকে পড়ল। দেখা হল এক বুড়োর সঙ্গে। বুড়োর বয়স এই পৃথিবীর বয়সের সমান। খুব বুড়ো। সে বলল, 'বাঃ, খুব সাহসী ছেলে তো! সাবাস্‌। তা তুমি এখানে এলে কেন।'

'আমি অমর রাজ্য খুঁজতে বেরিয়েছি। এখনও পাই নি।'

' সে তো অনেক অনেক দূর। বহু দূরে। আজ পর্যন্ত কেউ সেখানে যেতে পারে নি, কেউ তার পথ জানে না। আমি জানি, শুধু আমি জানি। তোমাকে আমার খুব ভালো লেগেছে। তাছাড়া আমার সব জীবজন্তুকে তুমি অভিবাদন জানিয়েছ, এতে আমি খুশি। ওরা আমার আদরের ছেলেমেয়ে। তোমায় আমি পথ বলে দেব। এই গোল বলটি তোমায় দিলাম। আসলে এতে জড়ানো আছে সোনার সুতো। এই তোমাকে পথ দেখাবে। এটাকে গড়িয়ে দেবে, আর এর পেছন পেছন যাবে। খুব ভালো লেগেছে তোমায়।'

ছেলে নত হয়ে বুড়োকে বিদায় জানাল। বলটি মাটিতে জোরে গড়িয়ে দিল। বল পাহাড় ডিঙিয়ে, উপত্যকা ছাড়িয়ে, শস্যখেত পেরিয়ে, মরুভূমি ছাড়িয়ে গড়িয়ে গেল। পেছনে পড়ে রইল সরু সুতো, সোনার সুতো,—ঠিক মাকড়সার জালের মতো। সুতোর পথ বেয়ে এগিয়ে চলল ছেলে। শেষকালে পৌঁছল এক ওক গাছের নীচে। সেখানে সে থামল। সত্যি ক্লান্ত সে। বসে পড়ল গাছের নীচে।

গাছের নীচে পড়ে ছিল ওক ফলের একটা বীজ, ছেলে না দেখে তার ওপরে বসে পড়ল। বীজ ফেটে গেল, অঙ্কুর বেরিয়ে পড়ল। এত চাপ কি ছোট্ট বীজ সহ্য করতে পারে? সে ব্যথা পেয়ে বলে উঠল, 'তুমি কে? তুমি তো খুব সুন্দর। তা তুমি চলেছ কোথায়?'

'আমি এক সর্দারের দুষ্টু ছেলে। আমি চলেছি অমর রাজ্যে। চিরকাল সেখানেই থাকব। সেখানেই যাচ্ছি।'

'বেশ ভালো, কিন্তু তুমি অমনভাবে আমার ওপরে বসে থেকো না। সবে আমার অঙ্কুর গজিয়েছে। এখনও আমি খুবই ছোট, বড়ই দুর্বল। তোমার চাপে গুঁড়ো হয়ে

গেলাম। তুমি ওঠ। আমাকে বড় হতে দাও। ইচ্ছে করলে তুমি এখানেই থাকতে পার। কিছুদিন পরে আমি মস্ত বড় গাছ হব, ডালপালা-পাতায় ছড়িয়ে পড়ব। ততদিন তুমি আমার কাছেই থাক। তোমাকে একটা কথা বলি, আমি অনেক অনেকদিন বাঁচব, তারপর বুড়ো হব, ভেঙে পড়ব ঝড়ে, ধুলোর সঙ্গে মিশে যাব, ছোট ছোট পাখি সেই ধুলোয় আনন্দে গড়াগড়ি যাবে। সেই তখন তোমার শেষ দিন ঘনিয়ে আসবে, তার আগে নয়।'

সর্দারের ছেলে একথা শুনে উঠে দাঁড়াল। নরম মাটি এনে অঙ্কুরের চারপাশে দিল, এটা ভালোভাবে বেড়ে উঠতে পারবে। বিদায় জানিয়ে ছেলে রওনা দিল।

অনেকদিন ধরে ছেলে পথ চলল। শেষকালে এক আঙুর খেতে এল। আঙুরের ভারে লতানো গাছ নুইয়ে পড়েছে। গাছের নীচের ছায়ায় সে বসে পড়ল। খুব ক্লান্ত সে। হাত বাড়িয়ে পাকা আঙুর তুলে খেতে লাগল। একটু পরে আঙুর গাছ বলল, 'ওগো সুন্দর ছোট্ট ছেলে, তুমি একা একা কোথায় চলেছ?'

'আমি চলেছি অমর রাজ্যে। চিরকাল সেখানেই থাকব।'

আঙুর গাছ বলল, 'আঙুরের একটা বীজ এই মাটিতে পুঁতে দাও। এই বীজ একদিন বড় হবে, তাতে অনেক আঙুর ফলবে। ইচ্ছে হলে তুমি এখানেই থেকে যেতে পার। আঙুর গাছ এত বড় হয়ে উঠবে যে মাটির নীচে আর শেকড় যেতে পারবে না, পাতা এত বেশি হবে যে সূর্যের আলো ঢুকতে পারবে না। ততদিন তুমি এখানে থেকে যাও আর আঙুর খাও। তুমি বাঁচবে ততদিন।'

ছেলে আঙুরের একটা বীজ ভালোভাবে মাটিতে পুঁতে দিল, নরম মাটি চারপাশে রেখে দিল। তারপর বলল, 'কত ভালো তুমি, তোমার ফলের রস খেয়ে আর আমার ক্লান্তি নেই। তোমার বীজ বড় হোক, তার ডালপালা ফুলে-ফলে ভরে উঠুক। কিন্তু আমায় যে আরও অনেক দুর যেতে হবে বন্ধু।'

আঙুর বীজ বলল, 'তুমি যাও, তোমার পথের বাধা দূর হোক। বিপদ না আসুক।'

এগিয়ে চলল ছেলে। চলছে, চলছে,......হঠাৎ বনের পথে দেখতে পেল একটা ঈগল পাখি আহত হয়ে পড়ে রয়েছে। ছেলের দুষ্টু বুদ্ধি জেগে উঠল। তির-ধনুক নিয়ে তাকে মারতে গেল। করুণ গলায় ঈগল বলল, 'ওগো সুন্দর ছেলে, তির নামাও, আমাকে মেরো না। আমাকে একটু জল দাও, আমাকে সুস্থ করে তোল। আমি তোমার অনেক উপকার করব। আমাকে মেরো না, দোহাই তোমার। তুমি যখন কোন বিপদে পড়বে, শুধু একবার আমার কথা মনে আনবে। আমি তক্ষুনি তোমার কাছে উড়ে যাব। তোমার বিপদে পাশে থাকব।'

তির-ধনুক পিঠে রেখে দিল ছেলে। জল এনে ঈগলকে সুস্থ করে তুলল। তার ভাঙা ডানায় হাত বুলিয়ে দিল, গাছের রস লাগিয়ে দিল। গাছের ফল এনে তাকে খেতে দিল। আবার এগিয়ে চলল সামনে।

একটু পরেই সে পৌঁছে গেল সমুদ্রের কাছে। বালির ওপর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে সে দেখতে পেল, তার সামনে সাদা মতন কি যেন চক্‌চক করছে। আরও একটু এগিয়ে গেল। অবাক হয়ে গেল। ঢেউ পেছনে সরে গেল, মাছেদের রাজা বালির ওপর ছট্‌পট করছে। সূর্যের তাপে বালি গরম হয়ে রয়েছে। মাছেদের রাজা চব্বিশ হাত লম্বা আর

মানুষের মতো উঁচু। তার পাখ্‌না রুপোলি রঙের আর আঁশ সোনালি রঙের। কোন মানুষ এমন মাছ আগে দেখেনি।

ছেলে মাছের পাশে গিয়ে বলল, 'এমন সুন্দর দেখতে যে মাছ তার স্বাদও নিশ্চয়ই খুব ভালো হবে। খিদেও পেয়েছে.....'

সোনালি মাছ বলে উঠল, 'ওগো সুন্দর ছেলে, তুমি আমাকে খেয়ো না। তুমি আমাকে মেরো না। সমুদ্রের গভীর জলে তুমি আমায় ভাসিয়ে দাও। যখনই তুমি বিপদে পড়বে, শুধু আমার কথা মনে করবে, আমি বিপদে তোমার পাশে থাকব।'

মস্ত বড় একটা লাঠি কুড়িয়ে আনল সে। তারপর আস্তে আস্তে গড়িয়ে মাছেদের রাজাকে সমুদ্রের জলে ভাসিয়ে দিল।

আবার রওনা দিল ছেলে। হঠাৎ দেখতে পেল, একটা শেয়াল প্রাণের ভয়ে ছুটছে আর তার পেছনে অনেকগুলো বুনো কুকুর। শেয়ালের দেহ ক্ষতবিক্ষত, জিভ বের করে সে হাঁপাতে হাঁপাতে ছুটছে। দুষ্টু বুদ্ধি জেগে উঠল ছেলের মনে। তির-ধনুক ঠিক করছে এমন সময় শেয়াল বলে উঠল, 'ওগো সুন্দর ছেলে, আমাকে মেরো না, দোহাই তোমার। আমাকে বাঁচাও, বুনো কুকুরদের হাত থেকে বাঁচাও। আমার আঘাত ভালো করে দাও। একদিন হয়তো তোমার বিপদে কাজে লাগতেও পারি।'

সর্দারের ছেলে বুনো কুকুরগুলোকে তাড়িয়ে দিল, শেয়ালের গায়ে গাছের ঠান্ডা রস লাগিয়ে দিল। বেশ কয়েকদিন ধরে তার কাছে থাকল। শেয়াল ভালো হয়ে উঠল। বিদায় নেবার সময় শেয়াল বলল, 'তুমি খুব ভালো ছেলে। তোমার ভালো হোক। যখনই তুমি বিপদে পড়বে, শুধু আমার কথা মনে করবে, আমি বিপদে তোমার পাশে থাকব।'

আবার পথে নামল ছেলে। যতই এগোয় সোনার সুতোর বল ততই এগিয়ে যায়। কিন্তু বলটি ছোট হয়ে আসছে, অনেক সোনালি সুতো পেছনে রয়ে গিয়েছে। হঠাৎ ছেলে দেখতে পেল একটা গাছ। তার দুই ডালের মাঝখানে মাকড়সার জাল। সেই জালে আটকে পড়েছে একটা মশা। সে তাকে দেখেই কেঁদে উঠল, 'ওগো সুন্দর ছেলে। আমাকে বাঁচাও, যেমন করে পারি তোমাকে সাহায্য করব। আমি জানি তুমি কোথায় চলেছ। অমর রাজ্যে। আমাকে যদি বাঁচাও, তোমাকে কিছু ভাবতে হবে না।'

এই কথা শুনে ছেলে থামল, মাকড়সার জালের কাছে গেল। হাত বাড়িয়ে জালের মধ্যে থেকে মশাকে তুলে আনল। তখনও মশা ছট্‌ফট করছে। মশা বলল, 'ছেলে, তোমার মন খুব ভালো, বড় দয়া তোমার। যখন কোন বিপদে পড়বে, আমার কথা মনে করবে, আমি তোমার পাশে থাকব। এগিয়ে যাও, কোন বিপদ হবে না। তোমাকে আর বেশি দূর যেতে হবে না, সামনেই তুমি একটা প্রাসাদ দেখতে পাবে। সোজা ঢুকে পড়বে, দেখবে রাজা বসে আছে সিংহাসনে। তার কাছে গিয়েই বলবে, আপনার ছোট মেয়ের সঙ্গে আমার বিয়ে দিন। বিয়ে না হলে তুমি অমর রাজ্য শাসন করতে পারবে না। এগিয়ে যাও।'

সর্দারের ছেলে এগিয়ে চলল। সোনালি সুতোর বল ছোট হচ্ছে, আরও ছোট হচ্ছে। আপেলের মতো হয়ে গেল, বাদামের মতো হয়ে গেল, মটরশুঁটির মতো হয়ে গেল,—মিলিয়ে গেল এক প্রাসাদের দরজার সামনে।

অপূর্ব প্রাসাদ। প্রাসাদের সিংহদ্বার বন্ধ। ছেলে দ্বারে আঘাত করল। রাজা সেই আঘাত শুনে একজন সৈন্যকে পাঠালেন। সৈন্য দ্বার খুলে বলল, 'কে তুমি, কোথা থেকে এসেছ, কেন এসেছ, কোথায় তুমি যেতে চাও?'

সব প্রশ্নের উত্তর দিল ছেলে। তার উত্তর শুনে রাজা তাকে তার সামনে আনতে বললেন। ছেলে মাথা উঁচু করে বলল, 'মহারাজ, আপনাকে প্রণাম জানাই। আমি এখানে এসেছি আপনার ছোট মেয়েকে বিয়ে করতে। আপনি কি রাজি আছেন? আপনার ছোট মেয়ে হবে আমার বউ।'

রাজা হেসে বললেন, 'কেন রাজি থাকব না? আমার ছোট মেয়েকে তোমার হাতেই দেব। কিন্তু একটা কথা। তোমাকে লুকিয়ে থাকতে হবে, যদি কেউ খুঁজে না পায় তবেই মেয়ের বিয়ে দেব। তোমার সঙ্গে তখন ধুমধাম করে ওর বিয়ে দেব, তুমি চিরকাল থাকবে আমার কাছে। কেননা, আর যাওয়ার পথ নেই। এই প্রাসাদের এই সিংহদ্বার থেকে শুরু হয়েছে অমর রাজ্য।'

অমর রাজ্যের কথা শুনেই ছেলের চোখমুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। আবার সঙ্গে সঙ্গে মুখে মেঘও নেমে এল। কেননা, সে কেমনভাবে লুকোবে তা জানে না! কেউ দেখবে না এমনভাবে লুকোতে হবে। সে তো এসব জানে না! সে ভাবছে, ভাবছে—হঠাৎ সেই আহত ঈগল পাখির কথা মনে পড়ল। চোখের পলক পড়তে না পড়তেই ছেলে দেখল তার পাশে ঈগল দাঁড়িয়ে রয়েছে।

'এত মন খারাপ কেন বন্ধু? কি হয়েছে?'

'তুমি এসে গিয়েছ ঈগল? বড় বিপদে পড়েছি। এমন বিপদ আগে বুঝিনি....।' ছেলে খুলে বলল বিপদের কথা।

'এই ব্যাপার। কিছু ভাবতে হবে না।' ঈগল আশ্বাস দিল।

ঈগল ছেলেকে তুলে নিল। উঁচু, উঁচু আকাশে লুকিয়ে ফেলল তাকে। নীচে নয়টা মেঘের স্তর। কেউ দেখতে পাবে না ছেলেকে। সেই রাজার ছিল তিন মেয়ে। তিনজনকে একই রকম দেখতে। তাদের মুখের গড়ন এক, মাথায় চুল এক, পোশাক এক, জুতোও একই রকমের। রাজা বড় মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে এলেন, হাতে তার খোলা তরবারি। বড় মেয়েকে বললেন, 'ছেলেকে খুঁজে বের করো। যদি না পাও, এক আঘাতে তোমার মাথা মাটিতে লুটিয়ে পড়বে।'

বড় মেয়ে বাগানে গেল, এক সাজিভর্তি ফুল তুলল। তারপরে বাবার সঙ্গে ছেলেকে খুঁজতে গেল। মেয়ে পৃথিবীর চারদিকে তাকিয়ে দেখল, ছেলেকে দেখতে পেল না। মেয়ে সাগরের চারদিকে দেখল, ছেলেকে দেখতে পেল না। মেয়ে আকাশের দিকে চাইল, ছেলেকে দেখতে পেল। বলল, 'ছেলে, মেঘের আড়াল থেকে বেরিয়ে এসো। তোমায় দেখে ফেলেছি।'

চোখের পলকে ঈগল ছেলেকে নিয়ে মেঘের আড়াল থেকে মাটিতে নেমে এল। তার দিকে তাকিয়ে রাজা বললেন, 'ছেলে, তোমার মাথা কি লুটিয়ে দেব? তরবরি খোলা রয়েছে।'

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বড় মেয়ে বলে উঠল, 'বাবা, প্রথমবারে ও হেরে গিয়েছে, ওকে ক্ষমা করো।'

রাজা ক্ষমা করলেন, 'শোনো, আমার মেজ মেয়ে যদি তোমায় খুঁজে পায়, তোমার মাথা কিন্তু দেহের ওপরে থাকবে না।'

রাজা প্রাসাদে চলে গেলেন মেজ মেয়েকে আনতে। আহা! বেচারি ছেলে, মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ল। ভাবতে লাগল। কেমন করে এ বিপদ কাটবে ? কোন পথ তো জানা নেই। হঠাৎ তার মনে পড়ল মাছেদের রাজার কথা। হঠাৎ সমুদ্রের গর্জন শুনতে পেল, ঢেউ এসে লাগল প্রাসাদের দেয়ালে। আর ঢেউয়ের মধ্যে থেকে উঠে এল মাছেদের রাজা। 'এত মন খারাপ কেন ? কি হয়েছে বন্ধু ?'

ছেলে সব বলল। এবার ঠিকমতো লুকোতে না পারলে রাজা তার মাথা কেটে দেবেন। বড় বিপদ তার।

'কোন চিন্তা নেই। সমুদ্রের অতল গভীরে অনেক লুকোবার জায়গা আছে। আমি জানি। আমি তোমায় নিয়ে যাব।' মাছেদের রাজা ছেলেকে মুখের ভেতর ঢুকিয়ে নিল, তারপরে গভীর সমুদ্রে মিলিয়ে গেল।

রাজা মেজ মেয়েকে নিয়ে প্রাসাদের বাইরে এলেন। খোলা তরবারির দিকে চেয়ে বললেন, 'ছেলেকে খুঁজে বের করো। যদি না পার, মাথা লুটিয়ে পড়বে মাটিতে।'

মেজ মেয়ে বাগানে গেল, এক সাজিভর্তি ফুল তুলে এনে বাবার সঙ্গো চলল। মেয়ে পৃথিবীর চারদিকে তাকিয়ে দেখল, ছেলেকে খুঁজে পেল না। মেয়ে আকাশের চারদিকে দেখল, সূর্যের পেছনে চাঁদের পেছনে, ছেলেকে খুঁজে পেল না। শেষকালে সমুদ্রের নীচে চোখ ফেরাল, দেখতে পেল ছেলেকে, 'বেরিয়ে এসো সমুদ্রের গভীর তল থেকে, আমি তোমায় দেখে ফেলেছি।'

মাছেদের রাজা ছেলেকে চোখের পলকে রাজার সামনে নিয়ে এল। রাজা বললেন, 'এবার তাহলে মাথা নিচু করো।'

মেজ মেয়ে ছুটে গিয়ে রাজার হাত ধরে বলল, 'বাবা, দ্বিতীয়বারেও হেরে গিয়েছে, ওকে এবারও ক্ষমা করো।'

'বেশ তোমার কথাই রাখলাম। দ্বিতীয়বারের জন্য ক্ষমা করলাম। ছেলে, আমার মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে তোমায় ক্ষমা করলাম। কিন্তু তৃতীয়বারেও যদি খুঁজে পাই, তাহলে সবুজ ঘাসে তোমার আর পা পড়বে না। সেই মুহূর্তেই..... ।'

রাজা প্রাসাদের মধ্যে চলে গেলেন। ছেলে মাথায় হাত দিয়ে সবুজ ঘাসের ওপরে বসে পড়ল। তার বুক কাঁপছে, চোখ ঝাপসা হয়ে উঠেছে। এখন সে কি করবে ? রাজার তরবরির তার দেহের কাছে আসবে, তার পর সব শেষ। কোথায় পড়ে রইল তার বাবা-মা, কোথায় তার অমর রাজ্য। অনেক পুরনো কথা মনে পড়ছে।

হঠাৎ আহত শেয়ালের কথা মনে পড়ল। তাকিয়ে দেখে, পাশে বসে রয়েছে সেই শেয়াল। 'এত মন খারাপ কেন ? কি বিপদ হয়েছে তোমার বন্ধু ?'

'শোনো বন্ধু আমার বিপদের কথা।'.........

'শান্ত হও। মন খারাপ করো না। এর জন্য অত ভাবতে হবে না। আমার সঙ্গো এস, আমি জানি কি করতে হবে।'

শেয়াল এগিয়ে চলল। পেছনে পেছনে যাচ্ছে সর্দারের ছেলে। মুখচোখে কালো মেঘ। শেয়াল ফুলের বাগানে ঢুকল। ছেলেও। শেয়াল হঠাৎ ঘুরে দাঁড়াল, লেজ দিয়ে ছেলের

দেহ স্পর্শ করল। সঙ্গো সঙ্গো ছেলে সুন্দর ফুল হয়ে গেল। বাহারি রঙিন ফুলগাছের মধ্যে সে মিশে থাকল। সবচেয়ে সুন্দর ফুল হয়ে রইল।

রাজার ছোট মেয়ে ফুলের বাগানে ঢুকল। সাজিতে একটি মাত্র ফুল তুলল। ওই ফুলটাই তার সব চেয়ে ভালো লেগেছে। এত সুন্দর ফুল বাগানে আর দুটি নেই। সাজি হাতে বেরিয়ে এল বাগান থেকে। বাবার কাছে। বাবা খোলা তরবারির দিকে চেয়ে বললেন, 'খুঁজে বের করো সেই ছেলেকে, নইলে তরবারির এক আঘাতে মাথা লুটিয়ে পড়বে মাটিতে।'

ছোট রাজকুমারী পৃথিবীর চারদিকে দেখল, ছেলেকে খুঁজে পেল না। মেয়ে সমুদ্রের চারদিকে দেখল, ছেলেকে খুঁজে পেল না। মেয়ে আকাশের চারিদিকে দেখল,—তবু খুঁজে পেল না ছেলেকে। মেয়ে আবার পৃথিবীর গভীরে, সমুদ্রের তলায় ওপাশের আকাশে বারবার চেয়ে দেখল, কিন্তু খুঁজে পেল না সেই লুকনো ছেলেকে।

রাজা বললেন, 'ভালোভাবে খুঁজে দেখো। তুমিই তাকে লুকিয়ে রেখেছ।'

গান ঝরে পড়ল গলায়। বিষাদের গান, 'বাবা, আমি চারদিকে খুব ভালোভাবে দেখেছি, খুঁজেছি। কিন্তু কোথাও তাকে দেখতে পাচ্ছি না। আমি তার ছায়া দেখেছি, কিন্তু তাকে দেখতে পাচ্ছি না।'

রাজার আর কিছু করার নেই। তিনি বলে উঠলেন, 'সাবাস সাহসী ছেলে, তুমি এবার বেরিয়ে এসো। আমার মেয়ে তোমায় খুঁজে পায়নি।'

দুষ্টু ছেলে ছোট রাজকুমারীর ফুলের সাজি থেকে লাফিয়ে পড়ে বলে উঠল, 'মহারাজ, এই তো আমি এখানে, আপনার সামনে।'

'সত্যি তুমি বেজায় সাহসী। ছোট ছেলে, তোমার কাছে হেরে গিয়েছি।'

রাজা আনন্দে লাফিয়ে উঠলেন। তার সব বাজনাদারদের ডাকলেন। ছেলেকে নিয়ে গেলেন প্রাসাদের মধ্যে। যদি ছেলে ঠিকমতো ছোট রাজকুমারীকে চিনতে পারে, তবে এক্ষুনি হবে তাদের বিয়ে। আর যদি চিনতে না পারে, তবে ছেলের মাথা লুটিয়ে পড়বে প্রাসাদের মেঝেতে।

ছেলে ভেবেছিল, তার সব বিপদ কেটে গিয়েছে। কিন্তু নতুন বিপদ হল। অনেকক্ষণ কাঁদল। তার চোখদুটো লাল হয়ে উঠল। 'এইবার আমার জীবনের শেষ, সব শেষ। এবার রাজা ঠিক আমার মাথা কেটে ফেলবেন। রক্ষা নেই।'

হঠাৎ তার সেই মশার কথা মনে পড়ল। দেখতে পেল, মশা তার কানের কাছে উড়ে এসে বসেছে। 'বন্ধু, এত মেঘ কেন তোমার মুখে ? এমন করে কাঁদছ কেন ? আমি তো রয়েছি।'

'বন্ধু, তুমি একটা ছোট্ট মশা। কি করবে তুমি ! আমি ভেবেছিলাম, আমাব সব বিপদ কেটে গিয়েছে। কিন্তু রাজা এবার সত্যিই আমার মাথা নামিয়ে দেবে। কেমন করে বলব, কোনজন রাজার ছোট মেয়ে। তিনজনেই যে একই রকম দেখতে।'

'কিচ্ছু ভেবো না বন্ধু। আমি সব জানি। কে বড়, কে মেজো আর কে ছোট মেয়ে আমি বুঝতে পারি। আমি যে ওদের সঙ্গোই বেড়ে উঠেছি। এদের চিনব না ? রাজা যখন তিন রাজকুমারীকে নিয়ে আসবে, আমি ছোট মেয়ের নাকের ওপরে উড়ে গিয়ে বসব। তাহলেই তুমি বুঝবে....।'

রাজার পেছনে তিন মেয়ে এগিয়ে এল। পাশাপাশি দাঁড়াল। এক চোখ, এক মুখ, মাথায় এক, পরে রয়েছে একই পোশাক। কেউ বলতে পারবে না, কে বড়, কে মেজো, কে ছোট। অসম্ভব। সবচেয়ে কঠিন পরীক্ষা। ছেলের কানের ওপর থেকে মশা উড়ে গেল। ছোট মেয়ে হাত তুলে নাকের ওপরে বসা মশাকে তাড়াতে গেল। ছেলে এগিয়ে গিয়ে ছোট রাজকুমারীর হাত নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে বলল, 'মহারাজ, এই মেয়েই ছোট রাজকুমারী।'

রাজা অবাক হলেন। হেসে বললেন, 'সাবাস ছোট্ট ছেলে, তুমি ঠিক চিনতে পেরেছ। হ্যাঁ, ওই আমার ছোট মেয়ে।'

ছোট মেয়ে সকাল বেলার সূর্যের মতো সুন্দরী, ফুটন্ত তুলসী ফুলের মতো মিষ্টি।

রাজা ছেলেকে বরের সাজে সবার সামনে নিয়ে এলেন, পাশে রয়েছে ছোট রাজকুমারী। রাজা ছেলের মাথায় হাত রেখে বললেন, 'তোমায় আমার ছোট মেয়েকে তুলে দিলাম। সেই সঙ্গো দিলাম আমার গোটা রাজ্য। আজ থেকে তুমি আমাদের সঙ্গো থাকবে। মৃত্যু কি, তা তুমি কোনদিন জানতে পারবে না, তুমি অমর হয়ে চিরকাল বেঁচে রইবে। তোমার রাজ্যে তুমি ঘুরে বেড়াও। এ রাজ্য আজ থেকে তোমার। কিন্তু একটা কথা মনে রাখবে, প্রাসাদের যে দ্বার দিয়ে তুমি একদিন এখানে ঢুকেছিলে, ভুলেও কখনও তার বাইরে যাবে না। তাহলে সর্বনাশ নেমে আসবে। ভীষণ বিপদ।'

ধুমধাম করে দুজনের বিয়ে হয়ে গেল। ছেলে প্রাসাদের চৌহদ্দির মধ্যে ঘুরে বেড়ায়। সে সোনালি বাগানে যায়, সোনালি গাছে গাছে ফল ধরেছে, ফলের ভারে গাছ মাটিতে নুয়ে পড়েছে। প্রাসাদের ঘরগুলো সোনায় মোড়া, রুপোয় মোড়া, তার মধ্যে অমূল্য সব উজ্জ্বল পাথর। প্রাসাদের কুয়োগুলো শ্বেতপাথরের, মধু আর দুধে ভর্তি নদীগুলো। ডালে ডালে গান-গাওয়া পাখি, পথগুলো সবুজ ঘাসে ঢাকা, ছোট ছোট লতানো ফুলে সাজানো। তার ওপর সকালের শিশির জমে, মনে হয় মুক্তো ঝরে আছে। এমন প্রাসাদ কেউ দেখেনি। সে রাজ্যে সূর্য ওঠে না, সূর্য ডোবে না। সূর্য সবসময় থাকে প্রাসাদের ওপরে। তার মিষ্টি নরম আলো প্রাসাদকে সবসময় উজ্জ্বল করে রাখে।

ছেলে যেন বাস করছে স্বর্গের উদ্যানে। একদিন ছেলে গিয়েছে শিকার করতে। হাতে তির-ধনুক। প্রাসাদের প্রাচীরের দিকে তির ছুড়ছে। প্রাচীর টপকে তির ওধারে চলে গেল। তিরটা কোথায় পড়েছে? সে প্রাচীরের ওধারে তাকিয়ে দেখল। নীচে বেশ দূরে। তিরটা আনা দরকার। সে সিংহদ্বার খুলে ফেলল। ভুলে গেল রাজার নিষেধের কথা। ঘরের বাইরে এসেই সে দেখতে পেল, সেখানে পড়ে রয়েছে সোনালি সুতোর ছোট্ট বল। মনে পড়ল বাড়ির কথা, বাবা-মায়ের কথা। এতদিন সব ভুলে ছিল। বাবা-মায়ের কাছে যাবার জন্য মনে কেমন করে উঠল। বুকের মধ্যে বেদনা। সে একটু চিন্তা করল। তারপর ঠিক করে ফেলল, 'সব কিছু পেছনে ফেলে যাব, যাব আমার বাবা-মায়ের কাছে। কেমনভাবে আমার বাবা-মা রয়েছে তা দেখতে যাব। যাবই। আহা! কতদিন বাবা-মাকে দেখিনি।'

সর্দারের সাহসী ছেলে রাজার কথা বিশ্বাস করতে পারেনি। তাই কি কখনও হয়? বাবা-মা মরে গিয়েছে? তা কেমন করে হবে? এই তো সেদিন এলাম তাদের ছেড়ে। না,

যেতেই হবে। ছেলে তৈরি হয়ে নিল। সে তার অস্ত্রগুলো সঙ্গে নিল। রাজাকে প্রণাম জানাল। বউয়ের হাত ধরে একটু তাকিয়ে রইল, বেরিয়ে পড়ল প্রাসাদ থেকে।

রাজা পাথরের মতো দাঁড়িয়ে রইলেন, বউয়ের বুক ভিজে গেল।

সোনালি সুতোর পথ ধরে ছেলে পেছন-পানে চলল। যে পথ দিয়ে সে অমর রাজ্যে পৌঁছে গিয়েছিল, সেই পথ ধরে চলল। আবার অবিরাম চলা।

সে এল আঙুরের ক্ষেতে। ছোট আঙুরের গাছ ছড়িয়ে পড়েছে। পাহাড় পেরিয়ে গিয়েছে, কোথায় তার শেষ কেউ জানে না। আঙুর গাছ তাকে চিনতে পেরে বলল, 'ওগো সাহসী ছেলে, আমার ছায়ায় কিছুক্ষণ বিশ্রাম করো। তুমি বড় ক্লান্ত।'

'আঙুর গাছ, তোমার কথা রাখতে পারছি না। কিছু মনে করো না। আমার সময় নেই। তাড়াতাড়ি বাড়ি পৌঁছতে হবে।'

এগিয়ে গেল ছেলে। পৌঁছল ওক গাছের নীচে। ওক গাছ তাকে চিনতে পারল, 'সাহসী ছেলে। অল্পক্ষণ জিরিয়ে নাও আমার ছায়ায়। তুমি আমার অনেক উপকার করেছিলে। সেদিনের কথা আমি ভুলিনি। যে ছোট্ট বীজকে তুমি সেদিন বাঁচিয়েছিলে, সেই আমি আজ এত বড় হয়েছি। অনেক কাল কেটে গিয়েছে।'

সর্দারের ছেলে অবাক হয়ে চেয়ে রইল ওক গাছের দিকে। সেই ছোট্ট বীজ আজ এত বড় হয়েছে? এই তো সেদিন আমার দেহের চাপে ওর অঙ্কুর বেরুল। এত সময় পেরিয়ে গিয়েছে। বিশ্বাস করতে পারছে না সে। ভাবতে ভাবতে ছেলে এগিয়ে গেল।

শেষকালে পৌঁছল সেই জায়গায় যেখানে সে সোনালি সুতোর বল পেয়েছিল, সেইখানেই সে সেই সাপটাকে দেখতে পেল। একি? সাপটা বুড়ো অথর্ব হয়ে পড়েছে। তার বিশাল দেহ শুকিয়ে ছোট হয়ে গিয়েছে। তবু সে চিনতে পারল ছেলেকে। খুব খুশি হল। মাথা নেড়ে বলল, 'আমি বুড়ো হয়েছি, তবুও তোমায় গিলতে গিয়েছিলাম। যেই তুমি অভিবাদন জানালে, তক্ষুনি তোমায় চিনতে পারলাম। ভালো আছো তো?'

প্রাসাদে ঢুকল ছেলে। বুড়ো বসে রয়েছে। তার দাড়ি বরফের মতো সাদা, বিরাট লম্বা। শোবার সময় দাড়িকে ভাগ করে এক গুচ্ছের ওপরে সে শুয়ে পড়ে, অন্য গুচ্ছ গায়ে চাপা দেয়। তাহলে অনেক অনেক বছর পেরিয়ে গিয়েছে। ছেলে বুড়োকে দেখে ভাবছে। বুড়ো কোঁচকানো মুখে চোখের ভারী পাতা তুলে বলল, 'তোমায় ঠিক চিনেছি ছেলে। যদি আবার এপথ দিয়ে কখনও যাও, যেমন করে পার আমার সঙ্গে দেখা করো, ভুলো না।'

বুড়োর কাছে বিদায় নিয়ে ছেলে আরও এগিয়ে গেল। তার গাঁয়ের বাড়ি আর বেশি দূর নয়। সে পৌঁছে গেল সন্ন্যাসীর কুঁড়েঘরের কাছে। কিন্তু কুঁড়েঘর নেই, সন্ন্যাসী নেই। ঘন জঙ্গালে ভরে উঠেছে সেই জায়গা। এত ঘন জঙ্গাল যে তার ভয় হল। এখুনি হয়তো নেকড়ে বেরিয়ে তাকে ছিনভিন্ন করে দেবে।

কুঁড়েঘরের জায়গায় এত ঘন জঙ্গাল দেখে এবার সত্যিই ছেলের বুক কেঁপে উঠল। মুখচোখে কালো মেঘ। সত্যিই তাহলে বহুকাল কেটে গিয়েছে। এত ঘন জঙ্গাল হতে তো অনেক দিন সময় লাগে। তাহলে বাবা-মা বেঁচে নেই? সে ঠিক করে ফেলল, না ফিরেই যাই বউয়ের কাছে।

তবু ফিরে যেতে পারল না। বাবা-মা তাকে টানছে, তার গ্রাম তাকে টানছে। সেই বুড়ির কথা মনে পড়ল। সে এগিয়ে চলল। শেষকালে নিজের ছেড়ে আসা গ্রামে পৌঁছল। সে এদিকে-ওদিকে চাইল, কাউকে দেখতে পেল না। এক বিশাল ধ্বংসস্তূপ দেখতে পেল। অনুমানে বুঝল, এই তার সর্দার বাবার মাটির প্রাসাদ।

ফোকরের মধ্যে দিয়ে সে একটা কুঁড়েঘর দেখতে পেল। তার মধ্যে বসে রয়েছে এক বুড়ো, তার বয়স তিনশো বছর। বুড়ো, বলল, 'হ্যাঁ, আমি আমার ঠাকুরদার কাছে শুনেছি, এখানে এক সর্দারের প্রাসাদ ছিল, আমি সে সর্দারকে চোখে দেখিনি। শুনেছিলাম, তার একটা দুষ্টু ছেলে ছিল। সে বেরিয়ে পড়েছিল বিশাল পৃথিবীতে, সে যেতে চেয়েছিল অমর রাজ্যে, যেখানে মৃত্যু নেই। যেখানে মানুষের বয়েস বাড়ে না, যেখানে অনন্ত সুখ। আমি শুনেছি এসব কথা। তারপরে গাঁয়ে মহামারী লাগল। সব মানুষ মরে গেল। সব পশুপাখি। এসব আমার শোনা কথা।'

সর্দারের ছেলে পাথরের মতো দাঁড়িয়ে রইল। অমর রাজ্যের রাজার কথা মনে পড়ল। তাহলে সব কথাই সত্যি। চোখের জল মুছে ছেলে ফিরে চলল। অনেক পথ পেরিয়ে সে অমর রাজ্যের সিংহদ্বারে পৌঁছল।

অবাক হল সে। ঘরের সামনে মাটির পাহাড় জমেছে। পা দিয়ে লাথি মেরে সে মাটি সরাতে লাগল। পাগলের মতো লাথি মারছে, মাটি এধার-ওধার ছিট্‌কে পড়ছে। বেরিয়ে পড়ছে দরজার সামনের চৌকাঠ। হঠাৎ মাটির ফাঁক থেকে মৃত্যু বেরিয়ে এল, তার সারা দেহ কালো পোশাকে ঢাকা। মৃত্যু খুব রোগা, দেহ হাড় জির্‌জিরে। তার কাঁধে একটা কাস্তে।

ছেলে মৃত্যুর দিকে তাকিয়ে ভাবল, 'তাহলে আমার সব শেষ হল আজ। চরম মুহূর্ত। মৃত্যু সামনে দাঁড়িয়ে।'

মৃত্যু খ্যান্‌খেনে গলায় বলল, 'তাহলে, শেষ পর্যন্ত তুমি এলে। কতকাল তোমার জন্য এখানে বসে রয়েছি।'

এক মুহূর্ত চিন্তা করে নিল ছেলে। মৃত্যু তার দিকে চেয়ে হাসছে। হঠাৎ বিদ্যুৎ-চমকের মতো ঘুরে দাঁড়াল ছেলে। প্রচণ্ড বেগে হাওয়ার গতিতে দৌড় দিল উলটো মুখে।

পৌঁছে গেল বুড়ো রাজার প্রাসাদে। আর দৌড়াতে পারছে না। সে সাপকে অভিবাদন জানাল, খুব খুশি হয়ে সাপ মাথা সরিয়ে নিল, ছেলে প্রাসাদে ঢুকে পড়ল। ক্লান্ত দেহে হাঁপাতে হাঁপাতে ছেলে বলল, 'ওগো বুড়ো মানুষ, আমাকে বাঁচাও। আমাকে বিপদের মুখে ঠেলে দিয়ো না। আমাকে বলো কি করতে হবে। মৃত্যু আমাকে ধাওয়া করছে।'

বুড়ো তখুনি তাকে পশমের একটা কটিবন্ধ দিল। বলল, 'এই নাও, মৃত্যুকে এই পশমের কটিবন্ধ দাও। তাকে বলো, যতক্ষণ সুতো থাকবে ততক্ষণ সে যেন এটা কোমরে জড়াতে থাকে। এই পশমের সুতো শেষ হলেই সে শুধু তোমার কাছে আসতে পারবে।'

মৃত্যু এসে পড়েছে সাপের সামনে। কাস্তে তুলে মৃত্যু সাপকে টুকরো করে কাটতে গেল। বিরাট হাঁ করল সাপ, তার জিভ আগুনের মতো লাল। আগুন বেরুতে লাগল সাপের মুখ থেকে। মৃত্যু কাছে আসতে পারছে না। সাপ চেঁচিয়ে বলছে, 'নিষ্ঠুর মৃত্যু, তুমি থামো। এগিয়ো না। কেন মিছিমিছি মানুষের পেছনে ধাওয়া করো?'

'সে ভাবনা তোমার নয়। ওসব তুমি বুঝবে না। আমাকে প্রাসাদে ঢুকতে দাও।' মৃত্যু কাস্তে চালচ্ছে।

'আমাকে তুমি অভিবাদন জানাও নি। তোমায় এক পা এগোতে দেব না। বাঁচতে চাও তো পালাও। কাছে এলে পুড়ে মরবে।'

সাপের মূর্তি দেখে, আগুনের হল্‌কায় ভয় পেয়ে মৃত্যু কিছু দূরে সরে গিয়ে চেঁচাতে লাগল, 'প্রাসাদের বুড়ো মানুষ, সর্দারের ছেলেকে বের করে দাও। নইলে একটা একটা করে তোমার দাড়ি উপড়ে ফেলব।'

এমন সময় পশমের কটিবন্ধ হাতে নিয়ে সর্দারের ছেলে প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে এল, 'মৃত্যু, এই কটিবন্ধ নাও, এটাকে কোমরে জড়াও, যখন পশমের সব সুতো জড়ানো শেষ হবে, তখন আমার কাছে এসো।'

মৃত্যু কটিবন্ধ নিয়ে কোমরে জড়াতে লাগল॥ দৌড় দিল ছেলে, তিরের বেগে। পৌঁছে গেল ওক গাছের নীচে। ওক গাছ বলল, 'আবার এসেছ তুমি, খুব ভালো লাগছে আমার। আমার ছায়ায় একটু জিরিয়ে নাও।'

'বন্ধু, সে সময় আমার নেই। মৃত্যু আমার পেছনে ধাওয়া করেছে।'

ওক গাছ কেঁপে উঠল, দুঃখ পেল। বলল, 'মৃত্যু যখন তোমার কাছে আসবে, তাকে এই লোহার ছড়িটা দেবে। বলবে, এই ছড়ি নিয়ে তুমি ঘুরে বেড়াও, নীচ থেকে এর হাতল পর্যন্ত যখন ক্ষয়ে যাবে তখন আসবে আমার কাছে।'

ওক গাছকে বিদায় জানিয়ে ছেলে দৌড় শুরু করল। মৃত্যু তার পিছনে। পথ ছেড়ে দিয়ে ছেলে মাঠঘাট পেরিয়ে, নদী পেরিয়ে ছুটছে। কোন জ্ঞান নেই তার। হঠাৎ মৃত্যু একদিন তার সামনে এসে দাঁড়াল। বলল, 'অনেক ছুটেছ সাহসী ছেলে, এবার থামো। তোমার দিন শেষ।'

'বেশ, দিন যদি শেষ হয়েই থাকে ভয় পাই না। কিন্তু তার আগে এই লোহার ছড়িটা নাও, এই ছড়ি নিয়ে ঘুরে বেড়াও। নীচ থেকে ক্ষয়ে ক্ষয়ে যখন হাতল পর্যন্ত ক্ষয়ে যাবে তখন এসো আমার কাছে।'

মৃত্যু লোহার ছড়ি নিয়ে চলে গেল। মাটিতে ঠুকে ঠুকে ঘুরে বেড়াচ্ছে, বেশি বেশি করে ঘুরছে, যাতে ছড়ি তাড়াতাড়ি ক্ষয়ে যায়।

মুক্ত হয়ে ছেলে আবার দৌড় দিল। তার যেন ডানা বেরিয়েছে, সে যেন হাওয়ায় ভেসে দৌড়চ্ছে। পৌঁছে গেল আঙুর খেতের কাছে। দূর থেকে তাকে চিনতে পেরেই আঙুর গাছ বলে উঠল, 'সাবাস বন্ধু, আবার দেখা হল। অনেক আঙুর পেকেছে। ছায়ায় বসে বিশ্রাম করো, আঙুর খাও, ক্লান্তি দূর করো।'

'খুব ইচ্ছে করছে তোমার ছায়ায় বসে বিশ্রাম করি। কিন্তু উপায় নেই। অনেক পথ চলতে হবে, আমার চলার পথ আঁকাবাঁকা হয়ে উঠছে। সময় কোথায় বন্ধু। মৃত্যু আমার পেছনে ধাওয়া করেছে।'

'তাই বুঝি. তা অত ভাবনা কিসের? দেখি তোমার জন্য কি করতে পারি।'

'বন্ধু, আর কিছু চাই না, শুধু তুমি আমায় বলে দাও কেমন করে নিষ্ঠুর মৃত্যুকে ঠেকাব। কি করলে মৃত্যু আমায় স্পর্শ করতে পারবে না? এটা বলে দাও।'

'যদি সত্যি সত্যি মৃত্যু তোমার এত কাছে এসে থাকে, তুমি তাকে তোমার তরবারি দিয়ে বলবে, এই তরবারি যখন মরচে পড়ে পড়ে ক্ষয়ে নিঃশেষ হয়ে যাবে, তখন তুমি আসবে আমার কাছে।'

'তুমি ভালো থেকো আঙুর গাছ, আমি তাই করব। মৃত্যু এলে তার পায়ের ওপরে আমার তরবারি ফেলে দেব। বিদায় বন্ধু।'

আবার মাঠঘাট পেরিয়ে ছেলে ছুটে চলল। চলছে, চলছে। হঠাৎ মৃত্যু একদিন তার সামনে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল। বলল, 'এবার থামো সর্দারের ছেলে, তোমার দিন ফুরিয়েছে।'

'বেশ, তাতে আমি ভয় পাই না। শেষবারের মতো তোমায় একটা জিনিস দেব, শেষবারের মতো। এই তরবারি আমি কোনদিন কাছছাড়া করিনি। তবু তোমায় দিলাম আমার এই প্রিয়তম বস্তু। মরচে পড়ে পড়ে ক্ষয়ে ক্ষয়ে এটা যখন নিঃশেষ হয়ে যাবে তখন এসো আমার কাছে। তখন আর কোন অনুরোধ জানাব না। আর যদি এটা ক্ষয়ে না যায়, আমার পেছনে এসো না, আমি অমর রাজ্যে পৌঁছে যাব।'

ছেলে তার প্রিয়তম তরবারি ফেলে দিল মৃত্যুর পায়ের ওপরে। আবার চলল এগিয়ে, বায়ুবেগে। তরবারিতে মরচে ধরল, ক্ষয়ে গেল, কিছুই বাকি রইল না। মৃত্যু ছুটে আসছে তার পেছনে, ধনুকের ছিলা থেকে ছাড়া-পাওয়া তিরের মতো।

কিন্তু ছেলে পৌঁছে গিয়েছে প্রাসাদে, সিংহদ্বার খুলে গিয়েছে। ছোট মেয়ে ছুটে এল বরের কাছে। বরের একটা হাত ধরে ফেলল। কিন্তু খোলা দরজা দিয়ে মৃত্যুও ঢুকে পড়েছে, তিরের বেগে মৃত্যু ছেলের একটা পা চেপে ধরল। বলল, 'থামো, তুমি এখন আমার। কোথায় যাচ্ছ তুমি ?'

ছোট রাজকুমারী কেঁপে কেঁপে বলে উঠল, 'না, ও তোমার নয়, ও আমার, শুধু আমার।'

'না, ছেলে আমার। আমি মৃত্যু, ওকে ছেড়ে দাও।'

মেয়ে চোখের জলে বুক ভাসিয়ে বলল, 'তাই যদি হয়, তবে আমি ছেলেকে একটা সোনার আপেল করে দেব, সোনার আপেলকে দূর আকাশে ছুড়ে দেব। যে তাকে ধরতে পারবে সে হবে তারই।'

সঙ্গে সঙ্গে মেয়ে সর্দারের ছেলেকে সোনার আপেল করে দিল। আপেলটি হাতে নিয়ে শূন্যে ছুড়ে দিল। আকাশের পথে যেতে যেতে দূর আকাশে মিলিয়ে গেল আপেল,— সে হল আকাশের ধ্রুবতারা।

এমন সময় রাজা ও অন্য দুই মেয়ে বেরিয়ে এসেছে। তক্ষুনি তারা বুঝে ফেলল কি হয়েছে। ছোট মেয়েকে তারা সোনার আপেল করে দিল, হাতে নিয়ে শূন্যে ছুড়ে দিল। আপেলকে বলল, 'আকাশে যাও, ছেলেকে খুঁজে নিয়ে আবার ফিরে এসো প্রাসাদে। তখন মৃত্যু আর তাকে স্পর্শ করতে পারবে না। সে অমর হয়ে রইবে।'

মেয়ে আপেল হয়ে আকাশের পথে যেতে যেতে দূর আকাশে মিলিয়ে গেল,— সে হল আকাশের শুকতারা।

মৃত্যু এইসব দেখে ভীষণ রেগে গেল। রাগে কাঁপতে লাগল। শেষকালে রাজা ও দুই মেয়ের ছায়াকে পদাঘাত করল, সঙ্গে সঙ্গে তারা তিনটি পাথরের স্তম্ভ হয়ে গেল।

সেদিন থেকে ধ্রুবতারা আর শুকতারা আকাশে দেখা দিল, উজ্জ্বল হয়ে সেখানেই রয়ে গেল। আর আজও সেই দূর অমর রাজ্যের সিংহদ্বারের কাছে তিনটি পাথরের স্তম্ভ দেখতে পাবে। সেই থেকে সব প্রাসাদের সামনেই পাথরের স্তম্ভ থাকে।

বর-বউ অমর হয়ে ধ্রুবতারা-শুকতারা হয়ে আকাশেই রয়ে গেল।

কার ফসল কে ঘরে তোলে

কাঠবেড়াল খুব কাজের লোক। এক মুহূর্ত সে চুপ করে বসে থাকে না। সবসময় কাজ করে। সেইসঙ্গে চট্‌পটেও খুব। শুধু যখন আবছা আঁধার ঘনিয়ে আসে, চোখে দেখতে পায় না,—তখনই ফিরে আসে গাছের কোটরের বাসায়। অনেকগুলো ছেলেমেয়ে তার, তার ওপরে বুড়ো বাবা-মা রয়েছে। এতগুলো মুখে খাবার জোগাতে তাকে হাড়ভাঙা খাটুনি খাটতে হয়।

আকাশ ফুটো হয়ে গিয়েছে। শুধু জল পড়ছে। জমি নরম হয়েছে। পাথুরে জমিও শেষকালে নরম হল। কাঠবেড়ালের ছিল একফালি জমি। সময় নষ্ট না করে সে কাজে লেগে গেল। টিপটিপ বৃষ্টির মধ্যেই জমিতে নেমে গেল। গায়ের লোম ভিজে উঠছে, বারবার চোখ থেকে জল সরাতে হচ্ছে। খুব কষ্ট। তবু কাজের বিরাম নেই। কিন্তু একটা কাজ করতে সে ভুলে গেল। জমিতে যাওয়ার আলপথ সে তৈরি করেনি। সে সাধাসিধে মানুষ। বিপদ যে এদিক থেকে আসবে তা আঁচ করতে পারেনি। আর তাছাড়া অত ঘোরপ্যাঁচও সে বোঝে না। এই তো অল্প ফসল, এর জন্য আবার আলপথের কি দরকার! গাছে গাছে লাফিয়ে, এদিক-ওদিক তিড়িং-বিড়িং লাফিয়েই সে জমিতে পৌঁছে যায়।

সেই বনে এক গাছের বাসায় থাকত এক মাকড়সা। ভারি চালাক। ভীষণ দুষ্টুবুদ্ধি তার। বসে বসে খাওয়ার ফন্দি আঁটে। মোটেই খাটে না, খাটতে চায়ও না। এমনি একদিন সে খাবার খুঁজতে বেরিয়েছে। যেতে যেতে দেখে একফালি জমিতে সবুজ ফসল ফলে আছে। সবুজ ফিকে হয়ে আসছে। ফসল পাকতে আর দেরি নেই। জমিটা ভালোভাবে দেখে মাকড়সা অন্য কোথাও চলে গেল।

কয়েকদিন কেটে গিয়েছে। মাকড়সা প্রতিদিনই এসে জমি দেখে যায়। লুকিয়ে লুকিয়ে। বাঃ, ফসল পেকে গিয়েছে। এবার ফসল কাটার সময়।

পরের দিন ভোরবেলা ছেলেমেয়ে নাতিপুতি নিয়ে মাকড়সা জমিতে চলে এল। সঙ্গে কয়েকটা ছোট ধামা। তারা এসেই আলপথ তৈরি করতে লেগে গেল। জাল দিয়ে পথ বানাল। জালের পথ হয়ে গেল। তারা কুটুস কুটুস করে ফসলের গোড়া কাটতে লাগল। আঁটি বেঁধে জমির একপাশে জড়ো করে রাখল। আঁটি বাঁধছে, আর জড়ো করছে।

জমির ফসল পেকে উঠেছে। আগাছা আর বাছতে হচ্ছে না তাই জমিতে কোনই কাজ নেই। কাঠবেড়ালও দু-তিন দিন এদিকে আসে নি। আসার তো আর কোন দরকার নেই! সেদিন জমিতে এসেই তার চোখ কপালে উঠে গেল। সে অবাক হয়ে চেয়ে রইল। বুক কাঁপতে লাগল। তার সব পাকা সোনার ফসল মাকড়সা কেটে ফেলেছে, জমির পাশে জড়ো করে রেখেছে।

চোখ-ভর্তি জল নিয়ে কাঠবেড়াল বলল, 'বন্ধু, মাকড়সা, এ তুমি কি করছ? আমার জমির ফসল তুমি কাটছ কেন? কত কষ্টের ফসল আমার।'

মাকড়সা গোল গোল চোখ ঘুরিয়ে বলল, 'তার মানে? এ জমি বুঝি তোমার? এ ফসল তুমি ফলিয়েছ? কেমন করে জমি চষলে?'

ভেতরে ভেতরে খুব রেগে উঠল কাঠবেড়াল। তবু রাগ চেপে নরম গলায় বলল, 'এ জমি আমার। আর ফসল ফলিয়েছি আমি নিজেই। রোদে পুড়ে, জলে ভিজে, আধপেটা খেয়ে। আজ এসেছি ফসল কাটতে। এ ফসল আমার নয়তো কার? এসব কি কথা বলছ তুমি?'

ফন্দিবাজ মাকড়সা। চট্ করে বলে বসল, 'বেশ, মেনে নিচ্ছি তোমার কথা। ভালো কথা। কিন্তু, এ জমি যদি তোমার হয়, এ ফসল যদি তোমার হয়, তবে জমিতে আসার আলপথ কোথায়?'

কাঠবেড়াল অবাক হয়ে বলল, 'আলপথ? আমার তো পথের দরকার হয় না। গাছে গাছে লাফিয়ে, তিড়িং-বিড়িং লাফিয়ে আমি সব জায়গায় যেতে পারি। এমনি করে জমিতেও পৌঁছে যাই। কি দরকার আমার পথের?'

মাকড়সা চোখদুটো আরও গোল করে ঠাট্টা করে বলল, 'বাঃ! বেশ মজার কথা শোনালে তো! জমি তোমার, সেই জমি তুমি চাষ করেছ, আর আলপথ বানাও নি? কে বিশ্বাস করবে তোমার কথা? কেউ কবে শুনেছে এমন কথা? তুমি আমাকে বোকা বানাবে? বাঃ! বাঃ! বেশ।'

কাঠবেড়াল গো-বেচারি, সাদাসিধে মানুষ। অত মারপ্যাঁচ বোঝে না। কি আর করে? দৌড়ে গেল পশুদের কাছে। সব খুলে বলল। কেঁদেও ফেলল।

সর্দার পশুরা বলল, 'কাঠবেড়াল, এ তো ঠিক কথা নয়। এ তো বিশ্বাস করা যায় না। তুমি জমি চাষ করেছ অথচ আলপথ বানাও নি? এ কেমন করে হবে? আর মাকড়সা? সে জমি চাষ করেছে, তার নিজের মতো করে জালের পথও বানিয়েছে। সে পথ বানিয়ে জমি চাষ করেছে। ও ফসল মাকড়সার। তুমি আজকাল বড্ড মিছে কথা বলতে শিখেছ।'

হাই তুলছে সর্দার পশুরা। তাদের সাদা দাঁত দেখা যাচ্ছে। গা চুলকোচ্ছে সর্দার পশুরা। তাদের থাবা-নখ দেখা যাচ্ছে। সেদিকে কয়েকবার তাকিয়ে কাঠবেড়াল ফিরে চলল। পথ দেখতে পারছে না। বন-পথ-আকাশ ঝাপসা লাগছে। চোখ-ভর্তি জল। ফিরে এল গাছের কোটরের বাসায়। সেখানে অনেকগুলো ক্ষুধার্ত মুখ তার পথ চেয়ে বসে রয়েছে। তার চোখ আরও লাল হয়ে উঠেছে। চোখের কোল বেয়ে জল গড়াচ্ছে। বাচ্চাদের মুখের দিকে তাকিয়ে তার বুক কেঁপে উঠল। এবার বোধহয় সবাইকে না খেয়েই মরতে হবে। বুক বুঝি ফেটে যাবে।

ওদিকে ফসলের পাহাড় বয়ে মাকড়সা চলেছে বাড়ির পথে। জালের পথ বেয়ে। খুব ছোটরাও ছোট্ট ছোট্ট আটি নিয়েছে। সার বেঁধে চলেছে তারা।

এমন সময় একটা দম্‌কা হাওয়া এল। পটাং করে ছিঁড়ে গেল জালের পথ। আঁটি সমেত মাকড়সারা ঝুপ করে পথের ওপরে পড়ে গেল। আচমকা একটু ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল। এমন সময় নামল বৃষ্টি। ওরা তাড়াতাড়ি একটা শুকনো গাছের কোটরে

ঢুকে পড়ল। আর একটুখানি পথ বাকি রয়েছে। এ বৃষ্টি আর কতক্ষণ। থেমে গেলেই ফসল তোলা যাবে গাছের বাসায়। সোনার ফসলে ভরে উঠবে গাছের কোটর। সারা বছর আর ভাবতে হবে না। বুদ্ধি থাকলে তেমন খাটতে হয় না। মাকড়সা ভাবছে, কার ফসল কে ঘরে তোলে। চোখে দুষ্টুমির হাসি।

শেষকালে বৃষ্টি ধরে এল। টিপ্‌টিপ্‌ করে বৃষ্টি পড়ছে। এতে অসুবিধে কিছু হবে না। মাকড়সা কোটর থেকে বেরিয়ে এল, পেছনে পেছনে আর সবাই। গুটিগুটি আসছে। কিন্তু এ কি ? মাকড়সার চোখ যেন ঠিকরে বেরিয়ে আসবে।

একটা মস্ত বড় বাজপাখি তার বিরাট দুটো ডানা দুপাশে মেলে ফসলের ওপরে বসে রয়েছে। বৃষ্টির জলে দেহের ডানা-পালক সব ভিজে কালচে হয়ে উঠেছে। লাল চোখ জ্বলছে। বাজপাখি বৃষ্টি থেকে ফসল বাঁচাচ্ছে। ঠোঁটদুটো অল্প ফাঁক করে রয়েছে, বুক ওঠাপড়া করছে।

বাজপাখি বেজায় রাগি, ভীষণ হিংসুটে। গায়ের জোর খুব, ঠোঁটের ধার ভীষণ। চোখদুটো তার জ্বলছে। তবু ভয়ে ভয়ে মাকড়সা এল বাজপাখির সামনে। চোখের দিকে তাকিয়ে মাকড়সার বুকের রক্ত জল হয়ে গেল। কোনরকমে চোখ নামিয়ে ঢোক গিলে বলল, 'প্রভু, আপনি খুব ভালো, খুব উপকারী। আমার ফসলগুলোকে কত কষ্টে বৃষ্টি থেকে বাঁচিয়েছেন।' গলা আটকে গেল মাকড়সার, আর কোন শব্দ বেরুল না।

কর্কশ আওয়াজ হল। হাওয়ার ধাক্কা খেয়ে আওয়াজ অনেক দূর ছড়িয়ে পড়ল। মাকড়সা দু-পা পিছিয়ে এল। আকাশে থেকে বুঝি বাজ পড়ল। চোখ ঘুরিয়ে বাজপাখি বলল, 'কি ? কি বললি ? তোর ফসল ? কে কবে শুনেছে,—নিজের জমির ফসল পথের মাঝে ফেলে রেখে কেউ চলে যায় ? চালাকি করিস না আমার সঙ্গে। এক ঠোকরে তোর..... । এ ফসল আমার। এক কুটোও পাবি না। আর একবার মুখ খুললে উবে যাবি।'

পেছন দিকে হাঁটতে লাগল মাকড়সা। চোখ রইল বাজপাখির দিকে। বেশ দূরে এসে সে থামল। আর একটু হলেই হয়েছিল আর কি! টুক করে বাজের মুখে ঢুকে যেতাম। খুব বাঁচা বেঁচেছি। ঢের হয়েছে, আর না।

পায়ের নখে ফসলের আঁটি চেপে ধরল বাজপাখি, ডানা মেলে দিল, ওপরে উঠল। তারপর হাওয়ায় ভেসে চলল। অনেক নীচ থেকে মাকড়সা দেখল,—বাজপাখি দূরে আরও দূরে আকাশে মিলিয়ে যাচ্ছে। ভাবল,—কার ফসল কে ঘরে তোলে।

সাতরঙা রামধনু

ওদের বাড়িঘর সেই দূরের আকাশে। ওরা দুই বোন। একজনের নাম হাইনে-ওয়াই, সে বড় বোন। সে আকাশের আলো, বৃষ্টি নামায় পৃথিবীতে। ছোট বোন হাইনে-পুকোহু-রান্‌গি, সে কুয়াশাকুমারী। আকাশে তেমন টলটলে জল নেই, কিন্তু ওরা দুজন চান করতে খুব ভালোবাসে। তাই প্রতিদিন ভোরবেলায় দুই বোন নেমে আসে পৃথিবীতে, টলটলে জলে চান করে। ভোরের বেলায় অল্প আলোয় আমরা যে কুয়াশা দেখি, আসলে তারা সেই দূর আকাশের দুই বোন, আলোকুমারী আর কুয়াশাকুমারী।

এমনি করে দিন বয়ে যায়। কোন বিপদ-আপদ ঘটে না। সূর্যের আলো একটু বেশি হলেই তারা অকাশ-পথে উড়ে যায়।

এখন হয়েছে কি, সেইখানে থাকত এক কিশোর। টলটলে জলধারার কাছে সে সকাল বেলায় ঘুরে বেড়াত। জলে মাছ কেমন খেলা করে, গাছের ফাঁকে পাখি কেমন বাসা বাঁধে, এসব সে দেখে বেড়াত। কিশোরের নাম উয়েনুকু। একদিন সে হঠাৎ দেখতে পেল, কুয়াশাকুমারী আর আলোকুমারী জলে চান করছে। কুয়াশাকুমারীকে দেখে সে আর চোখ ফেরাতে পারে না। এমন রূপ, এমন সুন্দরী। ঠিক করল, মেয়েকে সে বিয়ে করবে। মেয়েকে তার মনের কথা বলবে। ভাবছে, এমন সময় দুজনেই আকাশ-পথে মিলিয়ে গেল। অবাক হয়ে চেয়ে রইল উয়েনুকু।

এমনি করে দিন কাটে। সব দিন ভোরবেলায় ঝোপের আড়াল থেকে সে তাদের দেখে। পেছন ফিরে চান করছে ওরা, ডুবছে, ভাসছে, জলে ঢেউ তুলছে—হঠাৎ ঝাঁপিয়ে পড়ল উয়েনুকু। কিছু বুঝবার আগেই সে ধরে ফেলল কুয়াশাকুমারীকে। আলোকুমারী আকাশ-পথে মিলিয়ে গেল।

ধরা পড়ে কুয়াশাকুমারী কাঁদছে। কিশোর বলল, 'তুমি আমায় বিয়ে করবে? তুমি আমার বউ হবে? তোমাকে ছাড়া আমি আর কাউকে বিয়ে করব না। করবে বিয়ে?'

অবাক হল কুয়াশাকুমারী। অবাক চোখে চেয়ে রইল। কিশোরকে তারও বড় ভালো লেগে গেল। সে রাজি হল। কিন্তু একটা শর্তে!

আকাশের মেয়ে তার বউ হবে। কিন্তু সে দিনের বেলায় পৃথিবীতে বরের কাছে, বরের বাড়ি থাকবে না। সূর্য যখন অনেক নীচে নেমে যাবে, চারদিক যখন আঁধার হয়ে আসবে, তখন দূর আকাশ থেকে নেমে আসবে আকাশি মেয়ে। সারারাত থাকবে। আবার সূর্য যখন নীচ থেকে ওপরে উঠবে, সেই আলো-হওয়া ভোরের একটু আগেই আবার সে চলে যাবে দূর আকাশে। আর একটা কথা, গাঁয়ের কাউকে তার কথা বলা চলবে না। কেউ তাকে দেখতে আসতে পারবে না। তার বউয়ের কথা শুধু জানবে তার বর। তবে অনেক দিন নয়, তাদের যখন ফুটফুটে একটা ছেলে হবে তখন কিশোর সবাইকে বলতে পারবে আকাশি মেয়ের কথা, ছেলেকে কোলে নিয়ে

কুয়াশাকুমারী তখন সবার সামনে আসবে। এই কথা ভুলে গেলেই আকাশের মেয়ে সেই যে দূরে চলে যাবে, আর ফিরবে না কোনদিন।

উয়েনুকু মাথা নাড়ল, সে রাজি। এ মেয়েকে ছাড়া সে বাঁচবে কেমন করে? তাদের দুজনের বিয়ে হয়ে গেল! দুজনেই হাসছে।

এমনি করে দিন কাটে। সন্ধের আঁধার নেমে এলেই আকাশের মেয়ে বরের ঘরে ঢুকে পড়ে। কেউ দেখতে পায় না। ভোরের আলো আব্‌ছা হয়ে ফুটলেই দিদি আলোকুমারী বরের দোরের কাছে এসে বোনকে ডাকে। বোন ফিরে যায় আকাশে, দিদির পাশেপাশে। ভালোভাবে ভোর হবার আগেই দুই বোন মিলিয়ে যায়।

এমনি করে বেশ কিছুদিন কেটে গেল। সুখেই দিন কাটতে লাগল। তবু উয়েনুকুর মনে বড় দুঃখ। তার এমন সুন্দরী বউ, অথচ সে কাউকে বউয়ের কথা বলতে পারে না। গাঁয়ে কুয়াশাকুমারীর চেয়ে রূপসি মেয়ে আর একটাও নেই। অথচ সে কাউকে দেখাতে পারে না। গাঁয়ের কেউ আজ পর্যন্ত তার বউকে দেখতে পেল না। নাঃ, এভাবে মন মানে না। সে সবাইকে তার বউ দেখাবে। মনে মনে ঠিক করে ফেলল। লুকিয়ে লুকিয়ে দেখিয়ে দেবে।

একদিন সন্ধে হবার আগেই সে ঘরের সব ফাঁক-ফোকর ভালোভাবে বন্ধ করে দিল। দরজার ফাঁক, জানলার ফাঁক সব বন্ধ। সকালের আলো যাতে একটুও ঢুকতে না পারে। সব ব্যবস্থা করে সে নিশ্চিন্ত হল। সকাল হবে, বাইরে আলো ঝল্‌মল্‌ করবে কিন্তু ভেতরে একেবারে আঁধার। বউ বুঝতেই পারবে না,—সকাল হয়েছে, আলো ফুটেছে, আঃ, বউ কেমন বোকা বনে যাবে। সবাই তখন বউকে দেখতে পাবে, গাঁয়ের সবচেয়ে সুন্দরী বউকে তারা দেখবে।

কুয়াশাকুমারী নেমে এল ঘরে। আঁধার ঘর। সে কিছুই বুঝতে পারল না। অন্য দিনের মতোই সবকিছু ঠিকঠাক আছে। রাতে কত গল্প, কত কথা, কত আনন্দ। শেষকালে আকাশি মেয়ে ঘুমিয়ে পড়ল। কিশোর কিন্তু ঘুমোতে পারল না, জেগে রইল সারারাত। ভোর হলেই গাঁয়ের লোক আসবে তার ঘরে। সব আগে থেকে বলা হয়ে গিয়েছে।

সূর্য ঘুম থেকে জেগে উঠেছে। আব্‌ছা আলো পুব কোণে ফুঠে উঠেছে। আকাশ থেকে নেমে এল দিদি আলোকুমারী। বোনকে ডাকল। কোন ডাকই পৌঁছল না বোনের কানে। সব যে বন্ধ। অনেক, অনেকবার ডাকল দিদি, বোন তো আসছে না। কি আর করে সে। এদিকে আলোর তেজ বাড়ছে। দিদি আবার আকাশ-পথে চলে গেল।

সকাল হতেই গাঁয়ের মানুষজন চলে এসেছে কিশোরের বাড়িতে। খুব আগ্রহ তাদের, নতুন বউ দেখবে। নতুন বউয়ের রূপের কত কথাই না তারা উয়েনুকুর কাছে শুনেছে। সেই গল্পের বউ, রূপকথার বউকে আজ তারা প্রথম দেখবে। দলের প্রথমেই রয়েছে গাঁয়ের অন্য সব বউ।

উয়েনুকু বিছানা থেকে নেমে আস্তে আস্তে পাশের দরজা খুলছে। খুব সাবধানে। দরজা খুলে গেল। সকালের মিষ্টি রোদের আলো ছড়িয়ে পড়ল ঘরে। বাইরে দরজার সামনে অনেক মানুষজন। তারা উঁকি দিল। বউয়ের চোখে আলো পড়ল, বউ চমকে উঠল। উঠে বসল বিছানায়। অবাক চোখে চাইল,—দেখল উয়েনুকু দাঁড়িয়ে মিষ্টি চোখে হাসছে, দরজার ওপাশে অনেক অবাক-করা চোখ।

আকাশি মেয়ে বিছানা ছেড়ে নেমে পড়ল। দাঁড়িয়ে রইল ঘরের মাঝখানে। মাথার খোলা চুল দেহ বেয়ে পায়ের কাছে পড়েছে। অপরূপ দেবীমূর্তি। সে এগিয়ে গেল দরজার সামনে। বেরিয়ে এল বাইরের উঠোনে। সবাই পথ করে দিল। উঠোন পেরিয়ে সে একটা ঘন গাছের নীচে এল। চোখে জল, ঠোঁট কাঁপছে। সে গান গেয়ে উঠল। বিদায়ের গান। মিষ্টি গলার করুণ গান। গাঁয়ের মানুষজন আস্তে আস্তে তার দিকে এগিয়ে আসছে। তাদের বুকেও বেদনা, চোখ ভিজে উঠেছে। মেয়ের বিদায়ের গান শুনে। আকাশ থেকে ঘন কুয়াশা নেমে আসছে। ঠিক গাছের ওপর থেকে। ঘন কুয়াশা নেমে এসে গাছের ওপরে থেমে গেল। মেয়ে তখনও গান গাইছে। গান শেষ হল। কুয়াশা আরও নীচে নেমে এল, মেয়েকে ঢেকে দিল। হঠাৎ কুয়াশার মেঘ ওপরে উঠতে লাগল। পাক খেতে খেতে কুয়াশা ওপরে উঠছে। মাঝখানে মেয়ে, কিন্তু তাকে দেখা যাচ্ছে না। একটু পরে কুয়াশা আকাশের সাদা মেঘে মিলিয়ে গেল।

উয়েনুকু কান্নায় ভেঙে পড়ল। এ কি হল তার? ছলনা করতে গিয়ে সে সবকিছু হারাল। গাছের নীচে আছড়ে পড়ল কিশোর।

কুয়াশাকুমারী চিরকালের জন্য ফিরে গেল আকাশ-রাজ্যে। তার বর কথা রাখেনি। ছোট্ট ফুটফুটে ছেলে হবার আগেই সবাইকে বলে দিল। আকাশি মেয়ে আর কোনদিন ফিরে আসেনি উয়েনুকুর ঘরে।

কেঁদে কেঁদে চোখ ফুলে গেল কিশোরের। মনেও খুব কষ্ট। সে এ কি করল? তাকে ছাড়া বাঁচবে কেমন করে। শেষকালে ভাবল, তাকে খুঁজে আনবই, তাকে খুঁজে পেলে ক্ষমা চাইব। একদিন এই পৃথিবীতে তাকে পেয়েছিলাম, আবার তাকে ফিরিয়ে আনব। মনে দুঃখ নিয়ে উয়েনুকু ঘর ছাড়ল, গাঁ ছাড়ল। সে পথে বের হল।

নদী পেরিয়ে, বন পেরিয়ে, পাহাড় পেরিয়ে কিশোর চলেছে। সমুদ্রের পাশে পাশে হেঁটে চলেছে। ক্লান্ত হয়, বিশ্রাম নেয়, আবার চলে। গাছের তলায় রাত কাটায়, সূর্য ঘুম থেকে জাগলে সে-ও জেগে ওঠে, পথ চলে। অবিরাম পথ চলা। কিন্তু কোথাও সে তার বউকে খুঁজে পেল না। তবু খোঁজার বিরাম নেই। কোথায় তার গ্রাম, কোথায় তার জন্মভূমি,— সব ভুলে গেল সে। কোনদিকে তার ঘরবাড়ি, কিছু তার মনে পড়ে না। মনে শুধু একটি ছবি, সে ছবি কুয়াশাকুমারীর।

বহু বছর কেটে গিয়েছে, তবু পথ চলার ক্লান্তি নেই তার। বয়স তো থেমে থাকে না। শেষকালে পথে পথে ঘুরতে ঘুরতেই কিশোর একদিন বুড়ো হল। তার সব চুলদাড়ি পেকে কুয়াশার মতো সাদা হয়ে গেল। এখনও সে খুঁজে পায় নি কুয়াশাকুমারীকে।

দেহ আর চলে না, দেহ কাঁপে, চোখে ঝাপ্‌সা অন্ধকার। দূরের জিনিস ভালোভাবে ঠাওর হয় না। এক ঘন গাছের নীচে বসে পড়ল বুড়ো উয়েনুকু। মাথার তলায় হাত দিয়ে শুয়ে পড়ল। একটু দূরে বিশাল সমুদ্র। হাওয়া বইছে এলোমেলো। উয়েনুকু চোখ বন্ধ করল। সে চোখ আর খুলল না। নিঃস্পন্দ পড়ে রইল তার দেহ,— গাছের নীচে বালির ওপরে।

আকাশের ওপরে যেসব দেবতা থাকেন তারা সব দেখেছেন। বউকে খুঁজতে কিশোর কি করেছে সব তারা জানেন। পৃথিবীর মানুষের মধ্যে এমন ভালোবাসা তারা আগে দেখেন নি। তারাও অবাক হয়েছেন। মৃত্যুর পরে তারা উয়েনুকুকে রামধনু

করে আকাশে রেখে দিলেন, সাতরঙা রামধনু। যে আকাশ থেকে কুয়াশাকুমারী নেমে এসেছিল, কিশোর সেখানেই রামধনু হয়ে রইল। আমরা আকাশে রামধনু দেখলেই বুঝতে পারি, আসলে এ হল আমাদের পৃথিবীর উয়েনুকু। সে একদিন বউকে ঘরে তুলেছিল, আবার চিরকালের জন্য তাকে হারিয়েছিল।

সেই সেদিন থেকেই সূর্য ওঠার সময়েই প্রভাতী আলো ছড়িয়ে পড়ে, আর বুড়ি পৃথিবীমায়ের বুক চিরে রূপসী কুয়াশাকুমারী দেখা দেয়। আস্তে আস্তে সে আকাশ-পথে এগিয়ে যায়। আর উয়েনুকু রামধনু হয়ে তখন থেকেই আকাশের এক দিক থেকে অন্য দিকে ছড়িয়ে পড়ে,— সে এখনও আকাশের চারপাশে আলো ফেলে কুয়াশাকুমারীকে খুঁজছে। উয়েনুকু এখনও বউকে ভুলতে পারে নি।

বোকা স্বামী

অনেক অনেক কাল আগে এক গাঁয়ে থাকত একটা লোক। সে বেজায় বোকা। বোকা কিন্তু খুব ভালোমানুষ ছিল। সবার উপকার করত, তাই বোকা হলেও গাঁয়ের মানুষজন তাকে খুব ভালোবাসত। তার একটা নাম ছিল ঠিকই, কিন্তু সে নামে তাকে কেউ ডাকত না। তাকে ডাকত বোকা ছেলে বলে। এমনি ডাকতে ডাকতে একদিন সবাই তার আসল নাম ভুলেই গেল।

এমনি করে দিন যায়। বোকা ছেলের বয়স হল তিরিশ বছর। তবু তার বিয়ে হল না। কোন্ মেয়ে এমন বোকাকে বিয়ে করবে ? শেষে কি না খেতে পেয়ে মরবে ? বোকা বলে তার অবস্থাও ছিল খুব খারাপ। একটা নোংরা ছোট্ট কুঁড়েঘরে সে একা একাই থাকত।

কোনরকমে দিন কেটে যায়। একদিন সন্ধেবেলা বোকা কুঁড়ের মধ্যে বসে রয়েছে। মনে বড় কষ্ট। এমন সময় খোলা দরজা দিয়ে একটি মেয়ে কুঁড়েঘরে ঢুকল। পরমা সুন্দরী মেয়ে। বোকা তো কোনদিন এমন সুন্দরী মেয়ে দেখেই নি। সে অবাক হয়ে চেয়ে রইল।

মেয়েটি ভয়ে ভয়ে বলল, 'বড় বিপদে পড়েছি, এই রাত্তিরটা আমায় এখানে থাকতে দেবে ? কালই চলে যাব।'

বোকা অবাক হয়ে গিয়েছে। সে খুশি মনে রাজি হয়ে গেল। তার মনে আজ খুব আনন্দ। এমন মেয়ে থাকতে চেয়েছে আর সে রাজি হবে না ?

গভীর রাতে হঠাৎ মেয়েটি বলল, 'কত বড় আমাদের এই দ্বীপ, তবু তোমার আপনজন কেউ নেই দেখছি। আমারও কেউ নেই। বড় একা। তুমি কি আমায় বিয়ে করবে ? তোমার বউ করবে আমাকে ? আর একা থাকতে হবে না।'

বোকা হাসিহাসি মুখে তখনই রাজি হয়ে গেল। তার যে এমন পরমাসুন্দরী রাজকন্যার মতো বউ হবে সে ভাবতেই পারেনি। সে রাজি হবে না ?

গাঁয়ের সবাই খুশি। বোকার শেষকালে বউ জুটল। এমন সুন্দরী গাঁয়ে আর ছিল না। মেয়েও খুব ভালো। হাসিখুশি, কাজেকম্মেও ভালো। সবাই ভাবল, বোকা এবার ভালোভাবে থাকতে পারবে।

সেই বউকে বোকা এমন ভালোবেসে ফেলল যে সব সময় শুধু বউয়ের চিন্তাই করে। বউ ছাড়া সে আর কিছু বোঝে না।

বোকা শক্ত ঘাসের জুতো তৈরি করছে। বাজারে বিক্রি করে টাকা আনবে। বউ একটু দূরে রান্না করছে। হাতে কাজ করছে বোকা কিন্তু একমনে চেয়ে রয়েছে বউয়ের মুখের দিকে। জুতো বড় হচ্ছে, বড় হচ্ছে,— তার খেয়ালই নেই। যখন খেয়াল হল, দেখল— জুতো এত বড় হয়ে গিয়েছে যে কোন মানুষের পায়ের মাপে লাগবে না। কে কিনবে অত বড় জুতো ?

বর্ষা আসছে। মাঠে মাঠে ফসল বুনতে হবে। বৃষ্টির জন্য মাথা বাঁচাতে পাতার টোকা দরকার। বোকা টোকা বানাচ্ছে, বাজারে বিক্রি করবে। হাতে কাজ করছে, কিন্তু চেয়ে রয়েছে বউয়ের মুখের দিকে। টোকা বোনায় মন নেই। টোকা বড় হচ্ছে, বড় হচ্ছে—তার খেয়ালই নেই। যখন খেয়াল হল, দেখল,— টোকা এত বড় হয়েছে যে কেউ মাথায় পরতে পারবে না। এতবড় টোকা কিনবে কে?

বউ স্বামীর কাজকর্ম দেখে আর ভাবে, হায়রে বোকা স্বামী। মুখে কিছু বলে না, কিন্তু মনে মনে কষ্ট পায়।

শেষকালে বউ ভাবল,—বাড়িতে বসে কাজ করে বলে অমন হয়। স্বামীকে এবার মাঠের কাজে পাঠাবে। বর্ষাকালে, ফসলের জমিতে কত বাড়তি লোক লাগে। স্বামীকে সে জমির কাজে মাঠে পাঠাল। ভাবল, এবার সব ঠিক হয়ে যাবে।

স্বামী মাঠে কাজ করছে। বেশিক্ষণ হয়নি। হঠাৎ বোকার মনে হল,—বাড়িতে বউ ঠিক আছে তো? যদি কিছু হয়? মাঠের কাজ ফেলে ছুটে এল বাড়িতে। বউকে দেখেটেখে আবার গেল মাঠে। আবার কিছুক্ষণ কাটল। আবার মন ছট্‌ফট্‌ করে উঠল। আবার ফিরে এল বাড়িতে।

এমনি করে দিনের মধ্যে বারবার সে কাজ ছেড়ে বাড়িতে ছুটে আসে। জমির মালিক রেগে যায়। কাজও তেমন হয় না। এমন লোককে কাজে রেখে লাভ কি? তবু দয়া করে কাজ থেকে ছাড়ায় না। কিন্তু যা পাবার বোকা তার চেয়ে অনেক কম পায়।

বউ ভাবে, এমন করলে তো সংসার চলবে না। পেট তো চালাতে হবে, অনেক ভেবে ভেবে সে এক বুদ্ধি করল। সেই গাঁয়ে ছিল একজন শিল্পী। সে লোকের মাটির বাড়ির দেয়ালে পশুপাখি-গাছপালার ছবি আঁকত। সুন্দর ছবি। ছবি এঁকেই তার পেট চলত। বউ একদিন তাকে বাড়িতে ডেকে আনল। মিষ্টি করে বলল, 'তুমি তো খুব ভালো ছবি আঁকতে পারো। শুকনো পাতায় আমার ছবি এঁকে দাও।'

শিল্পী বলল, 'মানুষের ছবি কখনও আঁকি নি। দেখি চেষ্টা করে। ভালো না হলে মন খারাপ করবে না।'

সুন্দর ছবি হল। ঠিক বউয়ের চেহারার মতো। বউ খুব খুশি।

পরের দিন সকালে বউ বোকার হাতে সেই ছবি দিয়ে বলল, 'এই ছবি ঠিক আমার মতো দেখতে। এই ছবি তুমি জমির পাশে তুঁতগাছের ডালে ঝুলিয়ে রাখবে। কাজ করতে করতে মাঝে মাঝে দেখবে। যতবার খুশি দেখবে আর মন দিয়ে কাজ করবে। ছুটে ছুটে বাড়ি আসবে না। আমি ডালে তোমার চোখের সামনেই থাকব।'

বোকা ছবি নিয়ে তুঁতগাছের ডালে ঝুলিয়ে দেয়। সারাদিন কাজ করে, বারবার ছবিতে বউকে দেখে। খুব খুশি সে। কাজও ভালো হচ্ছে। সন্ধেবেলা ছবি খুলে বাড়িতে নিয়ে আসে। বউ নিশ্চিন্ত হল। সংসার ভালোই চলছে।

এখন হয়েছে কি, একদিন ভর দুপুরে হঠাৎ ঝোড়ো হাওয়া উঠল। ছবি পত্‌পত্‌ করে ডালের এপাশ-ওপাশ দুলছে। হঠাৎ ডাল থেকে খুলে পড়ল ছবি, হাওয়ার মুখে কোথায় উড়ে গেল সেই ছবি। কিছুটা দৌড়ে গেল বোকা, কিন্তু ছবি অনেক আগেই তার হাতের নাগালের বাইরে চলে গেল। জলভরা চোখে বোকা বাড়ি ফিরে এল।

বাড়িতে ঢুকেই সে হাউ-হাউ করে কেঁদে ফেলল। বউ তাকে শান্ত করে বুঝিয়ে বলল, 'ঠিক আছে, আমি আর একটা ছবি আঁকিয়ে নেব। ভাবনার কি আছে?'

এদিকে হয়েছে কি হাওয়ার বেগে বউয়ের ছবি এদিকে-ওদিকে উড়তে উড়তে শেষকালে গিয়ে পড়ল এক বাগানে। বাগানটা ছিল ওই এলাকার সর্দারের। সর্দার বাগানে কাজ করছে, হঠাৎ ছবিটা দেখতে পেল। ছবি দেখেই সর্দার ঠিক করল,— এই মেয়েকে বিয়ে করতে হবে। যার ছবি এত সুন্দর, সে নিশ্চয়ই আরও সুন্দরী।

সঙ্গো সঙ্গো সে তার অনুচরকে ডাকল। বলল, 'এই মেয়ে কোথায় আছে খুঁজে দেখো। দেখতে পেলেই নিয়ে আসবে। এ আমার বউ হবে। সঙ্গো অস্ত্র নিয়ে যাও।'

পিঠে-কোমরে অস্ত্র ঝুলিয়ে অনুচর রওনা দিল। পোশাকের মধ্যে বউয়ের ছবি। গ্রাম থেকে গ্রাম ঘুরে ঘুরে মেয়ের খোঁজ নিতে লাগল। যে গ্রামে যায় সেখানকার লোককে ছবি দেখিয়ে বলে, 'এই মেয়ে কি তোমাদের গাঁয়ের?' না, তারা এরকম মেয়েকে চেনে না। অনুচর আবার যায় অন্য গাঁয়ে।

শেষকালে অনুচর পৌঁছল বোকার গাঁয়ে। ছবি দেখিয়ে সে একজনকে বলল, 'এই ছবির মেয়ে কি তোমাদের গাঁয়ের?'

গাঁয়ের মানুষ বলল, 'হ্যাঁ, এই মেয়ে আমাদের গাঁয়ের। বোকার বউ। ওই যে তার বাড়ি।'

অনুচর বোকার বাড়ি গিয়ে দেখে হ্যাঁ ছবির মেয়ে এই মেয়েই বটে। সে তখন বলল, 'আমাদের সর্দার তোমাকে বিয়ে করতে চায়। এক্ষুনি আমার সঙ্গো যেতে হবে। না গেলে...।'

বোকা অনুচরের পায়ের ওপরে কেঁদে পড়ল, 'আমার আর কেউ নেই, তুমি ওকে নিয়ে যেয়ো না। দয়া করো।'

কে শোনে কার কথা। কার কান্না কে বোঝে। বোকার দুচোখ বেয়ে জলের ধারা নেমেছে, বউয়ের দুচোখে ঝরনা। বউ স্বামীকে ঘরের মধ্যে ডেকে নিয়ে বলল, 'সর্দার যখন বলেছে, ওগো, কেঁদেকেটে কোন লাভ নেই। আমাকে নিয়ে যাবেই। ওরা এরকমই। শোনো, বছরের শেষ দিনে অনেক দেবদারু পাতা মাথায় নিয়ে তুমি সর্দারের প্রাসাদে বিক্রি করতে যাবে। নতুন বছরে পরবের সময় সাজাবার জন্যই সবাই দেবদারু পাতা কেনে। তুমি যাবে তখন, আমরা আবার একসঙ্গো থাকতে পারব। তুমি ভুলে যেয়ো না।'

অনুচর চিৎকার করে ডাকছে, দেরি হয়ে যাচ্ছে। বউ বেরিয়ে এল, পেছনে বোকা। অনেক গ্রামবাসীর চোখের সামনে সর্দারের অনুচর বউকে নিয়ে চলে গেল। সবাই চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। বোকা হাউ হাউ করে কাঁদছে, অন্যদের চোখেও জল। বউ বাঁকের পথে মিলিয়ে গেল। বোকা আছড়ে পড়ল মাটিতে।

বছর ঘুরে গেল। আজ এ বছরের শেষ দিন। বোকা গাছে গাছে উঠে সুন্দর কচি কচি দেবদারু পাতা পাড়ল। একসঙ্গো বেঁধে মাথায় তুলে রওনা দিল। হাঁটতে হাঁটতে পৌঁছল সেই সর্দারের প্রাসাদের সামনে।

প্রাসাদের মধ্যে বউ তখন বসে রয়েছে সর্দারের পাশে। সর্দার মদ খাচ্ছে, বউ দেখছে। হঠাৎ বাইরে থেকে শোনা গেল, 'দেবদারু পাতা নেবে? কাল নতুন বছরের পরব। কচি দেবদারু পাতা। দরজা সাজাবে, বাড়ি সাজাবে। দেবদারু পাতা নেবে?'

বউ হেসে উঠল। অপরুপ মিষ্টি হাসি। সকালের শিশিরের মতো মুক্তো-ঝরানো হাসি। সাদা ফসলের মতো হাসি। সর্দার মদ খাওয়া থামিয়ে অবাক হয়ে চেয়ে রইল বউয়ের দিকে। আজ এক বছর হল বউ এসেছে এই বাড়িতে। একদিনও হাসে নি, একদিনও হাসিমুখে কথা বলেনি। আর আজ? সর্দার তক্ষুনি অনুচরকে আদেশ দিল, 'নিয়ে এসো ওকে। ওর সব পাতা কিনে নেব।'

মাথায় বোঝা চাপিয়ে বোকা ঢুকল প্রাসাদে। তাকে দেখে বউ হেসে গড়িয়ে পড়ল মাটিতে। কি সুন্দর হাসি। বউকে বড় সুন্দর লাগছে আজ।

সর্দারের আনন্দ দেখে কে? আনন্দে গলে গিয়ে সর্দার বলল, 'বউ, দেবদারু পাতা বিক্রিওয়ালাকে দেখে তোমার এত হাসি, তাহলে আমিও ওই রকম বিক্রিওয়ালা হতে রাজি আছি। তাহলে তোমার আরও আনন্দ হবে, আরও হাসি ঝরবে, তাই না?'

বউ কিন্তু কিছুই বলছে না। আরও মিষ্টি করে হাসছে। আরও সুন্দরী লাগছে তাকে।

সর্দার তখন আনন্দে নাচছে। হঠাৎ সে বোকার মাথা থেকে বোঝা নামিয়ে ফেলল। নিজের ঝলমলে পোশাক বোকাকে পরিয়ে দিল। বোকার ছেঁড়া নোংরা পোশাক নিজে পরে নিল। বউ আরও হাসছে। সর্দার আরও খুশি। সর্দার দেবদারু পাতার বোঝা মাথায় তুলে নিল। নাচতে নাচতে দরজার দিকে যেতে যেতে বলল, 'চাই দেবদারু পাতা, কচি কচি পাতা। কালকে নতুন বছরের পরব।'

এই না দেখে বউ আরও জোরে হেসে উঠল। আগের চেয়ে অনেক বেশি হাসি। হাসির শব্দে আরও খুশি হয়ে সর্দার দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল। বাগান পেরিয়ে পথে নামল। পথে চলতে চলতে সে হেঁকে চলেছে, 'চাই দেবদারু পাতা, কচি কচি পাতা। কালকে নতুন বছরের...।'

শব্দ দূরে মিলিয়ে যাচ্ছে। বউ হাসি থামিয়ে দিল। গম্ভীর হয়ে অনুচরকে আদেশ দিল, 'বাইরের দরজা বন্ধ করে দাও। খুলবে না, কাউকে ঢুকতে দেবে না। আমার আদেশ।'

কাঠের বিশাল দরজা ভেতর থেকে বন্ধ হয়ে গেল। একটু পরেই ফিরে এল সর্দার। দরজা বন্ধ দেখে অবাক হল। বারবার ধাক্কা মারল। দরজা খুলল না, ভেতর থেকে কোন সাড়া পাওয়া গেল না। চিৎকার করে বলতে লাগল, 'প্রাসাদের সর্দার বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। আমি সর্দার। দরজা খোল।' কোন সাড়াশব্দ নেই। দরজা বন্ধই রইল।

প্রাসাদের মধ্যে বোকা আর তার পরমা সুন্দরী বউ সুখে-শান্তিতে বাস করতে লাগল। কত চাকর-বাকর, কত অনুচর, কত ধনদৌলত। কোন অভাব নেই।

সাগরকন্যা ও আকাশের চাঁদ

অনেক অনেক কাল আগে আমাদের এই সুন্দর দ্বীপে এক রাজা ছিল। বড় ভালো রাজা। রাজা সবার সুখ-দুঃখের খবর নিত। তার সভায় ছিল এক জাদুকর। রাজা সব সময় তর কথা মেনে চলত।

এখন হয়েছে কি, এক মহা বিপত্তি। দ্বীপের জেলেরা এসে কেঁদে পড়ল রাজার পায়ে। রাজা মন দিয়ে সব শুনল আর জেলেদের বাড়ি ফিরে যেতে বলল।

রাজা জাদুকরকে ডেকে বলল, 'অবাক হবার মতো কথা বটে। আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না। জেলেরা ডিঙি করে অনেক দূরে যায়। ছিপ নামিযে দেয় জলে। একই জায়গায় ওরা যায়। কেননা, বহুকাল থেকে ওখানেই ওরা মাছ ধরে। ওই পাহাড়ের কোলে। ছিপে টান পড়ে না, বড়শিতে মাছ ঠোকরাচ্ছে তাও মনে হয় না। কিন্তু ছিপ তুললেই দেখা যায়, বড়শির ওপর থেকে সুতো কাটা। বারবার এমন হচ্ছে। মাছও পাওয়া যাচ্ছে না, বড়শিও উধাও হচ্ছে। গরিব মানুষ অত বড়শি পাবে কোথায়? আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না। তুমি কিছু উপায় বের করো।' রাজা বেশ চিন্তিত।

জাদুকর হেসে বলল, 'ও এই ব্যাপার। বুঝেছি। সাগরের অনেক নীচে এক রাজ্য রয়েছে। সেই রাজ্যের নাম লালো-নানা। সেখানে থাকে এক বোন আর দুই ভাই। তারা অপরূপ সুন্দর। এমন রূপ মানুষের হয় না। জেলেরা নিশ্চয়ই লালো-নানা রাজ্যের ওপরে মাছ ধরতে গিয়েছিল।'

অন্য সব কথা রাজা ভুলে গেল। বলল, 'আমি ওদের দেখব। ওরা কেমন তা তোমায় দেখাতেই হবে। জাদুকর, তুমি ওদের নিয়ে এসো।'

জাদুকর বলল, 'তা পারি। চেষ্টা করব। তবে ভাই দুজন তো এখন সাগররাজ্যে নেই। তারা দূর সাগরে বেড়াতে গিয়েছে। শুধু রয়েছে বোন। দেখি চেষ্টা করে বোনকে তীরে আনতে পারি কিনা।'

কয়েক দিন কয়েক রাত কেটে গেল। হঠাৎ একদিন রাতে দামামার আওয়াজ শোনা গেল। আওয়াজ আরও বেশি হচ্ছে। যেন দুই গোষ্ঠীতে লড়াই বেধেছে। দামামার আওয়াজ সবুজ নারকেল গাছের সারি পেরিয়ে সমুদ্রে আছড়ে পড়ছে। সমুদ্রের গর্জনকেও ছাড়িয়ে গেল।

আওয়াজ পৌঁছল লালো-নানা রাজ্যে। ঘুমিয়ে ছিল সাগরকন্যা হিনা। তার ঘুম গেল ভেঙে। সে জেগে উঠল। প্রবাল প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে এল হিনা, কিছুই বুঝতে পারল না। 'সাগর-ফুলের বাগানে এল, অসংখ্য রঙিন মাছ হিনার চারপাশে ভেসে ভেসে খেলে বেড়াচ্ছে, কিছুই বুঝতে পারল না হিনা। এদিকে চাইছে ঝিনুক চোখ, ওদিক চাইছে ঝিনুক চোখ। হঠাৎ সে দেখতে পেল,— মানুষের মতো দেখতে কি যেন

সাগরের মাঝখানে ঝুলে রয়েছে। অবাক হয়ে গেল সে। আস্তে আস্তে ভেসে ভেসে সে এগিয়ে গেল। আরও কাছে, আরও কাছে। একেবারে কাছে গিয়ে দেখল। একটা কাঠের মূর্তি, মানুষের মূর্তি। কিন্তু এত সুন্দর কারুকাজ করা যে হিনা চোখ ফেরাতে পারছে না। তার গায়ে সুন্দর ঝল্‌মলে রাজার পোশাক। ঠিক যেন কোন রাজপুত্র। মূর্তির মাথায় সুতো বাঁধা, সেই সুতোতে ঝুলছে কাঠের রাজপুত্র। নিশ্চয়ই ওপর থেকে কেউ মাছ ধরছে। কিন্তু এমন অদ্ভুত টোপ হিনা কোনদিন দেখে নি।

সাদা মুক্তোর মতো শরীর ভাসিয়ে হিনা সাঁতার দিল। সুতোর পথ ধরে ওপরে উঠতে লাগল। সাগরকন্যা দেখবে, কোন্ সেই জেলে যে এমনভাবে টোপ ফেলেছে। ওরা কেমন ধরনের ছিপ হাতে বড়শি ফেলেছে?

জলের ওপরে অল্প শব্দ হল। হিনা মাথা তুলেছে জলে। এলোমেলো ভেজা চুল কপাল বেয়ে মুখের ওপরে পড়ছে। মুখের ওপর থেকে চুল সরিয়ে সে দেখল, এখানে-ওখানে অনেকগুলো ডিঙি জলে ভাসছে। ঢেউ-এর তালে তালে অল্প অল্প দুলছে। ভালোভাবে তাকিয়ে দেখল, ডিঙির সারি সাগরের তীর পর্যন্ত চলে গিয়েছে। কি সুন্দর লাগছে জলের ওপরে ডিঙির সারি।

হিনা একটা ডিঙির কাছে গেল। মাথা উঁচিয়ে দেখল, তার ওপরে একটা কাঠের মূর্তি। আর একটা ডিঙির কাছে গেল, আর একটা মূর্তি। সাগরকন্যা সাঁতরে চলেছে এক ডিঙি থেকে আরেক ডিঙিতে। সব ডিঙিতেই একই রকমের মূর্তি। ঠিক জলের তলার মূর্তিটার মতো। তখন তো আকাশে কোন চাঁদ ছিল না, আকাশে শুধু ছিল তারা। সেই তারার আবছা আলোয় মূর্তিগুলোর পোশাক আর গায়ের গয়না দেখে মুগ্ধ হল হিনা। এমন সুন্দর জিনিস সে আগে কখনও দেখেনি। হিনা ভাবল, কোন এক জাদুকর বোধহয় দ্বীপের সব মানুষকে এমন কাঠের মূর্তি করে দিয়েছে। সব মানুষ প্রাণহীন কাঠ হয়ে গিয়েছে।

ডিঙির মূর্তি দেখতে দেখতে হিনা সাগরতীরে পৌঁছে গেল। চারিদিক শান্ত, প্রাণের কোন সাড়া নেই। নারকেল গাছের নীচে দাঁড়িয়ে রইল হিনা। ভাবল,—কোন মানুষ নেই দ্বীপে, তাহলে আর ভয় কি! একটু এগিয়ে সে আরও অবাক হল। নারকেল গাছের সারির মধ্যে মধ্যে সেই রকম মূর্তি দাঁড়িয়ে রয়েছে। সব কাঠের মূর্তি। তাহলে? তাহলে হিনা যা ভেবেছিল ঠিক তাই! সব মানুষ মূর্তি হয়ে গিয়েছে।

নারকেল গাছের সারির নীচ দিয়ে, ফুলফোটা বনের পাশ দিয়ে, আবছা আঁধারে সাগরকন্যা ভেসে চলেছে। চুলগুলো পেছনে দুলছে, যেন হাওয়ায় ভাসছে প্রবাল রাজ্যের মিষ্টি মেয়ে।

যেতে যেতে সে একটা ছোট বাড়ির সামনে এল। দোর বন্ধ। আল্‌তো করে হাত দিতেই দোর খুলে গেল। কেউ নেই ভেতরে। অনেকটা সাঁতার কেটেছে হিনা, অনেকটা পথ হেঁটেছে হিনা। ক্লান্ত সে। ধবধবে বিছানায় শুয়ে পড়ল সাগরকন্যা। ঘুমিয়ে পড়ল হিনা।

কখন ভোর হয়েছে। হিনা ঘুমিয়ে রয়েছে হঠাৎ তার ঘুম ভেঙে গেল। চোখ মেলে চাইল। দেখল, দ্বীপের রাজা তার দিকে চেয়ে রয়েছে। ভয় পেল না হিনা, খুব ভালো লাগল। রাজার মুখে হাসি, মেয়ের চোখে মুক্তো-ঝরানো হাসি। রাজা দুহাত বাড়িয়ে মেয়েকে বসিয়ে দিল। মেয়ের চোখে সাগরজলের শান্তি।

রাজা বলল, 'তোমাকে আমি বিয়ে করব। তুমি হবে হাওয়াই দ্বীপের রানি।'

মেয়ে কোন কথা বলল না। অল্প হেসে মাথা নেড়ে বুঝিয়ে দিল, সে রানি হতে চায়। রাজা সাগরকন্যার গলায় পরিয়ে দিল মুক্তোর মালা, হাতে পরিয়ে দিল প্রবালের বালা।

অনেক দিন কেটে গেল। দ্বীপের অপরূপ শোভা আর সৌন্দর্যের মধ্যে তাদের দিন কাটে। সুখে শান্তিতে। দ্বীপের সবকিছুতেই মেয়ে অবাক হয়, সবকিছুকেই সে ভালোবাসে।

এমনি করে দিন কাটে। একদিন মেয়ে বলল, 'তুমি আমায় অনেক দিয়েছ। সবচেয়ে ভালো জিনিস এই মুক্তোর মালা আর প্রবালের বালা। আমি তোমায় কিছু দিই নি। এবার একটা উপহার দেব।'

রাজা হেসে বলল, 'বেশ তো, দাও। কি উপহার তুমি দেবে।'

মেয়ে বলল, 'আমার প্রবাল রাজ্যে একজন ডুবুরি পাঠাও। সাগরের নীচে আমাদের প্রাসাদে সে একটা সুন্দর কাঠের বাক্স দেখতে পাবে। তার মধ্যে রয়েছে এক অমূল্য রত্ন। ডুবুরি সেই বাক্স নিয়ে আসবে। কিন্তু পথের মধ্যে সে যেন সেটা না খোলে। আমার হাতে দেবে। আমি আর আমার দুই ভাই বহু বছর ধরে সেই রত্ন রক্ষা করে এসেছি, পাহারা দিয়েছি।'

রাজা দ্বীপের সবচেয়ে ভালো ডুবুরিকে ডেকে সব বুঝিয়ে দিল। ডুবুরি মাথা নুইয়ে রাজাকে প্রণাম করে সাগরজলে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

বেশ কিছুক্ষণ পরে ডুবুরি উঠে এল তীরে। তার হাতে কাঠের বাক্স। রাজা প্রাসাদে ফিরে গিয়ে হিনার হাতে তুলে দিল সেই রত্নভরা বাক্স। খোলা আকাশের নীচে প্রাসাদের বাগানে হিনা বসে রয়েছে। বাক্স হাতে নিয়ে হিনা রাজার দিকে চাইল। একটু মিষ্টি হেসে রানি বাক্সের ডালা খুলে ফেলল। চোখ-ধাঁধানো গোলমতন কে যেন বেরিয়ে এল ভেতর থেকে। গোলমতন রত্ন ওপরে উঠছে, আরও ওপরে। উঠতে উঠতে সে আকাশে গিয়ে থামল। সে হল চাঁদ। হাওয়াই দ্বীপের মাথায় চাঁদ আটকে গেল। আগে আকাশে ছিল শুধুই তারা, আজ থেকে আকাশে দেখা দিল চাঁদ। অনেক তারার মাঝে একটি চাঁদ। সাগরকন্যার রত্ন।

মেয়ে রাজার মুখের দিকে চেয়ে হাসছে, রাজা আকাশে সেই রত্ন দেখে হাসছে। হঠাৎ মেয়ে সাগরের দিকে চেয়ে চমকে উঠল। সর্বনাশ! চাঁদের প্রতিবিম্ব সাগরজলে! মেয়ের চোখের কোল বেয়ে মুক্তো ঝরে পড়ল। মেয়ে হাত দিয়ে মুখ ঢেকে কাঁদছে। কাঁদতে কাঁদতে রানি বলল, 'হায়! কি হবে? সাগরজলে আকাশের চাঁদের প্রতিবিম্ব দেখে ভাইরা সব বুঝে ফেলবে। তারা জানবে, আমাদের রত্ন হারিয়ে গিয়েছে, রত্ন হাতছাড়া হয়ে আকাশে চলে গিয়েছে। দূর দূর সাগর থেকে একদিন তারা ফিরে আসবে, এসে দেখবে তাদের বোন প্রবাল রাজ্যে নেই। তারা বুঝবে, বোনই তাদের রত্ন নিয়ে গিয়েছে। তারা বন্যার দেহ নিয়ে আছড়ে পড়বে দ্বীপে। রেগে গিয়ে ভাসিয়ে দেবে আমাদের এই সুন্দর হাওয়াই দ্বীপ।' মেয়ে কেঁদেই চলেছে।

রাজা হেসে বলল, 'রানি, আমার হিনা, কোন ভয় নেই তোমার। আমাদের দ্বীপের ওই ওদিকে রয়েছে মস্ত উঁচু পাহাড়। বন্যা যদি আছড়েই পড়ে, আমার সব লোকজন, পশু আর ধনরত্ন নিয়ে আমরা উঁচু পাহাড়ে উঠে যাব। ওখানে সাগরজল পৌঁছবে না। কোন ভয় নেই তোমার।' তবু মেয়ে ভয়ে কাঁদছে।

পরের দিন দ্বীপের সবাই চলল উঁচু পাহাড়ে। পেছনে পেছনে বাড়ির সব পশু। ধনরত্নও সঙ্গেই নিল। সকলের সামনে হেঁটে চলেছে দ্বীপের রাজা আর রানি। তারা পৌঁছে গেল পাহাড়ে।

এমন সময়ে দূরে ঝড়ের শব্দ শোনা গেল। দূর সাগরের ওই দিক থেকে শব্দ ভেসে আসছে। হঠাৎ দেখা গেল,—সমুদ্র সাদা হয়ে ফুলে উঠল, প্রচণ্ড গতিতে এগিয়ে আসছে সাগরের জলের ওপরের সেই সাদা মেঘ। আছড়ে পড়ল দ্বীপের ওপরে। ভেসে গেল বাড়িঘর, ডুবে গেল নারকেল বাগান। জল আছড়ে পড়ল পাহাড়ের নীচে।

হিনা পাহাড়ের ওপর থেকে দেখতে গেল, তার দুই ভাই সাগরফেনার ওপরে বসে রয়েছে, চিৎকার করে ডাকছে। হিনা ভয়ে মুখ ঢেকে ফেলল।

সাগরজল নেমে গেল। ঝড়ের শব্দ থেমে গেল। রাজা রানি লোকজন নেমে এল পাহাড় থেকে। সাগরজলের বন্যায় সব বাড়িঘর পড়ে গিয়েছে, জমির সব ফসল নষ্ট হয়ে গিয়েছে, দ্বীপের সব কিছু এলোমেলো হয়ে গিয়েছে। দ্বীপ যেন কাঁদছে।

এত লোক, তাদের খাবার কিছু নেই। বাড়িঘর তৈরি করতে সময় লাগবে, তারা রয়েছে আকাশের নীচে। কত আনন্দ ছিল, সব মানুষ গরিব হয়ে গেল। রাজারও একই অবস্থা।

রাজা ভাবল, হিনাই দোষী। তার জন্যই এসব হল। সে না থাকলে তো এমন দশা হত না। তখন থেকে রাজা হিনাকে ঘৃণা করতে লাগল। তাকে ভালোবাসে না, তার সঙ্গে ভালোভাবে কথা বলে না, রানিকে অবহেলা করে। এমন অলক্ষুনে মেয়েকে কি আর রানি রাখা যায়। তাকে রাজা দাসী ভাবতে লাগল। সে হল রাজার দাসী।

রাজা হিনাকে সকাল থেকে খাটায়। রাত হলে হিনার কাজ শেষ হয়। সবচেয়ে কঠিন কঠিন কাজ তাকে করতে হয়। দেহ চলে না, তবু ভয়ে ভয়ে করতে হয়।

হিনা ভাবে, হায়! এ কি হল! কোথায় গেল রানির সুখ। কোথায় গেল রাজার ভালোবাসা। দ্বীপের সবচেয়ে গরিব মেয়েকেও এমন হাড়ভাঙা খাটুনি খাটতে হয় না। রাজা যেন আক্রোশের জন্য এমন করছে। দাসীর জীবনও এমন হয় না! হায়! যদি কোথাও শান্তি পেতাম, সেখানেই চলে যেতাম। হিনা ভাবে কিন্তু পথ পায় না।

হিনা ভাবে, ফিরে যাবে সাগরতলে প্রবাল রাজ্যে। কিন্তু ভাইদের ভয়ে তাও সাহস পায় না। কি যে করে এখন! দ্বীপের চারদিকে জল। রাজার হাত থেকে পালাবেই বা কোথায়?

একদিন তীরে বসে মাছ ধরছে সাগরকন্যা। চোখ দিয়ে মুক্তো ঝরছে। হঠাৎ দেখতে পেল, সাগরের ওপার থেকে এপার পর্যন্ত বিরাট রামধনু উঠেছে। সে ভাবল, আকাশের সূর্যের দয়া হয়েছে। তাই তার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছে এই রামধনু। রামধনু পথ দেখাচ্ছে। সূর্য যেন বলছে, এই পথ ধরে তুমি দ্বীপ থেকে পালিয়ে যাও।

হিনা ছুটে গেল রামধনুর কাছে। রামধনুর পথ বেয়ে সে ওপরে উঠতে লাগল। মনে আশা, সে পালাতে পারবে। ওপরে উঠছে, আরও ওপরে। সূর্যের অনেক কাছাকাছি। চোখ জ্বলছে, দেহ পুড়ে যাচ্ছে সূর্যের তাপে। তবু পালাতে হবে। ওপরে উঠছে জলকন্যা। আর পারছে না সহ্য করতে। জ্ঞান হারিয়ে ফেলল হিনা, হাত আল্‌গা হয়ে গেল। রামধনুর সেতু বেয়ে নীচে নেমে আসছে হিনা, ঝড়ের বেগে।

হায়! আছড়ে পড়ল বালির ওপরে। আঘাত পেয়ে জ্ঞান ফিরল হিনার। আবার সেই দ্বীপে। দাসী হিনা কেঁদে ফেলল।

হিনা উঠল না। সেখানেই শুয়ে শুয়ে কাঁদতে লাগল। সূর্য সাগরজলে ডুব দিল। আঁধার হল। আকাশে উঠল চাঁদ। তবু হিনা উঠল না।

হঠাৎ হিনা রাজার ডাক শুনতে পেল। রাগে কাঁপতে কাঁপতে রাজা তাকে ডাকছে। হিনা বুঝল এবার তাকে পেলে আর আস্ত রাখবে না। সারাদিন কোন কাজই সে করে নি। হায়! এখন সে কি করবে? বুক কাঁপতে লাগল। রাজা এসেই তাকে কাজ করতে বলবে। সারাদিনের শেষ-না-করা কাজ করাবে। হায়! সাগরকন্যার এ কি হল?

ঠিক সেই সময় এক অবাক কাণ্ড ঘটল। মেয়ে কোনদিন আগে এমন জিনিস দেখেনি। তার সামনেই চাঁদের রামধনু দেখা দিল। তার সামনে থেকে চাঁদের কাছ পর্যন্ত সেই চাঁদের রামধনু।

হিনা মনে মনে বলল, 'আঃ! কি মিষ্টি এই চাঁদের রামধনু। দেহ জুড়িয়ে গেল। আমি চাঁদেই যাব। আমি শান্তি পাব। চাঁদ আমায় এই পথ দেখাচ্ছে। চাঁদের রামধনুর সেতু বেয়ে আমি চাঁদে পৌঁছে যাব।'

দেহে শক্তি পেল হিনা। হিনা উঠে দাঁড়িয়েই চাঁদের রামধনু ধরে ফেলল। সেতু বেয়ে ওপরে উঠছে। কিন্তু এ কি! পা ধরে টানছে কে? রাজা পৌঁছে গিয়েছে সেখানে। দেখল, রুপোলি সেতু বেয়ে হিনা পালাচ্ছে। পা ধরে নীচ থেকে টানছে রাজা, মেয়েও ওপরে উঠতে চাইছে। ভীষণ টানাটানি। মেয়ের পা বুঝি ভেঙেই যাবে। মেয়ে বুঝল, এবার পালাতে না পারলে আর রক্ষা নেই। প্রাণপণ শক্তিতে রুপোলি সেতু ধরে সে ওপরে উঠতে চাইছে। পা দুমড়ে গেল। হিনা কাত্‌রাতে কাত্‌রাতে ওপরে উঠতে লাগল। পেছন ফিরে তাকালো না হিনা। অনেকক্ষণ ধরে শুনতে পেল। রাজা চিৎকার করছে।

শেষকালে সাগরকন্যা হিনা পৌঁছে গেল রুপোলি চাঁদের শীতল রাজ্যে। আঃ! কি শান্তি!

এখনও প্রবাল রাজ্যের রাজকুমারী চাঁদেই রয়েছে। পা ভেঙেছে, খোঁড়া হয়েছে। তবু শান্তি, অনেক সুখ।

তোমরা যখন দেখবে চাঁদের চারপাশে পরির মতো সাদা মেঘ ভেসে ভেসে বেড়াচ্ছে, বুঝবে ওগলো হিনার পশম বোনার কারুকাজ। হিনা পশম বোনে চাঁদে। সেগুলো সাদা মেঘের মতো চাঁদকে ঘিরে থাকে। একদিন যে ছিল প্রবাল রাজ্যের সাগরকন্যা, আজ সে চাঁদের দেশের আকাশি কন্যা। এই চাঁদ যে একদিন তারই বন্দি রত্ন ছিল। যে মেয়ে তাকে অন্ধকার বন্দিদশা থেকে মুক্তি দিয়েছে, তাকে সে বুকে টেনে নেবে না?

উলা আর উইম্‌বো

ছোট ছোট পাহাড়। এধারে-ওধারে ঝোপঝাড়। পাশেই তির্‌তিরে ছোট্ট নদী। জলের নীচে পাথরকুচি দেখা যাচ্ছে। দুপুর বেলা। ছোট্ট টিকটিকি উলা খাবার খুঁজছে ঝোপে, ডালে, পাহাড়ের ফাঁকে। চুপ করে মাথা হেলিয়ে এধার-ওধার চোখ রাখছে। টুপ করে পোকা-মাকড় ধরছে, গিলেও ফেলছে। উলার পেছনে পেছনে ঘুরছে তিনটে ছোট্ট বাচ্চা টিকটিকি। তারই দুই ছেলে আর এক মেয়ে। মা তাদের মুখেও মাঝে-মধ্যে ছোট্ট পোকা গুঁজে দিচ্ছে। মহা আনন্দ ছেলে-মেয়ের।

হঠাৎ উলা কেমন ভয় পেয়ে গেল। ঝোপের আড়ালে কিরকম যেন শব্দ হচ্ছে। অন্যরকম খস্‌খস্‌ আওয়াজ। উলা মাথাটা ওদিকে নিল, এদিকে ঘোরালো। তেমন দেখলে সে ঠিক পালাতে পারবে। কিন্তু সঙ্গে রয়েছে তিনটে ছানাপোনা। ওরা তো তেমন বড় হয়নি, পালাবে কেমন করে? ওদের ফেলে উলা পালাবে কেমন করে? মা তো চুপ করে তাকিয়ে আছে। নড়ছে না, খাবার খুঁজছে না। বাচ্চা তিনটেও ভীষণ ভয় পেয়ে গেল। যেদিক থেকে শব্দ আসছে, উলা চোখ ঘুরিয়ে মাথা বেঁকিয়ে ভয়ে ভয়ে সেদিকে চেয়ে রইল।

হঠাৎ একটা সাদা টিকটিকি ওপাশের ঘন ঝোপের ডাল থেকে লাফিয়ে পড়ল উলার ঠিক সামনে। ছেলে টিকটিকি। মাথা তুলে সামনের দুই পায়ে দেহ উঁচিয়ে সাদা টিকটিকি বলল, 'আমি সাদা টিকটিকি। আমার নাম উইম্‌বো। তুমি কালো দলের মেয়ে, তবু আমি তোমায় বিয়ে করব। পালাতে পারবে না। পালালে বাচ্চাদের মেরে ফেলব। চলো আমার সঙ্গে।'

উলা পেছন ফিরে ছানাদের দিকে একবার তাকিয়ে দেখল। বুকটা কেঁপে উঠল। চোখে চোখে কি কথা হল, উলা চলল উইম্‌বোর পাশে পাশে, ছানারা চলল মায়ের পেছনে পেছনে। চারজনের বুক কাঁপছে।

গাঁয়ে ঢুকছে উইম্‌বো। সর্দারের বাড়ির পাশ দিয়ে যাচ্ছে। সর্দার দাওয়ায় বসে বর্শা তৈরি করছিল। উইম্‌বো আর ওদের দেখে বুঝতে পারল। রেগে গিয়ে চেঁচিয়ে বলে উঠল, 'এই হতভাগা, ওই মেয়েটাকে বিয়ে করে আনলি কেন? এক্ষুনি কালো দলের লোকেরা ছুটে আসবে। যুদ্ধ বাধবে। গাঁয়ে কি সাদা মেয়ের অভাব আছে? উট্‌কো ঝামেলা বাধাস কেন? কে এখন এসব সামলাবে?'

উইম্‌বো বলল, 'গায়ের সবাই লড়ব। ওদের হারিয়ে দেব।'

সর্দার হাত নেড়ে বলল, 'কেউ লড়বে না। কেন লড়বে? কেন মরবে? তুই করবি বিয়ে আর বিপদ হবে সবার? তোর হয়ে কেউ লড়বে না। কাউকে লড়তে দেব না।'

উইম্‌বো বলল, 'বেশ, কাউকে লড়তে হবে না। আমি একাই লড়ব। বুদ্ধি করে ওদের হারিয়ে দেব। বিয়ে যখন একবার করেছি তখন বউকে ছাড়ছি না। বাচ্চাদেরও না। ভয় নেই, গাঁয়ের কারও কিছু হবে না। আমি একাই পারব।'

সর্দারের বাবা কুঁজো হয়ে দাওয়ার একধারে বসে ছিল। সে বলল, 'পারবে, পারবে, ও একাই পারবে। ওর সাহস আছে, ওর আছে বুদ্ধি। ওদুটো থাকলে কেউ হারে না।'

বুড়োর কথা কেউ শুনতে পেল না। সর্দার আবার বলল, 'খুব কথা ফুটেছে মুখে। একা পারবি কেমন করে? ওরা তো আসবে দল বেঁধে।'

উইম্‌বো আর কিছু বলল না। নিজের বাড়ির দিকে চলল। ঘরে ঢুকে পড়ল। উলা আর বাচ্চারাও ঘরে ঢুকল।

সর্দার তাকিয়ে রয়েছে নদীর ওপারে। চোখ কঁচকে কপালে হাত রেখে শুধুই তাকিয়ে রয়েছে। হঠাৎ বলে উঠল, 'যা ভেবেছি ঠিক তাই। ওই আসছে কালো টিকটিকির দল। ছুটে আসছে। এই হতভাগা, যা এবার। কত সাহস দেখব।'

কথা শেষ না হতেই গাঁয়ের ছেলে-বুড়ো সবাই বাইরে বেরিয়ে এল। নদীর ওপারে দলে দলে কালো টিকটিকি। সবার হাতে তির-ধনুক-বর্শা-লাঠি।

উইম্‌বো ঘর থেকে বেরিয়ে এল। তার হাতে শক্ত কাঠের একটা মুখোশ। তাকে দেখেই সর্দার বলে উঠল, 'যা, একাই যা। আমরা নেই ওসব বউ-চুরির মধ্যে।'

ততক্ষণে উইম্‌বো মুখে মুখোশ পরে নিয়েছে। হাতে একটা ছুঁচলো বর্শা নিয়ে ছুটে গেল নদীর পারে। গাঁয়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে সবাই দেখতে লাগল।

ছোট্ট নদী। উইম্‌বো চেঁচিয়ে বলল, 'সাহস থাকে এগিয়ে আয়। আমার নাম উইম্‌বো।'

শত্রুরা এগিয়ে আসছে। আরও কাছে, নদীর ওপারে। শত শত তির ছুটে এল এদিকে। দেহ বেঁকিয়ে মুখটা সামনে রেখে হঠাৎ বসে পড়ল উইম্‌বো। দেহে তির বিঁধল না, অনেকগুলো তির এসে মুখে লাগল। মুখোশে লেগে পড়ে গেল অনেক তির। কাঠের শক্ত মুখোশ। কিছুই হল না তার। মুখ রয়েছে মুখোশের পেছনে।

উইম্‌বো নড়ছে না, পড়ে রয়েছে মাটিতে। ওরা ভাবল, সে মরে গিয়েছে। একা এসেছে লড়তে! একবার লড়াইতেই শেষ। আমাদের সঙ্গে লড়াই করা?

হঠাৎ উইম্‌বো উঠে দাঁড়াল। হাত তুলে বর্শা বাগিয়ে ধরল। ওরা অবাক হল,—তাহলে শত্রু মরেনি!

আবার তিরের ঝাঁক। আগের চেয়ে শতগুণ বেশি। এধার-ওধার চারধার থেকে। আবার কায়দা করে বসে পড়ল সে। বর্শা তার হাতেই রইল। কিন্তু এবারও কিছু হল না তার। তির দেহে বিঁধল না, মুখোশে লেগে পড়ে গেল।

বেশ কিছুক্ষণ পড়ে রইল উইম্‌বো। এবার আর কি কৌশল করা যায় তাই ভাবছে। এর মধ্যে জল পেরিয়ে শত শত কালো টিকটিকি এপারে চলে এসেছে। তাকে চারধার থেকে ঘিরে ফেলল।

উইম্‌বো এটা বঝতে পারেনি। চোখ তুলেই দেখে তার চারপাশে শত্রু। এবার পালাবে কোথায়? নাঃ, এবার বুঝি মরতেই হল। হঠাৎ উইম্‌বো দেহ বেঁকিয়ে লাফ

দিল নদীর জলে। অনেক কালো টিকটিকি এদিকে এসেছিল জল পেরিয়ে,—তাই জল ঘোলা হয়ে উঠেছে। জলের মধ্যে তারা আর উইম্‌বোকে দেখতে পেল না।

কিন্তু দেখতে না পেলে কি হবে, ঝাঁকে ঝাঁকে তির এসে পড়ল নদীর জলে। টুপ টুপ করে তির পড়ছে জলে। উইম্‌বো বুঝল, বিপদ আরও বেড়ে যাচ্ছে। কোন তির যে কখন গায়ে লাগে!

হঠাৎ সে মুখের মুখোশ খুলে ফেলল। লুকিয়ে পড়ল বালি আর পাথরকুচির মধ্যে। হাঁফ ছাড়ল সে।

কাঠের মুখোশ। দু একবার ওলটপালট খেয়েই ভেসে উঠল জলের ওপরে। ওরা তাকিয়ে দেখল, ওটা জলে ভাসছে। কয়েকটা তিরও গিয়ে লাগল। কিন্তু ওটা আর পালাচ্ছে না। তাহলে? তাহলে উইম্‌বো মরেই গিয়েছে। আমাদের সঙ্গে চালাকি? উইম্‌বো মরে জলে ভাসছে। হৈ হৈ করে আনন্দ করতে করতে কালো টিকটিকির দল ফিরে চলল। তারা নদীর ওপারে গেল। তারপর পাহাড়ের আড়ালে মিলিয়ে গেল।

এ গাঁয়ের সবাই দেখছে ওদের লড়াই। শত্রুরা ফিরে যাচ্ছে। সর্দার বলে উঠল, 'অত সোজা একা লড়াই করা? হল তো! এমনি করে মরতে আছে? একটুও বুদ্ধি নেই। একা কখনও লড়াই করতে হয়?' সর্দার বসে পড়ল দাওয়ায়।

গাঁয়ের সবার মন খারাপ। তারা ভাবছে, কি দরকার ছিল ওকে একা পাঠানো? না হয় বিয়ে করেই এনেছে। সর্দার অন্যদের পাঠাতে পারত। সর্দার নিষেধ করল, নইলে ওরাও যেত। কিন্তু সর্দার না বললে যায় কেমন করে? অনেক কিছু ভাবছে তারা।

হঠাৎ তারা দেখতে পেল, হাতে কাঠের মুখোশ নিয়ে উইম্‌বো ফিরে আসছে। সে হাসছে। এমনভাবে আসছে,—তাহলে তো ওর গায়ে আঁচড়ও লাগে নি। সবাই অবাক হয়ে চেয়ে রইল।

উইম্‌বো গাঁয়ে ঢুকে সর্দারের দাওয়ার সামনে দাঁড়িয়ে নরম গলায় বলল, 'সর্দার, আমাদের মোড়ল, ওদের আমি হারিয়ে দিয়েছি। দেহের শক্তিতে নয়, বুদ্ধিতে। আমি একাই লড়েছি।'

সর্দার নেমে এল দাওয়া থেকে। হাত বাড়িয়ে উইম্‌বোর দু-কাঁধে ঝাঁকুনি দিয়ে বলল, 'তুই পারবি, তুই পারবি আমাদের ভালো করতে। তোর অনেক বুদ্ধি। আমি বুড়ো হয়েছি। এবার তুই হবি গাঁয়ের সর্দার। আমরা সবাই তোকে মানব। আমাদের ভালো হবে, বিপদ-আপদ ঘটবে না। তোমরা জেনে রাখো—আজ থেকে উইম্‌বো হবে এই গাঁয়ের সর্দার, আমাদের গোষ্ঠীপতি।'

পরবের মতো খাওয়া-দাওয়া হল। অনেক আনন্দ-গান-নাচ। সবার মনে আনন্দ। নতুন সর্দার আমাদের, আমাদের উইম্‌বো।

সাত বোন

অনেক কাল আগে এক গভীর জঙ্গালে সাত বোন ছিল। তারা খুব সুন্দরী। এমন রূপ কমই দেখা যায়। তাদের সাত জনেরই চুল ছিল কোমর পর্যন্ত লম্বা, আর চুল ছিল যেমন কালো তেমনি ঘন। তাদের দেহের রঙ ছিল সাদা, সাদা বরফের মতো। ছোট্ট ছোট্ট তুষার-কণা দেহে লেগে রইত। কি সুন্দর যে লাগত! যেন তুষার-রঙা ঘামের বিন্দু দেহের ওপরে।

কিন্তু তারা ছিল একটু অদ্ভুত। কারও সঙ্গো তারা মিশত না। সাত জনে একা একা থাকত। সাত বোন একসঙ্গো শিকার করতে যেত। তারা যেমন কারও সঙ্গো যেত না, তেমনি তাদের সঙ্গোও কাউকে নিত না। কারও সঙ্গো তারা সই পাতাতো না, তাদের কেউ বন্ধু ছিল না। বড় অদ্ভুত এই সাত বোন।

পাশের জঙ্গালে থাকত সাত ভাই। তারা দেখত, সাত বোন একসঙ্গো শিকারে যায়। তাদের খুব ইচ্ছে এই সাত বোনকে বিয়ে করে। খুব সুন্দরী বউ হত তাহলে। সাত বোন যখন শিকারে যায়, পেছন পেছন যায় সাত ভাই। একটু দূরে দূরে থাকে যাতে সাত বোন তাদের দেখতে না পায়। কিন্তু গাছের ফাঁক দিয়ে নজর রাখে,—তারা কোথায় যায়, কি শিকার করে, কোথায় বিশ্রাম করে, সবকিছু নজর রাখে।

এই সাত ভাই একটা জিনিস জানত। অন্য কেউ জানত না। সাত বোনও জানত না। তারা বনের মধুর খবর জানত। চাক ভেঙে কীভাবে মধু জোগাড় করতে হয় তা তারা খুব ভালোভাবে শিখেছিল। মৌমাছিদের এমন কায়দায় তাড়াত যে সেগুলো তাদের কামড়াতেও পারত না।

কোন গাছের ঘন পাতার মধ্যে মধুর চাক আছে। তারা করত কি, একটা মৌমাছিকে ধরত। তার পেছনে গাছের আঠা লাগিয়ে দিত আর আঠার মধ্যে গুঁজে দিত পাখির ছোট্ট একটা পালক। মৌমাছি জোরে উড়তে পারত না, আস্তে আস্তে উড়ত। এরাও পেছন পেছন যেত। মৌমাছি গিয়ে চাকে বসত। তখন ওরা চাক ভেঙে মধু নিত।

একদিন সাত ভাই অনেকটা মধু একটা মাটির ভাঁড়ে রাখল। প্রতিদিন যেখানে সাত বোন শিকার করতে এসে বিশ্রাম করত, সেটা আগে থেকেই সেখানে রেখে দিল। দূরে লুকিয়ে থেকে দেখতে লাগল কি হয়।

মেয়েরা শিকার করে গাছের নীচে বিশ্রাম করছে। হঠাৎ দেখতে পেল সেই মধুর ভাঁড়। এক বোন একটা আঙুল ডুবিয়ে মুখে দিল। অবাক হল। এমন সুন্দর জিনিস সে আগে কখনও খায়নি। সবাই খেল। খুব খুশি। কিন্তু কীভাবে এমন জিনিস এখানে এল তা বুঝতে পারল না। আগেও অনেকবার এখানে এসেছে, কিন্তু কোনদিন দেখেনি।

এমন সময় সাত ভাই গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল। তারাই সে এই মধু রেখেছে তাও বলল। তাদের মনের কথা জানাল। সাত ভাই সাত বোনকে বিয়ে করতে

চায়। খুব সুখে রাখবে তাদের। সাত বোন কথা বলল না, তাদের সঙ্গে শিকারেও যেতে চাইল না। তারা বিয়ে করতে মোটেই রাজি হল না। হাবভাবে এসব বুঝিয়ে দিল। সাত ভাইয়ের মন খারাপ হয়ে গেল।

এখন হয়েছে কি, এক এলাকায় এক মস্ত শিকারি ছিল। তার নাম উরবুনাহ্। একদিন সে বাড়ি ফিরছে। সারাদিন বনে বনে শিকার করেছে। খুব ক্লান্ত সে। বিকেল গড়িয়ে গিয়েছে, বাড়ি ফিরল শিকারি। ভীষণ খিদে পেয়েছে তার। বাড়িতে ঢুকেই মায়ের কাছে খাবার চাইল। মা বলল, এখনও খাবার তৈরি হয়নি। ক্লান্তিতে খিদেতে এমনিতেই তার মাথা গরম ছিল। মায়ের কথা শুনে সে আরও বেশি রেগে গেল। ভীষণ ঝগড়া করল মায়ের সঙ্গে।

মা আস্তে আস্তে বলল, 'বাছা, শুধুই রাগ করছিস। কি করব বল ? এক ফোঁটাও ঘাসের বীজ বাড়িতে নেই। কি দিয়ে রুটি বানাব ? ঘাসের বীজ না থাকলে আমি কি করব ? এত গরিব আমরা।'

ছেলে গেল আরও রেগে। রাগের মাথায় ওসব কথা শুনতে ভালো লাগে না। সে চিৎকার করে বলল, 'কাউকে কিছু বানাতে হবে না। আমি নিজেই রুটি বানিয়ে নেব।'

ঘরে ঢুকে হাঁড়ি খুঁজতে লাগল। কিন্তু সব ফাঁকা। কোন হাঁড়িতে এক তিল ঘাসের বীজ নেই ॥

ছেলে তিরের বেগে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল। তার যেন মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে। খিদে পেলে মানুষের কাণ্ডজ্ঞান থাকে না। সে বন্ধুদের বাড়ি গেল। এ বাড়ি সে বাড়ি ঘুরল। ঘাসের বীজ কিছুটা ধার চায়। কিন্তু কোন বাড়িতেই সে ধার পেল না। কেউ তাকে ধার দিল না। সবাই বলল, নেই। সে ভাবল, আসলে সবার ঘরেই বীজ আছে, কিন্তু তাকে কেউ দিচ্ছে না। প্রথমে সে খুব রেগে গেল, রাগে কাঁপতে লাগল। তারপর তার মনে খুব কষ্ট হল। তার এত খিদে পেয়েছে আর কেউ তাকে ধার দিল না ? তাকে বিশ্বাস করে না ? এরাই তার গাঁয়ের আপনজন ? এত খারাপ এরা ? নাঃ, সে আর এদেশে থাকবে না। নতুন মানুষের খোঁজে যাবে। ছেলে আর বাড়ি ফিরল না। বেরিয়ে পড়ল নতুন দেশের খোঁজে।

শিকারি বনের পথে হাঁটছে, হাঁটছে। পেট গুলিয়ে উঠছে, মাথা ঘুরছে। হঠাৎ সে একজন বুড়ো লোককে দেখতে পেল। বুড়ো গাছ থেকে মৌচাক পেড়ে তার থেকে মধু বের করছে। পায়ের শব্দে বুড়ো মুখ তুলে চেয়ে রইল তার দিকে। শিকারি এগিয়ে আসছে বুড়োর কাছে। একেবারে কাছে এসে সে দেখল, বুড়োর কোন চোখ নেই। অত দেখার সময় নেই, উররুনাহ্ বুড়োর কাছে খাবার চাইল। বুড়ো তাকে অনেকটা মধু দিল। সঙ্গে সঙ্গে খেয়ে ফেলল শিকারি। আহ্, প্রাণ বাঁচল। কি শান্তি। বসে পড়ল ঘাসের ওপর।

বুড়ো জিজ্ঞেস করল, 'গাঁ কোথায় ? থাকো কোথায় ? কত দূরে ? ইচ্ছে করলে আমাদের গাঁয়ে থেকে যেতে পারো। কোন ভয় নেই, ভাবনা নেই।'

বুড়োর কথা শুনে শিকারির খুব ভালো লাগল। আপনজনের মতো কথা। কিন্তু বুড়োর কথাবার্তা শুনে তো মনে হচ্ছে না, বুড়ো চোখে দেখতে পায় না। অথচ তার তো চোখ নেই। অবাক ব্যাপার।

শিকারি বলল, 'তুমি কি দেখতে পাও? কথা শুনে মনে হচ্ছে দেখতে পাও। অথচ চোখ কোথায়?'

বুড়ো মিষ্টি হেসে বলল, 'হ্যাঁ, খুব ভালোভাবে দেখতে পাই। ঠিক তোমার মতো। তবে হ্যাঁ, তোমার মতো চোখ নেই। আমাদের এই আদিবাসী গোষ্ঠীর কারও চোখ নেই। কিন্তু সবাই দেখতে পাই। আমরা নাক দিয়ে দেখতে পাই। নাকই আমাদের চোখ।'

শিকারি এমন অদ্ভুত কথা আগে কখনও শোনেনি। বুড়োর মধু দেওয়া, বুড়োর কথাবার্তা তার খুব ভালো লেগেছে। কিন্তু এমন গোষ্ঠীর মধ্যে তার থাকতে সাহস হল না। যদি কিছু হয়? না, সে থাকবে না। আরও এগিয়ে যাবে। দেহে বলও ফিরে এসেছে।

শিকারি এগিয়ে চলল, দু-একবার পেছন ফিরে দেখল। বুড়ো আবার একমনে কাজ করছে। হাঁটতে হাঁটতে সে এসে পৌঁছল একটা ছোট্ট হ্রদের তীরে। আঃ, কি স্বচ্ছ টল্‌টলে জল। নীচের বালি-পাথরকুচি পর্যন্ত স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। কেউ নেই আশেপাশে। সে এখানেই থাকবে।

হ্রদের টল্‌টলে জল অনেকটা খেল। মাথায় মুখে জলের ছিটে দিল। খুব ভালো লাগল। একটা ঘন গাছের নীচে শুয়ে পড়ল।

সকালের রোদ গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে তিরের মতো এসে পড়েছে ঘাসে। শিকারি চোখ মেলে চাইল। এক ঘুমেই রাত ফুরিয়ে গিয়েছে। চোখ খুলে সামনে চাইতেই সে অবাক হয়ে গেল। কোথায় গেল সেই হ্রদ? সেই টল্‌টলে জলের হ্রদ? ওই হ্রদ থেকেই তো জল খেয়েছিল? এখন মাঠ। সবুজ ঘাসের বিরাট মাঠ। সে অবাক হল, ভয়ও পেল। এ কেমন দেশ?

হঠাৎ আকাশ জুড়ে মেঘ করে এল। থম্‌থম্ করছে চারিদিক। ঝড় আসবে। হ্রদ নিয়ে ভাববার সময় নেই। একটা আস্তানা তৈরি করতে হবে। ঝড়-জল থেকে বাঁচতে হবে। সে লেগে পড়ল কাজে। গাছের মোটা মোটা ডাল মাটিতে পুঁতে ফেলল। গাছের বাকল নিয়ে এল। অনেক। ছাদ আর বেড়া করতে হবে। একটা গাছের সুন্দর বাকল দেখতে পেল। গায়ের জোরে হাত দিয়ে বাকল টানতেই সে অবাক হয়ে গেল। বাকলের নীচে গাছের সঙ্গে লেগে রয়েছে একটা অদ্ভুত জন্তু। এমন জন্তু সে আগে দেখেনি। ভয়ে তার বুক কেঁপে উঠল।

হঠাৎ জন্তুটা আকাশ-ফাটা গর্জন করে উঠল, 'আমি বুল্‌গাহ্‌নুন্‌নু। আমি.... '

বাকল ছেড়ে দিল শিকারি। পেছন ফিরেই ঝড়ের বেগে দৌড় দিল। ভয়ে তার বুক ভীষণভাবে কঁপছে। ওঃ, খুব বাঁচা বেঁচে গিয়েছে।

তারপর সে থামল। আর ছুটতে পারছে না। আর বোধহয় ভয় নেই। শান্ত হয়ে সে বসে পড়ল ঘাসের ওপর।

হঠাৎ শিকারি দেখতে পেল, দূরে একটা নদী। আর অনেক এমু পাখি ঝাঁক বেঁধে সেই নদীতে জল খেতে আসছে। শিকারি ঠিক করে ফেলল একটা পাখিকে মারতে হবে। তাহলে আর আজকের খাবারের জন্য ভাবতে হবে না। গুটিগুটি এগিয়ে সে নদীর পাশে একটা গাছে উঠে পড়ল। ঘন পাতার আড়ালে লুকিয়ে রইল। এমুরা অনেক কাছে এসেছে। শিকারি বর্শা ছুড়ে মারল। বড় শিকারি। বর্শা গিয়ে বিঁধল একটা এমুর গায়ে।

গাছ থেকে নেমে আহত এমুকে সে ধরতে ছুটেছে। এমু ছট্ফট্ করছে। হঠাৎ শিকারি বুঝতে পারল, ওগুলো এমু পাখি নয়। ওরা এক অজানা গোষ্ঠী। তাদেরই একজনকে সে বর্শায় বিঁধেছে। ও আর বাঁচবে না। সে পাখি ভেবে মানুষ মেরেছে। শিকারি বুঝল, এখুনি বিপদ হবে। ওরা লোকটাকে বাঁচাতে চেষ্টা করবে। এইবার ধাওয়া করবে হত্যাকারীকে। খুঁজবে কে এমন কাজ করল। ওরা অনেকে।

শিকারি পেছন ফিরে ঘন বনের মধ্যে দিয়ে দৌড় দিল। এঁকেবেঁকে সে ছুটে চলেছে, ওঃ, খুব বাঁচা বেঁচে গিয়েছে। ওরা যদি ওকে ধরতে পেত, ওমনিভাবে বর্শা দিয়ে মারত। আর ওপথে নয়।

উরবুনাহ্ পথ চলছে, বনের পথে এগিয়ে যাচ্ছে। শেষকালে এক জায়গায় এসে সে ঘাসের ওপরে বসে পড়ল। মাথার ওপরে গাছের ঘন ডালপালা। হঠাৎ শিকারী সাত বোনকে দেখতে পেল। অল্প দূরেই তারা বসে রয়েছে। শিকারি উঠে তাদের কাছে গেল।

তারা বলল, 'আমরা সাত বোন। এখান থেকে সেখানে, সেখান থেকে ওখানে ঘুরে বেড়াই। অন্য কারও সাথে কথা বলি না, কারও সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতাই না। কিন্তু আজ রাতটুকু তুমি আমাদের সঙ্গে থাকতে পারো। কালকেই তোমাকে চলে যেতে হবে।'

এই বলে সাত বোন শিকারিকে অনেকটা খাবার দিল। খুব খিদে পেয়েছে তার। সে কোন কথা না বলে খেতে লাগল। খাওয়ার পরেও সে কিছু বলল না। চুপচাপ শুয়ে পড়ল।

ভোর হতেই শিকারি এমন ভান করল যেন সে বহু দূরে চলে যাচ্ছে। অন্য পথে সাত বোন রওনা দিল। শিকারি ঘন বনের মধ্যে দিয়ে ঘুরে এসে সাত বোনের পেছন পেছন যেতে লাগল। লুকিয়ে লুকিয়ে সে যাচ্ছে যাতে ওরা দেখতে না পায়।

সাত বোন একজায়গায় থামল। মাটির গর্তে কি যেন দেখল। সেই গর্ত থেকে কয়েকটা ডিম তুলে নিল। তারপর গোল হয়ে বসে সেই ডিম খেতে লাগল। আপনমনে খাচ্ছে আর গল্প করছে।

শিকারি ঝোপের আড়ালে হামাগুড়ি দিয়ে ওদের দিকে এগেচ্ছে। ওদের পিছনে ওরা রেখে দিয়েছিল অনেকগুলো মেটে আলুর কাঠি। শিকারি হাত বাড়িয়ে দুটো কাঠি চুরি করেই ঝোপে লুকিয়ে পড়ল। ওরা কেউ দেখতে পায় নি।

খাওয়া শেষ করে সাত বোন উঠল। আবার অন্য কোথাও যাবে। মেটে আলুর কাঠি তুলে নিতেই দেখল, দুটো আলুর কাঠি নেই ! আশ্চর্য তো ! এই তো ছিল ! গেল কোথায় ? কেউ তো আসেনি এখানে ? তারা এধার-ওধার অনেক খুঁজল। কিন্তু দুটো কাঠি কোথাও পেল না।

শেষকালে ওরা ঠিক করল, যে দুই বোনের কাঠি হারিয়েছে, তারা এখানেই থাকবে। সেগুলো খুঁজবে। যতক্ষণ না পায় ততক্ষণ খুঁজবে। খুঁজে পেলে আবার পাঁচ বোনের কাছে যাবে। অন্য পাঁচ বোন ঘন বনে এগিয়ে গেল। দুই বোন খুঁজতে লাগল সে দুটো কাঠিকে।

তারা ঘন ঘাসের মধ্যে খুঁজছে, ঘন ঝোপের মধ্যে খুঁজছে। শিকারি ঝোপ থেকে বেরিয়ে এক জায়গায় শক্ত মাটিতে কাঠি দুটো পুঁতে দিল। আবার লুকিয়ে পড়ল ঝোপের আড়ালে। ঝোপের মধ্যে থেকে সবকিছু দেখতে পাচ্ছে।

দুই বোন পেছন ফিরেই কাঠি দুটো দেখতে পেল। মুখে হাসি ফুটল। ছুটে গিয়ে মাটি থেকে কাঠি তুলতে গেল। কাঠি টেনে তুলছে,— শিকারি ঝোপের আড়াল থেকে লাফ দিয়ে পড়ল। দুই হাতে দুই বোনকে শক্ত করে চেপে ধরল। তারা হাত ছাড়াতে চেষ্টা করল। পারল না। বুঝল, পালানো যাবে না। শান্ত হল দুই বোন।

শিকারি বলল, 'তোমরা আমার সঙ্গে যাবে। তোমরা দুজনে হবে আমার বউ। আমার তাই ইচ্ছে।'

বউ হতে দুই বোনের একটুও ইচ্ছে নেই। কিন্তু শিকারির দেহের শক্তি অনেক বেশি। তারা গায়ের জোরে পারবে না। তাই দুই বোন বউ হতে রাজি হল। উপায় কি ?

দুই বোন মনে মনে ভাবল, একদিন না একদিন যেমন করেই হোক শিকারির কাছ থেকে পালাতে হবে। সুযোগ পেলেই পালাবে।

শিকারি দুই বউয়ের মনের কথা বোঝে। তাই সব সময় নজর রাখে। সে ভাবে, তার হাত থেকে পালানো অত সহজ নয়। শিকারি কিন্তু খুব খুশি। দুই বউ পরমা সুন্দরী, কাজকর্মও মন দিয়ে করে। কিন্তু এরা দুজন বড় অদ্ভুত। কথা প্রায় বলেই না, বেশি রকমের শান্ত। তবু সে খুশি।

মেয়েদের দেহে রয়েছে সাদা তুষার-কণা। এগুলো শিকারির মোটেই ভালো লাগে না। শিকারি এগুলোকে গলিয়ে দিতে চায়। আগুনের পাশে দুই বউকে অনেকক্ষণ দাঁড় করিয়ে রাখে। বউ দুজন কিছু বলে না, ঠায় দাঁড়িয়ে থাকে। তুষার-কণার ঠান্ডা জল বাষ্প হয়ে উবে গেল, কিন্তু তবু তাদের দেহে কণাগুলো জ্বলজ্বল করতে লাগল। উজ্জ্বলতা কমল, কিন্তু দেহ থেকে কণাগুলো একেবারে মুছে গেল না।

এমনি করে দিন যায়। বউরাও শিকারিকে ভলোবেসে ফেলল। না, তাদের ভালোই লাগছে। শিকারি মানুষ ভালো। তারা সুখি হল। আনন্দে দিন কাটতে লাগল।

তবু দুই বোন যখন একা একা থাকে, অন্য পাঁচ বোনের কথা ভাবে, তাদের কথা বলে। মন কেমন উদাস হয়ে যায়। আহা ! ওরা এখন কোথায় ? কেমন আছে ? ভালো আছে তো ? স্বামীর সঙ্গে সুখে থাকলেও দুই বোন চিন্তা করে, একদিন ঠিক দেখা হয়ে যাবে পাঁচ বোনের সঙ্গে। আবার সাত বোন একসঙ্গে হেসেখেলে শিকার করে দিন কাটাবে।

একদিন উররুনাহ্ দুই বউকে বলল, 'পাহাড়ি দেবদারু গাছের ছাল ছাড়িয়ে নিয়ে এসো। আমার আগুন নিভে আসছে। একবার নিভে গেলে আর তো জ্বালাতে পারব না। আগুন আছে কিন্তু নতুন করে আগুন জ্বালাতে জানি না। সর্বনাশ হবে। গাছের বাকল নিয়ে এসো।'

কেঁদে ফেলল দুই বউ। কাঁদতে কাঁদতে বলল, 'ওগো, দেবদারু গাছের বাকল কাটতে বোলো না, ওই গাছের বাকল কাটলেই আমরা আর তোমার থাকব না। আমাদের হারাতে হবে। ও কাজ করতে দিয়ো না।'

শিকারি ভীষণ রেগে গেল। স্বামীর কথা অমান্য করা ? আসলে খাটতে চায় না ওরা। রাগে চিৎকার করে বলল, 'আমি বলছি, এক্ষুনি বাকল কেটে নিয়ে এসো। নইলে...। আগুন কমে আসছে দেখে শিকারি আরও বেশি রেগে গেল।

শিকারি শুনবে না তাদের কথা। বউ দুজন শিকারির শিকার করবার কুঠার নিয়ে পাহাড়ি বনে রওনা দিল। গোটা পথা তারা কাঁদছে। তারা দুটো পাহাড়ি দেবদারু গাছের নীচে এসে থামল।

চোখের জল মুছে তারা কুঠার দিয়ে আঘাত করল দেবদারু গাছে। সঙ্গে সঙ্গে দুটো গাছ বড় হতে লাগল, উঁচু হতে লাগল। মেয়ে দুটো কুঠার সমেত আটকে গেল গাছে। গাছ উঁচু হচ্ছে, মেয়েরা ওপরে উঠছে। গাছও আকাশ-পানে মাথা তুলছে, মেয়েরা আকাশ-পানে উঠছে। উঁচুতে, আরও উঁচুতে। শেষকালে দেবদারু গাছ আকাশে গিয়ে থামল। তাদের উঁচু হওয়া বন্ধ হল। মেয়েরা সেই দূর আকাশে।

হঠাৎ দুই বোন দেখতে পেল, মেঘের কোলে দাঁড়িয়ে পাঁচ বোন হাত বাড়িয়ে দুই বোনকে ডাকছে। পাঁচ বোন আগেই আকাশে পৌঁছে গিয়েছে। তারা অপেক্ষা করছিল দুই বোনের জন্য। দুই বোন জড়িয়ে ধরল পাঁচ বোনকে। কোথায় হারিয়ে গিয়েছিল দুই বোন, আবার তাদের ফিরে পেয়েছে। সাত বোন আবার একসঙ্গে হল। আকাশের ওই দূরের মেঘের রাজ্যে। বড় আনন্দের দিন আজ।

দূর থেকে শিকারি দেখতে পেয়েছে, দেবদারু ওর বউ দুজনকে নিয়ে ওপরে উঠে যাচ্ছে। রাগে সে ছুটে এল গাছের কাছে, হাতে তির-ধনুক-বর্শা। কিন্তু সে ওদের নাগাল পেল না। নীচ থেকেই হম্বিতম্বি করতে লাগল। শিকারি লাফাচ্ছে, উঁচু হচ্ছে, হাত-পা নাড়ছে আর মুখে বিড়্‌বিড় করে কি যেন বলছে।

সাত বোনের এক কুটুম্ব থাকত আকাশে। সে মাটির ওপরে শিকারির হম্বিতম্বি দেখে তো হেসেই খুন। কি মজা লাগছে। আহা! বেচারি। সেই কুটুম্বের হাসি আর কোনদিন থামল না। সে হল শুকতারা। আজও মিট্‌মিট করে হাসছে।

সেই সাত ভাই অনেক দিন বনে বনে পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরল, তারা প্রাণ দিয়ে সাত বোনকে ভালোবেসেছিল। কিন্তু সাত বোনকে বউ হিসেবে পায় নি। বড় কষ্টে বহু পথ তারা ঘুরেছে। নাঃ, আর কোনদিন সাত বোনের দেখা পায়নি। আকাশের দেবতা সাত ভাইয়ের মনের ব্যথা বুঝেছেন, তাদের ভালোবাসা তিনি দেখেছেন। আহা! ওরা সাত বোনের কাছাকাছিই থাকুক। তাই আকাশের দেবতা সাত ভাইকে মেঘরাজ্যে ঠাঁই দিলেন।

সাত বোন আকাশ-রাজ্যে তারা হয়ে ফুটে রইল। তারা হল সপ্তর্ষিমণ্ডল, সাত বোন একসঙ্গে রয়েছে। সাত ভাইও এল আকাশে। সারাদিন সাত ভাই মৌমাছি শিকার করে, মধু খায়। আর রাতে আকাশে ফুটে ওঠে তারা হয়ে। এই সাত ভাই হল কালপুরুষের কোমরবন্ধনী আর তরবারি। সাত তারা-বোন যখন গান গায়, সাত তারা-ভাই তখন আনন্দে নেচে ওঠে।

আকাশের সপ্তর্ষিমণ্ডলের সাত তারা-বোনই খুব উজ্জ্বল। কিন্তু এরই মধ্যে দুজনের আলো যেন অল্প কম। ওই দুটি তারা উর্‌রুনাহের বউ ছিল। আগুনের পাশে দাঁড় করিয়ে রেখেছিল শিকারি, তাই তুষার-কণার আভা অল্প কমে গিয়েছে।

সাত তারা-বোন, সাত তারা-ভাই আর কুটুম্ব শুকতারা আকাশে ফুলের মতো ফুটে রয়েছে আজও।

ডিরিরি আর বিব্‌বি

গাছ-গাছালির মধ্যে ছোট্ট একটা বাড়ি। গাছের ডালপালা আর পাতা দিয়ে তৈরি। সেই বাড়িতে থাকত এক মেয়ে। তার নাম ডিরিরি। তার চার মেয়ে। সবাই খুব ছোট। মায়ের বয়েসও বেশি নয়। চার মেয়ের বাবা নেই। বুমেরাং নিয়ে বাবা একদিন শিকারে গেল। আর ফিরল না। শিকার করতে গিয়েই সে মারা গেল। মা এখন বিধবা।

ডিরিরির বড় কষ্ট। সারাদিন খাটে, কাজ করে। নিজে হয়তো সারাদিন কিছুই খেল না। কিন্তু মেয়েদের খুব যত্নআত্তি করত। তার সাধ্যমতো সে মেয়েদের ভালোভাবে রেখেছিল। আহা! বাপ-মরা ছোট ছোট শিশু। ওদের যেন কষ্ট না হয়। মায়ের প্রাণ কাঁদত।

বড় বলতে বাড়িতে সে একা। আশপাশে কোন পড়শিও নেই। তাই মেয়েদের নিয়ে মা খুব ভয়ে ভয়ে থাকত। রাত হলে তো কথাই নেই, দিনের বেলাতেও ভয়। ডিরিরি ভাবত,—এই বুঝি বিপদ এল। মেয়েদের কথা ভেবে চমকে উঠত। তার শুধুই বিপদের ভয়। তাই বাড়ি থেকে কখনও সে বেশি দূরে যেত না।

এমনি করে ভয়ে-দুঃখে-কষ্টে তার দিন কাটে। সে ভাবে, কতদিনে যে মেয়েরা বড় হবে? বড় হলে তবে নিশ্চিন্ত।

এই সময় তার বাড়ির খুব কাছে একটা বাড়ি তৈরি হল। সারাদিন খেটেখুটে লোকটা বাড়ি তৈরি করল। ডিরিরি সেদিন বাইরেই বের হল না। মেয়েদের কাছে নিয়ে ঘরেই বসে রইল। সব দেখতে পেল ঘর থেকেই। সবসময় বুক কাঁপতে লাগল। এবার বুঝি সর্বনাশ হবে। কে যে এসে বাড়ি করল? কেন, দূরে তো অনেক ফাঁকা জায়গা আছে। এখানে আসার কি দরকার ছিল? কিন্তু এসব মনে মনে ভাবলেও মুখে কিছুই বলতে পারল না।

নতুন বাড়ি করেছে একটা পুরুষ। তার নাম বিব্‌বি। সে একা।

চারদিকে আঁধার হয়ে এল। রাত হল। ডিরিরি মেয়েদের ঘুম পাড়িয়ে জেগে বসে রইল। শুতে পর্যন্ত পারল না। ভয়ে বুক ঢিপ্‌ঢিপ্‌ করতে লাগল। ভয় বেড়েই চলল। আর সহ্য করতে পারছে না সে। যদি কিছু হয়? ডিরিরি ডুক্‌রে কেঁদে উঠল, 'হায়! হায়! ডিরিরি!' সারা রাত ধরে এমনিভাবে সে কেঁদে গেল। কান্না তার থামে না। শেষকালে আলো ফুটল, মেয়েরা জেগে উঠল।

দরজা খুলতেই সে দেখতে পেল, বিব্‌বি তার বাড়ির দিকে আসছে। বেশি করে বুক কাঁপতে লাগল তার।

বিব্‌বি দোরের সামনে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কি হয়েছিল? সারা রাত ধরে অমন করে কাঁদছিলে কেন? আধার রাতে অমন করে কাঁদতে আছে? কি হয়েছিল?'

ডিরিরির চোখ ফোলা, চোখ লাল। সারা রাত সে ঘুমোয় নি । ধরা গলায় বলল, 'সারা রাত জেগে বসেছিলাম। মনে হল, কে যেন বাড়ির চারপাশ দিয়ে হেঁটে বেড়াচ্ছে। শুধু পায়ের শব্দ, খুব ভয় হচ্ছিল। বুক কাঁপছিল। আগে কোনদিন এমন পায়ের শব্দ শুনিনি।' গাল বেয়ে চোখের জল গড়িয়ে পড়ল তার ।

বিব্‌বি বলল, 'তুমি তো একা নও, সঙ্গে রয়েছে তোমার চার মেয়ে। পাঁচজন থাকতে ভয়ের কি আছে? মিছিমিছি ভয়।'

দিন কাটল। এদিনও মা বাড়ি থেকে বেশি দূরে গেল না। ভয় তার কাটেনি। বিকেল যত গড়িয়ে যাচ্ছে, তার ভয়ও বেড়ে যাচ্ছে। এমনি করে আঁধার নামল। গাছের সারির ওপারে সূর্য ডুবে গেল। আবার শুরু হল তার কান্না। একটানা কান্নার শব্দ ভেসে আসছে, 'হায়! হায়! ডিরিরি।' সারা রাত এমনিভাবে সে কেঁদে চলল।

বিব্‌বি শুনছে তার কান্না। সারা রাত। সে-ও ঘুমোতে পারল না। শেষকালে সকাল হলেই বিব্‌বি ডিরিরির বাড়িতে চলে এল। এসেই বলল, 'কালও তো সারা রাত কেঁদেছ শুনতে পেলাম। ভয়? আমায় বিয়ে করো। আমি থাকব তোমার কাছে। আর ভয় পাবে না।'

ডিরিরি মেয়েদের দিকে চেয়ে দেখল। কেমন মনে হল। মাথা নেড়ে সে 'না' বলল। ডিরিরি তাকে বিয়ে করতে পারবে না। মুখে আর কিছু বলল না।

বিব্‌বি আর কিছু না বলে চলে গেল। সে মাঠের মাঝখানে গিয়ে কাজ করতে লাগল। একমনে কাজ করছে সে। সে একটা সুন্দর ধনুক তৈরি করল। ধনুকে অনেকগুলো রং। চোখ-জুড়ানো রং। আকাশের একদিক থেকে অন্যদিকে ছড়িয়ে-পড়া ধনুক। এই ধনুক পৃথিবী থেকে তারার দেশে যাওয়ার রঙিন পথ। আঃ, কি সুন্দর।

ডিরিরি আকাশ পানে চেয়েই ভয়ে কাঁপতে লাগল। সব জিনিসেই তার ভয়। আর এমন অবাক-করা বিশাল ধনুক সে আগে কখনও দেখেনি। তার বুক আরও কাঁপতে লাগল। যদি বাছাদের কিছু হয়? সে আরও জোরে কাঁদতে শুরু করে দিল। 'হায়! হায়! হায়!'

ডিরিরি এদিক-ওদিক চাইল। আহা, যদি বিব্‌বিকে দেখতে পেত। মনে সাহস পেত। বড় একা একা লাগছে। কিন্তু এধারে-ওধারে কোথাও সে বিব্‌বিকে দেখতে পেল না। সে তখন কোথায় কোন বনে চলে গিয়েছে ডিরিরি তা জানে না। জলা-ভরা চোখে তবু সে পড়শিকে খুঁজতে লাগল। ডিরিরি আকাশের ওই দৃশ্য আর সহ্য করতে পারছে না। এবার বোধহয় তার বুক ফেটেই যাবে। সে চার মেয়ের হাত ধরে অল্প দূরে পড়শির বাড়ির দিকে হাঁটছে আর বারবার আকাশে ও পেছনের দিকে চাইছে, শেষকালে কোনরকমে বিব্‌বির বাড়ির সামনে এল।

উঁকি মেরে দেখল, বিব্‌বি ঘরে বসে রয়েছে। একটা বুমেরাং বানাচ্ছে। ডিরিরি কাঁদতে কাঁদতে বলল, 'ওটা কি? কেন হল? এখন কি করি?'

বিব্‌বি ঠোঁটের কোণে একটু হেসে বলল, 'কি, ওই রামধনু? ও তো আমিই বানিয়েছি। তাহলেই বুঝে দেখ, আমি কত শক্তিমান। দেহে কত শক্তি থাকলে ওরকম বড় জিনিস বানানো যায়। তাইতো বলছি, আমায় তুমি বিয়ে করো, তোমার কোন ভয় নেই, কোন বিপদ আসতে দেব না। ভয়ে ভয়ে দিন আর রাত কাটাতে হবে না।'

ডিরিরি কিছুই বলছে না। চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে। মাঝে মধ্যে আকাশের দিকে চাইছে, আবার বিব্‌বিকে দেখছে। মুখে কিছুই বলছে না।

বিব্‌বি বলল, 'আর যদি বিয়ে না করো তবে এমন জিনিস বানাবো যা আরও অবাক -করা। সেই জিনিসটা এমন সাংঘাতিক হবে যে পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবে। কেউ বাঁচবে না। তাও আমি পারি।'

ডিরিরি কাঁপতে লাগল। তাহলে তো তার মেয়েরা মরে যাবে। সে সঙ্গে সঙ্গে মাথা নেড়ে রাজি হয়ে গেল। হ্যাঁ, সে বিব্‌বিকে বিয়ে করবে। বিব্‌বির চোখেমুখে হাসি ঝরে পড়ল।

সেইদিন ঘন গাছের নীচে ডিরিরি আর বিব্‌বির বিয়ে হয়ে গেল। বিব্‌বির চোখে হাসি। মেয়েরা বাবা-মাকে ঘিরে আনন্দ করছে। অনেকদিন তারা এমন প্রাণ খুলে বাইরে দৌড়াদৌড়ি করেনি।

অনেক অনেক কাল তারা সুখে-শান্তিতে সংসার করল। কত নিশ্চিন্ত ডিরিরি, কত আনন্দ বিব্‌বির।

শেষকালে তারা একদিন বুড়ো হয়ে মারা গেল। মরবার পরে দুজনেই হয়ে গেল পাখি। ডিরিরি হল খঞ্জন পাখি। দুরন্ত গরমের নির্জন রাতে ডিরিরি আজও খঞ্জন পাখি হয়ে ডেকে চলে, 'হায়! হায়! ডিরিরি! হায়! ডিরিরি!' ভয়ে একদিন সে যেভাবে কাঁদত, খঞ্জন পাখি হয়েও সে ভয় সে ভুলতে পারেনি। তাই আজও খঞ্জন পাখি ওভাবেই ডেকে চলে আঁধারে।

আর বিব্‌বি হল কাঠঠোকরা। উঁচু উঁচু গাছের মাথায় বাকলে নখ ঢুকিয়ে সে ঠুকরে চলে শক্ত গাছ। শক্ত ঠোঁটে আঘাত করে করে সে-ও চায় আর একটা রামধনু তৈরি করতে। পৃথিবী থেকে তারার দেশে ছড়িয়ে পড়বে সেই ধনুক। পারছে না, তাই বেদনায় আঘাত করে চলেছে। আজও তার সেই কাজের বিরাম নেই। রামধনু সে বানাবেই। আর একটা।

নারকেল গাছ

আমাদের দ্বীপ সবুজ গাছে ভরা। অল্প দূরে নীল জলের সাগর। অত বড় সাগর কোথাও নেই। সাগরের ওপার নেই। এই দ্বীপের পুব দিকে বয়ে গিয়েছে একটা নদী। পাহাড়ের কোল বেয়ে নদী বইছে। টল্‌টলে জল। মিষ্টি ঠান্ডা জল। এমন নদীর জল আর কোথাও নেই।

সেই নদীর পারে যে গ্রাম সেই গ্রামে থাকত এক মেয়ে। অপরূপ সুন্দরী সেই মেয়ে। তার সবচেয়ে ভালো লাগত সাঁতার কাটতে। জলে নামলে তার মন সবচেয়ে খুশি থাকত। নদীর তীরে ঘন গাছ-গাছালি। গাছ-গাছালির মধ্যে দিয়ে পাহাড়ের বড় বড় পাথরের কোল ছুঁয়ে নদী বয়ে চলেছে। আর সেই নদীতে প্রতিদিন চান করে সেই মেয়ে। মনের আনন্দে সাঁতার দেয়। আশপাশে কত রঙিন মাছ ভেসে ভেসে চলে, তারাও মেয়ের সঙ্গে খেলা করে।

একদিনও বাদ যায় না। সব দিন মেয়ে নদীতে যায়। ছোট্ট নদী, ভয় নেই। একা একাই সে যায়। প্রতিদিন তার আরও বেশি বেশি ভালো লাগে সাঁতার কাটতে। বড় আনন্দে দিন বয়ে যায়।

দুপুরে মেয়ে জলে নেমেছে। সাঁতার কাটতে কাটতে, জলে খেলা করতে করতে বিকেল হয়ে গিয়েছে। তবু জল ছেড়ে ওঠার নাম নেই। হঠাৎ মেয়ের মনে হল, কি যেন তার গায়ে লাগল। কে যেন আল্‌তো করে তার দেহ বার বার করে স্পর্শ করছে। স্বচ্ছ টল্‌টলে জল। নীচে তাকিয়ে দেখে, মস্ত বড় একটা মাছ তার পেছনে, সে-ই তাকে স্পর্শ করছে। মাছটির চোখ বড় বড়। ডাগর চোখ। মুখে কেমন হাসিহাসি ভাব। ভয়ে আঁৎকে উঠল মেয়ে। তাড়াতাড়ি সাঁতার কেটে তীরে উঠল। বুক কাঁপছে। জলের দিকে তাকিয়ে দেখল, মাছটা আস্তে আস্তে পাহাড়ের বড় বড় পাথরের ফাঁক দিয়ে কোথায় লুকিয়ে পড়ল। পাহাড়ের ওই এলাকায় যেখানে আঁধার আঁধার জল, সেখানে এরকম অনেক মাছ রয়েছে। মেয়ে তা জানে। কিন্তু ওরা তো কখনো পাথরের ফাঁক ছেড়ে টল্‌টলে জলে আসে না? তবে? মেয়ে খুব ভয় পেয়ে গেল। মেয়ের সাঁতার দেবার এলাকায় ওদের তো আগে কখনও দেখেনি? ভাবল, আর আসবে না এখানে।

পরের দিন। দুপুরবেলা। মেয়ের মন ছট্‌ফট্‌ করছে। কতদিন ধরে এই সময়ে সে নদীতে যায়। না গিয়ে থাকতে পারে না। আজও পারল না। ভাবল, ও একদিন ওরকম হয়েছে। আর হবে না। মেয়ে চলল নদীর দিকে। একটু ভেবে জলে নেমে পড়ল। না, কিছুই তো হচ্ছে না? মনের আনন্দে সাঁতার কাটছে মেয়ে।

হঠাৎ কোমরের কাছে কিসের যেন ছোঁয়া লাগল? সেই বড় ডাগর চোখের মাছ নয় তো? মেয়ে ভয়ে আঁৎকে উঠল। ভয়ে ভয়ে জলের নীচে চেয়ে দেখল। মাছটি

আস্তে আস্তে জলের ওপরে মাথা তুলল। কি শান্তি তার চোখে-মুখে। মাছ চেয়ে রয়েছে মেয়ের ভেজা সুন্দর টল্‌টলে মুখের দিকে। এত সুন্দর এই মাছ, এত শান্ত ওর চোখ-মুখ, এত মিষ্টি ওর স্বভাব! মেয়ের আর একটুও ভয় করছে না। মাছ তাকে তো আঘাত করছে না? মাছ তো তার কোন ক্ষতি করছে না? তবে আর ভয় কিসের? মেয়ে সাঁতার কাটতে লাগল, ডুবছে ভাসছে। মাছ তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল। অল্পক্ষণ পরে জলের নীচে চলে গেল মাছ। এঁকেবেঁকে পাথরের ফাঁক দিয়ে আঁধার জলে মিলিয়ে গেল মাছ। তাকে আর দেখা যাচ্ছে না। মেয়ে উঠে এল জল থেকে।

দিনের পর দিন চলল এই জলের খেলা। মেয়ে জলে নামলেই কোমরে মাছের ছোঁয়া লাগে। তারপরে মাছ মাথা তোলে জলে। মেয়েরও খুব আনন্দ। সে-ও মাছের সঙ্গে সাঁতার কাটে, ডোবে ভাসে। জলে মেয়ের সঙ্গী হয়ে গেল সেই মাছ। মেয়ের অভ্যাস হয়ে গিয়েছে। আর একটুও ভয় করে না। মাছ ডাগর চোখে মেয়েকে চেয়ে চেয়ে দেখে,—মেয়ের খুব ভালো লাগে। এমনি করে অনেকদিন কেটে গেল।

একদিন। মেয়ের চান হয়ে গিয়েছে। বালুতীরে বসে সে বিশ্রাম করছে। চুল আর দেহের জলে সেখানকার বালি ভিজে উঠেছে। অল্প অল্প ফুর্‌ফুরে হাওয়া দিচ্ছে! হঠাৎ মেয়ে দেখল, সাঁতার কেটে মাছ তীরের কাছে এল। সেখানে অল্প জল। অল্প ঢেউ তীরে আছড়ে পড়ছে। হঠাৎ মাছের দেহ পাল্‌টে গেল। কোথায় সেই মাছের দেহ? সেখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে এক কিশোর দেবতা। কি অপরূপ তার রূপ।

কিশোর দেবতা মানুষের ভাষায় বলল, 'সুন্দরী মেয়ে, আমি ওই পাথরের ফাঁকের মাছেদের দেবতা। ওরা আমার প্রজা, ওদের রাজা আমি। বিপদে-আপদে প্রাণ দিয়ে ওদের রক্ষা করি। ওদের কোন বিপদ ঘটতে দিই না। তাই ওরা সুখি।'

মেয়ে যেন নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছে না। কোন কথাই সে বলতে পারছে না।

কিশোর দেবতা আবার বলল, 'আমি আর আমার মাছেরা কখনও ওই পাথরের আঁধার রাজ্য থেকে টল্‌টলে জলে আসি না। ওখান থেকেই সবকিছু দেখতে পাই। তোমাকেও রোজ দেখতাম। তোমাকে ভালোবেসে ফেললাম। পারলাম না লুকিয়ে থাকতে। তোমার ভালোবাসা পাওয়ার জন্য অনেকদিন তোমার আশেপাশে ঘুরেছি। তোমার কোমর ছুঁয়ে জানিয়েছি আমি তোমাকে ভালোবাসি। তোমার মতো রূপসি মেয়ে আমি কখনও দেখিনি। তুমি আমায় ভয় পেযো না, আমি কিশোর দেবতা। আমি তোমায় সবচেয়ে বেশি ভালোবাসি। তুমি বোঝ না?'

না, মেয়ে ভয় পায়নি। যখন মাছ হয়ে জলে খেলা করত তখনও ভয় পায় নি। আর এখন তার সামনে বসে রয়েছে সুন্দর কিশোর দেবতা। তাকে ভয় পাবে কেন? মেয়ে কিশোরকে ভালোবাসল। সবচেয়ে বেশি ভালোবাসা।

এর পরদিন থেকে মেয়ে অনেক আগে আগে নদীতে চান করতে আসে। জলে মাছের সঙ্গে সাঁতার দেয়, খেলা করে। তারপরে তীরে উঠে আসে। তীরে এলে মাছ হয়ে যায় কিশোর দেবতা। বালুতীরে দুজনে বসে থাকে। চুল আর দেহের জল শুকিয়ে গেলে সবুজ বনে পথ হাঁটে। পাশাপাশি। হাত ধরাধরি করে। কি আনন্দ। কত সুখ। ঘন বনের মধ্যে দিয়ে সরু পায়ে-চলা পথ। পথে শুকনো পাতা। পাতার আওয়াজ

তুলে তারা পথ হাঁটে। এই সময়টা মেয়ের সবচেয়ে ভালো লাগে। কিশোর দেবতারও। এই পাশাপাশি হেঁটে চলার সময় দুজনের চোখ-মুখের চেহারাই কেমন পাল্‌টে যায়।

কিন্তু যে মুহূর্তে ফিরে যাবার সময় হয়, যে মুহূর্তে কিশোর দেবতা বালুতীর থেকে নদীর জলে পা দেয়, সেই মুহূর্তে সব অন্যরকম হয়ে যায়। কিশোর চোখের পলকে মাছ হয়ে যায়। এঁকেবেঁকে সাঁতার দিয়ে পাথরের অন্ধকার ফাঁকের মধ্যে মিলিয়ে যায়। মেয়ে-জল-ভরা চোখে তাকিয়ে থাকে,—মেয়ের চোখ-মুখও পাল্‌টে যায়। বেদনায় কান্নায়।

যত দিন যায় মেয়ে বেশি বেশি করে কিশোরকে ভালোবেসে ফেলছে। এমন ভালোবাসা কেউ কোনদিন দেখেনি, শোনেনি। প্রতিদিন একসাথে পথ হাঁটে। আগের দিনের চেয়ে আজ আরও ভালো লাগছে। প্রতিদিনই আগের দিনের চেয়ে বেশি ভালো লাগে।

একদিন মেয়ে চান করে তীরে বসে রয়েছে। মাছ সেদিন জলে আসেনি। মেয়ের সঙ্গো জলে সাঁতার কাটেনি। মেয়ের মন খারাপ। হঠাৎ মেয়ে দেখতে পেল, কিশোর দেবতা আসছে। মেয়ের চোখে হাসি ঝরে পড়ল। কিন্তু কিশোর আসছে খুব আস্তে আস্তে, চোখে-মুখে বর্ষাকালের কালো মেঘ। এমন তো কখনও হয়নি? মেয়ের বুক কেঁপে উঠল।

কিশোর এসে মেয়ের পাশে বসল। মেয়ের একটি হাত তুলে নিল নিজের কোলের ওপর। আস্তে আস্তে বলল, 'এবার বিদায় নেবার সময় হল। আর দুজনের দেখা হবে না। আমায় শেষ বিদায় দাও।'

'না, না, ও কথা বলতে নেই। ও কথা বোলো না। আমি তোমায় ছেড়ে বাঁচতে পারব না। বিদায়ের কথা বলতে নেই।' মেয়ে কাঁদতে কাঁদতে কিশোরের বুকে মুখ লুকিয়ে ফেলল। কিশোরের বুক ভিজে যাচ্ছে।

একটু পরে কিশোর বলল, 'এ হল দেবতার আদেশ। আমাদের মন না চাইলেও এ আদেশ মানতে হবে। দেবতার ইচ্ছের বিরুদ্ধে কিছুই করার নেই। বিদায় নিতেই হবে, বিদায় তোমায় দিতেই হবে। দেবতাদের দেবতার ইচ্ছে নয়, আমাদের মিলন হোক। আমি দেবতা, আমার দেবতার কথা মানতেই হবে।'

কিশোরের চোখের জলে মেয়ের কপাল-মুখ ভিজে গেল। মেয়ে চেয়ে রয়েছে কিশোরের মুখের পানে। সে-ও কাঁদছে।

কিশোর বলল, 'এক্ষুনি আমি বিদায় নিয়ে চলে যাব। কিন্তু তোমায় দিয়ে যাব এমন এক অমূল্য রত্ন যাতে তুমি বুঝবে আমি তোমায় কত ভালোবাসি। সবসময় তোমার একথা মনে পড়বে। শুধু আজ আমি তোমায় যা করতে বলব, তা তোমায় করতে হবে। প্রতিজ্ঞা করো আমার সেই কথা তুমি রাখবে। লক্ষ্মী মেয়ে, তোমায় হ্যাঁ বলতে হবে।' কিশোর ঝর্‌ঝর্‌ করে কাঁদছে।

কান্নায় ভেঙে পড়েছে মেয়ে। কি কথা? কথাটা বলবার আগে কিশোর কেন এমনভাবে কাঁদছে? কি প্রতিজ্ঞা? কেন সে প্রতিজ্ঞা করাচ্ছে? তবু মেয়ে মাথা নেড়ে সায় দিল। কিশোরের মুখের দিকে চেয়ে রইল।

কিশোর নদীর ওপারের সবুজ গাছের সারির দিকে চেয়ে মেয়েকে সেই কাজের কথা বলল। মেয়েকে যা করতে হবে সব খুলে বলল।

পরের দিন এই দ্বীপে প্রলয় ঘটে যাবে। অবিরাম বৃষ্টি পড়বে। এমন বৃষ্টি আগে কেউ কখনও দেখেনি। নদীর জল ফুলে-ফেঁপে উঠবে, কূল ছাপিয়ে যাবে। দ্বীপের জমি ডুবে যাবে, উঁচু উঁচু গাছ ডুববে তার পরে। সব জলের নীচে। মেয়ে দেখতে পাবে, সব ডুবে গিয়েছে। তার নিজের বাড়ির চারপাশেও থৈ থৈ জল। কিন্তু মেয়ের বাড়ি ডুববে না, সে বাড়ি সেরকমই থাকবে। সেই সময় কিশোর দেবতা মাছের রূপ ধরে মেয়ের উঠোনে আসবে। সাঁতার কেটে আসবে। মেয়ের দোরের সামনে এসে মাছ মাথা তুলবে। জলের ওপরে। আর তখন...। তখন মেয়ে যেন ঘর থেকে ঘাস কাটার কাস্তে নিয়ে আসে। এক আঘাতে মাছের মাথা যেন কেটে ফেলে। সেই মাথাটা নিয়ে মাটিতে পুঁতে দেবে। সেখানটা নজর রাখবে।

মেয়ে নুইয়ে পড়ল কিশোরের বুকে। এ কি বলছে সে? না, না, কিছুতেই এই নিষ্ঠুর কাজ সে করতে পারবে না। এর চেয়ে মরণ ভালো। এ কথা মেয়ে সহ্য করতে পারছে না। কিশোর যেন অমন কথা আর না বলে। 'এ আমি কিছুতেই পারব না। তোমার সঙ্গে চিরকালের জন্য বিচ্ছেদ হলেও এ কাজ আমি করতে পারব না।'

কিশোর মেয়ের মুখ দুহাতে তুলে ধরে ধরল, 'দেবতাদের দেবতার এ আদেশ। এ তোমাকে পারতেই হবে। না, না বলতে নেই। তুমি যে একটু আগে প্রতিজ্ঞা করলে? প্রতিজ্ঞা করে অমান্য করতে নেই। তাছাড়া দেবতার আদেশ, আমাদের ইচ্ছেয় কিছুই হবার নয়। এটাই হতে হবে।'

কিশোর দেবতা মেয়েকে আল্‌তোভাবে সরিয়ে দিয়ে উঠে দাঁড়াল। হেঁটে চলল নদীর দিকে। একবার পেছন ফিরে চাইল। চোখের জলে মুখ-বুক ভেসে যাচ্ছে। জলে পা দিল কিশোর। মুহূর্তে দেহ পাল্‌টে গেল। সে মাছ হয়ে পাথরের আঁধার ফাঁকের মধ্যে মিলিয়ে গেল।

মেয়ে আছড়ে পড়ল বালুতীরে। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল। দেহ কেমন অবশ হয়ে আসছে। বুকের মধ্যে বর্ষাকালের নদীর ঢেউ, চোখে পাহাড়ি ঝরনা।

রাত তখনও শেষ হয়নি। বৃষ্টি শুরু হল। সে কি বৃষ্টি। ঝম্‌ঝম্‌ শব্দ আর থামছে না। ভোর হল। বৃষ্টি পড়েই চলেছে। নদীর জল তীর ছাপিয়ে দ্বীপের মধ্যে ঢুকছে। নদীর জল, আকাশের জল। জল বাড়ছে। জমি ডুবল, বাড়িঘর ডুবল, গাছ ডুবল। সত্যিকার প্রলয়। মেয়ে সব জানে আগে থেকেই। কিশোর চলে যাবার পর থেকে সে ঘুমোয় নি, তার কান্নাও থামেনি।

গোটা দ্বীপ এখন মস্ত বড় একটা পুকুর। এ পুকুরের কোন তীরভূমি নেই। জল উঠল মেয়ের উঠোনে। কিন্তু তার বাড়ি ডুবল না। মেয়ে বসে রয়েছে দাওয়ায়। চোখ রয়েছে উঠোনের জলে। ঝাপসা চোখে মেয়ে বসে রয়েছে।

জলে ছলাৎ শব্দ হল। জল কেঁপে কেঁপে উঠল। মেয়ের বুক কেঁপে কেঁপে উঠল। হঠাৎ উঠোনের জলে দাওয়ার সামনে মাছের মাথা ভেসে উঠল। কিশোর দেবতা মাছের রূপে ডাগর চোখে চেয়ে রয়েছে মেয়ের পানে। চোখে কিসের যেন মিনতি।

মেয়ে বুঝল, শেষ সময় এসে গিয়েছে। চিরবিদায়ের সময়। এখন তার কথা-দেওয়া প্রতিজ্ঞা রাখতেই হবে। বুক চৌচির হয়ে গেলেও প্রতিজ্ঞা রাখতেই হবে॥

ঘরে ঢুকল মেয়ে। চোখে কিছুই দেখতে পাচ্ছে না। আন্দাজে হাতে তুলে নিল ঘাস কাটার কাস্তে। দাওয়ায় এল। মাছ মাথা তুলেই রয়েছে। সবকিছু আব্ছা। এবার মেয়ের চোখের সামনে সবকিছু অন্ধকার হয়ে এল। কাস্তে এধার থেকে ওধারে গেল। মাছের মাথা দেহ থেকে খসে পড়ল। মেয়ে জল থেকে তুলে নিল সেই মাথা। বুকের কাছে জড়িয়ে ধরল।

বাড়ির পাশে এক খণ্ড জমি জেগে রয়েছে। এত জলেও সে জমি ডুবে যায় নি। মাটি সরিয়ে গর্ত করে মেয়ে মাছের মাথা পুঁতে দিল সেখানে। কয়েক ফোঁটা নোন্তা জল গড়িয়ে পড়ল সেই মাটিতে।

সঙ্গো সঙ্গো বৃষ্টি থেমে গেল। আকাশে রোদ ঝল্‌মল্ করে উঠল। জল কমতে লাগল। গাছের মাথা জেগে উঠল, গাছের মাঝখানটা দেখা গেল। বাড়িঘর দেখা যেতে লাগল। সোঁ সোঁ শব্দে জল নদীর দিকে নেমে যাচ্ছে। বালি-ঘাস-ছোট গাছ-গাছালি সব দেখা যাচ্ছে। আবার সেই আগের দ্বীপ।

জল নেমে গেল। সবার মনে আনন্দ। কিন্তু মেয়ের মনে সুখ নেই, মুখে কোন কথা নেই। সে সবসময় ভাবে কিশোর দেবতার কথা। কাস্তের কথা মনে হতেই মেয়ে আঁৎকে ওঠে। হায়! কোথায় হারিয়ে গেল সেইসব সুখের দিন। মেয়ে আর নদীতে যায় না চান করতে। সব আনন্দ শেষ।

প্রতিদিন ভোরবেলা উঠেই মেয়ে সেই জমিখণ্ডের পাশে গিয়ে বসে যেখানে মাটির নীচে রয়েছে কিশোর দেবতার মাথা। প্রায় সারাদিনই মেয়ে সেখানে বসে থাকে আর ভাবে।

কিশোর দেবতা নজর রাখতে বলেছিল। তাই তাকিয়ে থাকে মেয়ে। কিন্তু কিছুই দেখতে পায় না। বেশ কয়েকদিন কেটে গেল। কিছুই দেখতে পেল না মেয়ে। তবু কিশোরের আদেশ সে মেনে চলে।

হঠাৎ মেয়ে একদিন ভোরবেলা দেখল, মাটির ওপর সবুজ মতন কি যেন দেখা যাচ্ছে। চোখ আরও কাছে নিয়ে দেখল,— সবুজ চারার কচি পাতা। পরের দিন দেখল,— কচি পাতা দুভাগ হয়ে অল্প বড় হয়েছে। আরও সবুজ হয়েছে। দিনে দিনে চারা ভালোভাবে মাথা তুলল। মাটি ফুঁড়ে বড় হচ্ছে চারা। এমন গাছ মেয়ে আগে কখনও দেখেনি। এই দ্বীপে এরকম গাছ নেই। নতুন গাছ। গাছ বড় হচ্ছে। গাছের মাথায় শুধুই বড় বড় শক্ত পাতা। মাথার নীচে কোন ডালপালা নেই, গোল কালো শক্ত খুঁটির মতো শুধুই দেহ।

দেখতে দেখতে সব গাছের মাথা ছাড়িয়ে সে গাছ ওপরে উঠল। এত লম্বা গাছ দ্বীপে আর নেই। একদিন গাছের মাথায় সাদা ফুল দেখা দিল। ফুল ঝরে পড়ল। ছোট্ট ছোট্ট ফল দেখা দিল। সবুজ ফল। এক ডালে অনেক ফল। এমন আকারের ফল মেয়ে আগে কখনও দেখেনি। ফল বড় হচ্ছে। ফলের সবুজ রঙ আরও গাঢ়-ঘন হচ্ছে। একসময় সবুজ আভা মিলিয়ে গেল। কেমন শুকনো হয়ে এল ফলের দেহ। আরও

শুকনো। হঠাৎ একদিন ঝোড়ো হাওয়ায় কয়েকটা ফল বালির ওপর আছড়ে পড়ল। মেয়ে ফলগুলো নিয়ে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল। কিশোর দেবতার দান।

সবাই এল। দ্বীপের সবাই। অবাক হয়ে সেই গাছকে দেখতে লাগল। মেয়ের হাতের ফলগুলো পরখ করল। মেয়ে বলল, 'জলের মাছেদের কিশোর দেবতা এই গাছ দিয়েছে, ফল দিয়েছে।' আর কিছু বলল না।

দ্বীপের একজন বুড়ো মানুষ ধারালো অস্ত্র দিয়ে ফলের খোসা ছাড়িয়ে ফেলল। মানুষের মাথার মতো শক্ত ফল বেরিয়ে এল। ফল ফাটিয়ে দিতেই বেরিয়ে পড়ল ভেতরের সাদা শাঁস আর কিছুটা জল। বুড়ো সবাইকে একটু একটু শাঁস দিল। মুখে দিয়ে সবাই অবাক হয়ে গেল। এমন সুস্বাদু ফল তারা আগে কখনও খায়নি। নতুন অভিজ্ঞতা। মেয়ে কিন্তু খেল না, শাঁস হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে রইল, তাকিয়ে রইল ছাড়ানো ফলের শক্ত খোলাটির দিকে।

মেয়ে মাটি থেকে তুলে নিল ফলের শক্ত খোলাটি। খোলার গায়ে দুটি চোখ আর একটি মুখ। কিশোর দেবতা নিজের জীবন দিয়ে যে অমূল্য রত্ন তাদের দিয়ে গেল, সেই ফলে তার চোখ আর মুখের চিহ্ন রেখে গেল। সাঁতার কাটবার সময় মেয়ে মাছের যে চোখ আর মুখ দেখেছিল, সেই চোখ-মুখ এই ফলের গায়ে আঁকা হয়ে রইল। কিশোর দেবতা বলেছিল, কোনদিন ভুলতে পারবে না। সত্যি তাই। চিরকালের জন্য মনে পড়বে।

এই হল নারকেল গাছ আর তার ফল। দ্বীপের অমূল্য রত্ন। সেদিন থেকে পৃথিবী এই ফল পেল। এ গাছ অমূল্য রত্ন। কেননা, গাছের সব কিছু মানুষের কাজে লাগে। ফলের শাঁস, ফলের জল, বাড়ির ছাদ করার জন্য গাছের পাতা, ঝাঁটার জন্য পাতার মধ্যেকার শক্ত কাঠি, বাড়ির খুঁটির জন্য গাছের দেহ, মাছ ধরবার সরু নৌকোর জন্য গাছের দেহ। কিশোর দেবতা ঠিকই বলেছিল, অমূল্য রত্ন।

এই অমূল্য নারকেল ফলের জল কিন্তু একটু নোন্‌তা। মেয়ে যখন তার প্রিয়তম কিশোর দেবতার মাছ-দেহের মাথা পাশের জমিখণ্ডে পুঁতে দিয়েছিল, সেই সময় মাটির ওপরে কয়েক ফোঁটা নোন্‌তা জল পড়েছিল। দুঃখী মেয়ের কান্নাঝরা চোখের জল। সেই থেকে ফলের জলও নোন্‌তা হয়ে রইল।

মেয়ে আর নেই। কিশোর দেবতা আজ আর নেই। কিন্তু দুজনে মিলে রয়েছে এই নারকেল ফলের মধ্যে। কিশোরের আত্মত্যাগ আর মেয়ের চোখের জল। কিশোরের দেহ থেকে হয়েছে শাঁস আর মেয়ের চোখের জলে হয়েছে ফলের নোন্‌তা জল। দুজনেই একসঙ্গে বেঁচে রয়েছে। ভালোবাসায় বিচ্ছেদ নেই।

ছোট্ট রবিন পাখি

সবুজ ঘন বনের সুন্দর ছোট্ট পাখি রবিন। অপূর্ব তার গড়ন, চঞ্চল তার চলাফেরা। এক ডাল থেকে আরেক ডালে সে উড়ে বেড়ায়, মনের আনন্দে ছোট্ট দুটো ডানা নাড়ে, ঠোঁট দিয়ে পালক আঁচড়ায়, অবোধ কাকলিতে বনভূমি মাতিয়ে তোলে।

কিন্তু সব দিন সমান যায় না। আঁধার করে যখন বর্ষা নামে কিংবা হাড়-কাঁপানো শীত আসে—তখন বড়ই কষ্ট ছোট্ট রবিনের। ঘন পালকের মধ্যে ঠোঁট গুঁজেও শীত মানে না, পাতার আড়ালে দেহ ঢাকলেও বৃষ্টি রোখা যায় না। তাই বর্ষার দিনগুলোতে গাছের গুঁড়ির ফোকরে তার দিন কাটে, রাত কাটে— খাবার জোটানো ভার। আর শীতের দিনে অনবরত উড়ে উড়ে দেহ গরম রাখতে হয়, রাতে বড়ই কষ্ট।

এমনি এক শীতের দিনে ঝল্‌মলে রোদের সকালে রবিন উড়তে উড়তে বনের শেষপ্রান্তে চলে গেল। হাঁপিয়ে গিয়েছে সে, তাই এক গাছের নীচে ঝরাপাতার স্তূপের ওপর বসে বিশ্রাম নিতে লাগল। দূরে পাহাড়-উপত্যকায় ঘন ঝোপে-ঝোপে কেমন কুয়াশা-কুয়াশা ভাব।

এমন সময় রবিনের বুকের নীচে রোদ-পোয়ানো গরম ছোঁয়াচ লাগল। খুব আরাম! ছোট্ট রবিন পাতার জঞ্জাল সরিয়ে দেখল এক টুক্‌রো আগুন। বিস্ময়ে আনন্দে আবিষ্কারের চমকে রবিন কেমন দিশেহারা হয়ে পড়ল। যে জিনিস সে পেয়েছে তা যে সব রাজার ধনদৌলতের চেয়েও বেশি দামি। এ যে সত্য, এ যে অমূল্য।

ঠোঁটের ফাঁকে আগুনের টুক্‌রোকে নিয়ে সে উড়ে চলল। চলছে, চলছে—গাছের মাথার ওপর দিয়ে সে উড়ে চলেছে। ছোট্ট ডানাদুটো তার টন্‌টন্ করছে, কিন্তু কোথাও সে বিশ্রাম নিতে চায় না। সোজা চলে যেতে চায় তার নিজের ডেরায়। কিন্তু ছোট্ট পাখির ছোট্ট দুটো ডানা, অত ধকল কি সইতে পারে। তার ওপরে দিনের শেষের রাঙা সূর্যও পাহাড়ের কোলে ঢলে পড়েছে। আর পারে না রবিন। এক গাছের ডালে ক্লান্ত দেহে সে বসে পড়ল। কিন্তু অন্ধকারে তার ঠোঁটের আলো যে জ্বলছে? কেউ যদি দেখে ফেলে? কেউ যদি কেড়ে নেয় তার অনেক কষ্টে-পাওয়া আগুন। এদিকে সকাল থেকে উড়ে উড়ে তার যে এখন বড্ড ঘুম পেয়েছে। তাই আগুনকে বুকের তলায় লুকিয়ে রেখে ছোট্ট রবিন ঘুমিয়ে পড়ল।

সাত সাকলে সূর্য আকাশে ওঠার সঙ্গো সঙ্গোই রবিন আবার উড়ে চলল। নিজের বনের মধ্যে এসে সে সেই আগুনকে শুকনো এক গাছের ফোকরে ঢুকিয়ে দিল। সব্বাই যাতে দেহ গরম করতে পারে। যে আরাম আর আনন্দ রবিন অনুভব করেছে, তা ছড়িয়ে পড়ুক সব জায়গায়। তাই শুকনো কাঠে কাঠ ঘষলে আজও আগুন জ্বলে।

ঠোঁটে রেখেছিল সেই আগুন, বুকের তলায় ছিল সেই আগুন তাই ছোট্ট রবিনের ঠোঁটদুটি হল রাঙা আর তুলতুলে বুক হল রক্তিম।

পাখি ও পশুদের মধ্যে যুদ্ধ

অনেক অনেককাল আগে সব পশু মিলে পাখিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল। সে এক ভয়ানক যুদ্ধ। দু'দলই নিজেদের মধ্যে গোপনে বৈঠক করতে লাগল। যুদ্ধে কে কেমনভাবে লড়বে তাই নিয়ে অনেক শলা-পরামর্শ চলল।

পাখিরা বুঝল, তাদের চেয়ে পশুদের শক্তি বেশি। তাদের দাঁত ও নখ বেশি ধারালো, দেহের শক্তিও বহুগুণ বেশি। তাই যুদ্ধের জন্য তারা অস্ত্রের লড়াই ছাড়াও অন্য অনেক কিছু চিন্তা করল।

পাখিরা ছোট্ট একটা কালো পিঁপড়েকে ডাকল। সে পশু হলেও বিরাট শক্তিধর পশুরা তাকে মোটেই পাত্তা দেয় না। আর এই ভয়ানক যুদ্ধে সে কি-ই বা করতে পারে। পাখিরা তাকে ঢুকিয়ে দিল পশুদের রাজত্বে। সে এত ছোট যে কেউ তাকে দেখতে পেল না, তার ওপরে তার গায়ের রং কালো। সে মাটির সঙ্গে মিশে দিব্যি ঢুকে গেল শত্রুরাজ্যে। চুপটি করে লুকিয়ে থেকে পিঁপড়ে পশুদের সব ফন্দি-ফিকির আর যুদ্ধের কৌশল জেনে নিল। তারপর যেমন নিঃশব্দে এসেছিল তেমনি চুপিচুপি পালিয়ে এল শত্রুর রাজ্য থেকে।

গুটি গুটি পাখিদের ডেরায় এসে বেশ পণ্ডিতের মতো সে বলল, 'শোনো, পাখিরা। আমি সব জেনে এসেছি। পশুদের সব ফন্দি-ফিকির তোমাদের জানাচ্ছি। তোমাদের বিরুদ্ধে পশুরা যে যুদ্ধ করতে আসছে, এবার সেই যুদ্ধে পশুদের যুদ্ধ-সর্দার হবে শেয়াল। আর তার লেজ হবে যুদ্ধের সংকেত বা বলতে পারো ইশারা। যতক্ষণ পর্যন্ত শেয়াল তার লেজকে আকাশের দিকে খাড়া করে রাখবে ততক্ষণ পশুরা সামনে এগিয়ে যাবে আর লড়াই চালিয়ে যাবে। কিরকম খাড়া থাকবে জানতে চাও? মাটির উপরে যেমন গাছ দাঁড়িয়ে থাকে, ঠিক সেই রকম। আর শেয়াল যেই লেজ নামিয়ে নেবে অমনি পশুরা যুদ্ধ বন্ধ করে পালিয়ে যাবে। কিরকমভাবে নামিয়ে নেবে জানতে চাও? গাছের গোড়া কাটলে যেমন পড়ে যায়, ঠিক সেইভাবে। এইসব যুক্তি হয়েছে আর পশুরা তাই মেনে চলবে।'

পাখিদের যুদ্ধ-সর্দার হয়েছে ঈগল। যেমন তার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি, তেমনি দ্রুতগতি, ও নির্ভীক শিকারি সে। ঈগল একটা ছোট্ট পাখিকে বলল, 'ভাই, তুমি শিগগির গিয়ে মৌমাছিকে ডেকে আনো। দেরি যেন না হয়।'

মৌমাছি তক্ষুনি উড়ে এল ঈগলের কাছে, পাশে রয়েছে সেই ছোট্ট পাখি।

ঈগল মৌমাছিকে বলল, 'ভাই মৌমাছি, এই যুদ্ধে তোমাকে খুব বিপদের মধ্যেও একটা কাজ করতে হবে। সব কিছু নির্ভর করছে তোমার ওপর। অবশ্য আমরাও প্রাণ দিয়ে লড়াই করব। তুমি এক কাজ করবে। যখন পশুরা অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে এগিয়ে আসবে আমাদের দিকে, যখন যুদ্ধের জন্য তারা খুব উত্তেজিত হয়ে থাকবে, ঠিক সেই সময়

তুমি উড়ে গিয়ে শেয়ালের লেজের ডগায় বসবে। আর দেহের সমস্ত শক্তি দিয়ে লেজের ডগায় বসাবে কামড়। একবার নয়, বারবার। আর তাতেই আমরা যুদ্ধে জিতে যাব। আমাদেরই একজন তুমি, তাই বিপদ থাকলেও তুমি এটা করবেই।'

যুদ্ধ-সর্দারের আদেশ মেনে নিয়ে ঘন বনের গভীরে অদৃশ্য হয়ে গেল ছোট্ট মৌমাছি।

তির-ধনুক-বর্শা-ছুঁচলো লাঠি নিয়ে এগিয়ে আসছে পশুরা। সবার সামনে লেজ উঁচু করে চলেছে শেয়াল, তার দাঁতে তির-ধনুক আর পিঠে তিরভরা ঝুড়ি।

পাখিরাও তৈরি। তারাও এনেছে একই ধরনের অস্ত্রশস্ত্র। সামনাসামনি হতেই বেধে গেল তুমুল লড়াই। সে এক ভয়ানক যুদ্ধ।

বোঁ বোঁ করে মৌমাছি উড়ে এল ঘন ঝোপের আড়াল থেকে। বাতাসে কয়েকবার ঘুরে ঘুরে উড়তেই সে শেয়ালকে দেখতে পেল। সব পশুর সামনে লেজ খাড়া করে সে যুদ্ধ করছে। পোঁ করে একবার পাক খেয়েই মৌমাছি শান্ত হয়ে বসল শেয়ালের লেজের ডগায়। আর তারপর ?

দেহের সমস্ত শক্তি মুখে এনে কামড়ে দিল লেজের ডগা, বিষ ঢেলে দিল ছোট্ট মৌমাছি। শেয়াল চমকে উঠল, ব্যথায় তার লেজ কেঁপে উঠল। তবু যুদ্ধ করতে লাগল। আবার বিষের তির ফুটল লেজের ডগায়—আবার—আবার। মৌমাছি কামড়েই চলেছে। লেজ অবশ হয়ে আসছে, ব্যথায় লাফাতে ইচ্ছে করছে, শেয়াল আর পারে না। শেষকালে শেয়াল যন্ত্রণায় চিৎকার করে লেজ নামিয়ে নিল। আর দৌড় দিল উল্টো মুখে।

পশুরা অবাক হয়ে দেখল, শেয়ালের লেজ নামানো, শেয়াল পালাচ্ছে। তারা বুঝল, যুদ্ধে এগিয়ে যাওয়া আর উচিত নয়, কেননা তাদের সর্দারের লেজ নামানো। তারাও ছত্রভঙ্গ হয়ে শেয়ালের পিছু পিছু দৌড় দিল।

আর এই ভয়ানক যুদ্ধে শেষকালে পাখিদেরই জয় হল।

ছোট্ট খরগোশ আর পশুরাজ

এক ছোট্ট খরগোশ খুব মজার মানুষ। ছোট্ট হলে কি হবে? বলিহারি তার সাহস। শুধু কি তাই? সে খুব মজা করতে ভালোবাসে, চোখেমুখে তার কৌতুক। এই সাহসী কৌতুকপ্রিয় খরগোশ পশুদের কাছে যখন তখন যেখানে সেখানে পশুরাজের নামে নিন্দে রটিয়ে বেড়াচ্ছে। ভয় ডর বলে কিছু নেই। অত শক্তিমান পশুরাজের বিরুদ্ধে সে শুধুই আজেবাজে কথা বলে ঘুরে বেড়ায়।

পশুরাজ শুনলেন খরগোশের কথা। এত বড় স্পর্ধা! ঠিক করলেন খরগোশকে এক কামড়ে খেয়ে ফেলবেন।

শেয়ালকে ডেকে পশুরাজ বললেন, তুমি এক্ষুনি যাও। খরগোশকে বেঁধে আনো। ওকে আমি খাব। আমার পথের কাঁটা সরিয়ে ফেলব। আমার বিরুদ্ধে নিন্দে? বড় বাড় বেড়েছে। যাও তুমি।

শেয়াল মাথা নুইয়ে নমস্কার করে রওনা দিল। চলতে চলতে সবুজ তৃণপ্রান্তরে দেখা হল ছোট্ট খরগোশের সঙ্গে। শেয়াল বলল, খরগোশ, আমার সঙ্গে তোমায় যেতে হবে। তোমাকে ধরে নিয়ে যেতে পশুরাজ আমাকে আদেশ করেছেন।

কয়েকবার ঠোঁট চুলবুল করে খরগোশ বলল, তা তো যেতেই হবে, পশুরাজের আদেশ! কিন্তু যাওয়ার আগে তুমি কি কয়েকটা মিষ্টি আপেল খেতে চাও না, খেয়েই দেখ না। ওই মাঠের ওদিকে একটা আপেল গাছ আছে, আর আপেলের ভারে ডালগুলো সব নুয়ে গিয়েছে। কত আপেল! তুমি ওই গাছে গিয়ে মনের সুখে পেট পুরে আপেল খেয়ে এসো। আমি এখানে তোমার জন্য বসে থাকছি। যাও যাও। দেরি কেন?

আপেলের নাম শুনেই শেয়ালের মনটা কেমন হয়ে গেল, পেটের মধ্যেও মোচড় দিয়ে উঠল। আহা! কতকাল ভালো খাবার খাই না, কতকাল আপেলের মুখ দেখি না। আঃ! কতকাল কতকাল! শেয়াল লোভী চোখে এগিয়ে গেল মাঠের ওদিকে, পেছনে পড়ে রইল খরগোশ। শেয়ালের দেরি সহ্য হচ্ছে না, সে ছুটল আপেল গাছের দিকে। খরগোশ লাফ দিয়ে পেছন ফিরল, অদৃশ্য হয়ে গেল দূর পাহাড়ি বনে।

শেয়াল আপেল খেতে লাগল। বড় সুমিষ্ট রসাল আপেল। বহুদিন এমন জিনিস খেতে না পেয়ে আরও ভালো লাগল। খাচ্ছে আর খাচ্ছে, সারারাত চলে গেল, তবুও সে খাচ্ছে। সকাল হতেই শেয়ালের হুঁশ হল, কিন্তু তক্ষুনি শুরু হল পেটের যন্ত্রণা। যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে শেয়াল মাটিতে শুয়ে পড়ল, ঘাসের ওপর গড়াগড়ি দিতে লাগল। গড়াচ্ছে আর যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে আর গড়াগড়ি দিচ্ছে।

শেয়াল ফিরছে না দেখে পশুরাজ অবাক হলেন। শেয়াল কোথায় গেল? তার আদেশ কি মানে নি? তখন পশুরাজ ছোট্ট পাহাড়ি নেকড়েকে ডেকে বললেন, ছোট্ট

পাহাড়ি নেকড়ে, তুমি যাও আর শেয়ালকে খুঁজে আনো। দেখ, কেন শেয়াল খরগোশকে আমার কাছে ধরে নিয়ে এল না? যাও, শিগগির যাও।

ছোট্ট পাহাড়ি নেকড়ে মাথা নুইয়ে প্রণাম করে রওনা দিল। নেকড়ে চলছে, চলছে, দুপাশে চোখ রেখে এগোচ্ছে। চলতে চলতে নেকড়ে দেখতে পেল, একটা আপেল গাছের তলায় ঘাসে শুয়ে শেয়াল যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে। সে অবাক হল।

শেয়ালের কাছে গিয়ে নেকড়ে বলল, তুমি এখানে? দুষ্টু খরগোশ কোথায় গেল? তাকে ধরে নিয়ে তুমি কেন পশুরাজের কাছে যাওনি? কত দেরি হয়ে গেল। ওধারে পশুরাজ রেগে লেজ ঝাপটাচ্ছে।

শেয়াল ভয় পেল। শুয়ে শুয়েই বলল, আমি খরগোশকে গিলে ফেলেছি। সে যাতে না পালাতে পারে তাই আস্ত গিলেছি। কিন্তু বন্ধু, কি বিপদ! সেই হতচ্ছাড়া এখন পেট থেকে বেরিয়ে আসার জন্য আমার ভেতরে খালি লাথি মারছে। আর দেখ আমার দশা। পেটের ব্যথায় আমি এখন মরছি। এখন কি করি? আমি তো বন্ধু আর হাঁটাচলা করতে পারছি না! বড়ই যন্ত্রণা! তুমি একটা কাজ করবে? ওই যে দূরে পাহাড়টা দেখছ, ওই পাহাড়ের ওপাশে এক ধরনের বুনো লতাপাতা আছে দেখতে পাবে। ওই লতাপাতা খুব ভালো ওষুধ, ওগুলো চিবিয়ে খেলেই আমার পেটের ব্যথা একেবারে কমে যাবে।

বন্ধুর যন্ত্রণায় নেকড়ে স্থির থাকতে পারল না। ছুটে গেল পাহাড়ের দিকে। পাহাড় ডিঙিয়ে ওপাশে গেল। দেখতে পেল, ঘন সবুজ লতাপাতায় জায়গাটা ভরে রয়েছে। দাঁত দিয়ে অনেক লতাপাতা ছিঁড়ে মুখ ভর্তি করল। পাতার রসে জিভ ভিজে গেল। চমকে উঠল পাহাড়ি নেকড়ে। এমন সুস্বাদু পাতা তো বহুকাল খাই নি! আঃ, কি অপূর্ব! কতকাল ভালোমন্দ খাই না। কতকাল কতকাল! এমন ভালো জিনিসের মুখ কতকাল দেখি না! পেটের মধ্যেও মোচড় দিয়ে উঠল। ক্ষুধিত চোখে ছোট্ট পাহাড়ি নেকড়ে লতাপাতা খেতে লাগল, ভুলে গেল কেন সে এখানে এসেছিল। খাচ্ছে আর খাচ্ছে, সারারাত ধরে নেকড়ে লতাপাতাই খাচ্ছে। পেছনে দূরে আপেল গাছের তলায় শেয়াল শুয়ে যন্ত্রণায় ছটফট করছে।

পরের দিন আলো ফুটল, অন্ধকার কোথায় পালাল। শেয়াল ফিরল না খরগোশকে নিয়ে। নেকড়ে ফিরল না শেয়াল আর খরগোসকে নিয়ে। পশুরাজ আরও রেগে গেলেন। তার রাজ্যে হল কি?

পশুরাজ রাঙাচোখ শিকারি পাখিকে ডাকলেন। পাহাড়ের সবচেয়ে উঁচুতে সে থাকে, সবাই তাকে ভয় পায়। পশুরাজের খুব অনুগত এই শিকারি পাখি। সে এসে পশুরাজের সামনে মাথা নুইয়ে দাঁড়াল। খুব শক্ত কাজ না হলে পশুরাজ সহজে তাকে ডাকেন না। সে একথা জানে।

পশুরাজ বললেন, আমার অনুগত শিকারি পাখি, তুমি এক্ষুনি যাও। দেখো, কোথায় গেল শেয়াল আর পাহাড়ি নেকড়ে? আর জেনে এসো, কেন তারা এখনও খরগোশকে ধরে আনেনি? যাও, শিগগির যাও।

শিকারি পাখি মাথা নুইয়ে প্রণাম করে উড়ে চলল তৃণভূমিতে। আকাশে উড়ছে শিকারি পাখি, তার রাঙাচোখ রয়েছে নীচের দিকে। দেখতে পেল, দুষ্টু নিন্দুকে

খরগোশ তৃণপ্রান্তরে কুটুস্ কুটুস্ করে ঘাস ছিঁড়ে খাচ্ছে। কোথায় আছে শেয়াল আর কোথায় আছে পাহাড়ি নেকড়ে— তাদের আর খোঁজ করল না শিকারি পাখি। হঠাৎ ওপর থেকে ঝড়ের বেগে সোঁ করে নেমে এল খরগোশের ওপরে, কিছু বুঝবার আগেই ধারালো নখে তুলে নিল খরগোশকে। খরগোশ আচমকা ধরা পড়ে গেল, পালাবার পথ পেল না। উড়ে চলল পশুরাজের কাছে।

খরগোশ দাঁড়িয়ে রয়েছে পশুরাজের সামনে। পশুরাজ বড় বড় চোখে তাকালেন খরগোশের দিকে, ধারাল দাঁতগুলো বের করলেন, জিভ দিয়ে ঠোঁট চাটতে লাগলেন। তারপর আস্তে আস্তে লেজ নাড়তে নাড়তে বললেন, খরগোশ, শেষ অব্দি তুমি ধরা পড়লে। পড়বেই এটা তো জানা কথা। অনেকদিন থেকেই তুমি আমার নিন্দে রটিয়ে বেড়াচ্ছ, পশুদের কাছে আমার নামে যা খুশি তাই বলে বেড়াচ্ছ। আমাকে নিয়ে তুমি মজা করেছ, পশুদের কাছে তুমি আমাকে ছোট করেছ। আমি খুব মজার মানুষ, তাই না? এবার বুঝবে। আমি তোমাকে গোটা গিলে ফেলব।

খরগোশ বেশ বিপদে পড়েছে, কিন্তু তার সাহস ফুরোয়নি, বিপদে বুদ্ধিও কমে যায়নি। শান্তভাবে খরগোশ বলল, পশুরাজ আমি বড় ক্লান্ত। আপনি যদি আমাকে খেয়ে ফেলেন তাহলে আমি মোটেই দুঃখিত হব না, বরং আনন্দিতই হব। কেননা, আমি বড় ক্লান্ত। কিন্তু আমাকে খাওয়ার আগে আপনার কি একটুও ইচ্ছে করছে না ওই তৃণভূমির মোটাসোটা কয়েকটা কুকুরকে খেয়ে নিতে? আমি তো হাতের মুঠোয় রয়েছি। আঃ, কি নাদুস-নুদুস আর চর্বিতে ভরা ওই ছোট্ট ছোট্ট কুকুর! আমি জানি, কোথায় তারা ঘুরে বেড়ায়। বোধহয়, আমিই শুধু তাদের খবর জানি আর সে পথ আপনাকে দেখিয়েও দিতে পারি। অবশ্য, আপনার যদি ইচ্ছে হয়।

চর্বিতে ভরা নাদুস্-নুদুস তৃণভূমির ছোট্ট ছোট্ট কুকুর....ছবিগুলো ভেসে উঠল পশুরাজের চোখের সামনে। খরগোশ তো রয়েছেই, এগুলো তো বাড়তি।

পশুরাজ এগিয়ে চলেছেন খরগোশের পেছনে পেছনে। আর কেউ নেই। শুধু পশুরাজ আর খরগোশ, খরগোশ আর পশুরাজ। তৃণভূমির পাশে ঘন ঝোপের দিকে চোখ তুলে তাকিয়ে খরগোশ পশুরাজকে ইশারা করল, যেন ওই ঝোপেই রয়েছে। পশুরাজ লাফিয়ে পড়লেন ঘন ঝোপের লতাপাতার জালে।

খরগোশ জানত, ওখানে রয়েছে এমন বুনো লতাপাতা যে, কেউ সেখানে গিয়ে পড়লে আর বেরিয়ে আসতে পারবে না। যত চেষ্টা করবে, পা যাবে আরও বেশি জড়িয়ে, দেহ আঁকড়ে ধরবে বুনো লতা। আর হলও তাই। রাগে পশুরাজ যত লাফালাফি করতে লাগলেন ততই পড়লেন জড়িয়ে। ক্রমশ এ বাঁধন বেশি শক্ত হচ্ছে। লতার ফাঁদে পশুরাজের শক্তি কমে আসছে।

বনের সব খবর খরগোশ জানে। বনের সব জায়গায় সে ঘুরে বেড়ায়। চলে যেতে যেতে খরগোশ পশুরাজকে বলে উঠল, পশুরাজ, মনের সুখে তৃণভূমির ছোট্ট ছোট্ট কুকুর খান আর আনন্দ করুন। চিরকালের জন্য আনন্দ করুন।

শুয়োর ও সাদা ইঁদুর

খেতে না পেয়ে পেয়ে কালো শুয়োর শুকিয়ে যাচ্ছে। এক সময় কত মোটাসোটা ছিল, থল্‌থল্‌ করত তার দেহ। আর আজ চামড়ার ওপরে হাড় দেখা যাচ্ছে, পায়ে আগের মতো জোর নেই। মনও তাই ভালো থাকে না। দিনে দিনে সব কেমন হয়ে যাচ্ছে।

তাই একদিন শুয়োর কাজের খোঁজে বেরিয়ে পড়ল। বাবা-মা বেঁচে থাকতে সে পেটের কথা চিন্তা করেনি। আজ আর সেদিন নেই। এখানে-ওখানে বহু জায়গায় শুয়োর কাজের জন্য ঘুরছে, কিন্তু কোথাও কাজ পাচ্ছে না। সবাই বলছে, আমার মাঠে কাজের জন্য লোক আছে। কিন্তু শুয়োর যে আর পারে না। তাকে যে কিছু জোগাড় করতেই হবে।

এমনি করে ঘুরতে ঘুরতে শুয়োর একদিন হাজির হল এক সাদা ইঁদুরের কাছে। ইঁদুর তাকে বলল, 'তোমার তাহলে নেহাৎই কাজ দরকার। আচ্ছা, আমি তোমায় রাখব। তুমি হবে আমার চৌকিদার। রোজ রাতে তুমি আমার খামার পাহারা দেবে। মনে হচ্ছে, কেউ আমার ফসল চুরি করছে। কি, রাজি তো?'

শুয়োর আস্তে আস্তে বলল, 'হ্যাঁ রাজি। তা, কি রকম কি খেতে পরতে দেবেন?' শুয়োরের মনে ভয়, যদি একথা বলাতে তার কাজ না হয়? তবু মুখ ফস্‌কে বেরিয়ে গেল কথাগুলো।

ইঁদুর মাথা নেড়ে বলল, 'আরে বাবা, কাজে তো আগে লেগেই পড়ো। যা দেব, খারাপ দেব না। আর মনে রেখো, কাজের লোকের অভাব নেই। তোমাকে সাড়ে তিন পয়সা মাইনে দেব প্রতি সপ্তাহে। থাকার জায়গাও পাবে। তবে খাওয়া-দাওয়াটা তোমার।'

চম্‌কে উঠল শুয়োর। সাত দিনে মাত্র সাড়ে তিন পয়সা। এর মধ্যেই আমাকে খাওয়া-দাওয়া চালাতে হবে। তা কি করে হবে? সে কাজটা নিতে চাইল না। মাথা নাড়ল। হঠাৎ পেটের মধ্যে কেমন করে উঠল। ভাবল, তাও তো কিছু হচ্ছে, এটা না নিলে একেবারেই তো মৃত্যু। যাক্‌, এটা পেয়ে পরে ভালোমত কিছু একটা খুঁজে নিলেই হবে। সাত দিন তো করি।

শুয়োর রাজি হয়ে গেল। কিন্তু সাত দিনের জন্য। সাদা ইঁদুর হাসল।

সারা রাত জেগে শুয়োর খামার পাহারা দেয়। আগে কোনদিন রাত জাগেনি সে। আরামে ছোট্ট ঘরে ঘুমিয়ে থাকত। আর আজ? রাতে চোখ জড়িয়ে আসে ঘুমে, সকালে চোখ লাল হয়ে থাকে, দেহ কেমন অবশ। কাজ খোঁজার আর উৎসাহ থাকে না তার। ঘুমিয়ে ঘুমিয়েই দিন কাটে। তবু রাতে সে কাজ করে চলে।

সাত দিন কেটে গেল। ইঁদুর তাকে সাড়ে তিন পয়সা দিল। শুয়োরের কান্না পেল। মাইনে নিয়ে সে বেরিয়ে এল ইঁদুরের বাড়ি থেকে। পেছনে তাকিয়ে শুয়োর দেখে, সাদা ইঁদুর হাসছে।

বাজারের দিকে গেল শুয়োর। সেখানে সে কিছু খেল। দেখা হল এক কালো কুকুরের সঙ্গে। কুকুর আপনমনে গান গাইছে,

রারাবুম রারাবুম
জেগে রই, রাত নিঝুম
রারাবুম রারাবুম
রাতে কাজ দিনে ঘুম॥

গান শুনে অবাক হল শুয়োর। আরে! কালো কুকুর কি তার কথাই বলছে? তাকেই ঠাট্টা করছে? কিন্তু তা কি করে হবে? কুকুর তো তাকে চেনেই না।

গুটি গুটি শুয়োর এগোল কুকুরের কাছে। শুয়োর বলল, 'বন্ধু, তুমি কি আমায় চেনো? আমার নামে তুমি গান করছ কেন?'

কুকুর বলল, 'তোমার নামে? কই না তো। আমি যে আমার গান গাইছি। আজ কুড়ি বছর ধরে মনিবের চৌকিদার আমি। আমি তার খামার পাহারা দি। এ গান তো আমার গান।'

শুয়োর অবাক হল। কুড়ি বছর ধরে রাত জাগা! সে বলল, 'বন্ধু আমিও চৌকিদার, কিন্তু সাত দিন কাজ করে আজ ছেড়ে দিয়ে এসেছি। মাত্র সাড়ে তিন পয়সা মাইনে। চলবে কি করে বলো? তাই ছেড়ে দিলাম।'

সমস্ত দেহ কাঁপিয়ে কুকুর হেসে উঠল। বলল, 'সাড়ে তিন পয়সা! বাঃ, বেশ ভালো মাইনে বলতে হবে। আমি যখন প্রথম কাজে ঢুকি, আমার মাইনে ছিল এক পয়সা। আর তুমি প্রথমেই সাড়ে তিন পয়সা। জানো, এখন আমি মাইনে পাই পাঁচ পয়সা।' কুকুর আবার গান গাইতে লাগল। হঠাৎ গান দিল থামিয়ে। রেগে গিয়ে বলল, 'তুমি কাজটা ছেড়ে দিয়ে এলে? তুমি কি পাগল? যাও, এখন মরগে না খেয়ে। কে তোমায় কাজ দেবে?'

শুয়োর বলল, 'বন্ধু, পেট ভরে না, রাত জাগতে পারি না। কি করি বল?'

চুপ করে রইল কালো কুকুর। একটু পরে মুখ নামিয়ে আস্তে আস্তে বলল, 'বন্ধু, আমারও ওই রকম হত। কিন্তু আজ সব সয়ে গিয়েছে। দিনে ঘুমোই, রাতে জাগি। আগে খুব খিদে পেত, আজ আর পায় না। আগে কত কি ভাবতাম! এখন অবশ্য আর ভাবি না। যাও ভাই, কাজ করো, ছেড়ে দিয়ো না। কোথাও পাবে না।'

আস্তে আস্তে কুকুর চলে গেল। শুয়োর দেখল, কুকুরের কোঁচকানো চোখের কোণে জল চিক্‌চিক্ করছে।

শুয়োর কিছুক্ষণ ভাবল। শেষকালে রওনা দিল আগের পথে। এগিয়ে আসছে ইঁদুরের বাড়ি। কাছে আসতেই শুয়োর দেখল, সাদা ইঁদুর বাড়ির বাগানে দাঁড়িয়ে তার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে হাসছে।

শুয়োর খামারে ঢুকে পড়ল মাথা নিচু করে।

রাঙামুখো বানর ও বুনো গোরু

রাঙামুখো বানরের বাবার বিরাট কাঠের বাড়ি, বাড়ি খুব উঁচু, গাছের মাথার সমান। সামনে-পিছনে এদিকে-ওদিকে অনেকটা বাগান। কত গাছ সেই বাগানে।

একদিন বানর বনের পথে রওনা দিল। বাড়িতে বলে গেল, তার ফিরতে দেরি হবে, খুব জরুরি কাজে সে বেরুচ্ছে। তার হাতে এক বিরাট চামড়ার থলে। তার মধ্যে রয়েছে খুব সুমিষ্ট মদ। বানর চলেছে, পিঠে ঝুলছে মদের থলে।

বন ক্রমশ ঘন হচ্ছে। পাহাড়ও এগিয়ে আসছে। পাহাড়ি বনে রাঙামুখো বানর গুনগুন করে গান করতে করতে হাঁটছে। অনেক দূর এসে সে একটা গাছের তলায় বসল।

এমন সময় দেখে পাশের ঝরনায় তিনটে গোরু জল খাচ্ছে। তাকে দেখেই গোরুগুলো পালাতে চেষ্টা করল। পালাতে দেখেই বানর বলল, 'বন্ধু, তোমরা পালাচ্ছ কেন ? আমি তো তোমাদের বন্ধু ! আমায় ভয় কি ? আমার বড্ড তেষ্টা পেয়েছে, আমাকে একটু জল দেবে ?'

গোরুগুলো বুনো, তারা সরল। তার ওপরে একজন জল খেতে চেয়েছে, জল না দিলে যে বড় অন্যায় হবে। তাই আর না পালিয়ে তারা বানরকে জল দিয়ে বলল, 'তুমি তো আমাদের মতো দেখতে না, তাই আমরা ভয় পেয়েছিলাম।'

অল্প একটু জল খেয়েই মুখ বেঁকিয়ে বানর বলল, 'ইস, তোমরা এই জল খাও ? এ তো একটুও মিষ্টি নয় ! এসো, আমার জল খেয়ে দেখ।'

গোরুরা অবাক হল। জল আবার অন্যরকম হয় নাকি ! বানরের দেওয়া জল খেয়ে তারা আরও অবাক হল। এত সুন্দর, এত মিষ্টি ! দেহমন ভরে গেল। তারা ঠোঁট-জিভ চাটতে লাগল।

বানর বলল, 'কি, বলিনি ? আমার জল মিষ্টি না ?'

গোরুরা স্বীকার করল। বানর তাদের আর একবার তার জল খেতে দিল। গোরুরা খাচ্ছে, আমেজে তাদের চোখ বুজে আসছে।

এই সময় বানর বলল, 'তোমরা আমার ভাই, আমার বন্ধু। চলো না আমাদের বাড়ি, সেখানে এমন মিষ্টি জলের নদী রয়েছে। কত খাবে ? চলো না আমার সঙ্গে।'

গোরুরা তো সরল, অতশত বোঝে না তারা। বানরের পেছন পেছন রওনা দিল। যেতে যেতে বানর বলল, 'একটা কথা, আমার বাবা খুব বদরাগী। তা সে কিছু না। তোমাদের দু'চার কথা বললেও কানে তুলো না। কিছু করলেও চুপ করে থেকো। দু'দিন পরেই ঠিক সয়ে যাবে। ওরকম তো হয়ই।'

গোরুরা ভয় পেল, আবার অভয়ও পেল। তারা বন পেরিয়ে এগোতে লাগল।

বিরাট বাগানের কাঠের দরজা পেরিয়ে চারজন ঢুকল। গোরুদের দাঁড়াতে বলে বানর বাড়ির মধ্যে চলে গেল।

একটু পরে তিনজন রাঙামুখো বানর বেরিয়ে এল। তাদের হাতে বুনো গাছের লম্বা মোটা লতার দড়ি। তিনজন চলে এল গোরুদের কাছে। তাদের গলায় দড়ির ফাঁস পরিয়ে দিল। তরপরে বেরিয়ে এল তাদের বন্ধু বানর।

গোরুরা বলল, 'বন্ধু, গলায় লতার দড়ি কেন ?'

বানর বলল, 'ও কিছু নয়। তোমাদের তো বলেছি, বাবা বদরাগী, ওরকম একটু হবেই। সব ঠিক হয়ে যাবে।'

গোরুরা বিশ্বাস করল। তাদের টেনে নিয়ে যাওয়া হল বাড়ির পেছনে ভাঙাচোরা একটা ঘরে। বিরাট মোটা কাঠের সঙ্গে তাদের বেঁধে রাখা হল।

একদিন যায়, দু'দিন যায়, বানর আর আসে না। তাদের খেতে দেওয়া হয় দুর্গন্ধ খাবার। কোথায় গেল সেই মিষ্টি জলের নদী ? গোরুরা ভাবে, গলার দড়ি দেখে অবাক হয়। জীবনে তো কাউকে তারা দড়ি বাঁধা দেখে নি। কোথায় গেল বানর ? এইসব তারা ভাবে।

বেশ কয়েকদিন কেটে যাবার পরে একদিন ভোরবেলা বানর এল। তার হাতে লম্বা মতন একটা দড়ি। বানর এসে বলল, 'তোমরা তো এখন থেকে এখানেই থাকবে। তা শোনো, খাওয়া-দাওয়ার কোন চিন্তা নেই। এখন তোমাদের আমার সঙ্গে বনে যেতে হবে। ওখানে অনেক কাঠ কেটে সন্ধের সময় বয়ে নিয়ে আসতে হবে। এখন তাহলে গলার বাঁধন খুলে দি, কি বলো ?'

গোরুরা অবাক হল। এ কি সেই বানর ? আমরা কি তাহলে আর কোনদিন আমাদের বাড়ি যেতে পারব না ?

তারা বলল, 'আমরা এখানে থাকতে চাই না। আমাদের ছেড়ে দাও, আমরা বাড়ি চলে যাব। আমাদের কাজ করেও দরকার নেই, খেয়েও কাজ নেই।'

হাঃ হাঃ করে দাঁত বের করে হাসতে লাগল বানর। হাসি থামিয়ে চোখ পাকিয়ে বলল, 'সেটি হচ্ছে না, আর কোনদিন বাড়ি যেতে পারবে না। এখন কাজে চলো।'

'যাব না', গোরুরা একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল।

সপাং করে চাবুক এসে পড়ল একজনের চোখে। একি ? এই দড়িতে এত লাগে ? কোনদিন তো এরকম দেখিনি ? আবার সপাং শব্দ...আবার...আবার। বানর চিৎকার করছে আর মারছে। এমন সময় খুব কাছে আসতেই একটা গোরু শিং দিয়ে মেরেছে এক গুঁতো, ছিটকে পড়ল বানর।

মাটি থেকে উঠেই বানর বেরিয়ে গেল। গোরুরা ভাবছে কি করবে। একি হল ? আবার ফিরে এল বানর, তার হাতে মস্ত বড় চক্‌চকে অস্ত্র। বানর ঢুকেই একটা গোরুর মাথায় মারল সেই অস্ত্র, বুনো তৎপর গোরু-মাথা সরিয়ে নিল। অস্ত্র লাগল কাঠে, পায়ের ওপর ঠিক থাকতে না পেরে বানর গেল পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড লাথি মারল একটা গোরু, ছিট্‌কে পড়ল বানর। সে কাতরাচ্ছে।

সমস্ত শক্তি দিয়ে বাঁধন ছিঁড়তে চেষ্টা করল তারা। পটাং করে দড়ি গেল ছিঁড়ে। বাগানের মধ্যে দিয়ে ছুটে বেড়া ভেঙে তিনজন ছুটে চলল বনের পথে, রাঙামুখো বানরের দিকে একবারও ফিরে তাকাল না।

পাহাড়ি বনে এসে তারা হাঁফ ছাড়ল। অনেক কষ্টে অন্য গোরুরা তাদের গলার দড়ি দাঁত দিয়ে কেটে দিল। সেদিন থেকে তারা সবাই সাবধান হল। রাঙামুখো বানর দেখলেই তারা আরও গভীর পাহাড়ি বনে ঢুকে পড়ত।

সোনালি মেয়ে সোনালি ফসল

ভুলে যাওয়া সেই কালের কথা। কতদিন আগের কথা। সেই কালে সবে আমরা এই পৃথিবীতে এসেছি। কেউ কোথাও নেই। আদিতে সূর্য ছিল না, না ছিল কোন তারা। চারদিকে আঁধার, শুধু ছিল জল। জলময় চারিদিক। তারপরে সব হল। সবদিক আলোকিত হল, রাত আলোকিত হল চাঁদের আলোয়। সূর্যের তাপে জল শুকোতে শুরু করল। ডাঙা জেগে উঠল। তারপরেই তো আমরা পৃথিবীতে এলাম। আমরা মানে মাত্র একজন। আমাদের প্রথম মানুষ।

সেই মানুষ একা একা থাকত। এখানে ওখানে ঘন বনভূমি, অল্প দূরে তির্‌তিরে বয়ে যাওয়া নদী, উঁচু পাহাড়, পাহাড়ে অনেক গুহা, আশেপাশে জলাভূমি, এসবের মধ্যে সেই একজন মানুষ, দীর্ঘদেহী, মাথায় ঘন চুল, হাত পায়ের গড়ন পাহাড়ের পাথরের মতো। কথা বলার লোক নেই, তাই সে শুধু চেয়ে থাকে, অবাক হয়, সময় কাটে কিন্তু বড় নিঃসঙ্গ সে। আশেপাশে প্রকৃতি ছাড়া আর কেউ নেই। না, কেউ নেই।

সে আগুন জ্বালাতে জানে না। গছের ফল, শেকড় কিংবা মাটির নীচের বাদাম খেয়ে বেঁচে থাকে। সবই কাঁচা খায়। রাতে বড় কষ্ট, চাঁদের আলো থাকলে ভালো লাগে। কিন্তু চাঁদ তো প্রতিদিন আকাশে ওঠে না। কেন যে ওঠে না? তার ভালো লাগে না। মাঝে মাঝে রাতে বড় শীত করে। সে যদি আগুন জ্বালাতে পারত, তার এত কষ্ট হত না। উপায় নেই, এভাবেই তার দিন কাটে, রাত পেরিয়ে যায়।

তার দেহে কোন পোশাক নেই। পোশাক সে বানাতে জানে না। পোশাক যে পরতে হয় তা সে জানেই না। পোশাক বুনবেই বা কি করে। সে তো কোন কিছুই শেখেনি।

সে মানুষ বড় ক্লান্ত। গাছের শেকড় খুঁজে খুঁজে সে ক্লান্ত। মাটি খুঁড়ে বাদাম খুঁজতে খুঁজতে সে ক্লান্ত। অনেক উঁচু ডালের ফল পাড়তে পাড়তে সে ক্লান্ত। তার মনও ভালো নেই। বড় একঘেয়ে খাবার। নিত্যিদিন কি এক জিনিস খেতে ভালো লাগে? তার অরুচি ধরে গেল। নাঃ, আর ভালো লাগে না। কয়েকদিন সে কিছুই খেল না। নরম সূর্যের আলোয় শুধু শুয়ে থাকল। সে স্বপ্ন দেখতে শুরু করল। আগে স্বপ্ন দেখত না, এখন চোখ খুলে সাদা আকাশের দিকে তাকিয়ে সে স্বপ্ন দেখে। মেঘ ভেসে যাচ্ছে, সেই ভেসে যাওয়া মেঘের দিকে তাকিয়ে সে স্বপ্ন দেখে। উঁচু গাছের ডালপালা হাওয়ায় মাথা নাড়ছে, সেদিকে তাকিয়ে সে স্বপ্ন দেখে। জলায় জলের ঢেউ খেলছে বাতাসের ছোঁয়ায়, সেদিকে তাকিয়ে সে স্বপ্ন দেখে।

একদিন স্বপ্ন দেখছে। ক্লান্ত চোখের পাতা রয়েছে বন্ধ। চোখ মেলে সে সামনের দিকে তাকিয়ে রইল। চম্‌কে উঠল। ভয় পেল। এরকম কিছু তো সে আগে কখনও

দেখেনি। তার সামনের সেই দেহ এবার কথা বলল। কি মিষ্টি যে তার কথা। সেই মানুষের ভয় ভাঙল, মনে খুব আনন্দ হল। হৃদয় ভরে গেল।

সামনে দাঁড়িয়ে একজন নারী। তার দেহ সোনালি রঙের, মাথার চুল রুপোলি, পিঠের ওপর দুলছে,—ঠোঁট রয়েছে অল্প খোলা, সাদা মেঘের মতো দাঁতগুলো দেখা যাচ্ছে, ঠোঁটদুটি জলে ভেজা। চোখদুটিও যেন হাসছে। কি অপরূপ দেহ। তার দেহেও কোন পোশাক নেই। সে কি মেঘের রাজ্য থেকে নেমে এল?

মানুষটি এই প্রথম হাসল। হেসে তাকে কাছে ডাকল। মেয়ে কাছে এল না। মানুষটি দাঁড়িয়ে তার কাছে এগিয়ে গেল, মেয়ে দূরে সরে গেল। তার পেছন দেখা যাচ্ছে, পিঠের ওপরে চুলগুলো দুলছে, আর খিলখিল হাসির শব্দ শোনা যাচ্ছে।

আরও এগিয়ে গেল সে, মেয়ে আরও দূরে চলে গেল। মানুষটি যত এগোয়, মেয়েও তত দূরে চলে যায়। শেষকালে মেয়ে এল নদীর কাছে। অনেকটা দূর থেকে মানুষটি বলল, 'ওগো মেয়ে, তুমি যখন আমার কাছে এসেছ, আর দূরে চলে যেয়ো না। আমি বড় একা, আমার কেউ নেই, কথা বলার কেউ নেই, বড় কষ্ট আমার। কাছে থাকো, দূরে যেয়ো না।'

আস্তে আস্তে মেয়ে ঘুরে দাঁড়িয়ে তাকে বলল, 'বেশ, আমি কোনদিন আর দূরে চলে যাব না। কিন্তু আমি তোমাকে যা যা করতে বলব, তোমাকে তাই করতে হবে। তুমি যদি আমার কথা শোনো, আমি চিরকাল তোমার কাছে থাকব। কথা দাও।'

মানুষটি বলল, 'তুমি যা বলবে আমি তাই শুনব। শুধু তুমি আমার কাছ থেকে দূরে চলে যেয়ো না। আমি বড় একা।'

সোনালি মেয়ে মিষ্টি হেসে কাছে এগিয়ে এল। এসে তার হাত ধরল। দুজনে দুজনের দিকে চেয়ে রইল। মানুষটি জীবনে এত আনন্দ পায়নি। তার মন ভরে গেল।

হাত ধরে এগিয়ে গেল সেই মেয়ে। নদীর ধার দিয়ে জলাভূমি পেরিয়ে এসে মেয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল একটা ডাঙা জমির ওপরে। সেই জমিতে পড়ে রয়েছে অনেক শুকনো ঘাস। রোদে পুড়ে খুব শুকনো হয়ে রয়েছে সেই লম্বা লম্বা মোটা ঘাস।

মেয়ে নিচু হয়ে সবচেয়ে মোটা দুটো শুকনো ঘাস তুলে নিল। পুরুষের হাতে ঘাস দুটো দিয়ে সে বলল, 'হাতের তালুর মধ্যে দুটো ঘাস নাও। তালু দুটো চেপে খুব জোরে জোরে ঘষতে থাকো।'

পুরুষটি তাই করল। কিন্তু কিছুই হল না। ঘাস দুটো সেরকমেই রইল।

মেয়েটি ঘাস দুটো নিয়ে কীভাবে ঘষতে হবে দেখিয়ে দিল। কৌশল শিখিয়ে দিল। আরও জোরে, খুব তাড়াতাড়ি ঘষতে হবে। 'তুমি জোয়ান পুরুষ, গায়ে তোমার অসীম শক্তি। ঠিক পারবে।'

এবারে জোরে জোরে ঘষতে ঘষতে ঘাস দুটোয় আগুন জ্বলে উঠল। হাতের তালুতে তাপ লাগছে, পুরুষ ঘাসদুটো ফেলে দিল। জ্বলে-ওঠা ঘাস নীচে পড়ল, আশেপাশের শুকনো ঘাসে দাউ দাউ আগুন জ্বলে উঠল।

পুরুষ ভয় পেয়ে দূরে দৌড়ে গেল। সে কখনও আগুন দেখেনি। সে আগুন দেখেছে সূর্যের মধ্যে, ভর দুপুরে। কিন্তু সে তো দূরের আগুন। গায়ে আঁচ লাগেনা।

মেয়ে এল পুরুষের পাশে। দাউ দাউ জ্বলছে মাঠ। মেয়ে বলল, 'এই আগুনই আমাদের বাঁচিয়ে রাখবে। আমরা সুখি হব।'

আগুন নিভে গেল। গোটা মাঠে কালো শুকনো ছাই। সব ঘাস পুড়ে গিয়েছে।

মেয়ে বলল, 'ওই জলা থেকে আঁজলা করে জল এনে মাঠে দাও। আমিও জল আনছি।

পুরুষ অঁজলা করে জল আনছে। মাঠে দিচ্ছে, আবার যাচ্ছে। মেয়ে জলায় চুল ভিজিয়ে নিচ্ছে, জমিতে এনে চুল নিঙ্‌ড়ে জল ফেলছে। অনেকক্ষণ হয়ে গেল। ভর দুপুর। তারা একটা বড় ঘন গাছের ছায়ায় বসে রইল। মেয়ে আর কোন কথা বলছে না।

গাছের ছায়া একদিকে বড় হচ্ছে। অনেক বড়। রোদের তেজ কমে এসেছে। সূর্য ওই দিকে ঢলে পড়ছে। দূরে আঁধার আঁধার দেখা যাচ্ছে। এবার সন্ধ্যা হল।

মেয়ে উঠে দাঁড়াল, একবারে পড়ন্ত সূর্যের দিকে তাকিয়ে দেখল। তারপরে আস্তে আস্তে বলল, 'আমি এই জমিতে শুয়ে পড়ছি, তুমি আমার চুল ধরে এই জমির ওপর দিয়ে টেনে নিয়ে যাবে। জমির এদিক থেকে ওদিক, ওদিক থেকে এদিকে। আমার দেহের ছোঁয়া যেন জমির সবখানে লাগে।'

মেয়ে শুয়ে পড়ল। কিন্তু পুরুষটি চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। মেয়ে হাত নেড়ে ইশারা করে ডাকল। পুরুষ তবু নড়ে না।

পুরুষ বলল, 'এ আমি পারব না। তোমার ব্যথা লাগবে, তোমার চুল ধরে টানলে তোমার ব্যথা লাগবে। দেহ জমির ওপর দিয়ে নিয়ে গেলে তোমার দেহে লাগবে, কেটে যাবে, রক্ত ঝরবে।'

মেয়ে বলল, 'হয়তো একটু লাগবে, হয়তো ছড়ে যাবে। কিন্তু উপায় নেই। বাঁচতে হলে একাজ করতে হবে। আমার দেহের ছোঁয়া ছাড়া জমি কোন কথা শুনবে না। আমার দেহ সমস্ত জমিতে না গড়ালে জমি কিছুই দেবে না। আমার দেহের ছোঁয়ায় জমির চেহারা যে পালটে যাবে। কথা শোনো। যে আনন্দ আমরা পাব তাতে দেহের ওই ব্যথা কিছুই নয়। আর তুমি তো আমায় কথা দিয়েছ সব কথা শুনবে।'

পুরুষ নেমে এল জমিতে। মেয়ের চুল গোছা করে ধরল। তার খুব কষ্ট হচ্ছে, তবু সে মেয়ের কথা শুনল।

পুরুষ আস্তে করে টানল। কিন্তু সোনালি মেয়ের দেহ বড়, বেশ ভারী। এত আস্তে টানলে চলবে না। পুরুষ জোরে টান দিল, মেয়ের দেহ এগিয়ে আসছে। মেয়ের সোনালি দেহ কালো পোড়া ঘাস ও কাদায় অন্য রকম হয়ে যাচ্ছে। দেহে কালো কাদা, জলের ছিটে। পুরুষ সমস্ত মাঠে মেয়ের দেহ নিয়ে ঘুরছে, এপাশ থেকে ওপাশে, ওপাশ থেকে এপাশে। জমিও কেমন যেন কাদামাটি হয়ে উঠছে। জমির চেহারা পাল্‌টে যাচ্ছে।

অনেক সময় কেটে গেল। এখন চারিদিকে অন্ধকার। তারা নদীতে গেল, দেহ পরিষ্কার করল। আবার মেয়ের সোনালি রঙ ফিরে এল। তারা গুহায় গিয়ে শুয়ে পড়ল। বড় ক্লান্তি, তারা ঘুমিয়ে পড়ল।

এক সময় পুরুষের ঘুম ভেঙে গেল। পাশে তাকিয়ে দেখে মেয়ে নেই। তার বুক কেঁপে উঠল। ঝড়ের বেগে গুহা থেকে বেরিয়ে এল। অল্প দূরে দেখতে পেল, সকালের রোদে মাঠের ধারে দাঁড়িয়ে রয়েছে সেই মেয়ে। রোদ এসে পড়েছে তার সোনালি দেহে, রুপোলি চুলে। সে দুহাত সামনে মেলে ধরেছে, মনে হচ্ছে সোনালি রঙের একটা গাছ।

আস্তে আস্তে পরুষ এগিয়ে গেল। এল মেয়ের পাশে। মেয়ে মিষ্টি হেসে জমির দিকে তাকিয়ে রইল।

দিন যায় রাত যায়। সূর্য ওঠে, সূর্য ডোবে। বৃষ্টির দিন শেষ হয়ে গেল। রোজ মেয়ে জমিতে যায়, অনেকক্ষণ থাকে। পুরুষ তখন ফল আনে, শেকড় আনে, বাদাম তোলে।

একদিন সকালে মেয়ে পুরুষের হাত ধরে জমির পাশে গেল। জমির দিকে তাকিয়ে পুরুষ অবাক হয়ে গেল। মেয়ের চোখের দিকে চেয়ে দেখল। মেয়ে হাসছে।

সোনালি ফসলে মাঠ ভরে গিয়েছে। ফসলের ডগায় রুপোলি শিষ। মেয়ের সোনালি দেহের ছোঁয়ায় ফসলের রঙ হয়েছে সোনালি, আর রুপোলি চুলের ছোঁয়ায় ফসলের শিষ হয়েছে রুপোলি।

মেয়ে বলল, 'এই ফসল আমাদের বাঁচিয়ে রাখবে, এই ফসল আমাদের সুখি করে তুলবে। আমাদের মিলনে যারা জন্মাবে তারা এই ফসল খেয়েই বেঁচে থাকবে। এই এক মাঠ ফসল থেকে অনেক ফসল হবে। পাশের জমিতে, তাব পাশের জমিতে, সব জায়গায়।'

তাই আমরা আমাদের প্রথম মাকে ভুলিনি। তার রুপোলি চুলের ছোঁয়া আজও তোমরা দেখতে পাবে সোনালি ফসলের শিষে।

হৃদয় রেখে এসেছি

আমাদের সুন্দর সবুজ দেশের চারদিকে সাগর। ঘন নীল জলের সাগর। সেই সাগরের নীচে রয়েছে রাজ্য। সেখানে বাস করত এক রাজা। রাজার এক মেয়ে। চোখের মণি।

একবার সেই মেয়ের হল অসুখ। কঠিন অসুখ। কিছুতেই মেয়ে ভালো হয় না। অনেক ওষুধ-পথ্য খাওয়ানো হল, কিছুতেই কিছু হল না। শেষকালে ডাকা হল দেশের সবচেয়ে বড় ওঝাকে। ওঝা অনেক মন্তর-টন্তর পড়ে শেষকালে বলল, হ্যাঁ, ধরতে পেরেছি। মেয়ের অসুখ কেমন করে সারবে বুঝতে পেরেছি। ওই ওপারে দূরের দ্বীপে থাকে এক বানর। তার তাজা হৃদয় মেয়েকে খাওয়ালেই মেয়ের রোগ সারবে। খুব সাবধান। বানর যেন টের না পায়। খুব চালাক। মহা ফন্দিবাজ। ওঝা চলে গেল।

কুকুর খুব বুদ্ধি ধরে। সে ছুটতে পারে খুব জোরে। রাজা কুকুরকেই পাঠাল। কুকুর রওনা দিল। তাড়াতাড়ি পৌঁছে গেল মাটি-গাছপালার দ্বীপে। খুঁজে খুঁজে শেষকালে কুকুর বানরের দেখা পেল।

কুকুর গাছের নীচে বসে রয়েছে। গাছের ডালে বানর। কুকুর মিষ্টি হেসে বলল, বন্ধু তোমার দ্বীপে বেড়াতে এলাম। নিজের দেশে ঘুরতে ঘুরতে একঘেয়ে লাগছিল। তুমি কোথাও বেড়াতে যাও না? কত কিছু দেখার আছে। একঘেয়েমি লাগে না?

বানর পিঠ চুলকে বলল, তা আর লাগে না? যেতে তো ইচ্ছে করে কিন্তু.....

বানরের মুখের কথা কেড়ে নিয়ে কুকুর বলল, হবেই তো। চলো না আমাদের দেশে। দু চারদিন ঘুরে আসবে। নতুন জায়গা, বেশ ভালো লাগবে।

তা জলের নীচে যাব কেমন করে? পথ যে চিনি না। কোনদিন তো যাইনি।

এই কথা! আমার পিঠে চেপে বসবে, দু পা দুদিকে দিয়ে। চোখের পাতা ফেলতে না ফেলতেই দুজনে পৌঁছে যাব জলের তলার সুন্দর দেশে। এ আর এমন কি কথা!

বানর একটু চিন্তা করল। কুকুর অন্যদিকে চেয়ে আছে। তার যে খুব আগ্রহ আছে বোঝা গেল না। কুকুরকে ভালোই মনে হচ্ছে। কি আর হবে। দেখাই যাক না।

কুকুরের পিঠের ওপরে দুদিকে দুপা দিয়ে বানর জুত করে বসল। কুকুর আস্তে আস্তে জলের দিকে এগিয়ে গেল। জল আছড়ে পড়ছে তীরে। বালি ভিজে যাচ্ছে, কুকুরের পায়ে এসে জল লাগল। পা বাড়াল কুকুর, অল্প জল। হঠাৎ........। হঠাৎ কিছু শোনার আগেই দুজনে পৌঁছে গেল জলের নীচের রাজ্যে।

রাজার বাড়িতে বানরের খুব খাতির। খাওয়া দাওয়া আনন্দ ফুর্তি। সবাই বানরকে মানে, ভক্তি করে। দেখা হলেই কোমর বেঁকিয়ে মাথা নিচু করে প্রণাম জানায়। এত সম্মান বানর আগে কোনদিন পায় নি। দ্বীপে তো বেশ ভয়ে ভয়েই থাকতে হত। ফল ফুলুরি জোগাড় করা কি সোজা কষ্ট! আর এখানে? বানর রয়েছে রাজার হালে।

এমনি করে দিন যায়। সব মাছ, সব পশু, সব বাসিন্দার সঙ্গে খুব ভাব হয়েছে। সারাদিন শুধু আনন্দ। নতুন বন্ধুদের ডেরায় ডেরায় ঘুরে বেড়ানো। আহা, এমন দিন যেন চিরকাল থাকে। একদিন বানর বেড়তে গিয়েছে অক্টোপাসের বাড়িতে। সেদিন শংকর মাছও এসেছে, তিনজনে গল্পগুজব করছে। মজার প্রাণী এই শংকর মাছ। বানরের বেশ মজা লাগে। কেমন গোল, এমনটি সে আগে দেখেনি।

হঠাৎ একথা সেকথা বলতে বলতে ওরা দুজন বানরকে বলল, বন্ধু, কি বিপদেই না পড়েছ? কবে যে কি হয়ে যায়? ভাবলে গা শিউড়ে ওঠে।

কেন কেন কিসের বিপদ? বানরের লেজ যেন গুটিযে এল।

সে কি? বন্ধু, তুমি কিছুই জানো না? তাই ভাবি, এমন ফুর্তিতে থাকো কেমন করে?

আঃ বাজে কথা রাখ তো। আসল ব্যাপার বলো। বানরের বুক কাঁপছে, গলা শুকিয়ে আসছে। বিদেশ বিভুঁই জায়গা, অচেনা রাজ্য।

আসলে, রাজার মেয়ের রোগ সারছে না। ওঝা বলেছে, বানরের তাজা হৃদয় জ্যান্ত অবস্থায় কেটে মেয়েকে খাওয়ালে তবেই রোগ সারবে। তাই তো তোমায়......। এরা কি বলছে বানর আর কিছুই শুনতে পাচ্ছে না। কানের মধ্যে ভোঁ ভোঁ করছে, জোরে জোরে নিঃশ্বাস পড়ছে, জিভ যেন গলার ভেতরে ঢুকে যাচ্ছে। কিন্তু ভেঙে পড়লে তো চলবে না। বাঁচার পথ খুঁজতে হবে। বুদ্ধি করে বাঁচতে হবে। আমার মনের কথা ওরা যেন বুঝতে না পারে। ভয় পেয়েছি এটা যেন জানতে না পারে।

বানর কুতকুত চোখে এধার ওধার চাইছে, চোখে কেমন দুষ্টু দুষ্টু ভাব। ঠোঁট বেঁকিয়ে মুচকি মুচকি হাসছে। খুব যেন মজার ব্যাপার। ওরা দুজন অবাক হয়ে গেল। বানরের মনে কি একটুও ভয় নেই। তার কি প্রাণের মায়া নেই? জ্যান্ত থাকতে বুক চিরে হৃদয়.......। ওরা ভাবতে পারছে না।

বানর বলল, হায় কপাল! আমার হৃদয় খেয়ে রাজার মেয়ে ভালো হয়ে উঠবে, আর আমি এমন বোকামি করলাম? ইস, এতো মস্ত পুণ্যের কাজ। কিন্তু, ছিঃ ছিঃ, আমি একি করলাম? কেন? কেন? কেন? কি আর বলব দুঃখের কথা। এসব আগে থেকে বলতে হয়। লুকোনোর কি আছে? আমি যদি জানতাম, তাহলে কখনও হৃদয়টাকে ওই গাছের ডালে রেখে আসতাম না। আহা, মেয়েটা কেমন সেরে উঠত। বুকের মধ্যে ফাঁকা, হৃদয়টা রয়েছে গাছের ডালে। দুঃখে বেদনায় বানর ভেঙে পড়ল।

কথার হাত-পা নেই, ডানাও নেই। তবু এক কান থেকে দশ কান হয়, দশ কান থেকে হাজার কানে পৌঁছয়। খুব তাড়াতাড়ি। হলও তাই। বানরের কথা দশ কান হয়ে রাজার কানে গেল। রাজা ব্যথা পেল। আহা, বানর তো নিজেই তার মেয়ের জন্য হৃদয় দিতে চাইছে। কি দরকার ছিল তাকে বোকা বানানো? আগে থেকে খুলে বললেই হত।

রাজা বানরকে ডেকে বলল, বন্ধু, তুমি যে আমার মেয়েকে এত ভালোবাস, আগে জানতে পরিনি। আমায় ক্ষমা করো। শিগগির তুমি চলে যাও, গাছ থেকে তোমার হৃদয় নিয়ে এসো। খুব তাড়াতাড়ি। আমি সঙ্গে কুকুরকে দিচ্ছি।

বানর ভেজা চোখে রাজি হয়ে গেল। এই যাবে আর আসবে। আহা ছোট্ট মেয়ে বড় কষ্ট পাচ্ছে।

কুকুরের পিঠে চেপে চোখের নিমেষে বানর তার দ্বীপে ফিরে এল। বানর পিঠ থেকে নামল। কুকুরের পাশে বসে একটু অপেক্ষা করল। আস্তে আস্তে হেঁটে চলেছে বানর। কোন তাড়া নেই। কুকুর তাকে জোরে যেতে বলল। কিছুটা এগিয়েছে বানর, আড়চোখে পেছন ফিরে কুকুরের দিকে চাইল বানর। কুকুর সামনের দুপায়ের মধ্যে মুখ রেখে আধবোজা চোখে তাকিয়ে রয়েছে। বানরের লেজ খাড়া হল,.... তিন লাফে গাছের মগডালে চেপে বসল। আঃ, কি শান্তি। এবার বানরের হাসি পেল। জলের নীচের লোকজন এত বোকা? হৃদয় কি রেখে আসা যায়? হাসির দমকে প্রায় পড়েই যাচ্ছিল, তাড়াতাড়ি ডাল ধরে ফেলল।

কুকুর বসেই আছে, বসেই আছে। বানর তো গাছ থেকে নামছে না? সে গাছের নীচে গেল। ওপরে তাকিয়ে দেখে, বানর দাঁতমুখ খিঁচিয়ে ভেংচি কাটছে। মুখে কোন কথা বলছে না। কুকুর সব বুঝল, সে খুব চালাক। দু একবার গাছের গোড়ায় নখের আঁচড় কেটে রাগে ফিরে গেল জলের নীচের রাজ্যে।

জানাজানি হয়ে গেল। অক্টোপাস আর শংকর মাছ বানরকে একথা ফাঁস করে দিয়েছে। তারা বিশ্বাসভঙ্গ করেছে। রাজার হাতে শাস্তি পেতে হবে। তাদের ধরে আনা হল। রাজার সৈন্য অক্টোপাসকে ধরল। দেহ কেটে দেহের সব হাড় বের করে নিল। যন্ত্রণায় ছটফট করতে লাগল অক্টোপাস। হাড় নেই দেহে, একতাল মাংস ঘুরে বেড়াচ্ছে জলে। মাংস কাটার ফলে কিছু টুকরো মাংস দেহের চারপাশে ঝুলে রইল।

ধরা হল শংকর মাছকে। মুগুর দিয়ে পেটানো হল। বেদম প্রহার। ওপরের মুখ দেহের নীচে চলে গেল। সুন্দর থল্‌থলে লেজে মুগুরের আঘাত পড়ছে। হাড় বেরিয়ে লেজের বাইরে লেগে থাকল। ধারালো কাঁটা। মুগুরের আঘাতে ছোট লেজ বড় লম্বা হয়ে গেল। দেহের তুলনায় বড়। বড়ই অসুবিধে। মুখ রয়ে গেল দেহের নীচে। রাজার শাস্তি, কথা ফাঁস করে দেবার শাস্তি।

বানর তারপর থেকে জলের দিকে এগোয় না। গাছ থেকে নামে না। মাটিতে যদি বা নামতে হয়, সবসময় তৈরি থাকে গাছ ওঠার জন্য। মাটিতে সে দৌড়েই চলাফেরা করে। যদি কুকুর ধরে। আহা, হৃদয় উপড়ে ফেলে যদি।

হায়রে কুকুর হায়রে ব্যাঙ

বরফ-ঢাকা এক মস্ত নদীর তীরে ছিল এক ছোট বাড়ি। সেই বাড়িতে থাকত এক বুড়ি। বুড়ির ছিল এক নাতনি, একটা লোমশ কুকুর আর একটা সবুজ ব্যাঙ। এই নিয়ে বুড়ির সংসার।

নাতনি দিদিমার বাড়িতে ছিল মহাসুখে। কতই না তার আদর। বুড়ি খুব ভালোবাসত নাতনিকে, খুব যত্নআত্তি করত। সবচেয়ে ভালো খাবার তাকে খেতে দিত। রঙা-চঙা নানান পোশাক তাকে বুনে দিত।

কিন্তু বেচারা কুকুর ? তার দিনরাত বড় কষ্টে কাটত। বুড়ি তাকে দুচোখে দেখতে পারত না। সারাদিন তাকে দিয়ে হাড়ভাঙা খাটুনি করাত। একটু বিশ্রাম নেবার উপায় নেই। তার ওপরে খালি গালাগালি। এত কাজ করেও কুকুরের ভাগ্যে জুটত এঁটো খাবার। শুধু মাংসের হাড় আর মাছের কাঁটা। হায়রে লোমশ কুকুর।

আর বেচারা সবুজ ব্যাঙ ? তার কষ্ট কুকুরের চেয়েও বেশি। তাকে অনেক কাজ করতে হত। রাতদিন সে কাজ করত। জল বয়ে আনত দূর থেকে, কাঠ কেটে আনতে হত বন থেকে। এত করেও বুড়ি ব্যাঙকে একটু কিছু খেতে দিত না। কুকুর তাও কিছু পেত। রাত্তিরে ব্যাঙ ঘুমোতে যেত পেটে খিদে নিয়ে। হায়রে সবুজ ব্যাঙ।

সেদিন ব্যাঙের পেটে কিছু পড়ে নি, কিছুই খায়নি সে। তার ওপরে বুড়ি সারাদিন ধরে ব্যাঙকে গালিগালাজ করেছে। এমনি করে বিকেল গড়িয়ে গেল। পুব কোণ আঁধার হয়ে এল, পশ্চিমে তখনও লাল আলোর আভা। বুড়ি ব্যাঙকে পাঠাল জল আনতে। নদীর তীরে বরফের গর্তে রয়েছে জল। ব্যাঙ ক্লান্ত, তার পা আর চলছে না, চোখ মেলে রাখতে পারছে না, মাথা সোজা রাখতে পারছে না, বুক কাঁপছে। তবু ব্যাঙ 'না' বলতে পারল না। ভয়,—যদি বুড়ি কিছু করে!

জল আনতে যাবার সময় ব্যাঙ কুকুরকে ডাকল। সে যদি সঙ্গে যায়, ব্যাঙ একটু ভরসা পায়। কুকুর ব্যাঙের কষ্ট বোঝে। তারও যে কষ্ট! সঙ্গে সঙ্গে কুকুর রাজি হল।

তারা দুজনে আস্তে আস্তে নদীর তীরে সেই বরফের গর্তের পাশে এল। দুজনেই ধপ করে বসে পড়ল। দেহ আর চলে না। এবার দুজনেই কেঁদে ফেলল। এভাবে তো আর বাঁচা যায় না! এর চেয়ে মরণ ভালো। কি ভাগ্য করেই তারা এসেছিল! তারা কাঁদছে কাঁদছে। আকাশে সুন্দর গোল চাঁদ উঠেছে। পুর্ণিমার রাত। চাঁদের আলোয় বরফের মাঠ, বরফের নদী, বরফ-ঢাকা বন স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। কাকে আর বেদনার কথা জানাবে তারা ? চাঁদের দিকে চেয়ে চেয়ে তারা কাঁদতে লাগল।

হঠাৎ সবুজ ব্যাঙ ফোঁপাতে ফেঁপাতে চাঁদকে বলল, 'ওগো চাঁদ, তুমি কত ভালো। আমাদের দিকে একটু চাও, আমাদের দয়া করো। চাঁদ, তুমি আকাশ থেকে নেমে

এসো। তুমি যদি শুধু আকাশেই থাকো, আমাদের দুঃখ ঘুচবে কেমন করে? তুমি এই বরফ-ঢাকা জমিতে নেমে এসো। আমাদের নিয়ে যাও। তোমার বুকে নিয়ে যাও। আমরা তোমার কাছে থাকব।' ব্যাঙ আরও কাঁদছে।

কাঁদছে কাঁদছে, তারা কাঁদছে। আর বারবার চাঁদকে ওই এককথা বলে চলেছে। অনেকক্ষণ পরে চাঁদ তাদের কান্না আর কষ্টের কথাগুলো শুনতে পেল। তার বুক টনটন করে উঠল। তার চোখেও জল এল। সে ঝড়ের বেগে আকাশ থেকে নেমে এল বরফ-ঢাকা জমিতে। কুকুর আর ব্যাঙকে বুকে তুলে আবার ঝড়ের বেগে আকাশে উঠে গেল।

অনেকক্ষণ পরে বুড়ি এল খোঁজ করতে। এখনও কেন কুকুর আর ব্যাঙ ফিরছে না? কিন্তু বরফের গর্তের কাছে বুড়ি কাউকেই দেখতে পেল না। চিৎকার করে বুড়ি তাদের ডাকল, কেউ সাড়া দিল না। হঠাৎ তার চোখ চলে গেল চাঁদের পানে। অবাক হয়ে বুড়ি দেখল, লোমশ কুকুর আর সবুজ ব্যাঙ চাঁদের বুকে খেলছে, হাসছে। বুড়ি চিৎকার করে বলল, 'ও আমার আদরের কুকুর আর ব্যাঙ, আমি তোমাদের ভালো ভালো খেতে দেব, আদর করব, তোমরা নেমে এসো। তোমরা আমার ছেলের মতো, তোমরা কেন দূরে থাকবে?'

কেউ তার কথার জবাব দিল না। কেউ ফিরে এল না। সেদিন থেকে বুড়ি তার বাড়িতে থাকে নাতনিকে নিয়ে, চাঁদের বুকে থাকে কুকুর আর ব্যাঙ।

তাই আজও তোমরা যদি চাঁদের দিকে তাকাও, দেখবে,—চাঁদের বুকে বসে রয়েছে একটি কুকুর ও একটি ব্যাঙ।

শিকারি হাইলিবু

অনেক অনেককাল আগের কথা। সেই সময়ে আমাদের এই সুন্দর দেশে ছিল এক শিকারি। নাম তার হাইলিবু। বড় দয়ালু ছিল সেই শিকারি। অন্যের কষ্ট সহ্য করতে পারত না, তাই সবসময় অন্যদের উপকার করত। শিকার করে আনা পশুপাখি সে কোনদিন একা-একা খেত না, পাড়াপড়শির মধ্যে বিলিয়ে দিত, নিজের জন্য অল্পই রাখত। তাই সবাই তাকে খুব ভালোবাসত।

একদিন হাইলিবু চলেছে পাহাড়ি বনের পথ ধরে। হাঁটতে হাঁটতে পাহাড়ের অনেকটা ওপরে উঠে এসেছে, হঠাৎ দেখতে পেল, একটা ঘন পাতার গাছের নীচে একটা ছোট্ট সাদা সাপ নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে আছে। সাপ যাতে তার পায়ের শব্দে ঘুম থেকে জেগে না ওঠে তাই খুব আস্তে পাশ কাটিয়ে শিকারি চলে গেল। এমন সময় ওপর থেকে ঝড়ের বেগে একটা বাজপাখি নীচে নেমে এল, ঝাঁপিয়ে পড়ল সাপটার ওপরে, নখে করে তুলে নিয়ে আবার আকাশে উড়ে গেল। হঠাৎ জেগে উঠে সাপটা চেঁচিয়ে উঠল, বাঁচাও বাঁচাও! কান্না শুনে শিকারির বুক টনটন করে উঠল। ধনুকে তির বসিয়েই ছেড়ে দিল পাহাড়ি বনের আঁধারে। তির গিয়ে লাগল বাজের ডানায়, সাপ পড়ল মাটিতে। বাজপাখি উড়ে পালাল।

শিকারি বলল, এইভাবে একা একা কখনও থাকতে হয়! তুমি এত ছোট। যাও বাবা-মায়ের কাছে। একা বেরিয়ো না।

মাথা নেড়ে সায় দিয়ে সাপ বনের পথে চলে গেল। ধনুক ঠিকঠাক করে শিকারি বাড়ির দিকে রওনা দিল। পরের দিন হাইলিবু আবার গেল সেই পাহাড়ি বনে। আগের দিনের জায়গায় এসে সে দেখতে পেল, একটা ছোট সাদা সাপ এঁকে-বেকে তার দিকে আসছে, পেছনে অসংখ্য সাপের সারি। অবাক হল শিকারি। তাদের পাশ কাটিয়ে চলে যাবে, এমন সময় সেই ছোট্ট সাদা সাপ বলল, কেমন আছ শিকারি? আমাকে তুমি চিনতে পারছ না? কালকে তুমি আমাকে বাঁচিয়েছিলে। আমি সর্পরাজের মেয়ে। আমাকে বাবা-মা পাঠিয়েছে, তোমাকে যেতে হবে আমাদের প্রাসাদে। বাবা-মা তোমাকে ধন্যবাদ জানাবে। যাবে না আমার সঙ্গে? শিকারি বলল, কেন যাব না? নিশ্চয়ই যাব।

মেয়ে বলল, শোনো, একটা কথা মনে রাখবে। প্রাসাদে যাওয়ার পরে বাবা-মা তোমাকে কিছু দিতে চাইলে তুমি কিন্তু কিছু নেবে না। শুধু চাইবে একটা দামি পাথর, ওই পাথর বাবা মুখের মধ্যে লুকিয়ে রাখে। সেই পাথরটা তোমার কাছে থাকলে তুমি সব পশুপাখির ভাষা বুঝতে পারবে। কিন্তু তুমি সেই ভাষা বুঝলেও কোনদিন কাউকেই বলবে না। যদি বলো তবে তুমি পাথর হয়ে যাবে, পা থেকে মাথা পর্যন্ত পাথর হয়ে যাবে। তুমি মরে যাবে। মনে রেখো।

মেয়ের কথা শুনে শিকারি মাথা নাড়ল, তারপরে সাপের দলের পেছন পেছন বনপথ দিয়ে হাঁটতে লাগল। তারা অনেক দূরের এক পাহাড়ি ঢালুতে এল, সেই ঢালু পেরিয়ে

আরও দূরে যেতে লাগল। শিকারির এখন বেশ শীত শীত লাগছে। শেষকালে তারা এসে পৌঁছল বিরাট এক দরজার সামনে। মেয়ে বলল, তোমাকে ভেতরে নিয়ে যাওয়ার জন্য বাবা মা আসছে, এই যে আমার বাবা মা।

সর্পরাজ এগিয়ে এসে মাথা নুইয়ে শিকারিকে অভিনন্দন জানিয়ে বলল, তুমি আমার মেয়েকে বাঁচিয়েছ শিকারি। তোমাকে ধন্যবাদ দেওয়ার ভাষা আমার নেই। আমি প্রাণের ভেতর থেকে অন্তর দিয়ে তোমাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এই আমার ধনরত্নের ভাণ্ডারে ঢুকে তোমায় সবকিছু দেখাচ্ছি। যা মন চায় তাই তুমি নাও। লজ্জা করবে না।

রাজা ধনভাণ্ডার খুলে দিলেন। হাইলিবুকে নিয়ে রাজা ভাণ্ডারে ঢুকলেন। মণি মুক্তো হীরে জহরৎ ও আরও নাম না জানা সব পাথর থেকে আলো ঠিকরে বেরিয়ে আসছে। শিকারি এসব কোনদিন দেখেনি, অবাক হয়ে এক ঘর থেকে সে অন্য ঘরে রাজার পেছন পেছন যাচ্ছে। তার মুখে কোন কথা নেই। কিন্তু কোন ধনরত্নই শিকারি নিল না, কোন পাথর সে ছুঁয়েও দেখল না।

অবাক বিস্ময়ে রাজা বলল, শিকারি, কোন কিছুই কি তোমার পছন্দ হল না ? আশ্চর্য তো ! হাইলিবু বলল, রাজা, আপনার ভাণ্ডারে সবকিছুই খুবই সুন্দর কিন্তু এগুলো সবই সখের জিনিস। আমি একজন সাধারণ গরিব শিকারি, এসব দিয়ে আমি কি করব রাজা ? কোন উপকারে লাগবে এসব ? স্মৃতির জন্য সত্যিই যদি আপনি আমায় কিছু দিতে চান, তাহলে আপনার মুখের ভেতর লুকিয়ে-রাখা ওই দামি পাথরটি আমায় দিন।

এই কথা শুনে রাজা আস্তে আস্তে তার মুখটা নীচের দিকে নামিয়ে আনল, অল্পক্ষণ চুপ করে রইল, তার পরে মুখ থেকে পাথরটা বের করে দিল। শিকারির হাতে তুলে দিল সেই পাথর।

পাথর নিয়ে শিকারি প্রাসাদ থেকে বাইরে বেরিয়ে এল। পেছন পেছন এল সেই মেয়ে। বারবার সাবধান করে দিল সেই মেয়ে, ওগো শিকারি, এই পাথর যতদিন তোমার সঙ্গে থাকবে তুমি সবকিছু জানতে পারবে। কিন্তু তুমি যা জেনেছ তা যেন কাউকে বলে দিয়ো না। কিছু বলবে না। সর্বনাশ হয়ে যাবে শিকারি। তুমি বাঁচবে না, তুমি পাথর হয়ে যাবে। একথা একবারের জন্যও ভুলে যেয়ো না। মনে রেখো।

হাইলিবুর খুব সুবিধে হয়ে গেল। বনে পাহাড়ে শিকার করা অনেক সহজ হয়ে গেল। পশুপাখির ভাষা সে বুঝতে পারে, গাছের ঘন পাতার আড়ালে কোন পাখি বসে আছে, পাহাড়ের এপাশে কোন পশু রয়েছে তাদের কথা শুনেই সে জেনে যেতে পারে।

এমনি করে কয়েক বছর কেটে গেল। একদিন প্রতিদিনের মতো হাইলিবু পাহাড়ে শিকার করছে। হঠাৎ সে শুনতে পেল এক ঝাঁক পাখি আকাশ দিয়ে ডানা মেলে উড়ে যেতে যেতে বলছে, যত তাড়াতাড়ি পারা যায় অন্য কোথাও চলে যেতে হবে। আগামী কাল এই পাহাড়ে বিরাট বিস্ফোরণ ঘটবে, আগ্নেয়গিরি কাঁপিয়ে ভেঙে ফেলবে এই পাহাড়কে। মাঠঘাট ভেসে যাবে জলে। কে জানে কত পশুপাখি মারা পড়বে ! কি যে হবে এদের !

এই কথা শুনে হাইলিবু চমকে উঠল। কি হবে তাহলে ? শিকার করতে আর মন চাইল না। সে তাড়াতাড়ি ফিরে গেল গাঁয়ে। তাঁদের বলল, যত তাড়াতাড়ি পারা যায় আমাদের সবাইকে অন্য কোথাও চলে যেতে হবে। এখানে আর এক মুহূর্তও থাকা নিরাপদ নয়। তোমরা আমাকে বিশ্বাস করো, পালাও এখান থেকে। সর্বনাশ হয়ে যাবে।

কেউ বিশ্বাস করল না হাইলিবুকে। কেউ ভাবল, ও বোধহয় পাগল হয়ে গিয়েছে। শেষ পর্যন্ত কেউই শিকারির কথায় বিশ্বাস করলনা। চোখের জলে বুক ভাসিয়ে শিকারি কাকুতিমিনতি করে বলল, আমি মরে গিয়ে কি তোমাদের বিশ্বাস জাগাতে পারব ? তখন কি তোমরা বিশ্বাস করবে ?

কয়েকজন বুড়ো মানুষ বলল, আমরা জানি তুমি কোনদিন আমাদের কাছে মিথ্যে কথা বলনি। আমরা সবাই জানি। আজ তুমি বলছ পাহাড় ভেঙে পড়বে, বানে ভেসে যাবে মাঠঘাট গ্রাম। বলতো শিকারি, এই ভয়ানক কথা তুমি জানলে কেমন করে ? কেমন করে তুমি নিশ্চিন্ত হলে যে এই সর্বনাশ কালকে ঘটবে ?

হাইলিবু মনে মনে বলল, আমি জানি সর্বনাশ ঘটবেই। আমি পালিয়ে গেলে আমি বেঁচে যাব ঠিকই। কিন্তু গ্রামবাসীরা ? তাদের ছেড়ে আমি পালাব ? একাই শুধু বাঁচব ? আর গ্রামবাসীদের সর্বনাশের পথে ঠেলে দেব ? তারা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে ? না তা হয় না। আমি ওদের বাঁচাবই। আমার কপালে যা থাকে তাই হবে, আমি সবাইকেই বাঁচাব।

সব কথা খুলে বলল শিকারি। যা যা ঘটেছে সব। সাপের কথা, বাজপাখির কথা, সর্পরাজের কথা, পাথর পাওয়ার কথা, শিকারে সুবিধে হওয়ার কথা, সব বলে দিল তাদের। নইলে যে ওরা বিশ্বাস করবে না তাকে, গ্রাম ছেড়ে যাবে না যে।

কথা বলছে শিকারি আর আস্তে আস্তে সে পাথর হয়ে যাচ্ছে। পা থেকে শুরু হয়েছে, পাথর হচ্ছে শিকারি, শেষকালে কিছুক্ষণ পরে শিকারির দেহ নিথর হয়ে গেল, এখন শুধুই একটি পাথর। গ্রামবাসীদের চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ল। বিশ্বাস করত সবাই শিকারিকে ! কিন্তু বড্ড দেরি হয়ে গিয়েছে।

বাড়ির পশুপাখি জিনিসপত্র সব নিয়ে তারা দূরে চলে গেল। পথ চলতে চলতেই তারা দেখল, পেছনের আকাশে ঘন কালো মেঘ, বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল। সারা রাত ধরে খুব বৃষ্টি। এমন বৃষ্টি কেউ কোনদিন আগে দেখেনি। পরের দিন দূর থেকে তারা শুনতে পেল, প্রচণ্ড শব্দ আর কি যেন ভেঙে ভেঙে পড়ছে, কেঁপে উঠল পৃথিবীর মাটি। চৌচির হয়ে গেল পাহাড়। পাহাড়ের বুক থেকে জলের ধারা নেমে এল মাঠেঘাটে।

দূর থেকে এসব দেখে গ্রামবাসীরা বিড়বিড় করে বলল, শিকারি হাইলিবু নিজের প্রাণ দিয়ে আমাদের বাঁচিয়ে গেল। সে যদি আমাদের চলে আসতে না বলত আমরা এতক্ষণ ডুবে মরে যেতাম। নিজের জীবন দিল শিকারি।

গ্রামবাসীরা কয়েকদিন পরে ফিরে এল তাদের পুরনো গাঁয়ে। গাঁয়ের মধ্যে তারা সেই পাথরটিকে দেখতে পেল, এ তো পাথর নয়, হাইলিবুর জীবন, সেই জীবন যে কখনও নিজের দিকে তাকায়নি, পরের জন্য পাথর হতেও সে দ্বিধা করেনি।

পাথরটিকে বয়ে নিয়ে তারা ভাঙাচোরা সেই পাহাড়ের চুড়োয় গিয়ে উঠল। সেই সেদিন থেকে গ্রামবাসীরা এই পাথরকে পুজো করে আসছে। হাইলিবুর স্মৃতি অমর হয়ে আছে। সেই হাইলিবু, সেই বীর মানুষটি, সেই শিকারি যে অন্যদের জন্য প্রাণ উৎসর্গ করেছিল। এই তো সত্যিকারের মানুষ, আমাদের প্রাণের বীর দেবতা।

আজও মানুষজন বলে ওই পাহাড়ের উঁচু এই চুড়োয় এখনও রয়েছে 'হাইলিবু পাথর'।

অজেয় দুই ভাই

আদি দেবতা ও আদি দেবীর দুই ছেলে। তারা যমজ ভাই। একজনের নাম হুনহুন-আহ্‌পু, আর অন্যজনের নাম ভুকুর-হুনাপু। এই দুজনের মতো অসাধারণ খেলোয়াড় সেই এলাকায় কেউ ছিল না। সেই এলাকায় বলি কেন, গোটা দুনিয়াতেই এমন খেলোয়াড় ছিল না। লাঠি দিয়ে তারা গোল বল খেলত,—সেই খেলাতেই ছিল সবচেয়ে পটু। অন্য খেলাতেও তারা হার মানত না।

একদিন দুজনে এমন জোরে বল মারল যে সেটা গিয়ে পড়ল পাতালে। সেই এলাকায় রাজত্ব করত দুজন। হুন-কামে আর ভুকুব-কামে। তাদের রাজত্বে বল পড়ার খবর পেয়ে তারা ভাবল, ওদের দুজনকে যদি লোভ দেখিয়ে কিংবা ভুলিয়ে এখানে নিয়ে আসা যায় তবে ওদের মেরে ফেলা যাবে। তারা তখন চারজন দূতকে পৃথিবীতে পাঠিয়ে দিল, চারজনেই গেল পেঁচার রূপ ধরে। উড়ে চলেছে চার পেঁচা।

তারা ভাই দুজনের কাছে গিয়ে বলল, 'পাতালে আমাদের রাজ্য হল জিবাল্‌বা। রাজকুমাররা বলখেলায় তোমাদের দুজনকে আহ্বান করেছে। তোমরা তাদের কিছুতেই হারিয়ে দিতে পারবে না।'

কি, এই কথা ? যারা বড় খেলোয়াড় তারা কি আর এই কথায় রাজি না হয়ে পারে ? পাতালে যাওয়ার জন্য তারা তক্ষুনি তৈরি হয়ে নিল।

পেঁচারা আগে, পেছনে যমজ ভাই। খাড়া পাহাড়, অন্ধকার গুহা, ঘন বন পেরিয়ে তারা চলেছে। একবার পেরিয়ে গেল এক রক্তনদী। তারপরেই পাতাল রাজ্য জিবাল্‌বা। তারপরে দুজনে ঢুকল রাজপ্রাসাদে, পাশে রয়েছে চার পেঁচা।

প্রাসাদে ঢুকে যমজ ভাই দেখল, অতুল ঐশ্বর্যের মধ্যে সিংহাসনে পাশাপাশি বসে রয়েছে পাতালপুরীর দুই রাজকুমার। যমজ ভাই মাথা নিচু করে অভিবাদন জানাল। যাদের কাছে তারা অতিথি হয়ে এসেছে তাদের তো সম্মান জানাতেই হবে !

মাথা তুলেই যমজ ভাই হাসির শব্দ শুনতে পেল। তাদের দেখে কারা যেন হাসছে, হাসির মধ্যে ঠাট্টার সুর। যমজ ভাই ভালোভাবে সামনে চেয়ে দেখল, সিংহাসনে যে দুজন বসে রয়েছে তারা জীবন্ত রাজকুমার নয়। কাঠখোদাই করে তাতে রং লাগিয়ে ঠিক আসল রাজকুমারদের মতো মূর্তি বানিয়ে সিংহাসনে বসিয়ে রাখা হয়েছে। পাতালপুরীর লোকেরা তখনও হাসছে।

দুই ভাই চুপ করে গেল, রাগে লাল হয়ে উঠল, চোখে আগুন ঝরিয়ে তাদের দিকে চাইল। তাদের হাসি থেমে গেল, তারা যমজ ভাইদের আসনে বসতে বলল। সুন্দর দুটি উঁচু আসন পাশাপাশি রয়েছে।

যমজ ভাই আসনে বসেই যন্ত্রণায় চিৎকার করে উঠল। আসন ছেড়ে সামনে লাফিয়ে পড়ল। পাথরের আসন তেতে আগুন হয়ে রয়েছে। অতিথি দুজনের যন্ত্রণা আর দুর্দশা

দেখে ওরা হেসে গড়িয়ে পড়ল, আনন্দে লাফিয়ে উঠল, হিহি-হাহা করে পাগলের মতো হাসতে লাগল। ভাই দুজন মেঝেতে তখনও ব্যথায় কাতরাচ্ছে। তারপরে তারা যমজ দুই ভাইকে অন্ধকার ঘরে নিয়ে গেল, সেখানে তাদের মেরে মাটির তলায় পুঁতে দিল।

এদিকে হয়েছে কি, পাতালে জিবাল্‌বার রাজকন্যা ভালোবেসেছিল হুনহুন-আহ্‌পুকে। কাউকে না জানিয়ে তারা বিয়েও করে ফেলেছিল। কেমন করে যেন রাজকন্যার বাবা পাতালরাজ সেটা জেনে ফেললেন।

রাগে কাঁপতে কাঁপতে রাজা পেঁচা-দূতদের আদেশ দিলেন, 'রাজকন্যাকে মেরে ফেলে ওর হৃদপিণ্ড এখুনি নিয়ে এসো।'

পেঁচা-দূতরা রাজকন্যার কাছে গেল। কিন্তু কান্নাভেজা গলায় রাজকন্যা বলল, 'আমায় তোমরা মেরো না, এত নিষ্ঠুর কেন হবে? আমি অন্যায় তো কিছু করিনি!'

দূতেরা তাকে ছেড়ে দিল। রাজকন্যা পাতাল ছেড়ে ওপরের পৃথিবীতে পালিয়ে এল। সোজা চলে এল হুনহুন-আহ্‌পুর মায়ের কাছে। সেখানে তার যমজ ছেলে হল। ছেলে দুটির নাম রাখা হল হুন-আপু ও জবালানকি।

হুনহুন-আহ্‌পুর আর একটা বউ ছিল। সে এই বউকে আগে বিয়ে করেছিল। এই বউয়েরও দুটো ছেলে হয়েছিল। তাদের নাম হুনবাজ ও হুনচাউয়েন। ছোট যমজ দুই ভাই একই সঙ্গে বড় হতে লাগল। কিন্তু ছোট দুটো ছেলে বড় বেশি কান্নাকাটি করত, চিৎকার-চেঁচামেচিতে বাড়ি মাথায় করে রাখত। ঠাকুমা এত অত্যাচার আর সহ্য করতে পারছে না, সে-ও রেগে উঠত। শেষকালে আর সহ্য করতে না পেরে দুই নাতিকে বাড়ি থেকে বের করে দিল। বাইরের দুনিয়ায় রোদে-জলে তারা বেড়ে উঠল আর দিনে দিনে তাদের দেহ হল বিরাট আর শক্তিও খুব। পাহাড়-বনে ঘুরে ঘুরে তারা মস্ত শিকারি হয়ে উঠল। তির লক্ষ করে যাকেই বিন্ধ করতে চাইত, ঠিক তার গায়ে লাগত। তারা এক ধরনের ধনুক ব্যবহার করত। মধ্যে ফাঁপা সোজা লম্বা নল, তার মধ্যে বিষমাখানো তির ঢুকিয়ে পেছন থেকে ফুঁ দিত, আর তির ভীষণ বেগে বেরিয়ে লক্ষে বিঁধত।

গাঁ ও আশেপাশের সবাই ছিল তাদের ভক্ত। সবাই তাদের খুব তারিফ করত। বিপদে পড়লে তাদের সাহায্য চাইত। যমজ ভায়েরা নিজেদের জীবন তুচ্ছ করে অন্যদের সাহায্য করত। তারা আবার ঠাকুমার চোখের মণি।

ঠাকুমার কাছে থেকে ছোট দুই ভাইকে হিংসে করলেও তারা ছিল খুব ভদ্র, খুব দয়ালু। তারা সুন্দর বাঁশি বাজাতে পারত, মিষ্টি গলায় গান গাইত। ঠাকুমা তাদের গান শুনে মুগ্ধ হয়ে যেত। শুধু একটাই দোষ, তাদের মনে খুব হিংসে।

বড় দুই ভাই কিছুতেই সহ্য করতে পারত না, ছোট দুজন কেন এত সুখে শান্তিতে থাকবে। তারা বারবার ছোট দুজনের ক্ষতি করার চেষ্টা করতে লাগল। কিন্তু কিছুতেই কিছু করতে পারল না। কেননা, ছোট দুজন মায়ের কাছ থেকে জাদুশক্তি পেয়েছিল, দাদাদের সব চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে গেল। তাদের মা তো ছিল পাতালরাজ্য জিবাল্‌বার রাজকন্যা। যমজ ভাই দুজন মায়ের কাছে শিশুবেলাতেই অনেক জাদু শিখেছিল। শেষকালে দাদাদের ওপর বিরক্ত হয়ে তারা জাদু প্রয়োগ করল আর বড় দুই ভাই বানর হয়ে গেল।

ঠাকুমা যেই শুনল, তার আদরের দুই নাতি বানর হয়ে গিয়েছে, তখন কাঁদতে কাঁদতে সে বলল, 'ওগো ছোট দুই নাতি, একবার ওদের দেখতে দাও, দয়া করে ওদের আগের রূপে আসতে দাও। ওদের বানর থেকে মানুষ করে দাও।'

ছোট দুভাই বলল, 'বেশ তাই হবে। কিন্তু একটা কথা, ঠাকুমা, তুমি যদি ওদের দুজনের দিকে তাকিয়ে না হাসো তবে ওরা মানুষ হয়ে যাবে।'

ঠাকুমা ভাবল, 'এতো খুব সহজ কাজ। ওদের দেখে হাসব কেন?'

দুই বানর ঠাকুরমার সামনে এল। অদ্ভুত মুখভঙ্গি, হাত বেঁকিয়ে পিঠ চুলকোচ্ছে, একজন আরেকজনকে খোঁচা মারছে, দাঁত খিঁচিয়ে উঠছে, চোখ পিটপিট করছে। এই বাঁদরামি দেখে ঠাকুমা আর হাসি চাপতে পারলনা, হেসে ফেলল। হেসে গড়িয়ে পড়ল। তিনবার চেষ্টা করল ঠাকুমা, গম্ভীর হয়ে তাকাবার চেষ্টা করল। না, পারল না। তিনবারই ঠাকুমা হেসে ফেলল। ঠাকুমা তার দুই নাতি হুনবাজ ও হুনচাউয়েনকে আর মানুষের রূপে পেল না। তারা বানর হয়েই থাকল। আর মুক্তি পেল যমজ দুই ভাই। তাদের আর কেউ বিরক্ত করবে না, শাস্তি দেবার চেষ্টা করবে না।

তারা অপূর্ব গান শিখল। তাদের সুরে সবাই অবাক হয়ে যেত। এমন গান কেউ আগে শোনেনি। সবচেয়ে ভালো সুরের নাম হুন আপুর বানর। এই সুরটাই তাদের সবচেয়ে বেশি পছন্দ।

তখন থেকে যমজ দুজন ঠাকুমার সব কাজ করে দিত। এছাড়া তারা বনে-পাহাড়ে শিকার করত, খেতে ফসলের কাজ করত, আর জাদুর বলে সব কাজই তাড়াতাড়ি খুব ভালোভাবে করতে পারত। গমের মাঠে খুব পরিশ্রম, কিন্তু যাদের কাছে জাদু রয়েছে, তাদের অল্প সবয়েই সব কাজ হয়ে যেত। বাকি সময়ে তাদের অদ্ভুত তির-ধনুক নিয়ে তারা শিকার করে বেড়াত। দিনের বেলা তারা যন্ত্রপাতি দিয়ে গাছপালা উপড়ে ফেলত আর রাতের বেলা সব বুনো পশু একসঙ্গে হয়ে আবার সেইসব গাছপালা ঠিকঠাক পুঁতে দিত। বারবার এরকম হতে দেখে দুই ভাই ফাঁদ পেতে আড়ালে লুকিয়ে থাকল। কিন্তু পশুরাও খুব বুদ্ধি ধরে। কেউ ফাঁদে পড়ল না, শুধু হরিণ আর খরগোশের লেজ কাটা পড়ল আর ফাঁদে পড়ল শুধু একটা ছোট্ট ইঁদুর। দুই ভাই একটা কাপড়ে বাঁধল, কিন্তু এত ছোট্ট প্রাণী দেখে তাদের দয়া হল। তারা ইঁদুরকে বনে ছেড়ে দিল।

তখন ইঁদুর বলল, 'তোমরা যে দয়া দেখালে তার বদলে আমি তোমাদের কিছু বলব। আমি তোমাদের বলব, তোমাদের বাবা আর তার ভাই কি সাহসের সব কাজই না করেছে। আমি তোমাদের জানাব, তাদের কি হয়েছে। তোমাদের যদি সেরকম কিছু ঘটে তবে কীভাবে মুক্ত হতে পারবে তাও আমি তোমাদের জানিয়ে দেব।'

তখন ইঁদুর সব খুলে বলল। তাদের বাবা হুনহুন-আহ্‌পু ও তার ভাই ভুকুব-হুনাপুর গল্প। তারা বুঝল, কীভাবে পাতাল রাজ্যের লোকেরা তাদের ভুলিয়ে নিয়ে যায় আর তারপরে তাদের মেরে ফেলে। বাবার মৃত্যুর খবর শুনে দুই ভাই অনেকক্ষণ ধরে কাঁদল। কান্না থামিয়ে তারা বাবার গোল বল খেলার কথা চিন্তা করতে লাগল। তারাও ওরকম খেলোয়াড় হতে চায়। কিন্তু সে বল আর লাঠি পাবে কোথায়?

ইঁদুর বলল, 'কোন ভাবনা নেই, আমি জানি। সেই বল আর লাঠি আছে তোমাদের ঠাকুমার বাড়িতে। ঠিক কোথায় আছে, কেমন করে তা পাবে আমি বলে দিচ্ছি। মন দিয়ে শুনে নাও।'

ইঁদুর সব বলে দিল। দুই ভাই তক্ষুনি ঠাকুমার বাড়িতে ফিরে এল। খুঁজে পেল বল আর লাঠি। আর তখন থেকেই শুরু করে দিল সেই খেলা। অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই

তারা তাদের বাবার মতো মস্ত খেলোয়াড় হয়ে উঠল। খোলা মাঠে পাতাল রাজ্য জিবাল্‌বার খুব কাছে তারা খেলত। এখানেই তার বাবা-কাকাও খেলত। খেলার শব্দ শুনতে পেল পাতাল রাজ্যের দুজন রাজা হুন্‌-কামে ও ভুকুব কামে। তারা ঠিক করল, লোভ দেখিয়ে ওদের দুজনকে এখানে নিয়ে আসতে হবে। আর তারপর যেমনভাবে যে জায়গায় বাবা-কাকা গিয়েছে সেখানে পাঠাতে হবে।

পেঁচা-দূত খবর নিয়ে এল, লড়তে হবে। সঙ্গে সঙ্গে যমজ দুভাই রাজি। জিবাল্‌বায যাওয়ার জন্য তারা তৈরি হল।

ঠাকুমা তো তাঁদের কিছুতেই ওই সর্বনেশে জায়গায় যেতে দেবে না। ঠাকুমা কাঁদতে লাগল। শেষকালে দুই ভাই উঠোনে একটা বেতগাছ পুঁতে দিল। বলল, 'বেতগাছ যদি লক্‌লক্‌ করে তবে জানবে আমরা বেঁচে আছি আর গাছ যদি শুকিয়ে ওঠে তাহলে জানবে বিপদে পড়েছি।'

হুন-আপু তার পায়ের একটা লোম ছিঁড়ে হরিণকে দিল, হরিণ জিবাল্‌বার পথে চলল। সে পৌঁছে গেল পাতালরাজ্যে। সেখানে অল্প কয়েকদিন হরিণ থাকল। সে কৌশল করে একটা কাজ করল। হুন-আপুর দেওয়া লোম সে সব পাতালবাসীর গায়ে কায়দা করে ফুটিয়ে দিত। হরিণ এভাবে বুঝতে পারল, কারা কারা জ্যান্ত আর কারা কারা রং-করা কাঠের মূর্তি। এই রঙ-করা মূর্তিগুলোই হুনহুন্‌-আহ্‌পু ও ভুকুব-হুনাপুকে ঠকিয়েছিল। হরিং এসব জেনে ছুটে এল ওপরের পৃথিবীতে আর সব খুলে বলল দুই ভাইকে।

এবার রওনা হল যমজ দুই ভাই। জিবাল্‌বার পথে। সেখানে পৌঁছে তারা কাঠের পুতুলগুলোকে আর অভিবাদন জানাল না। এ সময় তাদের মনে পড়ল ইঁদুরের কথা। ইঁদুর সাবধান করে দিয়েছিল। তাই তারা পাথরের আসনে বসল না। আসন তো তেতে আগুন হয়ে রয়েছে নিশ্চয়ই। তারা পেরিয়ে গেল অন্ধকার দুঃখের ঘর। এই ঘরেই তাদের বাবা আর কাকাকে মেরে ফেলা হয়েছিল। তাদের মনে একটুও ভয় নেই, ভয় পেতে তারা শেখেনি। তারপর তারা খেলা শুরু করল। হুন্‌-কামে ও ভুকুব-কামে ভালো খেলল কিন্তু যমজ দুই ভাইয়ের কাছে হেরে গেল। দুই ভাই হল বিজয়ী।

পাতাল রাজ্যের দুই রাজা রেগে আগুন। তারা যমজ দুই ভাইকে আদেশ দিল, জিবাল্‌বার রাজ-উদ্যান থেকে চারটে ফুলের তোড়া নিয়ে এসো।

এদিকে গোপনে বাগানের মালিদের বলে দিল, 'যমজ দুই ভাই যেন বাগান থেকে একটাও ফুল তুলতে না পারে। লক্ষ রাখবে।'

যমজ ভাই দুজন কিন্তু বাগানে ফুল তুলতে গেল না! তারা হাজার হাজার পিঁপড়েকে বাগানে পাঠিয়ে দিল, তারাই চারটি ফুলের তোড়ার মতো ফুল তুলে নিয়ে এল।

অচেনা পাতালরাজ্যের সব থেকে কঠিন কঠিন বিপদের কাজ তাদের দেওয়া হল। তারা সব কাজ বুদ্ধি করে অনায়াসে করে ফেলল। তারা কোন বিপদেই পড়ল না। বর্শা হাতে দৈত্যরা পাহারা দিচ্ছে বর্শার ঘর, তারা সে ঘর পেরিয়ে গেল। তারা পেরিয়ে গেল বরফ-ঠান্ডা ঘর, দেবদারু গাছের ফল পুড়িয়ে দেহ গরম রাখল। বাঘের ঘর পেরিয়ে গেল, আগুনের ঘর পেরিয়ে গেল। বাদুড়ের ঘরে হুন্‌-আপু ভীষণভাবে আহত হল, কিন্তু জাদুর বলে সে তাড়াতাড়ি সেরে উঠল।

শেষকালে রাগে কাঁপতে কাঁপতে জিবাল্‌বার রাজা দুজন বলতে বাধ্য হল, যমজ ভাই দুজন অজেয়। ওদের কেউ কোন বিপদে ফেলতে পারবে না।

ভাই দুজন বলল, 'শুধু অজেয় নয়, আমরা অমর। আমরা তারও প্রমাণ দেব।'

তারা দুজন জাদুকরকে ডাকল। তাদের বলে দিল, তাদের হাড়গুলো দিয়ে কি করতে হবে।

দুই ভাই চিতা তৈরি করে ওপরে উঠল আর পুড়ে মরে গেল। জাদুকরদের আগেই বলা ছিল। তারা হাড়গুলোকে গুঁড়ো করে ধুলোর মতো করল। সেগুলো নিয়ে নদীতে ফেলে দিল। অল্পক্ষণ পরে হাড়ের গুঁড়ো জলের সঙ্গে মিশে গেল।

একদিন যায়, দুদিন যায়। পাঁচদিন পরে যমজ ভাই দুজন আবার ফিরে এল। এক অদ্ভুত প্রাণী হয়ে। অর্ধেক মানুষ, অর্ধেক মাছ। আবার তারা জলে ডুব দিল। পরের দিন উঠে এল দুজন হাড় জিরজিরে বুড়ো হয়ে। বুড়ো অনেক মজার মজার খেলা দেখাল। পরের দিন তারা হয়ে গেল হুন্-আপু ও জবালানকি।

অবাক হয়ে গিয়েছিল জিবাল্‌বার রাজারা। তারা অনুরোধ করল, আরও জাদু দেখাও। যমজ ভাই দুজন তাই দেখাল। তারা প্রাসাদ পুড়িয়ে দিল, আবার আগের প্রাসাদ ফিরে এল। একটা কুকুরকে মেরে ফেলল, আবার তাকে জ্যান্ত করে তুলল। একটা মানুষকে টুক্‌রো-টুক্‌রো করে কেটে ফেলল, আবার আস্ত মানুষ করে দিল।

জিবাল্‌বার দুজন বলল, 'বেশ আমাদের মেরে আবার বাঁচিয়ে তোল তো। দেখি কেমন লাগে।'

যমজ ভাই দুজন তাদের মেরে ফেলল। কিন্তু তাদের জীবিত করে না তুলে বলল, 'আজ থেকে তোমরা ওপরের পৃথিবীর দুই দেবতা হয়ে থাকবে। আর আজ থেকে পাতালরাজ্যের বাসিন্দাদের শেষ বিচার হয়ে গেল। তারা নিঃশেষ হয়ে গেল।'

যমজ দুই ভাই বলল, 'জিবাল্‌বার দুই রাজা, তোমরা কোনদিন মরবে না। তোমরাও অমর হয়ে থাকবে। কিন্তু বেঁচে থাকবে যতসব নিকৃষ্ট কাজ করার জন্য, যেসব কাজ চাকররা করে। শুধুমাত্র বনের পশুরা তোমাদের বশে থাকবে, তোমাদের কথা শুনবে। তোমরা আর কোনদিন বল খেলার মতো সুন্দর খেলা খেলতে পারবে না। তোমরা পেঁচার মতো কুৎসিত দেখতে হবে, তোমাদের মুখের রং হবে কালো আর সাদা। কালো-সাদা মুখ বুঝিয়ে দেবে তোমরা কত শয়তান আর বিশ্বাসঘাতক ছিলে।'

তারপর অজেয় দুই ভাই তাদের বাবা আর কাকার আত্মা নিয়ে এল। জিবাল্‌বার সেই অন্ধকার থেকে আত্মা নিয়ে এল। আত্মাদুটি আকাশে রেখে দিল,—সেখানে তারা হল সূর্য আর চন্দ্র। ঠাকুমা দুই নাতিকে আবার দেখতে পেয়ে খুব খুশি হল। এতদিন বড় কষ্টে কেটেছে তার। আবার আনন্দও হয়েছে। কষ্ট আর আনন্দে তার দিন কেটেছে। কেননা, বেতগাছ মাঝে-মধ্যে লক্‌লক্ করে উঠত, আবার মাঝে-মধ্যে শুকিয়ে যেত। জিবাল্‌বার অন্ধকার দুঃখের রাজ্যে দুই ভাই যেভাবে কাটিয়েছে তাই ফুটে উঠত তাদের পোঁতা বেতগাছে। কখনও জয়, কখনও বিপদ। কখনও আঁধার, কখনও আলো।

বুড়ি ও রবিন পাখি

সে অনেক অনেককাল আগের কথা। সেবার বরফ পড়ছে। প্রত্যেক বছর শীতকালেই এমনটা হয়। কিন্তু এবারে এমন ঘন আর পুরু হয়ে বরফ পড়েছে যে পাহাড়ের গাছপালার ডগাও দেখা যাচ্ছে না। শুধু সাদা বরফ আর বরফ।

পাহাড়ের কোলে এক ছোট্ট গ্রাম। তার নাম তাওস। সেই গ্রামে সেই শীতের দিনে এমন বরফ পড়ল যে আগুন জ্বালাবার মতো এক টুকরো শক্ত পাথরও তাওসরা খুঁজে পেল না। ঘরের দরজা-জানালা বন্ধ করে সবাই ভেতরে বসে রইল। কিন্তু ভেতরেও এত ঠান্ডা যে তারা ঠক্‌ঠক্‌ করে কাঁপতে লাগল। সেই কনকনে শীতে এবার বুঝি তারা মারাই পড়বে।

এমনি করে খুব কষ্টে কয়েক দিন কেটে গেল। শেষকালে বাদামি রঙের এক ছোট্ট রবিন পাখি উড়ে এল সেই গ্রামে। তার বুক বাদামি রঙের নরম পালকে ঢাকা। ভীষণ ঠান্ডায় রবিন থর্‌থর্‌ করে কাঁপছে, তার ঠোঁটদুটো কষ্টে অল্প অল্প নড়ছে, পায়ে যেন কোন জোর নেই।

চারপাশে লোকজনের বাড়ি, মধ্যিখানে অনেকটা ফাঁকা জায়গা। আনন্দের দিনে গ্রামবাসী সেখানে গান গায়, নাচে ; আর দুঃখের দিনে সেখানে সবাই মিলে দুঃখ থেকে বাঁচবার কথা ভাবে। সেই ফাঁকা জায়গায় কোন ঘর নেই, নেই কোন গাছ-গাছালি। রবিন কাঁপতে কাঁপতে ধপ্‌ করে সেখানে পড়ে গেল। নরম দেহে বড় লাগল।

এমন সময় সেখানে এল এক পাহাড়ি ভালুক। এসেই মুখটা আকাশের দিকে তুলে বলল, 'আর বেশি দেরি নেই। যা বরফ পড়ছে না! এই শীতেই ঠান্ডায় জমে গাঁয়ের সব লোক মরে যাবে। আর আমি হব তখন এই দেশের সর্দার। মজা করে শাসন করব এই দেশ, আমি হব রাজা।'

ক্লান্ত দেহে রবিন আরও বেশি কাঁপছে। গলা উঁচিয়ে রবিন বলল, 'আমি যদি সাহায্য করি, তাহলে কিন্তু তুমি তা পারবে না। আমি তাওসদের বাঁচাবই। যেমন করে পারি। তাতে যদি আমার প্রাণ যায় যাক।'

এই কথা বলে রবিন দেহে শক্তি আনল, মনে সাহস আনল, তারপরে অনেক কষ্টে উড়ে চলল। সে দক্ষিণমুখো উড়ছে, আরও দক্ষিণে, আরও দক্ষিণে। উড়তে উড়তে সে এসে পৌঁছল আর একটি গাঁয়ে। সেখানে থাকে তাওসদের জ্ঞাতিভাইরা। রবিন দেখল, চারিদিকে সুন্দর সুন্দর বাড়ি, মাঝখানে বিরাট খোলা উঠোন। আর সেই উঠোনে জ্বলছে দাউ দাউ করে কাঠের আগুন। রবিন তার ছোট্ট ঠোঁটে তুলে নিল এক টুকরো জ্বলন্ত কাঠ। উড়ে চলল তাওসদের গাঁয়ের পথে।

আকাশে বড় দমকা হাওয়া। আগুন নিভে যেতে চায়। ছোট্ট ক্লান্ত ডানা দুটোয় আড়াল করে সে উড়ে চলল। আগুনটাকে জিইয়ে রাখতেই যে হবে। এ আগুন বাঁচাবে তাওসদের।

গাঁয়ে নেমেই ছোট্ট ছোট্ট পায়ের নখে সে বরফ সরিয়ে ফেলল, একটা ছোট্ট গর্ত খুঁড়ে তার মধ্যে ঢুকিয়ে দিল ঠোঁঠের আগুন। উড়ে গেল একটা শুকনো গাছে। ছোট্ট ডাল ভেঙে উড়ে এল আগুনের কাছে। গুঁজে দিল শুকনো ডাল। আবার উড়ে গেল সেই গাছে, বয়ে নিয়ে এল আরেকটা শুকনো ডাল। আগুন জ্বলে উঠল লাল শিখা বেয়ে। রবিন ছুটলো আরও ডাল আনতে।

এমন সময় আগুন দেখে ভালুক ছুটে এল। খুব জোরে এক নিঃশ্বাস ফেলল আগুনের গর্তে। এ আগুন নেভাতে না পারলে তাওসরা বেঁচে যাবে, তারা ঠান্ডায় জমে মারা পড়বে না, সেই-বা কেমন করে সর্দার হবে? আগুন গেল নিভে, ধোঁয়ার মধ্যে রইল আগুনের কয়েকটা ফুলকি।

রবিন একটা ডাল নিয়ে ফিরে এল। ধোঁয়া দেখে চমকে উঠল। শুকনো ডাল গুঁজে দিয়ে ছোট্ট দুটো ডানায় আস্তে আস্তে পাখা করতে আরম্ভ করল। মনে মনে বলল, 'আগুন, তুমি জ্বলে ওঠো। নইলে যে তাওসরা জমে মরে যাবে। তুমি নিভে যেও না আগুন।'

আগুন জ্বলে উঠল। রবিনের চোখদুটোয় খুশি-খুশি ভাব। উড়ে চলল শুকনো গাছে, আরও শুকনো ডাল আনতে হবে।

যেই না রবিন উড়ে গেল, তক্ষুনি ভালুক ফিরে এল আগুনের গর্তের কাছে। জোরে দুবার নিঃশ্বাস ফেলল, আগুন গেল নিভে। ধোঁয়ার মধ্যে রইল আগুনের কয়েকটি ফুলকি।

ধনুক থেকে ছাড়া-পাওয়া তিরের মতো গলা বাড়িয়ে পা লম্বা করে উড়ে এল রবিন। মুখে তার শুকনো ডাল, বুকে কাঁপুনি। শুকনো ডাল গর্তে ঢুকিয়েই ছোট্ট দুটো ডানায় হাওয়া করতে লাগল রবিন, হাওয়া দিচ্ছে। বারবার ডানা নাড়ছে, ক্লান্ত তার ডানা। কিন্তু আগুন যে নিভে যায়, তাকে যে জ্বালাতেই হবে। আগুন জ্বলে উঠল।

আবার উড়ে চলল রবিন। ঝড়ের মতো গতি তার। আরও শুকনো ডাল তার চাই। আগুন জ্বালিয়ে রাখতেই হবে।

আবার ফিরে এল ভালুক। তিনবার খুব জোরে নিঃশ্বাস ফেলল গর্তের মুখে। সব আগুন নিভে গেল, রইল শুধু খুব ছোট্ট একটিমাত্র ফুলকি। আনন্দে মুখ ঘুরিয়ে ভালুক বলল, এবার? এবার আমি হব এই দেশের সর্দার। আগুন নিভেছে।

পাহাড়ের ওপরের বিদ্যুৎ যেমন করে আছড়ে পড়ে মাঠের গাছের মাথায়, ছোট্ট ডাল মুখে নিয়ে ছোট্ট রবিন নেমে পড়ল গর্তের মুখে। ঢুকিয়ে দিল শুকনো ডাল। ধোঁয়া দেখে বুক ব্যথায় ভরে গেল, চোখে এল জল। তবু সেই ছোট্ট এক টুকরো ফুলকিতে ডানা দিয়ে হাওয়া করল রবিন, কিন্তু ছোট্ট ফুলকি জ্বলে উঠল না।

কিন্তু রবিন তাতেও আশা ছেড়ে দিল না, চেষ্টা করে যেতে লাগল। মনে মনে বলল, 'আগুন তুমি জ্বলে ওঠো, দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠো। দোহাই, তাওসদের জন্যই জ্বলে ওঠো।'

যতবার সে ডানা দিয়ে হাওয়া করছে, ততবার আগুনের হলকা এসে লাগছে তার নরম বাদামি বুকে। কষ্ট হচ্ছে, জ্বালা করছে, কিন্তু পাখা বন্ধ করে নি। হঠাৎ দাউ দাউ করে শুকনো ডালের আগুন জ্বলে উঠলো। অনেক শুকনো ডাল জমে উঠেছিল,

ডালগুলো পুরো ছাই হয়ে যায় নি। এমন আগুন জ্বলল, ভালুক আর সহজে তা নিভিয়ে ফেলতে পারবে না। রবিনের বুকে আনন্দ, চোখে খুশি-খুশি ভাব।

কাঠের ঘরের ফাঁক দিয়ে তাওসরা দেখল সামনের উঠোনে লাল আলো। অবাক হয়ে তারা দরজা খুলে ফেলল, আগুনের শিখা উঁচু উঁচু হয়ে নাচছে। তার সামনে ক্লান্ত ডানায় ছোট্ট এক রবিন পাখি হাওয়া দিচ্ছে। শীতে জমে-থাকা তাওসরা সবাই ছুটে এল ঘর থেকে। সবাই তুলে নিল এক টুকরো আগুন। ফিরে গেল ঘরে। শুকনো কাঠে আগুন জ্বেলে মনের খুশিতে উত্তাপ পোয়াতে লাগল।

কেউ ছোট্ট পাখির কথা ভাবল না।—হায় ক্লান্ত ছোট্ট পাখি! সবাই ভুলে গেল রবিনের কথা।

কিন্তু ভোলেনি একজন বুড়ি। সেও ঘরের ফাঁক দিয়ে দেখেছে রবিনকে হাওয়া করে আগুন বাঁচাতে। সেও বড় দুর্বল, বড় ক্লান্ত।

সে শুকনো ঠান্ডা হাতে তুলে নিল ছোট্ট রবিনের দেহটি। আদরে বুকের কাছে চেপে ধরল আলতোভাবে। খুব সাবধানে নিয়ে গেল নিজের বাড়িতে। আগুনের পাশে তাকে শুইয়ে দিল, রবিনের সমস্ত পালক যেন বরফ হয়ে গিয়েছে। এখন তার উত্তাপ চাই।

বড় দেরি হয়ে গিয়েছে! ছোট্ট ক্লান্ত রবিন মরে গিয়েছে। বরফ-জমা ঠান্ডায় রবিন মরে গিয়েছে।

কান্না-ভরা চোখে ক্লান্ত বুড়ি দেখল, রবিনের ছোট্ট নরম বুকের মাঝখানটা ওইরকম আগুনের মতো লাল। ফুলকিতে ডানার হাওয়া দেওয়ার সময় যে রবিনের বুকে আগুনের আঁচ লেগেছিল! তাই বুক লাল হয়ে গিয়েছে। আজও সব রবিনের বুক তাই লাল।

বাজ ও সূর্যের আগুন

সে অনেককাল আগের কথা। কতদিন আগে তা বলতে পারব না, কিন্তু অনেক আগের কথা। তখন আমাদের বড় কষ্ট ছিল। আমাদের পিতা পিতামহদের বড়ই কষ্ট ছিল। হায়! সেকালের কথা মনে পড়লে চোখে জল আসে। কিন্তু বাছারা, তবু সেকালের কথা তোমাদের জানতে হবে। আমরা থাকব না, তোমরা তোমাদের ছেলেমেয়েদের তখন এই গল্প শোনাবে। সত্যি গল্প।

সেই কালে আমাদের লোকজন খুব কম ছিল। তারা ছোট্ট একটা গাঁয়ে বাস করত। গাঁয়ের একদিকে বয়ে চলেছে ছোট্ট তিরতিরে পাহাড়ি নদী, আর গাঁয়ের কিছুটা দূর দিয়ে তিনদিকে পাহাড়। ঘন গাছে সবুজ। অনেক কষ্ট, তবু সুখে দিন বয়ে যায়।

সব বছরই ওই সময় চারিদিকে বরফ পড়ে। মাটি ঢেকে যায়, গাছের ডাল নুয়ে পড়ে। শীত পড়ে, ভীষণ কষ্ট। কিন্তু একবার সৃষ্টি-ছাড়া বরফ পড়ল। এমন বরফ-পড়া আগে কেউ দেখেনি। নদীর জলও জমে গেল। গাছগুলাকে মনে হল বরফের গাছ। সূর্যের তেজও যেন কমে গেল। সে কি দুর্দিন!

গাঁয়ের মানুষ ঘর থেকে বাইরে বেরোতে পারে না। ঘরের মধ্যেও দেহ জমে যাচ্ছে। জমানো খাবারও ফুরিয়ে আসছে। সবদিকে দুশ্চিন্তা। বুড়োরা ভাবল, একটা কিছু করতে হয়, নইলে তো জমে গিয়ে না খেয়ে ঘরেই মরে পড়ে থাকতে হবে। কিন্তু কি করবে ভেবে পেল না।

একদিন একজন বুড়ো দরজা খুলে বাইরে উঁকি দিল। বরফের হাওয়া দেহে যেন কেটে কেটে বসছে। হঠাৎ সে দেখল, একটা বাজপাখি ঠোঁট দিয়ে বরফ সরিয়ে কি যেন করছে। লোকটি দরজা ভেজিয়ে বাইরে বেরিয়ে এল। বাজপাখি তাকে দেখে করুণভাবে সবুজ চোখ মেলে তাকাল। বলল, 'তিনটে ছেলেমেয়ে বেশ কয়েকদিন খায়নি। বড় কাঁদছে। দেখি কিছু পাই কিনা।'

বুড়ো অবাক হল। পাহাড়ি গাছের উঁচু ডালে থাকে বাজ, দুরন্ত তার গতি, অসীম তার শক্তি, ক্ষুরধার তার ঠোঁট ও নখ। সেও এমন অসহায়! হায় কপাল!

বুড়ো আস্তে আস্তে বলল, 'বাজ, আমরাও যে মরে আছি। একটা কিছু করতে হয়। দেহ তো বরফ হয়ে গেল, পেটে যে ভীষণ ব্যথা।' বাজ মুখ তুলে বলল, 'অনেক কিছুই আমি জানি। কিন্তু এবারে যা অবস্থা তাতে কোন বুদ্ধিই খেলছে না। কোথাও দূরে পালিয়ে যাব তার উপায়ও নেই। ছানারা উড়তে শেখেনি।'

বুড়ো কিছুক্ষণ ভেবে বলল, 'বাজ, সূর্যের আগুন আনা যায় না? সূর্যের মধ্যে দাউ দাউ আগুন জ্বলছে। তুমি ওই কত ওপরে উড়ে যাও, আগুন আনতে পারো না? এ ছাড়া আমরা বাঁচব না। বাজ, তুমি আমাদের বাঁচাও, তুমি ছাড়া কেউ পারবে না। চিরকাল আমরা মনে রাখব। আমাদের বাঁচাও, আমাদের ছেলেমেয়েদের বাঁচাও। আগুন পেলে তোমার ছেলেমেয়েরাও উত্তাপ পাবে।'

বাজ চুপ করে রইল। সে জানে, সূর্যের মধ্যে আগুন আছে। দূর আকাশে অনেক অনেক ওপরে সে যখন উড়ে যায়, এখানকার চেয়ে আরও বেশি উত্তাপ পায় সে। আরও ওপরে উঠলে আরও গরম। ডানার পালক, চোখ জ্বালা করে। হ্যাঁ, সূর্যের আগুনের খবর সে জানে। কিন্তু ওই আগুন যদি তার পালককে পুড়িয়ে দেয়? সে মাটিতে নামবে কেমন করে? বুড়ো তাকিয়ে রয়েছে বাজের দিকে। বাজ মুখ তুলে আবার চোখ নামিয়ে বলল, 'বেশ তাই হোক। আমি তোমাদের জন্য আগুন আনব। কিন্তু আর কয়েকদিন পরে। একটু সহ্য করো, আগুন আমি আনবই।'

বাজ উড়ে গেল তার বাসায়। মা বলল, 'বাছারা, সব সময় ডানা নাড়বে। তাড়াতাড়ি উড়তে শিখতে হবে। মা তো আর চিরকাল তোমাদের পাশে থাকবে না! তাড়াতাড়ি বড় হও।'

ছানারা অতশত বোঝে না, কিন্তু মায়ের চোখে চিকচিক জল দেখতে পায়। তারা জানতে চায়, মা হেসে উড়ে যায় খাবার আনতে। সারাদিন ধরে বেশ কয়েকদিন পরিশ্রম করল বাজ। তারপরে একদিন ছানাদের বলল, 'তোমাদের পালক বেশ সবল আর ঘন হয়েছে। বরফ পড়া একটু কমলেই তোমরা উড়তে পারবে। ভয় নেই। আমি একটু দূরে যাব। যদি নাও ফিরে আসি, তোমরা নিজেরাই বেঁচে থাকতে পারবে। বাছারা আমার।'

বাজ উড়ে এল বুড়োর দরজায়। বুড়ো দরজা খুলে অবাক হল। বাজ কথা রেখেছে, সে এসেছে। তারা বোধহয় বেঁচে যাবে।

বাজ বলল—'অনেক দূরের পথ। অনেক উঁচু পথ। অবিরাম ডানা মেলে উড়তে হবে, মুখ দিয়েও নিঃশ্বাস নিতে হবে। তাই শুকনো ডাল মুখে ধরতে পারব না, পড়ে যেতে পারে। তুমি ওই গাছের লতা দিয়ে এই শুকনো ডালটা খুব জোরে আমার পায়ের সঙ্গে বেঁধে দাও। আগুন আনতে চললাম। যাই হোক না কেন, তোমাদের জন্য আগুন বয়ে নিয়ে আসবই।'

কৃতজ্ঞতায় বুড়ো অভিভূত, সে শুকনো ডাল বাজের পায়ে বেঁধে দিল, কিন্তু কোন কথা বলতে পারল না। একবার বুড়োর দিকে আর একবার তার বাসার দিকে তাকিয়ে বাজ উড়ে চলল পাহাড়ের পথে। অল্পক্ষণ তাকিয়ে থেকে বুড়ো ভেতরে চলে গেল।

ওপরে, ওপরে, আরও ওপরে উঠছে বাজ। মাঝে মধ্যে নীচে তাকিয়ে দেখছে গলা নামিয়ে। না, তার বাসা কিংবা বাছাদের আর দেখা যাচ্ছে না। কিছুই দেখা যাচ্ছে না।

উঁচুতে আরও উঁচুতে উড়ে চলে দুর্জয় বাজপাখি। তার ডানা দুটো টনটন করছে। কিন্তু বাজের একটা সুবিধা আছে। সে অনেকক্ষণ হাওয়ায় ভেসে থাকতে পারে, তখন আর ডানা ঝাপটাতে হয় না, ডানা মেলে সে ভেসে থাকে। কিন্তু এতে তাকে কিছুটা নেমে যেতে হয়। তাতে কি? দম নিয়ে, ডানায় জোর এনে আবার সে ওপরের দিকে উড়ে যায়, দ্বিগুণ উৎসাহে। তাকে আগুন আনতেই হবে।

গাছের বাসায় দেহ জমে যেত। এখন একভাবে উড়তে উড়তে বাজের দেহ গরম হয়ে উঠেছে। ক্লান্তি আছে, শীত নেই। ডানায় ব্যথা আছে, প্রাণে উৎসাহ জেগেছে। মানুষের কষ্টে সে অনেক বড় কাজ করতে চলেছে। সে ভাবছে, আর কি কোনদিন তার বাছাদের কাছে ফিরে যেতে পারবে। আহা আদরের বাছারা তার।

অগ্নিপিণ্ড সূর্যের অনেক কাছে বাজ চলে এসেছে। সূর্যের মধ্যে কেমন আগুনের খেলা দেখতে পাচ্ছে। চোখ জ্বলছে, ডানার পালক জ্বলছে। আর যে এগোনো যায় না। আর তো সহ্য করা যায় না। আর পারছে না বাজ। দেহ যেন পুড়ে খাক্ হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু ছেড়ে গেলে তো চলবে না! আগুন তাকে আনতেই হবে, জীবন যায় যাক।

দেহটা লম্বা করে সে সূর্যের দিকে চেয়ে দেখল। ঝলসে গেল তার সবুজ দুটো চোখ। জ্বলে উঠল পায়ে-বাঁধা শুকনো ডাল। বিদ্যুতের বেগে নীচে নামতে লাগল। পাহাড় থেকে যেমন করে নুড়ি গড়িয়ে পড়ে, পাহাড়ি ঝরনা থেকে যেমন জল ছিটকে পড়ে, বাজ তেমনিভাবে মাটির দিকে নামতে লাগল। সে কি গতি! এমনভাবে বাজ কোনদিন নীচে নামেনি। সে নামছে, নামছে।

হঠাৎ তার বুক পুড়তে লাগল, পালক পুড়তে লাগল। মাথা নামিয়ে বাজ দেখে, পুরো ডালটা জ্বলছে, তার শিখা তার দেহকে পুড়িয়ে দিচ্ছে। ভাবল, আর পারি না, ডালটা ঠোঁটের আঘাতে ফেলে দি। কিন্তু মানুষ যে চেয়ে আছে, আমার ফেরার আশায় বসে রয়েছে। বাজ গতি আরও বাড়িয়ে দিল। না, তার গোটা দেহের পালক জ্বলছে। সে কি পারবে মানুষের কাছে পৌঁছতে?

ধপ করে কিছু পড়ার শব্দ হল। একেবারে সামনেই। বুড়ো দরজা খুলে কাঁপতে কাঁপতে বেরিয়ে এল,—বাজপাখি জ্বলছে, সে উলটে-পালটে যন্ত্রণায় ছটপট করছে। আগুন! আগুন! আগুন! চিৎকার করতে লাগল বুড়ো। একের পর এক দরজা খুলে যাচ্ছে। বেরিয়ে আসছে বুড়ে-বুড়ি যুবক-যুবতী-কিশোর-কিশোরী। সবার হাতে শুকনো কাঠ। বাজের দেহ থেকে আগুন জ্বালিয়েই ছুটে যাচ্ছে ঘরে, আরও কাঠ দিয়ে দাউ দাউ আগুন জ্বেলে চারপাশে বসে আগুন পোয়াতে লাগল তারা। বুড়োর ঘরেও আগুন গেল।

বুড়ো কিন্তু বাজকে ছেড়ে একবারও ঘরে যায়নি। হাতের ঝাপটা দিয়ে আগুন নেভাতে চেষ্টা করছে। হাত পুড়ছে, তবু চেষ্টা থামায় নি। না, বড় বেশি দেরি হয়ে গিয়েছে। পাথরের মতো নিথর হয়ে গিয়েছে বাজের দেহ। পালক পুড়ে গিয়েছে, বাজকে যেন কেমন লাগছে। বাজের দেহে প্রাণ নেই।

বুড়ো বাজের দেহকে তুলে নিল। বুকের কাছে আনতেই বুড়ো অবাক হয়ে গেল। বাজের মুখে কেমন সুন্দর হাসিহাসি ভাব। সবুজ চোখদুটো আগুন-রাঙা হয়ে গিয়েছে, পাদুটোও লালচে। বুড়ো ভাবল, বোধহয় আগুনের শিখায় এমনটি হয়েছে। কিন্তু এ কি? শরীর আর নরম নেই, বাজ পাথর হয়ে গিয়েছে। পাথরের বাজ বুড়োর হাতে।

গাঁয়ের পাশের ওই পাহাড়ে বুড়ো গেল। বরফ-জমা পথে পাহাড়ে উঠল। পাহাড়ে ওই উঁচুতে পাথরের বাজকে বসিয়ে দিল। ওই লাল চোখ, লাল পা, পালক-পোড়া পাথরের বাজকে বসিয়ে রাখল। ওই দেখো, আজও বাজ ডানা মেলে এখানে বসে আমাদের গাঁ পাহারা দিচ্ছে। কবে থেকে দিচ্ছে কেউ জানে না।

আমরা বাজকে পুজো করি। কোনদিন কোন বাজকে মারি না, শিকার করি না। কোন বাজ আমাদের কোন ক্ষতি করে না। বাজ আমাদের দেবতা। হবেই বা না কেন? নিজের জীবন দিয়েও সে আমাদের জন্য আগুন এনে দিয়েছে। এর চেয়ে বড় উপকার আর কি হতে পারে? বাজ আমাদের আগুন দিয়েছে, তাকে আমরা ভুলিনি।

আদিবাসী লোককথা ঃ মোটিফ ইনডেক্স্

লোককথার যে ভাবটি আমাদের বিস্মিত করে তা হল এর অভিপ্রায়ের বিশ্বজনীনতা। মানবসমাজের আর্থ-সামাজিক-সাংস্কৃতিক অসম বিকাশ ঘটেছে নিঃসন্দেহে, কিন্তু বিশ্বের যে কোন প্রান্তের লোককথা বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, এসবের মধ্যে মানসিক অভিপ্রায়ের এক আশ্চর্য মিল রয়েছে। সংস্কৃতি ভাষা আচার-আচরণ পাল-পার্বণ লোকবিশ্বাস পোশাক জন্ম-বিবাহ-মৃত্যু প্রথা এবং আর্থ-সামাজিক অবস্থান নানা ধরনের হলেও মানবগোষ্ঠীর মানসিক চিন্তা-চেতনায় একই রকমের চিন্তা ও ঘটনা আনাগোনা করেছে। কেননা, তারা সামাজিক ও গোষ্ঠীবদ্ধ মানুষ এবং একই সভ্যতার বিবর্তনের উত্তরাধিকার বহন করে চলেছে। তাই মানবগোষ্ঠীর মধ্যেকার বিভেদ-বিরোধগুলি মনে হয় অতি তুচ্ছ, তাদের আসল পরিচয় মানসিক সেতুবন্ধনে। আর এই বন্ধনের অনন্য পরিচয় রয়েছে লোককথাগুলির মধ্যে।

এই বিস্ময়কর বিশ্বজনীন মানসিকতা ধরা পড়বে মোটিফ ইনডেক্সের মাধ্যমে। স্টিথ টমসন ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দ থেকে বিশ্বের লোককথাগুলি বিশ্লেষণ করে অভিপ্রায় অনুসন্ধানের কাজ করেছেন। তিনি বারো হাজার মূল মোটিফের সন্ধান পেয়েছেন। আঞ্চলিক বা স্থানীয় বৈশিষ্ট্য অনেক লোককথায় থাকলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই রয়েছে সর্বজনীন অভিপ্রায়। ১৯৫৫-৫৮ খিস্টাব্দের মধ্যে স্টিথ টমসন ব্লুমিংটন, ইন্ডিয়ানা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ছয় খণ্ডে প্রকাশ করেন 'মোটিফ ইনডেক্স্ অব ফোক লিটারেচার' গ্রন্থ। তিনি এই বিশাল গ্রন্থ রচনা করে মানবসমাজের মধ্যেকার মানবিক-মানসিক অভিন্নতার দিকটি সুস্পষ্ট করে তুলেছেন। লোককথা বিশ্লেষণে বহু পদ্ধতি এর আগে ও পরবর্তীকালে আলোচিত হলেও মোটিফ ইনডেক্স্কেই আমার সবচেয়ে বিজ্ঞাননির্ভর ও মানবিক পদ্ধতি বলে মনে হয়েছে। কেননা, এই পদ্ধতির মাধ্যমেই লোকসমাজের মনের গভীরে পৌঁছনো যায় এবং সামাজিক সম্পর্কের বিষয়টি স্পষ্টতর হয়। অন্যান্য পদ্ধতি বড় যান্ত্রিক।

একটি লোককথাকে বিশ্লেষণ করলে তার মধ্যে একটি মূল বা একাধিক কাহিনি অংশ পাওয়া যাবে, এই মূল কাহিনি-অংশেই হল মোটিফ। এই খণ্ড খণ্ড মৌলিক কাহিনি-অংশই সমগ্র লোককথাকে অখণ্ড সূত্রে গড়ে তোলে। আবার প্রত্যেকটি কাহিনি-অংশেরও একটি স্বাধীন বৈশিষ্ট্য থাকে। স্টিথ টমসন ইংরেজি বর্ণমালা ধরে মোটিফগুলিকে ২৩টি বর্গে ভাগ করেছেন, 'ও, আই ও ওয়াই' এই তিনটি বর্ণকে তিনি যুক্ত করেননি। 'এ' থেকে 'জেড' পর্যন্ত এই বর্ণগুলিতে এমন বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত করেছেন মানবজীবন ও পরিবেশকে কেন্দ্র করে যার বাইরে আর কোন বিষয় হতে পারেনা। মানুষের সামাজিক ইতিহাস ও লোককথার প্রাণ বিশ্লেষণ করেই তিনি এই সঠিক সিদ্ধান্তে

এসেছিলেন। তালিকাকে সম্প্রসারণশীল করবার জন্য তিনি মূল ভাগগুলির অন্তর্গত মোটিফের সংখ্যায় দশমিক প্রথা ব্যবহার করার পদ্ধতি চালু করেন।

'আদিবাসী লোককথা' গ্রন্থে পৃথিবীব্যাপী আদিবাসী লোকসমাজের যেসব লোককথা অনুবাদ করেছি তার মোটিফ ইনডেক্স্ দেওয়া হল। সর্বজনীন ও মানবিক সেতুবন্ধনের বিষয়টি পাঠক উপলব্ধি করতে পারবেন।

এ. লোকপুরাণ

এ ২১.১	নারী ও পুরুষ সৃষ্টিকর্তা
এ ৩০	সৃষ্টিকর্তার সঙ্গী
এ ১৩১	পশু আকৃতির দেবতা
এ ১৩২	পশুর রূপে দেবতা
এ ১৩৩	দানবরূপী দেবতা
এ ১৫১	দেবতাদের আবাসস্থল
এ ১৫১.৩	সাগরতলে দেবতার আবাসস্থল
এ ১৫৬	দেবতার অমূল্য সম্পদ
এ ১৫৬.৫	দেবতার রথ
এ ১৬৫.২	দেবদূত
এ ২১০	আকাশদেবতা
এ ২২০	সূর্যদেবতা
এ ২৪০	চন্দ্রদেবতা বা চন্দ্রদেবী
এ ২৮২	বায়ুদেবতা
এ ২৮৩	মেঘদেবতা
এ ২৮৭	বৃষ্টিদেবতা
এ ৪২১	সাগরদেবতা
এ ৪২১.১	সাগরদেবী
এ ৪৬২.১	রূপের দেবী
এ ৪৬৩	ভাগ্যদেব বা ভাগ্যদেবী
এ ৪৬৪	ন্যায়ের দেবতা
এ ৪৭৩.১	সম্পদের দেবী
এ ৪৮৭	মৃত্যুর দেবতা
এ ৪৮৮	ধ্বংসের দেবতা
এ ৪৯৩	আগুনের দেবতা
এ ৬২৫.২.২	আকাশ কেন ওপরে
এ ৬৬১	স্বর্গ
এ ৭১০	সূর্যের জন্ম
এ ৭১১	চাঁদের জন্ম

এ ৭৬০	তারাদের জন্ম
এ ৭৯১	রামধনুর জন্ম
এ ১১৪১	বিদ্যুতের জন্ম
এ ১৩৩৫	মৃত্যু এল মানুষের জীবনে
এ ১৪১৪	আগুনের জন্ম
এ ২৬০১	ফসলের জন্ম
	বি. জীবজন্তু
বি ১০	পৌরাণিক কাল্পনিক পশু
বি ১১.১১	সাপের সঙ্গে যুদ্ধ
বি ৪১.২	পক্ষীরাজ ঘোড়া
বি ১২০	বুদ্ধিমান পশু
বি ১২০.২	বুদ্ধিমান শেয়াল
বি ১২২.১	যে পাখি উপদেশ দেয়
বি ১৩১	সত্যের পাখি
বি ১৪৩	জ্ঞানী পাখি
বি ১৮৪.১	জাদু ঘোড়া
বি ২১০	কথাবলা পশু
বি ২১১.১.৫	কথাবলা গোরু
বি ২১১.২.৮	কথাবলা ইঁদুর
বি ২১১.২.১০	কথাবলা বানর
বি ২১১.৩	কথাবলা পাখি
বি ২১১.৩.৫	কথাবলা বাজপাখি
বি ২১৫.১	পাখির ভাষা
বি ২১৬	পাখির ভাষায় জ্ঞান
বি ২২০	পশুদের গ্রাম
বি ২২৩	মাছেদের রাজ্য
বি ২৪০.৪	পশুরাজ সিংহ
বি ৩৫০	কৃতজ্ঞ পশু
বি ৩৬৫.১	ছানাদের উদ্ধার করায় কৃতজ্ঞ পাখি
বি ৪০১	উপকারী ঘোড়া
বি ৪১১	উপকারী গোরু
বি ৪১৩	উপকারী মোষ
বি ৪২১	উপকারী কুকুর
বি ৪৫০	উপকারী পাখি
বি ৪৬৩.২	উপকারী বক
বি ৪৯১.১	উপকারী সাপ
বি ৫০০	পশুর কাছ থেকে জাদুশক্তি লাভ

বি ৫৫২	পাখি-বাহিত মানুষ
বি ৫৭১	মানুষের জন্য পশু কাজ করে
বি ৫৮১.১	পাখি মানুষকে সম্পদ দেয়
বি ৭৭৬.৭	বিষধর সাপ
	সি. নিষেধাজ্ঞা
সি ৫০	নিষেধাজ্ঞা ঃ দেবতাকে বিরূপ করা
সি ২১০	নিষেধাজ্ঞা ঃ বিশেষ স্থানে খাদ্য গ্রহণ
সি ২১১	নিষেধাজ্ঞা ঃ স্বর্গে খাদ্য গ্রহণ
সি ২৫০	নিষেধাজ্ঞা ঃ পান করা
সি ৪২০	নিষেধাজ্ঞা ঃ গুপ্তকথা প্রকাশ
সি ৪২৫	নিষেধাজ্ঞা ঃ পশুর ভাষা জানা জ্ঞান প্রকাশ করা
সি ৯২১	নিষেধাজ্ঞা-ভঙ্গের জন্য তৎক্ষণাৎ মৃত্যু
সি ৯৩০	নিষেধাজ্ঞা-ভঙ্গের জন্য ভাগ্যহীন
সি ৯৬১.২	নিষেধাজ্ঞা-ভঙ্গের জন্য পাথরে পরিণত হয়
	ডি. ঐন্দ্রজালিকতা বা জাদু
ডি ১৫০	রূপ পরিবর্তন ঃ মানুষ থেকে পাখি
ডি ১৫০.৩	রূপ পরিবর্তন ঃ মানুষ থেকে পেঁচা
ডি ১৭০	রূপ পরিবর্তন ঃ মানুষ থেকে মাছ
ডি ২১২	রূপ পরিবর্তন ঃ মানুষ থেকে ফুল
ডি ২৩১	রূপ পরিবর্তন ঃ মানুষ থেকে পাথর
ডি ২৩১.২	রূপ পরিবর্তন ঃ মানুষ থেকে পাথরের স্তম্ভ
ডি ৪৮২	গাছ উঁচু হতে থাকে
ডি ৬৪২	মৃত্যুকে এড়াতে রূপ পরিবর্তন
ডি ৬৫১	শত্রুকে হত্যা করার জন্য রূপ পরিবর্তন
ডি ৬৭২	বাধাযুক্ত যাত্রা
ডি ৮০০	জাদুবস্তু
ডি ৮১১	দেবতার কাছ থেকে জাদুবস্তু পাওয়া
ডি ৮১২.১	সন্ন্যাসীর কাছ থেকে জাদুবস্তু পাওয়া
ডি ১০৬৫	জাদু-যাত্রা
ডি ১৩২৩	জাদু-বস্তু অলৌকিক শক্তি জোগায়
ডি ১৩৪৬.৯	জাদু-তরবারি অমরতা দান করে
ডি ১৩৪৭	জাদু-বস্তু উর্বরতা দান করে
ডি ১৩৯৩	জাদু-বস্তু পলাতককে সাহায্য করে
ডি ১৪০০.১.৪.১	জাদু-তরবারি শত্রুকে পরাজিত করে
ডি ১৪০১.১	জাদু-লাঠি আঘাত করে
ডি ১৪০১.৫	জাদু-থলের মধ্যে যুবক মালিকের শত্রুকে আঘাত করে
ডি ১৪১১	জাদু-বস্তু বেঁধে ফেলে

ডি ১৪৭২	জাদু-বস্তু থেকে খাদ্য পানীয়
ডি ১৫০০.১.৪	রোগ নিরাময়ে জাদু-গাছ
ডি ১৬৫২.৫.৫	পাত্রের অফুরন্ত জিনিস
ডি ১৭১১	জাদুকর
ডি ১৭১২	ভবিষ্যৎ-বক্তা
ডি ১৭১৩	সাধুর জাদু-শক্তি
ডি ১৮১০.০.১	দেবতার সর্বদর্শিতা
ডি ১৮১০.৯	দেবতার কাছ থেকে জাদু-জ্ঞান
ডি ১৮৭০	জাদুবলে লুকিয়ে থাকা
ডি ১৯৮০	জাদুর দ্বারা অদৃশ্য হওয়া
ডি ২১০০	জাদু-সম্পদ
ডি ২১৩১	জাদুর সাহায্যে নীচের পৃথিবীতে যাত্রা
ডি ২১৫০	জাদু-ঝড়
ডি ২১৬৫	জাদুর সাহায্যে পলায়ন

ই. মৃত

ই ০	পুনর্জীবন
ই ৫২	জাদুবলে পুনর্জীবন লাভ
ই ৮০	জিয়ন-জল
ই ১২১.১	দেবতার কৃপায় পুনর্জীবন
ই ৬০০	পুনর্জন্ম
ই ৭০০	বহিরঙ্গ আত্মা
ই ৭১১	বস্তুর মধ্যে আত্মা
ই ৭১১.২	গাছের মধ্যে আত্মা
ই ৭৬১.৪.৭	জীবনলক্ষণ ঃ তরবারিতে মরচে ধরে

এফ. অসাধ্য সাধন

এফ ০	অন্য ভুবনে যাত্রা
এফ ১০	আকাশে আরোহণ
এফ ১১	আকাশ-পথে যাত্রা
এফ ১৫	তারাদের দেশে যাত্রা
এফ ১৬	চাঁদের দেশে যাত্রা
এফ ১৭	সূর্যের দেশে যাত্রা
এফ ৫১	আকাশ-দড়ি
এফ ৫১.১	আকাশ-পথে মাকড়সার জাল
এফ ৫৪.১	গাছ মাথা তুলে বড় হয়
এফ ১১১	পাতাল-রাজ্য
এফ ১২৭	পাতালে পশুর রাজ্যে যাত্রা
এফ ১৫২	অন্য ভুবনে রামধনুর পথ

এফ ২০০	পরি
এফ ২৫২.২	পরিরানি
এফ ২৬১	নৃত্যরতা পরি
এফ ২৬৫	স্নানরতা পরি
এফ ৩৭০	পরিরাজ্যে যাত্রা
এফ ৩৮৬.২	মানুষকে বিয়ে করার অপরাধে পরি শাস্তি পায়
এফ ৪০২	অনিষ্টকারী দানব
এফ ৪০৩.২	রাক্ষস মানুষকে সাহায্য করে
এফ ৪২০.৬.৫	মেঘকন্যার সঙ্গে মানুষের প্রেম বা বিয়ে
এফ ৫৫৫	আশ্চর্য চুল
এফ ৫৭৪.১	চোখ-ধাঁধানো রূপ
এফ ৫৭৫.১	পরম রূপবতী কন্যা
এফ ৬১০	অস্বাভাবিক শক্তিমান মানুষ
এফ ৭৭১	অস্বাভাবিক প্রাসাদ
এফ ৭৭১.১.৫.৫	যে প্রাসাদে মণি-মাণিক্যের ছড়াছড়ি
এফ ৭৭১.৪.৩	পরিত্যক্ত পুরী
এফ ৯৮৯.১৭	অস্বাভাবিক দ্রুতগামী ঘোড়া

জি. রাক্ষস-খোক্কস-দৈত্য-দানব-ডাইনি

জি ১০০	দৈত্য
জি ২৬৯.৮	দানব জাহাজ ডুবিয়ে দেয়
জি ৫০১	বোকা দানব
জি ৫১২.১	দানব নিহত হল
জি ৫৭২	দানব কৌশলের দ্বারা পরাজিত হল

এইচ. পরীক্ষা

এইচ ১০১০	অসম্ভব কাজ
এইচ ১০১০.৩	অজানা কাজ
এইচ ১২৩৩	অনুসন্ধানে সাহায্যকারী
এইচ ১৩৩১.১	অসাধারণ পাখির জন্য অনুসন্ধান
এইচ ১৩৭১	অসম্ভব অনুসন্ধান
এইচ ১৩৭৫	অস্বাভাবিক অনুসন্ধান

জে. চালাক ও বোকা

জে ২১	অভিজ্ঞতার মাধ্যমে উপদেশ সত্য প্রমাণিত হয়
জে ১৫৫	নারীর কাছ থেকে জ্ঞান
জে ১৫৭	স্বপ্নের মাধ্যমে জ্ঞান
জে ১১১২	বুদ্ধিমতী বউ
জে ১৮২০	ভুল বোঝার ফলে বেঠিক কাজ করে ফেলা
জে ২১৬০	অপরিণামদর্শিতা

কে. প্রতারণা

কে ১২.৩	খেলায় প্রতিযোগিতা
কে ১০০	প্রতারণার মাধ্যমে লাভ
কে ১২১	ছাই সোনার দামে বিকোয়
কে ১৭১.১	প্রতারিত ফসল ভাগ ঃ গোড়ার দিক আগার দিক
কে ২১২	ভয়ে দৈত্য প্রতারিত হয়
কে ৫৫০	মিথ্যে অজুহাত দেখিয়ে পলায়ন
কে ৭৩৫	ফাঁদে ফেলে বন্দি করা
কে ১০৮১	প্রতারিত অন্ধ মানুষ
কে ১৮৬০	সঠিক সময়ে প্রতারণা
কে ২১১০.১	নিন্দিতা বউ
কে ২২১১.০.৪	বিশ্বাসঘাতক বন্ধু
কে ২২১৩	বিশ্বাসঘাতিনী বউ
কে ২২২২	বিশ্বাসঘাতিনী সতীন

এল. ভাগ্যচক্র

এল ১০	বিজয়ী কনিষ্ঠ পুত্র
এল ১০০	অতি সাধারণ নায়ক বা নায়িকা
এল ১১৩.১	অতি নিচু কাজে নিযুক্ত নায়ক
এল ১২৩	কপর্দকশূন্য নায়ক
এল ১৬১	অতি সাধারণ নায়ক রাজকন্যাকে বিয়ে করে
এল ১৬২	অতি সাধারণ নায়িকা রাজপুত্রকে বিয়ে করে
এল ৪৫১	পুনর্মিলন

এম. ভাগ্য বা নিয়তিকে বশে আনা

এম ২০৩	রাজার কথা অপরিবর্তনীয়
এম ২০৫	সংকল্প ভাঙা
এম ৩০২.২	মানুষের ভাগ্য পুর্ননির্ধারিত থাকে
এম ৩৬১	ভাগ্যবান নায়ক
এম ৩৭৩	ভবিষ্যৎ-বাণী এড়াতে পলায়ন

এন. অদৃষ্ট বা কপাল

এন ২০৩	ভাগ্যবান মানুষ
এন ২৫০	ধারাবাহিক মন্দ কপাল
এন ৮১০	অলৌকিক সাহায্যকারী
এন ৮১২	সাহায্যকারী দৈত্য
এন ৮১৫	সাহায্যকারিণী পরি
এন ৮৩১	সাহায্যকারিণী মেয়ে
এন ৮৪৩	সাহায্যকারী সন্ন্যাসী

পি. সমাজ

পি ১৬.৪.১	সতী
পি ২৫৩	ভাই ও বোন
পি ৩১০	বন্ধুত্ব
পি ৩১১.৮	রাজপুত্র ও সাধারণ মানুষের মধ্যে বন্ধুত্ব
পি ৬১১	স্নানের সময়ে নারীর সঙ্গো দেখা

কিউ. পুরস্কার ও শাস্তি

কিউ ২	দয়ালু ও নির্দয়
কিউ ২০	ধর্মানুরাগের পুরস্কার
কিউ ২১	ধর্মীয় আত্মত্যাগের পুরস্কার
কিউ ৩২	প্রার্থনা করবার জন্য পুরস্কার
কিউ ৩৩	সুন্দর স্বভাবের পুরস্কার
কিউ ৪২	উদারতার পুরস্কার
কিউ ৪৫	আতিথেয়তার পুরস্কার
কিউ ৫১	পশুর প্রতি দয়ার জন্য পুরস্কার
কিউ ২০০	পাপের শাস্তি
কিউ ২২০	অধর্মের শাস্তি
কিউ ২২৩	দেবতার প্রতি অবহেলার শাস্তি
কিউ ২৬১	বিশ্বাসঘাতকতার শাস্তি
কিউ ২৬৬	প্রতিজ্ঞাভঙ্গোর শাস্তি
কিউ ২৭৬	লোভের শাস্তি
কিউ ২৮১	অকৃতজ্ঞতার শাস্তি
কিউ ২৮৫	নিষ্ঠুরতার শাস্তি
কিউ ২৮৬	অনুদারতার শাস্তি
কিউ ৩৩১	অহঙ্কারের শাস্তি
কিউ ৩৮৫	বন্দি পশুরা প্রতিশোধ নেয়
কিউ ৪২৮	শাস্তি ঃ জলে ডুবিয়ে হত্যা
কিউ ৪৩১	শাস্তি ঃ নির্বাসন
কিউ ৫৫১.৪	শাস্তি ঃ পাথরে পরিণত হওয়া
কিউ ৫৬০	শাস্তি ঃ নরকভোগ

আর. বন্দি ও পলাতক

আর ১১	দানবের দ্বারা অপহরণ
আর ১১.১	দানব বালিকাকে অপহরণ করে
আর ৩৯.২	বুড়ির দ্বারা অপহরণ
আর ১১০	বন্দির মুক্তি
আর ১১১	বন্দিনী মেয়ের মুক্তি
আর ২২৫	ভুলিয়ে কাউকে নিয়ে যাওয়া

আর ৩২১	তারার রাজ্যে পলায়ন
	এস. অস্বাভাবিক নিষ্ঠুরতা
এস ৩১	নিষ্ঠুর সৎমা
এস ১১৫.৪	মাথার কাঁটা ফুটিয়ে হত্যা
এস ১৪৩	বনে নির্বাসন
এস ৪০০	যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি
এস ৪০০.৫	জলপ্রপাতের নীচে শুইয়ে শাস্তি
	টি. যৌনবিষয়ক
টি ১১.৪.২	অদেখা মেয়ের চুল দেখে প্রেমে পড়া
টি ১৫	প্রথম দেখতেই প্রেম
টি ৫২	বর কেনা
টি ৫৩	ঘটক
টি ৬৮	পুরস্কার হিসেবে রাজকন্যাকে দান
টি ৮০	ব্যর্থ প্রেম
টি ৯১	অসম প্রেম
টি ৯১.৫.১	ধনীর মেয়ের সঙ্গে গরিব ছেলের বিয়ে
টি ৯১.৬.৪	রাজকন্যা অতি সাধারণ ছেলেকে ভালোবাসে
টি ১১১.১	মানুষের সঙ্গে দেবতার বিয়ে
টি ১২১	অসম বিয়ে
	ডাবলিউ. চারিত্রিক গুণ ও বৈশিষ্ট্য
ডাবলিউ ১১	উদারতা
ডাবলিউ ১১.২	দয়ালু রাজা
ডাবলিউ ১৫৪	কৃতজ্ঞতাবোধ
ডাবলিউ ১৫৪.৮	কৃতজ্ঞ পশু অকৃতজ্ঞ মানুষ
	জেড. বিভিন্ন
জেড ১১	যে গল্পের শেষ নেই
জেড ৭১.৫.১	সংকেত সংখ্যা ঃ সাত ভাই এক বোন

গ্রন্থপঞ্জি

African Folktales and sculpture : P. Radin & J. Sweeney. Belligen Foundation, New york, 1952.

African Myths and Tales : Susan Feldmann. Dell Publishing Co. Inc. New. York, 1963

Ashanti : R. S.Rattray. Oxford University Press, 1923

Facing Mount Kenya : Jomo Kenyatta. Secker & Warburg. London, 1953

Fetichism in West Africa : Rev. Robert Hamill Nassau. Young people's Missionary Movement, New York, 1904

In the shadow of the Bush : P. A. Talbot. William Heinemann Ltd, London, 1912

Myths and Legends of the Bantu : A. Werner. Harrap, London 1933

Religions of Primitive Peoples : Daniel Garruson Brinton. G. P. Putnams, London, 1897

Specimens of Bushmen Folklore : W. H. I. Bleek & L. C. Lloyd. London, 1911

Tales Told in Togoland : A. W. Cardinall. Oxford University Press, 1931

The Bavenda : H. A. Stayt. Oxford University Press, London, 1931.

The Life of a South African Tribe : H. A. Junod. Macmillan & Co. Ltd., London, 1927

The Masai : A. C. Hollis. The Clarendon Press, Oxford, 1905

The Mende of Sierra Leone : K. L. Little. Routledge and Kegan Paul, London, 1951

Twilight and the Tortoise : Kunle Akinsemoyin. African Universities Press, Lagos, Nigeria, 1964

With a Prehistoric people : K. Routledge. Edward Arnold Ltd, London, 1910

Yes and No. A. Jablow. Horizon Press Inc. New York, 1961

A New Book of Tribal Fiction : Verrier Elwin. North-East Frontier Agency, Shillong, 1970

An Anthology of Indian Tales : C. A. Kincaid. Humphrey Milford. London, 1924

Folklore of the Santal Parganas : C. H. Bompas, David Nutt, London, 1909

Hahn's Oraon Folklore : A. Grignard. Government Printing, Bihar and Orissa, Patna, 1931

Himalayan Folklore : Rev. E. S. Oakley & Tara Dutt Gairola. Printing and Stationery, Allahabad, U. P. 1935

Indian Myth and Legend : D. A. Mackenzie. Grahzam Publishing Co. Ltd. London, 1913

In the Nicobar Island : B. Whitshad, Seely Service & Co. Ltd. London, 1924

Myths of middle India : Verrier Elwin. Geoffery Cumberiege, Oxford University Press, Madras, 1949

The Khasis : P. R. T. Gurdon. Macmillan and Co. Ltd., London 1914

The Mikirs : Edward Stack. David Nutt, London 1908

The Naked Nagas : C. V. Furer-Haimendrof. Thacker, Spink & Co. (P) Ltd, Calcutta, 1962

The Handbook of Folklore : G. L. Gomme, Folklore Society, London 1890
The Garos : A Playfair. David Nutt, London, 1909
The Lusai Kuki Clans : John Shakespear. Macmillan and Co. Ltd, London, 1912
Tribal myths of Orissa : Verrier Elwin, Geoffery Cumberiege, Oxford University Press, London, 1954
Tribal Folktales of Assam (Hills) : S. N. Barkataki. Publication Borad, Assam, 1970
Tribes of India : V. Raghaviah (Editor) Bharatiya Adimjati Sevak Sangh, New Delhi, 1969
Tribal Heritage : W. J. Culshaw. Lutterworth Press, London, 1949
Hawaiian Mythology : Backwith, Martha Warren. Yale University Press, 1940
The Maori as he was : Best, Elsdon. Wellington, New Zealand, 1924
Both sides of Buka passage : Blackwood,B. Oxford, 1935
A flower in my ear : Burrows, E.G. University of Washington Press, Seattle, 1963.
Sumerian epics and myths : Chiera. Chicago University Press, 1934
The migratory legends : Christiansen, Reidar. Helsinki, 1958
A Voyage to Tasmania : Crozet, Lieutenant. New Zealand, (Eng. translation by H. Ling Roth), 1891
Creation myths among the early Filipinos : Demetrio, F. Asian Folklore Studies, XXVII-I, 1968
Mythology of Oceania (Vol 9) : Dixon R. B. Cooper Square Pubs, Inc. New York, 1932
Chinese fairy tales and folk-tales : Eberhard, Wolfram, London, 1937
The Australian aborigines : Elkin, A.P. Sydney, 1938
Tongan myths and tales : Gifford, E.W. Bernice P. Bishop Museum, Honolulu, 1924
Myths and songs from the south Pacific : Gill, W.W. London, 1876
Polynesian mythology : Grey, George, Whitcombe and Tombs, London, 1965
Asiatic mythology : Hackin, J. (Eng. translation by R.M. Alkinson) George G. Harrap, London, 1963
Ancient Hawaiian civilization : Handy. E.S.C. Honolulu, 1933
The native tribes of south-eastern Austrialia : Howitt, A.H. Macmillian and Co. Ltd.. London, 1904
The Southern New Hebrides : Humphreys. C.B. Cambridge University Press, 1926
Folkates of Japan : Keigo Seki, (Eng. translation by Robert J. Adams) Chicago University Press, 1963
Folktales of the Kiwai Papuans : Landtman. G. Finnish society of literature, Helsinki, 1917
Tales from Atoll : Lessa, W.A. University of California, 1961

Tales from China : Lin Siam-Tek. John Day Company, New York. 1944
Austrialian legendary tales : Paskar, K.L. London. 1897
Oceanic mythology : Poignant, Roslyn, Paul Hamlyn, London, 1967
The Melanesians of British New Guinea : Seligmann, C.S. Cambridge 1914
Myrhs and legends of many lands : Smith, Evelyn. Thomas Nelson Ltd. London. 1930
Howaiki : Smith, S.P. London 1921
Old Samoa : Stair, J.B. London, 1897
Aranda traditions : Streholw, T.G.H. Melbourne University Press 1947
The Fijians : Thomson, B. London, 1908
Hawaiian Folktales : Thrum, T.G. Chicago, 1907
Mono-Alu Folklore : Wheeler, G.C. Routledge, Kegan Paul Ltd. London, 1926
Anicient history of the Maori : White, J. Wellington, 1887
Tales of the North American Indian : Stith Thompson, Indiana University Press, Bloomington, 1929
Myths of the origin of fire : J.G. Frazer, Macmilla & Co. Ltd. London, 1930
The Godden Bough : J. G. Frazer, Macmillann & Co. Ltd. London, (Abridged Edition), 1957
Quest for fire : J.S. Rosny-Aine, Penguin Books. Great Britain, 1981
Favourite Folktales of China : Zhong Jingwen (Eng. Tr. by John Minford) New World Press, Beijing, China 1983